সীরাতে সরওয়ারে আলম

৫ম খন্ড

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

সীরাতে সরওয়ারে আলম (সা)

৫ম খণ্ড

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ ঃ আব্বাস আলী খান

শতাব্দী প্রকাশনী

আমাদের কথা

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.) তাঁর বিখ্যাত সীরাতে সরওয়ারে আলম গ্রন্থটি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। হিজরত পর্যন্ত লেখার পর তিনি ওফাত লাভ করেন। উর্দু ভাষায় তা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। হিজরত পর্যন্ত উর্দু দুই খণ্ডকে আমরা বাংলায় পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ করেছি। উর্দু প্রথম খণ্ডকে বাংলায় দু'খণ্ডে এবং উর্দু দ্বিতীয় খণ্ডকে বাংলায় তিন খণ্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। এ খণ্ডটি উর্দু দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় অংশ।

বাংলা প্রথম খণ্ডে মূলত নবুওত ও রিসালত সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে অতীত জাতিগুলোর ধ্বংসের ইতিহাস। তৃতীয় খণ্ড থেকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সীরাতের ইতিহাস আলোচনা শুরু হয়েছে।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী মাওলানার সবগুলো গ্রন্থই বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে পেশ করার পরিকল্পনা করেছে। ইতোমধ্যে তার প্রায় সবগুলো গ্রন্থই বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মাওলানার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী সুসাহিত্যিক জনাব আব্বাস আলী খান। তাঁর অনুবাদ কাজের পারদর্শিতা, শব্দ প্রয়োগের নিপুণতা এবং ভাষার বলিষ্ঠতা সম্পর্কে সুধী পাঠকগণকে নতুন করে কিছু বলার আছে বলে আমরা মনে করিনা।

একাডেমীর পক্ষ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি। এ গ্রন্থের সকল পাঠককে তিনি নবুওতের প্রকৃত মিশন উপলব্ধির তৌফিক দিন। আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী

ইসলাম প্রকৃতপক্ষে সেই আন্দোলনের নাম যা এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ধারণা-বিশ্বাসের ওপর মানব জীবনের গোটা প্রাসাদ নির্মাণ করতে চায়। এ আন্দোলন অতি প্রাচীনকাল থেকে একই ভিত্তির ওপর এবং একই পদ্ধতিতে চলে আসছে। এর নেতৃত্ব তাঁরা দিয়েছেন, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার নবী রসূল বলা হয়। আমাদেরকে যদি এ আন্দোলন পরিচালনা করতে হয়, তাহলে অনিবার্যরূপে সেসব নেতৃবৃন্দের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। কারণ এছাড়া অন্য কোন কর্মপদ্ধতি এ বিশেষ ধরনের আন্দোলনের জন্যে না আছে আর না হতে পারে। এ সম্পর্কে যখন আমরা আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) এর পদাংক অনুসন্ধানের চেষ্টা করি, তখন আমরা বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হই। প্রাচীনকালে যেসব নবী তাঁদের জীবন অতিবাহিত করেছেন, তাঁদের কাজকর্ম সম্পর্কে আমরা বেশী কিছু জানতে পারিনা। কুরআনে কিছু সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু তার থেকে গোটা পরিকল্পনা উদ্ধার করা যায়না। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে হযরত ঈসা (আঃ) এর কিছু অনির্ভরযোগ্য বাণী পাওয়া যায় যা কিছু পরিমাণে একটি দিকের ওপর আলোকপাত করে এবং তা হলো এই যে, ইসলামী আন্দোলন তার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে কিভাবে পরিচালনা করা যায় এবং কি কি সমস্যার সম্মুখীন তাকে হতে হয়। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) কে পরবর্তী পর্যায়ের সম্মুখীন হতে হয়নি এবং সে সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিতও পাওয়া যায়না। এ ব্যাপারে একটি মাত্র স্থান থেকে আমরা সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ পথ নির্দেশ পাই এবং তা হচ্ছে নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) এর জীবন। তাঁর দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন তাঁর প্রতি আমাদের শুধু শ্রদ্ধাশীল হওয়ার কারণে নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে এ পথের চড়াই উৎরাই সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্যে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে আমরা বাধ্য। ইসলামী আন্দোলনের সকল নেতৃবৃন্দের মধ্যে শুধু নবী মুহাম্মদ (সা)ই একমাত্র নেতা যাঁর জীবনে আমরা এ আন্দোলনের প্রাথমিক দাওয়াত থেকে শুরু করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এবং অতঃপর রাষ্ট্রের কাঠামো, সংবিধান, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি-পদ্ধতি পর্যন্ত এক একটি পর্যায় ও এক একটি দিকের পূর্ণ বিবরণ এবং অতি নির্ভরযোগ্য বিবরণ আমরা জানতে পারি।

আমার বিভিন্ন রচনায় রিসালাত ও সীরাতে পাক সম্পর্কিত আলোচনাসমূহকে চমৎকারভাবে একত্রে সংকলিত করে জনাব নঈম সিদ্দীকী ও জনাব আবদুল ওয়াকীল আলভী এ গ্রন্থের প্রথম খন্ড (বাংলায় ১ম ও ২য় খন্ড) তৈরী করেন। সেখানে পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের তেমন প্রয়োজন অনুভব করিনি।

কিন্তু এ খন্ডের জন্যে তাঁরা আমার যেসব লেখা সংকলন করেছেন, সেগুলোতে মাঝে মাঝে শূন্যতা রয়ে গেছে। এসব শূন্যতা নিয়ে কিছুতেই একটি সীরাত গ্রন্থ প্রণীত হতে পারেনা। তাই, এতে আমি ব্যাপকহারে সংযোজন ও পরিবর্ধন করেছি। এখন এটি একটি অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক সীরাত গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

এই (মূল) দ্বিতীয় খন্ড হিজরতের বর্ণনায় এসে সমাপ্ত হয়েছে। এরপরই শুরু হবে মাদানী অধ্যায়। সে অধ্যায় মূলত অকূল সমুদ্র সম। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাকে এ গ্রন্থটি পূর্ণ করার শক্তি ও তৌফিক দান করেন এবং এটিকে যেন তাঁর বান্দাদের জন্যে কল্যাণময় করেন।

আবুল আ'লা

- ☐ সপ্তম অধ্যায়ঃ সাধারণ দাওয়াতের সূচনা ১৩
- ● ইসলামের সর্বপ্রথম প্রকাশ ১৩
- ● আপন পরিবারবর্গের প্রতি দাওয়াত ১৫
- ● কুরাইশের সকল পরিবারের প্রতি ইসলামের দাওয়াত ১৬
- ● আবু লাহাবের আচরণ ১৭
- ● কুরআনে আবু লাহাবের নাম নিয়ে তার নিন্দা করার কারণ ১৮
- ● হুযুরের নিকৃষ্ট প্রতিবেশী ১৯
- ● হুযুরের (স) কন্যাদেরকে তালাক দিতে আবু লাহাব তার পুত্রদের বাধ্য করে ২০
- ● নবী পুত্রের মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ ২০
- ● ইসলামী দাওয়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ২১
- ● শিয়াবে আবি তালেব ঘেরাওকালে আবু লাহাবের আচরণ ২১
- ● তার বিরোধিতা ইসলামী দাওয়াতের কাজে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো ২২
- ● তার স্ত্রীর আচরণ ২২
- ● আবু লাহাবের পরিণাম ২৩
- ● সর্ব সাধারণের মধ্যে ইসলাম প্রচার ২৩
- ● নবী পাক (সা) এর নৈতিক প্রভাব ২৫
- ● আবু জাহলের আতংকিত হওয়ার ঘটনা ২৬
- ● দ্বিতীয় ঘটনা ২৭
- ● তৃতীয় ঘটনা ২৮
- ● বিরুদ্ধবাদীগণ নবীর (স) সততা ও সত্যবাদিতা স্বীকার করতো ২৮
- ● নবী (স) সম্পর্কে কুরাইশদের ধারণা বিশ্বাস ৩০
- ☐ সূত্র নির্দেশিকা ৩১
- ☐ অষ্টম অধ্যায়ঃ ইসলামী দাওয়াত প্রতিরোধের জন্যে কুরাইশদের ফন্দিফিকির ৩৩

১. নবী (স) এর সাথে আপোসের চেষ্টা ৩৪
  - ● তাঁর সাথে ওতবা বিন রাবিয়ার সাক্ষাৎ ৩৪
  - ● আর একটি প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ ৩৬
  - ● আপোসের আরও কিছু চেষ্টা ৩৭

২. হযরত আবু তালিবের উপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা ৩৯
  - ● প্রথম প্রতিনিধি দল ৩৯
  - ● দ্বিতীয় প্রতিনিধি দল ৩৯
  - ● আবু জাহল হুযুরকে (স) হত্যা করার চেষ্টা করে ৪০
  - ● তৃতীয় প্রতিনিধি দল ৪১
  - ● চতুর্থ প্রতিনিধি দল ৪৩

- আবু তালিব বনী হাশিম ও বনী আল মুত্তালিবকে একত্রে সমবেত করেন ৪৩
- কুরাইশদের প্রতি আবু তালিবের হুমকি প্রদর্শন ৪৩

৩. কুরাইশদের বালসুলভ ও হীন আচারণ ৪৪
- হযরত যয়নবকে (রা) তালাক দেয়াবার চেষ্টা ৪৪
- নবী পুত্রের মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ ৪৫
- কুরআনের আওয়াজ শুনা মাত্র হৈ চৈ করা ৪৭
- কুরআনের কদর্থ করে পথভ্রষ্ট করা ৪৮
- মুসলমানদেরকে অযথা ও বেহুদা বিতর্কে লিপ্ত করা ৪৮
- মুসলমানদের বিদ্রুপ করা ও তাদেরকে হেয় করা ৪৯
- অজ্ঞ লোকদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করা ৪৯

৪. সাংস্কৃতিক কর্মসূচী ৫০

৫. মিথ্যার অভিযান ও তার প্রভাব ৫০
- হজ্জের সময় কুরাইশদের পরামর্শ ৫১
- এ ঘটনার বিষয়ে কুরআনের পর্যালোচনা ৫২
- স্থায়ীভাবে ও ব্যাপক আকারে মিথ্যা প্রচারণা ৫২
- মক্কার বাইরে ইসলামের প্রচার ৫৩
- তুফাইল বিন আমর দাওসীর ইসলাম গ্রহণ ৫৩
- হযরত আবুযর গিফারীর (রা) ইসলাম গ্রহণ ৫৪
- আমর বিন আবাসা সুলামীর ইসলাম গ্রহণ ৫৬
- দিমাদুল আযদীর (রা) ইসলাম গ্রহণ ৫৭
- হযরত আবু মূসা আশয়ারীর (রা) ইসলাম গ্রহণ ৫৭
- মুয়ায়কীব বিন আবি ফাতিমা আদ্দাউসীর ইসলাম গ্রহণ ৫৮
- জুয়াল বিন সুরাকা (রা) ৫৮
- আবদুল্লাহ (রা) ও আবদুর রহমান কিনানী (রা) ৫৮
- বুরায়দাহ বিন আল মুসাইবের ইসলাম গ্রহণ ৫৮

৬. মুসলমানদের উপর জুলুম নির্যাতন ৫৯
- পরিবারের অধীন লোকদের উপর জুলুম নির্যাতন ৫৯
- হযরত খালিদ বিন সাঈদের (রা) বর্ণনা ৬০
- হযরত আবু বকরের (রা) উপর অমানুষিক জুলুম ৬১
- হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদকে নির্মমভাবে প্রহার করা হয় ৬২
- অসহায় দাস দাসীদের উপর জুলুম নির্যাতন ৬৩
- হযরত বেলাল ৬৩
- হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা) ৬৩
- হযরত খাব্বাব বিন আল আরাত ৬৪
- হুযুরের (স) নিকটে হযরত খাব্বাবের ফরিয়াদ এবং তাঁর জবাব ৬৫
- হযরত আবু বকর কর্তৃক মজলুম গোলামদের খরিদ করে আযাদ করা ৬৫
- হযরত আবু বকরের (রা) পিতার আপত্তি ও তাঁর জবাব ৬৭
- অত্যাচার উৎপীড়নের পরিণাম ৬৭

● অহী বন্ধের কাল ৬৮
● সূরা 'দোহা' নাযিল হওয়া ৬৯
● সূরা 'আলাম নাশরাহ' অবতরণ ৭০
□ সূত্র নির্দেশিকা ৭৪
□ **নবম অধ্যায়ঃ আবিসিনিয়ায় হিজরত** ৭৬
● দ্বীন ইসলামে হিজরতের গুরুত্ব ৭৬
● কুরআনে মুসলমানদেরকে হিজরতের জন্যে তৈরী করা হয় ৭৬
● হিজরতের সময় হিদায়াত ৭৯
● আবিসিনিয়ার প্রথম হিজরত ৮০
● প্রথম হিজরতে অংশ গ্রহণকারী ৮০
● আবিসিনিয়ায় মুহাজিরদের সাথে আচরণ ৮১
● তাঁদের পেছনে কুরাইশ প্রতিনিধি দলের গমন ৮১
● মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন ও তার কারণ ৮১
● গারানিক কাহিনীর রহস্য ৮৩
● প্রত্যাবর্তনকারী মুহাজিরগণের অবস্থা ৮৯
● আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয়বার হিজরত ৯১
● মুহাজিরগণের তালিকা ৯২
● মক্কায় এ হিজরতের প্রতিক্রিয়া ৯৬
● হযরত আবু বকরের (রা) হিজরতের ইচ্ছা ৯৬
● মুহাজিরগণকে ফেরৎ আনার জন্য নাজ্জাশীর নিকটে মুশরিকদের প্রতিনিধি ৯৭
● হযরত উম্মে সালমার (রা) বর্ণনা ৯৭
● হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদের বর্ণনা ১০০
● হযরত আবু মুসা আশয়ারীর বর্ণনা ১০১
● স্বয়ং হযরত জা'ফরের (রা) বর্ণনা ১০১
● মুহাজিরদের সত্যবাদী ভূমিকা ১০১
● আবিসিনিয়া থেকে ঈসায়ী প্রতিনিধিদের আগমন ১০২
● আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকারী মুহাজিরদের প্রথম তালিকা ১০৩
● সূরা রূমের ভবিষ্যদ্বাণী ১০৪
□ সূত্র নির্দেশিকা ১০৭
□ **দশম অধ্যায়ঃ নবুওতের ৬ষ্ঠ বছরের পর থেকে দশম বছরের পর পর্যন্ত** ১০৯
● নবী (সা) এর উপর কুরাইশদের নির্যাতন ১০৯
● হযরত হামযার (রা) ইসলাম গ্রহণ ১১১
● হযরত ওমরের (রা) ইসলাম গ্রহণ ১১২
● তাঁর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ১১৩
● তাঁর মনে হিজরতে হাবশার প্রতিক্রিয়া ১১৩
● তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী ১১৪
● হযরত ওমরের (রা) বর্ণনা ১১৫
● ইবনে ওমরের (রা) বর্ণনা ১১৬
● ওমরের (রা) ইসলাম গ্রহণের তারিখ ১১৭

- 'শিয়াবে আবি তালিবে' অবরুদ্ধ অবস্থায় ১১৭
- চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার ঘটনা ১২০
- কিভাবে অবরোধের অবসান হলো ১২২
- আল্লাহর কুদরতের এ এক বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ ১২৪
- হযরত খাদিজা (রা) ও জনাব আবু তালেবের ইন্তেকাল ১২৫
- মুসলমানদের প্রতি কাফেরদের নির্যাতন ১২৬
- আবু তালেবের অসিয়ত ১২৭
- আবু লাহাব হুযুরের (সা) সমর্থনের জন্য অগ্রসর হয়ে পেছনে ফিরে যায় ১২৮
- হযরত সাওদার (রা) সাথে বিবাহ ১২৯
- হযরত আয়েশার সাথে বিবাহ ১৩০
- হযরত আয়েশার (রা) বিয়ের তারিখ ১৩১
- আয়েশার (রা) বিয়ের বিরূপ সমালোচনা ১৩২
- তায়েফ সফর ১৩৪
- হুযুরের (সা) উপর তায়েফবাসীদের বিরাট জুলুম ১৩৫
- নবীর (সা) মর্মস্পর্শী দোয়া ১৩৬
- নবীর (সা) 'রাহমাতুল্লিল আ'লামীন' হওয়ার বর্ণনা ১৩৬
- আদ্দাস নাসরানীর ইসলাম গ্রহণ ১৩৭
- জিনদের কুরআন শ্রবণ ১৩৮
- প্রত্যাবর্তনের পর মক্কায় হুযুরের (সা) প্রবেশ কিভাবে হয় ১৩৯
- □ সূত্র নির্দেশিকা ১৪১

□ **একাদশ অধ্যায়ঃ ইস্‌রা ও মে'রাজের মর্মকথা** ১৪২

- মে'রাজের তারিখ ১৪২
- ঐতিহাসিক পটভূমি ১৪৩
- ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৪৩
- মে'রাজ দৈহিক ছিল না আত্মিক? ১৪৪
- হাদীস অস্বীকারকারীদের আপত্তি অভিযোগ ১৪৫
- মে'রাজকে স্বপ্ন বলে আখ্যায়িতকারীদের যুক্তি পর্যালোচনা ১৪৬
- মে'রাজের প্রকৃত মর্মকথা ১৪৮
- মে'রাজের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ১৪৯
- বিভিন্ন পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্টকারী শক্তি ১৫০
- বায়তুল মাকদেসে নামায ১৫০
- প্রথম আসমানে ১৫১
- পরবর্তী আসমানগুলোতে ১৫৪
- সিদরাতুল মুন্তাহা ১৫৪
- প্রত্যাবর্তন ১৫৫
- হযরত সিদ্দীকের (রা) সত্যতা স্বীকার ১৫৬
- আরও সাক্ষী ১৫৭
- হুযুরকে (সা) পাঁচ ওয়াক্ত নামায শিক্ষাদান ১৫৮
- মে'রাজের পয়গাম ১৫৮
- বনী ইসরাঈলের ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ ১৫৯

- প্রত্যেক ব্যক্তি দায়িত্বশীল ১৫৯
- বড়ো লোকদের অধঃপতন ১৫৯
- দুনিয়ার সাথে আখেরাতের গুরুত্ব ১৫৯
- ইসলামী তামাদ্দুনের বুনিয়াদী মূলনীতি ১৬০
- হুযুরকে হিজরতের দোয়া শিক্ষাদান ১৬৪
- সাহায্যের জন্যে মজলুম মুসলমানদের দোয়া শিক্ষাদান ১৬৫
- মে'রাজের আর একটা দিক ১৬৬
- জিব্রিল (আ) এর সাথে হুযুর (সা) এর দুনিয়ার উপর প্রথম সাক্ষাত ১৬৬
- এ ধরনের অসাধারণ পর্যবেক্ষণের পর নবীর মনে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার কারণ ১৬৭
- জিব্রিলের সাথে দ্বিতীয় সাক্ষাত সিদরাতুল মুন্তাহায় ১৬৮
- সিদরাতুল মুন্তাহা ১৬৯
- জান্নাতুল মাওয়া ১৬৯
- সিদরার উপরে আল্লাহর তাজাল্লীর প্রতিভাত ১৬৯
- হুযুর (সা) এর সংযম ও ধৈর্য ১৬৯
- নবী (সা) কি আল্লাহকে দেখেছিলেন? ১৭০
- হযরত আয়েশার (রা) বর্ণনা ১৭১
- হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদের (রা) বর্ণনা ১৭২
- হযরত আবু হুরায়রার (রা) বর্ণনা ১৭৩
- হযরত আবুযুর (রা) এ রর্ণনা ১৭৩
- হযরত আবু মূসা আশয়ারীর (রা) বর্ণনা ১৭৩
- হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রা) বর্ণনা ১৭৩
- মুহাম্মদ বিন কাব আল কুরাযীর বর্ণনা ১৭৪
- হযরত আনেসের (রা) বর্ণনা ১৭৪

☐ সূত্র নির্দেশিকা ১৭৬

☐ **দ্বাদশ অধ্যায়ঃ মক্কী যুগের শেষ তিন বছর** ১৭৭

- সেসব গোত্র যাদের সাথে মিলিত হন ১৭৭
- গোত্রগুলোর সাথে সাক্ষাতের বিবরণ ১৮০
- বনী হামদানের এক ব্যক্তির দ্বিধা প্রকাশ ১৮০
- বনী বকর বিন ওয়ায়েলের সাথে সাক্ষাৎ ১৮০
- বনী আমের বিন সা'সায়ার সাথে সাক্ষাৎ ১৮১
- বনী শায়বান বিন সা'লাবার সাথে সাক্ষাৎ ১৮১
- বনী আব্বাসের সাথে সাক্ষাৎ ১৮৩
- আউস ও খাযরাজের প্রাথমিক ইতিহাস ১৮৪
- এ ঐতিহাসিক পটভূমির প্রভাব ১৮৫
- মদীনার প্রথম ব্যক্তির হুযুরের (সা) সাথে সাক্ষাৎ ১৮৬
- মদীনার আর একটি প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাৎ ১৮৭
- আনসারের প্রথম দলের ইসলাম গ্রহণ ও আকাবার প্রথম বয়আত ১৮৮
- মদীনা থেকে দ্বিতীয় প্রতিনিধি দলের উপস্থিতি ও আকাবায় দ্বিতীয় বয়আত ১৯০

- মুসআব বিন উমাইরকে মদীনা প্রেরণ ১৯১
- মদীনায় জুমা কায়েম ১৯৪
- আকাবায় শেষ বায়আত ১৯৪
- আকাবার বায়আতের গুরুত্ব ২০০
- আনসারদের জীবন বিলিয়ে দেয়ার প্রেরণা ২০০
- নকীব নিয়োগ ২০১
- বায়আতের সংবাদে কুরাইশের প্রথম প্রতিক্রিয়া ২০২
- বায়আতের পর মদীনায় ইসলাম প্রচার ২০৩
- □ সূত্র নির্দেশিকা ২০৪
- □ ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ মদীনায় হিজরত ২০৫
- সর্বপ্রথম মুহাজির ২০৫
- হযরত উম্মে সালামার বিপদ কাহিনী ২০৫
- হিজরতের সাধারণ নির্দেশ ২০৬
- মুসলমানগণকে হিজরত থেকে বিরত রাখার জন্য কুরাইশের চেষ্টা তদবীর ২০৭
- আইয়াশ বিন আবি রাবিয়ার (রা) বিবরণ ২০৮
- হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সুহাইলের বিপদ ২০৯
- শেষ সময় পর্যন্ত হুযুরের (সা) মক্কায় অবস্থান ২১০
- কুরাইশের পেরেশানী ২১১
- হুযুরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত ২১২
- হুযুরের (সা) প্রতি হিজরতের অনুমতি ও তার প্রস্তুতি ২১২
- হত্যার রাতের ঘটনা ২১৪
- হযরত আলীর (রা) গ্রেফতারী ও মুক্তি ২১৪
- হযরত আবু বকরের (রা) বাড়িতে আকস্মিক আক্রমণ ২১৫
- মক্কা থেকে বেরিয়ে সওর গুহায় আশ্রয় ২১৫
- 'সওরে' আশ্রয় গ্রহণের রহস্য ২১৫
- সওরে অবস্থানকালের জন্যে আবু বকরের (রা) ব্যবস্থাপনা ২১৭
- সওর গুহার বিবরণ ২১৮
- সওর গুহায় চরম মর্মান্তিক মুহূর্ত ২১৯
- হুযুর (সা) এবং হযরত আবু বকরকে (রা) হত্যা অথবা গ্রেফতারের জন্যে পুরস্কারের সাধারণ ঘোষণা ২২০
- গুহা থেকে রওয়ানা ২২০
- সফরের বিবরণ ২২১
- সুরাকার ঘটনা ২২২
- উম্মে মা'বাদের কাহিনী ২২৩
- উম্মে মা'বাদ হুযুরের হুলিয়া শরীফ বয়ান করেন ২২৪
- মদীনায় হুযুরের (সা) আগমন প্রতীক্ষা ২২৫
- হুযুরের (সা) কুবায় পৌঁছানো ২২৬
- কুবা পৌঁছার তারিখ ২২৭
- কুবায় অবস্থান ২২৭
- কুবা থেকে রওয়ানা এবং প্রথম জুমার নামায ২২৯

- মদীনায় প্রবেশ ২২৯
- হযরত আবু আইয়ূবের বাড়ী অবস্থান ২৩০
- মদীনায় হুযুরের (সা) সম্বর্ধনা ২৩১
- কুরাইশের অস্বস্তিকর অবস্থা ২৩৩
- মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ ২৩৪
- হুযুরের হুজরা নির্মাণ ২৩৫
- পরিবার পরিজনকে মক্কা থেকে ডেকে পাঠানো ২৩৬
- ☐ সূত্র নির্দেশিকা ২৩৭
- ☐ **চতুর্দশ অধ্যায়ঃ মক্কী যুগের সামগ্রিক পর্যালোচনা** ২৩৮
- হুযুরের (সা) উচ্চ বংশ মর্যাদা ২৩৮
- বনী ইসমাঈলে হুযুরের (সা) জন্মগ্রহণ ২৩৮
- তাঁর ব্যক্তিত্ব ২৩৯
- নবুওত পূর্ব জীবন ২৪০
- নবুওতের পর তাঁর মহৎ গুণাবলীর প্রকাশ ২৪১
- হুযুরের (সা) আর্থিক ত্যাগ ২৪২
- হুযুরের (সা) দৃঢ় সংকল্প ২৪২
- হুযুরের (সা) নযীর বিহীন বীরত্ব ২৪৩
- হুযুরের (সা) মহানুভবতা ২৪৩
- তাঁর কথা ও কাজে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যতা ২৪৪
- তিনি ছিলেন সকল প্রকার গোঁড়ামির উর্ধ্বে ২৪৪
- কুরআনের বশীকরণ শক্তি ২৪৫
- হুযুরের (সা) প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের গুণাবলী ২৪৬
- মদীনায় আনসারদের গুণাবলী ২৪৭
- ☐ সূত্র নির্দেশিকা ২৪৮

সপ্তম অধ্যায়

সাধারণ দাওয়াতের সূচনা

আগের দুটো পরিচ্ছেদে যা কিছু বলা হয়েছে তার থেকে এ কথা ভালোভাবে বুঝতে পারা যায় যে, রসূলুল্লাহ (স) তিন বছর গোপনে দাওয়াত দেয়ার পর যখন প্রকাশ্যে ইসলামের প্রচার শুরু করেন, তখন তার জন্য কুরাইশ এবং সাধারণ আরববাসীর এতোটা ক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ কি ছিল এবং কেন তারা নবীর বিরুদ্ধে এতো প্রতিবন্ধকতা, শত্রুতা ও অভদ্র আচরণে মেতে উঠলো। সেই সাথে এ আলোচনায় এ কথাও ভালোভাবে জানা যায় যে, ইসলামের এ দাওয়াত যুক্তি ও চরিত্রের কেমন শক্তিশালী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উপস্থাপিত হয়েছিল যে, তার সামনে পুরাতন জাহেলিয়াত তার সকল কৌশল, ছল-চাতুরী এবং জুলুম নিষ্পেষণ সত্ত্বেও অসহায় হয়ে পড়লো। এখন আমরা ঐতিহাসিক বর্ণনার ধারাবাহিকতা সে স্থান থেকেই শুরু করছি যেখানে চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা ছেড়ে এসেছিলাম।

ইসলামের সর্বপ্রথম প্রকাশ

যদিও ঐতিহাসিক ও সীরাত প্রণেতাগণ এ বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেননি, কিন্তু কুরআন পাকে সূরায়ে আলাকের প্রাথমিক পাঁচ আয়াতের পর যেভাবে হঠাৎ আয়াত ৬-২১ পর্যন্ত এ ঘটনা বয়ান করা হয় যে, এক ব্যক্তি আল্লাহর এক বান্দাহকে নামায পড়তে নিষেধ করে এবং ধমক দিয়ে তাকে বিরত রাখতে চায়। হাদীসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলোতে এ ঘটনার ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, নামায পাঠকারী স্বয়ং নবী (স) ছিলেন এবং বাধাদানকারী আবু জেহেল ছিল, এর উপর চিন্তাভাবনা করলে স্পষ্ট জানা যায় যে, নবী (স) তাঁর দ্বীনের অভিব্যক্তি সর্বপ্রথম হারামে কাবায় ইসলামী পদ্ধতিতে নামায পড়ে করেন, ঐ সময় পর্যন্ত মুসলমানগণ গোপনে নামায পড়তেন। কেউ হারামে কাবা তো দূরের কথা, উন্মুক্ত স্থানেও প্রকাশ্যে নামায পড়ার সাহস করতোনা। শুধু একবার মক্কার এক জনমানবহীন উপত্যকায় হযরত সা'দ বিন আবি ওক্কাস (রা)-এর সাথে মুসলমানদের নামায পড়তে মুশরিকরা দেখে ফেলে। যার ফলে চরম হাংগামা শুরু হয় যেমন আমরা পূর্বে বয়ান করেছি। কিন্তু যখন আল্লাহ তায়ালার এ ইচ্ছা হলো যে, খোলাখুলি ইসলামের প্রচার হোক তখন রসূলুল্লাহ (স) নির্ভয়ে ও দ্বিধাহীনচিত্তে হারামে গিয়ে নামায শুরু

করেন। এ সাহস তিনি ছাড়া আর কেউ করতে পারতোনা।(১)

এর থেকে কুরাইশের সাধারণ মানুষ প্রথম এ কথা অনুভব করলো যে, তাদের দ্বীন থেকে মুহাম্মদ (স) এর দ্বীন ভিন্ন হয়ে গেছে। আর যারা দেখেছিল তারা বিস্মিত ছিল। কিন্তু আবু জেহেলের জাহেলিয়াতের আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠলো এবং সে নবীকে (স) ধমক দিয়ে কয়েকবার নামায থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা) বলেন, আবু জেহেল কুরাইশদের জিজ্ঞেস করলো, মুহাম্মদ (স) কি তোমাদের সামনে যমীনের উপর তার মুখ রাখে? তারা উত্তরে বলে হ্যাঁ, তখন আবু জেহেল বলে, লাত ও ওয্যার কসম। আমি যদি তাকে এভাবে নামায পড়তে দেখি, তাহলে তার ঘাড়ে পা রেখে দেব এবং তার মুখ মাটিতে মর্দন করব। তারপর ঘটনাক্রমে হুযুরকে (স) নামায পড়তে দেখে সামনে অগ্রসর হলো তাঁর ঘাড়ে পা রাখার জন্য। কিন্তু হঠাৎ লোকেরা দেখলো যে সে পিছু হটছে এবং কোন কিছু দিয়ে মুখ রক্ষার চেষ্টা করছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, তার কি হলো? সে বল্লো, আমার ও তার মাঝখানে এক আগুনের গর্ত, একটা ভয়ংকর বস্তু এবং পালকও ছিল।

রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, সে যদি আমার কাছে আসতো তাহলে ফেরেশতাগণ তার মস্তক উড়িয়ে দিত (আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতিম, ইবনুল মুনযের, ইবনে মারদুয়া, নুয়াইম, ইস্পাহানী, বায়হাকী)।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবু জেহেল বল্লো, আমি মুহাম্মদকে (স) কাবার নিকটে নামায পড়তে দেখলে তাঁর ঘাড় পায়ের তলায় নিষ্পেষিত করব। নবীর (স) নিকটে এ খবর পৌঁছলে তিনি বলেন, যদি তারা এমন করে তাহলে ফেরেশতাগণ প্রকাশ্যে তাকে ধরে ফেলবে (বোখারী, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে জারীর, আবদুর রাজ্জাক, আবদ বিন হামীদ, ইবনুল মুনযের, ইবনে মারদুয়া)।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে,নবী (স) মাকামে ইব্রাহীমে নামায পড়ছিলেন। আবু জেহেল সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। সে বল্লো, মুহাম্মদ (স) তেমাকে কি আমি নিষেধ করে দিইনি? এই বলে সে ধমক দিতে লাগলো। তার জবাবে নবী মুহাম্মদ (স) কঠোরভাবে তাকে তিরস্কার করলেন। তার উত্তরে আবু জেহেল বলে, হে মুহাম্মদ (স)! তুমি কার বলে আমাকে ভয় দেখাচ্ছো? খোদার কসম! এ উপত্যকায় আমার সমর্থনকারী সকলের চেয়ে বেশী (ইবনে জারীর, আহমদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে আবি শায়বা, ইবনুল মুনযের , তাবারানী, ইবনে মারদুয়া)।(২)

তারপর কুরাইশদের অন্যান্য লোকেরাও দলবদ্ধ হয়ে হারামে কাবায় নবী মুহাম্মদকে (স) নামায পড়তে বাধা দান করে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। কুরআন বলে-

وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا-

এবং আল্লাহর বান্দাহ্ যখন তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়ালো তখন লোক তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে তৈরী হলো (জ্বিনঃ ১৯)।

এখানেও তফসীরকারগণ আল্লাহ্র বান্দাহ্ বলতে নবী মুহাম্মদকেই (স) বুঝিয়েছেন। আর আয়াত প্রমাণ করে যে,নবী (স) প্রকাশ্যে নামায পড়া বন্ধ করেননি, যদিও আবু জেহেল ছাড়াও কুরাইশের অন্যান্য লোকেরাও তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হতে থাকে।

আপন পরিবার বর্গের প্রতি দাওয়াত

নবী মুহাম্মদ (স) দ্বিতীয় যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা এই যে, তিনি আল্লাহ তায়ালার এ নির্দেশ-

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ - (الشعراء : ٢١٤)

অনুযায়ী আপন পরিবারবর্গকে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জনান। তাদের মধ্যে বনী আবদুল মুত্তালিব ও বনী হাশেম ছাড়াও কতিপয় বনী আল মুত্তালিব ও বনি আবেদ মানাফের লোকও ছিল। বালাযুরী ও ইবনে কাসির বলেন, এ দাওয়াতে মোট পঁয়তাল্লিশ জন শরীক হয়। নবী (স) এর কিছু বলার পূর্বেই আবু লাহাব বলতে শুরু করে, এখানে তোমার চাচা ও চাচাতো ভাই রয়েছে। যা ইচ্ছা বলতে পার। তবে দ্বীন থেকে ফিরে যাওয়ার কথা বলোনা। তোমার মনে রাখা উচিত যে, তোমার কওম সমস্ত আরবের বিরুদ্ধে লড়বার শক্তি রাখেনা। তোমার হাত ধরে তোমাকে নিবৃত্ত করার সবচেয়ে হকদার তোমার পরিবারের লোকেরা। তুমি যা করছো তার উপর যদি অটল থাক তাহলে কুরাইশদের সকলে তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং আরববাসী তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। আমি এমন কাউকে দেখিনি যে আপন পরিবারবর্গের উপর এর চেয়ে অধিকতর বিপদ এনে দিয়েছে। যা তুমি এনেছো।

এভাবে আবু লাহাব প্রথম বৈঠক বানচাল করে দেয়। দ্বিতীয় দিন পুনরায় নবী (স) তার পরিবারের লোকজনকে দাওয়াত করে তাদের সামনে নিজের দ্বীনী দাওয়াত পেশ করেন। আবু তালেব বলেন, আমি আবদুল মুত্তালিবের দ্বীন ছাড়তে চাইনা। তবে যে কাজের আদেশ তোমাকে দেয়া হয়েছে তা তুমি করতে থাকো। আমি তোমার সমর্থন ও হেফাজত করব।

আবু লাহাব বলে, খোদার কসম। এ বড়ো খারাপ কথা। অন্য কেউ তার হাত ধরার আগে তুমি তার হাত ধর। আবু তালেব বলেন, খোদার কসম! যতোক্ষণ জীবন আছে, ততোক্ষণ তার হেফাজত আমি করব। এ বর্ণনা বালাযুরী এবং ইবনে আমীর জাফর বিন আবদুল বিন আবিল হাকামের বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেন যিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী (আনসাবুল আশরাফ লিল্ বালাযুরী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৮-১১৯, তারিখুল কামেল লে-ইবনে আমীর ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০-৪১)।(৩)

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে, নবী (স) যে ভাষণ দান করেন, তা প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে করেন- হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ, হে আব্বাস, হে সুফিয়া (রসূলুল্লাহর ফুফু), হে ফাতেমা (নবীর কন্যা), তোমরা নিজেদেরকে জহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। কারণ, আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমাদের বাঁচাবার কোন অধিকার আমার নেই। অবশ্যি আমার মাল থেকে যা ইচ্ছা কর চাইতে পার। তাঁর ভাষণ নিম্নরূপ ঃ

يا بنى عبد المطلب ، يا عباس ، يا صفية (عمة رسول الله) يا فاطمة (بنت محمد) انقذوا انفسكم من النار فانى لا املك لكم من الله شيئا ، سلونى من مالى ما شئتم -

তাঁর এ ভাষণ শুধু আপনজনদের কাছে হকের দাওয়াতই ছিলনা। বরঞ্চ এর থেকে এ কথাও প্রকাশ পায় যে, খোদার দ্বীন নিরপেক্ষ। এতে নবীর (স) সত্তা এবং তাঁর নিকটতম আত্মীয়দের জন্যও কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অবকাশ নেই। এখানে যার সাথেই কোন

আচরণ করা হোক না কেন, তা করা হবে তার গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে। কারো বংশ মর্যাদা এবং কারো সাথে কোন লোকের সম্পর্ক কোন কাজেই আসবেনা। গোমরাহী এবং অসৎ কাজের জন্য খোদার শাস্তির ভয় সকলের জন্যই একই রূপ। এমন নয় যে, অন্যান্য সকলকেও পাকড়াও করা হবে কিন্তু নবীর আত্মীয় স্বজন এর থেকে রেহাই পাবে। এ নীতিকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল বিধায় হুযুর (স) এ ভাষণে স্বয়ং আপন কন্যা হযরত ফাতেমার (রা) নাম উল্লেখ করেন। অথচ তাঁর বয়স তখন দু'আড়াই বছরের বেশী ছিলনা। প্রকাশ থাকে যে, তিনি কিছুতেই এ দায়িত্বে আওতাভুক্ত ছিলেননা যে, তাঁর সম্পর্কে কোন শাস্তি বা সওয়াবের প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারতো। কিন্তু এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ সত্য তুলে ধরা যে, দ্বীন ইসলামে নবী এবং তাঁর পরিবারের জন্য কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নেই যার থেকে অন্যান্যগণ বঞ্চিত। যা জীবনহরণকারী বিষ, সকলের জন্যই বিষ। নবীর কাজ হচ্ছে এই যে, সবার আগে তার থেকে নিজে দূরে থাকবেন এবং তাঁর নিকট আত্মীয়গণকে তার প্রতি ভীতি প্রদর্শন করবেন। তারপর সর্বসাধারণকে সাবধান করে দেবেন যে, যে তা ভক্ষণ করবে সে মৃত্যুবরণ করবে। আর যা উপকারী তা সকলের জন্যই উপকারী। নবীর কাজই হচ্ছে এই যে, সকলের আগে তিনি স্বয়ং তা গ্রহণ করবেন এবং প্রিয়জনকে তা গ্রহণের উপদেশ দেবেন যেন প্রত্যেকে দেখতে পায় যে, এ নসিহত উপদেশ অন্যদের জন্যই নয়। বরঞ্চ নবী (স) তাঁর দাওয়াতে একেবারে আন্তরিক। কারণ নিজেও তা মেনে চলেন এবং অপরকেও মেনে চলার উপদেশ দেন।(৪)

কুরাইশের সকল পরিবারের প্রতি ইসলামের দাওয়াত

অতঃপর তৃতীয় পদক্ষেপ যা তিনি গ্রহণ করেন তা এই যে, একদিন অতি প্রত্যুষে সাফা পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে ডাক দিলেন 'ইয়া সাবাহা' (হায় সকাল বেলার বিপদ)। হে কুরাইশের লোকেরা! হে বনী কা'ব বিন লুই। হে বনী মুররা, হে কুসাই এর লোকেরা, হে আবদে মানাফ, হে আবদে শামস, হে আবদুল মুত্তালিবের লোকেরা! এভাবে কুরাইশের এক এক গোত্র ও পরিবারের নাম ধরে ধরে তিনি আওয়াজ দেন। আরবের রীতি ছিল যে, যখন প্রভাতে হঠাৎ কোন আক্রমণের আশংকা হতো, তাহলে যেই তা জানতে পারতো, সে এভাবে আওয়াজ দিত এবং লোক তার আওয়াজ শুনে চারদিক থেকে সেদিকে দৌড় দিত। বস্তুতঃ নবী (স) এর এরূপ আওয়াজ শুনে সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। যে আসতে পারলোনা সে অন্য কাউকে খবর নেয়ার জন্য পাঠিয়ে দিল। সকলে একত্র হওয়ার পর নবী (স) বলেন, হে লোকেরা! যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, পাহাড়ের অন্যদিকে এক বিরাট সৈন্য বাহিনী রয়েছে, যে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। তাহলে আমার কথা সত্য মনে করবে? সকলে সমস্বরে বলে, আমাদের অভিজ্ঞতা যে তুমি কোনদিন মিথ্যা বলনি। নবী (স) বলেন, তো আমি তোমাদেরকে খোদার আযাব আসার পূর্বে সাবধান করে দিচ্ছি। নিজেদেরকে তার থেকে রক্ষা করার চিন্তা কর। আমি খোদার মুকাবিলায় তোমাদের কোন কাজে লাগবনা। কিয়ামতে আমার আত্মীয় শুধু তারা হবে যারা খোদাকে ভয় করে। এমন যেন না হয় যে, অন্যরা নেক আমল নিয়ে আসবে এবং তোমরা দুনিয়ার সকল শাস্তি ও যন্ত্রণা মাথায় নিয়ে হাযির হবে। সে সময়ে তোমরা ডাকবে, হে মুহাম্মদ! কিন্তু আমি তোমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবো। অবশ্যি দুনিয়াতে তোমাদের আমার রক্তের সম্পর্ক রয়েছে

এবং এখানে তোমাদের সাথে আত্মীয়তাসুলভ সদাচারণই করব। বোখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, তিরমিযি, নাসায়ী এবং তফসীরে ইবনে জারীর-এ হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবু হুরায়রাহ (রা), হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা), হযরত যুবাইর বিন আমর (রা), হযরত কাবীসা বিন মুখারেক (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত)।(৫)

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বিভিন্ন সূত্রে এ বর্ণনা মুহাদ্দিসগণ উদ্ধৃত করেছেন যে, যখন নবী মুহাম্মদকে (স) সর্বসাধারণকে দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয় এবং কুরআনেই এ হেদায়াত নাযিল হয় যে, তিনি যেন সর্ব প্রথম নিকট আত্মীয়-স্বজনকে খোদার আযাবের ভয় দেখান, তখন তিনি অতি প্রত্যুষে সাফা পাহাড়ে উঠে উচ্চস্বরে এভাবে ডাক দেন, ইয়া সাবাহা (হায় প্রাতঃকালীন বিপদ)। আরবে এ ডাক সে ব্যক্তি দিত, যে দেখতে পেত প্রাতঃকালে ঝাপটার বেগে কোন দুশমন তার গোত্রের উপর আক্রমণ করতে আসছে। হুযুরের এ ডাক শুনে লোক জানতে চাইলো এ ডাক কে দিচ্ছে। বলা হলো, এ ডাক মুহাম্মদ (স) এর। এর ফলে কুরাইশের সকল পরিবারের লোক তাঁর দিকে দৌড় দিল। যে যেতে পারলোনা সে নিজের পক্ষ থেকে অন্য কাউকে পাঠালো। সকলে সমবেত হওয়ার পর, হুযুর (স) কুরাইশের এক এক পরিবারের নাম ধরে ধরে ডাকলেন, হে বনী হাশেম, হে বনী আবদুল মুত্তালিব, হে বনী ফেহর, হে বনী অমুক, হে বনী অমুক। আমি যদি বলি যে, পাহাড়ের পশ্চাৎ দিক থেকে একদল সৈন্য তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত, তাহলে আমার কথায় বিশ্বাস করবে? সকলে বলে, হ্যাঁ (তোমার কথা বিশ্বাস করি)। কারণ, তোমার মিথ্যা কথা বলার কোন অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। হুযুর (স) বলেন, আমি তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি যে, ভবিষ্যতে কঠিন শাস্তি আসছে। তারপর কারো কিছু বলার পূর্বে, হুযুরের (স) চাচা আবু লাহাব বলে,

تَبًّا لَكَ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا ؟

'তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি কি এ জন্য আমাদেরকে এখানে একত্র করেছ?'

আর এক বর্ণনায় আছে যে, হুযুরকে (স) ছুঁড়ে মারার জন্য আবু লাহাব পাথর হাতে তুলে নেয়। (মুসনাদে আহমদ, বোখারী, মুসলিম, তিরমিযি, ইবনে জারীর প্রমুখ)।(৬)

ইবনে সা'দ ইবনে আব্বাস (রা) এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে যা বলেন তার মধ্যে এ কথাগুলোও ছিল- কুরাইশদের সম্বোধন করে নবী (স) বলেন, আল্লাহ আমাকে নিকট আত্মীয়দের সাবধান করে দেয়ার আদেশ করেছেন এবং তোমরা কুরাইশের লোকেরা আমার নিকট আত্মীয়, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু দেখাবার এবং আখেরাতে কোন অংশ লাভ করাবার অধিকার রাখিনা। অবশ্যি তোমরা যদি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মেনে নাও, তাহলে আমি তোমাদের রবের কাছে তোমাদের সপক্ষে সাক্ষ্য দেব। আর এ কালেমার বদৌলতে আরব তোমাদের অনুগত এবং আজম বশীভূত হবে। এর জবাবে আবু লাহাব বলে, তোমার সর্বনাশ হোক। এ জন্য কি তুমি আমাদেরকে ডেকেছিলে?

আবু লাহাবের আচরণ

এভাবে আবু লাহাব[১] প্রথম দিন থেকেই নবী (স) এর বিরোধিতার জন্য বদ্ধপরিকর

১. এ ব্যক্তির প্রকৃত নাম ছিল, আবদুল ওয্যা বিন আবদুল মুত্তালিব। কুনিয়াত ছিল আবু ওতবা। কিন্তু তার দুধ ও আলতা রঙের উজ্জ্বল চেহারার জন্য আবু লাহাব (জ্বলজ্বলে সৌন্দর্য) নামে খ্যাতি লাভ

হয় এবং আমরণ নবীর সাথে এবং তাঁর কারণে আপন পরিবারের সাথে এমন দুশমনী করতে থাকে যা কোন চরম দুশমন করে থাকে। যদিও বনী হাশিমের আর একজন আবু সুফিয়ান বিন আল হারেস বিন আবু মুত্তালিবও নবীর বিরোধী হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথমতঃ আবু লাহাবের বিরোধিতা থেকে তাঁর বিরোধিতা বেশী ছিলনা। আবু লাহাব বিশ বছর যাবত নবী ও তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখে শুনাতো এবং হিজরতের পর যুদ্ধগুলোতে নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো। আবু লাহাব এবং আবু সুফিয়ানের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য ছিল তা এই যে, দ্বিতীয় জনের মন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ মক্কা বিজয়ের পূর্বেই তিনি আবওয়া নামক স্থানে নবীর হাতে বয়আত করেন।[২] কিন্তু আবু লাহাবের ব্যাপার একেবারে ভিন্ন ধরনের সে শুধু মানবতারই নয়, বরঞ্চ আরবের সর্বস্বীকৃত নৈতিক ঐতিহ্যের সকল সীমা লংঘন করে এবং নবীর শত্রুতার মানবতা ও ভদ্রতার পরিবর্তে চরম নীচতায় নেমে আসে। অথচ উভয়ের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক ছিল। তার এ আত্মীয়তার কারণে অন্যান্যের বিরোধিতার তুলনায় তার বিরোধিতা দ্বীনের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে পড়ে।(৭)

এটাই কারণ যে, সে সময়ের ইসলামের সকল দুশমনের মধ্যে আবু লাহাবই একমাত্র ব্যক্তি যার নাম নিয়ে কুরআনে তার নিন্দা করা হয়েছে। অথচ মক্কায় এবং হিজরতের পর মদীনাতেও এমন বহু লোক ছিল যারা ইসলাম ও মুহাম্মদ (স) এর শত্রুতায় তার চেয়ে কোনদিক দিয়ে কম ছিলনা। প্রশ্ন এই যে, এ ব্যক্তির কি বৈশিষ্ট্য ছিল যার জন্য কুরআনে তার নাম নিয়ে ক্রোধ প্রকাশ করা হয়। এ কথা উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজন যে, সে সময়ের আরব সমাজকে জানতে হবে এবং এর প্রেক্ষিতে আবু লাহাবের আচরণ লক্ষ্য করতে হবে।

কুরআনে আবু লাহাবের নাম নিয়ে তার নিন্দা করার কারণ

প্রাচীনকালে যেহেতু সমগ্র আরবে চারদিকে নিরাপত্তাহীনতা, বিশৃংখলা, খুন খারাবি, লুঠতরাজ প্রভৃতি ছড়িয়ে ছিল এবং শত শত বছর যাবত অবস্থা এ ছিল যে, কোন ব্যক্তির জন্য তার আপন পরিবার ও জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে সমর্থন ছাড়া জানমাল ও ইজ্জত আবরুর হেফাজতের কোন নিশ্চয়তা ছিলনা। সে জন্য আরব সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতো। তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করা বড়ো পাপ মনে করা হতো। আরবের এসব ঐতিহ্যের প্রভাব এ ছিল যে, রসূলুল্লাহ

করে। ইবনে সা'দ বলেন স্বয়ং আবদুল মুত্তালিব তাকে আবু লাহাব বলে ডাকতেন। এ জন্যে প্রকৃত নাম চাপা পড়ে যায় -গ্রন্থকার।

২. তাবকাত ইবনে সাদ, ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা ৪৯-৫০ অনুযায়ী ইনি নবী (স) এর চাচতো ভাই ছিলেন। হালিমা সা'দীয়ার দুধ পানের কারণে দুধ ভাইও ছিলেন। জাহেলিয়াতের যুগে নবী (স) এর প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল। কিন্তু নবুওতের পর চরম বিরোধী হয়ে যান। বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬১) এরা একই কথা বলেন। অতিরিক্ত এতোটুকু বলেন যে, হযরত আব্বাস (রা) এর সুপারিশক্রমে নবী (স) তাকে মাফ করে দেন। আবওয়াতে তাঁর উপস্থিতিকে দুর্বল বক্তব্য বলে উল্লেখ করেন। এ বক্তব্যকে প্রাধান্য দেন যে, এ ক্ষমা করার আবেদন নিয়ে 'নিকুল ওকাব' (মক্কা মদীনার মধ্যবর্তী হুজফার নিকটই একটি স্থান) নামক স্থানে হাযির হন। 'মু'জামুল বুলদানে'ও এ কথা বলা হয়েছে। -গ্রন্থকার

(স) যখন ইসলামী দাওয়াতসহ আবির্ভূত হলেন তখন কুরাইশের অন্যান্য পরিবার ও সর্দারগণ হুযুরের (স) চরম বিরোধিতা শুরু করে। কিন্তু বনী হাশেম ও বনী আল মুত্তালিব (হাশিমের ভাই মুত্তালিবের সন্তানগণ) তাঁর যে বিরোধিতা করেননি, তাই নয়, বরঞ্চ প্রকাশ্যে তাঁকে সমর্থন করতে থাকে। অথচ তাদের অধিকাংশ হুযুরের (স) নবুওতের উপর ঈমান আনেনি। কুরাইশের অন্যান্য পরিবারসমূহ স্বয়ং হুযুরের (স) এ সব জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে সমর্থন করা আরবের নৈতিক ঐতিহ্যের রীতি পদ্ধতিই মনে করতো। এ কারণে তারা কখনো বনী হাশিম ও বনী আল মুত্তালিবকে ভর্ৎসনা করেনি যে তারা ভিন্ন এক দ্বীন প্রচারককে সমর্থন করে আপন পূর্ব পুরুষের দ্বীন থেকে সরে পড়েছে। তারা এ কথা জানতো এবং স্বীকার করতো যে, নিজের পরিবারের এক ব্যক্তিকে তারা কোন অবস্থাতেই দুশমনের হাতে তুলে নিতে পারতোনা এবং তাদের আপন আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য সহযোগিতা করা সকলের জন্য স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত ছিল।

এ নৈতিক মূল্যবোধকে জাহেলিয়াতের যুগেও আরববাসী শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। শুধু এক ব্যক্তি ইসলামের প্রতি শত্রুতায় অন্ধ হয়ে সব ঐতিহ্য ও নৈতিক মূল্যবোধ চূর্ণ করে। আর সে ব্যক্তি হলো আবু লাহাব বিন আবদুল মুত্তালিব। সে ছিল নবী (স) এর চাচা। হুযুরের (স) পিতা ও আবু লাহাবের পিতা একই ব্যক্তি যদিও মা ছিল ভিন্ন। আরবে চাচাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত মনে করা হতো। বিশেষ করে ভাতিজার পিতা যখন মৃত্যু বরণ করতো। আরব সমাজে এটাই আশা করা হতো যে, চাচা ভাতিজাকে আপন সন্তানের মতোই মনে করবে। কিন্তু এ ব্যক্তি ইসলামের প্রতি শত্রুতা এবং কুফরের প্রতি ভালোবাসার কারণে সকল আরব ঐতিহ্য ধ্বংস করে।

হুযুরের (স) নিকৃষ্ট প্রতিবেশী

মক্কায় আবু লাহাব ছিল হুযুরের (স) সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশী। উভয়ের বাড়ি ছিল একটি প্রাচীরের এপার-ওপারে। উপরন্তু হাকাম বিন আস্ (মারওয়ানের পিতা) ওকবা বিন আবি মুয়াইত, সাদী বিন হামরায়েখ সাকাফী এবং ইবনুল আস্দায়েল হুযালীও হুযুরের প্রতিবেশী ছিল।[১] এরা নবীকে (স) বাড়িতে শান্তিতে থাকতে দিতনা। তিনি কখনো নামায পড়ছেন এমন সময়ে এরা উপর থেকে ছাগলের নাড়ি-ভূঁড়ি নিক্ষেপ করতো। কখনো উঠানে খানা পাক করা হচ্ছে, এমন সময় এরা পাতিলের উপর ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করতো। হুযুর (স) বাইরে বেরিয়ে তাদেরকে বলতেন, হে আবেদ মানাফ, এ কোন্ ধরনের প্রতিবেশীসুলভ আচরণ?

আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল (আবু সুফিয়ানের ভগ্নি) এটাকে তার স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করেছিল যে, রাতে নবীর ঘরের দরজায় কন্টকপূর্ণ গুল্মগুচ্ছ ফেলে দিত যাতে নবী অথবা তাঁর সন্তানগণ বাইরে বেরুতে গেলে তাঁদের পা কাঁটায় জর্জরিত হয়।

- (বায়হাকী, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে জারীর, ইবনে আসাকের, বালাযুরী, ইবনে হিশাম)।

---

১. ইবনে সাদ বলেন, এদের মধ্যে আবু লাহাব এবং ওক্বা সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশী ছিল। তিনি হযরত আয়েশার (রা) বর্ণনা উদ্ধৃতি করে বলেন যে, নবী (স) বলেছেন, আমি দু'জন অতি নিকৃষ্ট প্রতিবেশীর মধ্যে বাস করতাম। একজন আবু লাহাব, অন্যজন ওক্বা।
এর থেকে জানা যায় যে, হুযুর (স) এর বাড়ি এ দু'জনের মাঝে ছিল। - গ্রন্থকার

হুযুরের (স) কন্যাদেরকে তালাক দিতে আবু লাহাব তার পুত্রদের বাধ্য করে

নবুওয়তের পূর্বে রসূলুল্লাহ (স) এর দুই কন্যার বিয়ে আবু লাহাবের দুই পুত্র ওত্‌বা ও ওতায়বার সাথে হয়েছিল।[১] নবুওতের পর যখন হুযুর (স) ইসলামের দাওয়াত দেয়া শুরু করেন, তখন আবু লাহাব তার দু'ছেলেকে বলে, যদি তোমরা মুহাম্মদের (স) মেয়েদেরকে তালাক না দাও, তাহলে তোমাদের মুখ দেখা আমার জন্য হারাম। অতএব উভয়েই তালাক দিয়ে দেয়। ওতায়বাহ্ অজ্ঞতার সীমা এতোটা লংঘন করে যে, সে নবীর (স) সামনে এসে বলে, আমি اَلَّذِىْ دَنَا فَتَدَلّٰى এবং اَلنَّجْمِ اِذَا هَوٰى মানিনা। এ কথা বলে সে নবীর (স) প্রতি থুথু নিক্ষেপ করে, যা নবীর (স) গায়ে পড়েনা। নবী (স) বলেন, হে খোদা! তার একটি কুকুরকে তার উপর চাপিয়ে দাও। তারপর ওতায়বাহ তার পিতার সাথে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে শাম দেশ ভ্রমণে বের হয়। ভ্রমণকালে তারা এমন একস্থানে শিবির স্থাপন করে যেখানকার স্থানীয় অধিবাসীগণ বলে যে, এখানে রাতের বেলায় হিংস্র জন্তুর আনাগোনা হয়। আবু লাহাব তার সাথী কুরাইশদেরকে বলে, আমার ছেলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা কর। কারণ আমি মুহাম্মদের (স) বদদোয়ার ভয় করি।[২] তার কাফেলার লোকজন ওতায়বার চারধারে উট বসিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত্রে একটি বাঘ এসে উটের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ওতায়বাকে খেয়ে ফেলে। (আল্ ইস্তিয়াব ইবনে আবদুল বারর, আল ইসাবাহ্ ইবনে হাজার, আস্‌সাবুল আশরাফ বালাযুরী, দালায়েলুন নবুওয়ত- আবু নাঈম ইসফেহানী, রাওযুল উনুফ- সুহায়লী)।

এ বিষয়ে কিছু মতানৈক্য আছে। কেউ বলেন, তালাকের ঘটনাটি নবুওয়তের পূর্বে সংঘটিত হয়। আর কেউ বলেন, تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ নাযিল হওয়ার পর। এ বিষয়েও দ্বিমত আছে যে, বাঘে যাকে খেয়ে ফেল্ল সে ওতায়বা, না ওত্‌বা। কিন্তু এ কথা প্রমাণিত যে, মক্কা বিজয়ের পর ওত্‌বা ইসলাম গ্রহণ করে স্বয়ং নবী পাকের (স) হাতে বয়আত করে। অতএব সত্য কথা এই যে, উপরোক্ত পুত্র ওতায়বা ছিল।

নবী পুত্রের মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ

তার মনের নীচতা ও জঘণ্যতা এমন ছিল যে, নবী (স) এর পুত্র হযরত কাসেমের (রা) ইন্তেকালের পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র হযরত আবদুল্লাহও (রা) ইন্তেকাল করেন, তখন

---

১. তাবারানীতে কাতাদার একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত উম্মে কুলসুম (রা) এর বিয়ে ওতায়বার সাথে এবং হযরত রোকেয়ার (রা) বিয়ে ওতবার সাথে হয়েছিল। ইবনে কুতায়বা আল মায়ারেফে এবং সুহায়লী রাওযুল উনুকেও এ কথা বলেছেন। কিন্তু ইবনে ইসহাক বলেছেন যে, ওত্‌বার বিয়ে হযরত রোকেয়ার (রা) সাথে হয়েছিল, না হযরত উম্মে কুলসুমের (রা) সাথে- এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। ইবনে কুতায়বা মায়ারেফে, যুরকানী শরহে মাওয়াহেবে এবং তাবারী তাঁর ইতিহাসে লিখেছেন যে, মেয়ে বিদায় হওয়ার পূর্বেই আবু লাহাব দুই নবী কন্যার তালাকের আদেশ করে। পরে নবী (স) তাঁর বিয়ে হযরত ওসমান (রা) এর সাথে দেন। -গ্রন্থকার।

২. এর অর্থ এই যে কমবখ্‌ত মনে মনে হুযুরের (স) বুযর্গী মানতো এবং ভয় করতো যে তার মুখ থেকে বের হওয়া বদদোয়া ব্যর্থ হবার নয়। -গ্রন্থকার।

আপন ভাতিজার শোকে শরীক হওয়ার পরিবর্তে আনন্দে অধীর হয়ে দৌড়ে কুরাইশ সর্দারদের নিকটে পৌঁছে বলে, আজ মুহাম্মদের (স) নাম-নিশানা মুছে গেল।

ইসলামী দাওয়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

নবী (স) যেখানেই ইসলামী দাওয়াতের জন্য যেতেন, সে তাঁর পেছনে পেছনে যেতো এবং তাঁর কথা শুনতে লোকদের বাধা দিত। রাবিয়া বিন আববাদ (এবাদ)[১] আদ্দিলী বলেন, আমি ছোটবেলায় আমার পিতার সাথে যুলমাজায বাজারে যাই। সেখানে আমি রসূলুল্লাহকে (স) একথা বলতে শুনি, হে লোকেরা! বল আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তাহলে তোমরা সাফল্য লাভ করবে। তাঁর পেছনে পেছনে এক ব্যক্তি এ কথা বলছিল, এ মিথ্যাবাদী, পূর্ব পুরুষের দ্বীন থেকে বেরিয়ে গেছে।

"আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? লোকে বল্লো, এঁর চাচা- আবু লাহাব।" (মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, বায়হাকী)

সেই হযরত রাবিয়া থেকে আর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, আমি দেখলাম নবী (স) একটি গোত্রের শিবিরে উপস্থিত হয়ে বলছেন, হে বনী অমুক, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রসূল হিসাবে এসেছি। তোমাদেরকে হেদায়েত করছি যে তোমরা একমাত্র আল্লাহর এবাদত কর এবং তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করোনা। তোমরা আমাকে সত্য বলে মান এবং আমার সহযোগিতা কর, যাতে আমি সে কাজ সম্পন্ন করি যার জন্য আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন।

তাঁর পেছনে পেছনে আর এক ব্যক্তি আসছে এবং বলছে, হে বনী অমুক! এ তোমাদেরকে লাত ও ওয্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে সেই বেদআতের দিকে নিয়ে যেতে চায় যা নিয়ে সে এসেছে। তার কথা কখনো শুনবেনা এবং তাকে মানবেনা। আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? তিনি বল্লেন এ তাঁর চাচা আবু লাহাব (মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, ইবনে হিশাম, তাবারী)।

তারেক বিন আবদুল্লাহ আল মুহাবেরী প্রায় এ ধরনের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, আমি যুল মাজাযের বাজারে দেখলাম রসূলুল্লাহ (স) উচ্চস্বরে বলছেন, হে লোকেরা! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল, সাফল্য লাভ করবে। তাঁর পেছনে পেছনে এক ব্যক্তি চলছিল, যে নবীর উপর পাথর নিক্ষেপ করছিল, আর নবীর পদদ্বয় থেকে রক্ত ঝরছিল। সে বলছিল, এ মিথ্যাবাদী, তার কথা শুননা। আমি লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, লোকটি কে? তারা বল্লো সে তাঁর চাচা আবু লাহাব (ইবনে আবি শায়বা, আবু ইয়া'লা, ইবনে হিববান, হাকেম, তাবারানী, নাসায়ী এবং ইবনে মাজাহ সংক্ষেপে এ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন)।

শিয়াবে আবি তালেব ঘেরাও কালে আবু লাহাবের আচরণ

নবুওতের সপ্তম বর্ষে যখন কুরাইশের সকল পরিবার বনী হাশিম ও বনী আল মুত্তালিবের সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং এ দুটি পরিবার নবী (স) এর সমর্থনে অবিচল থেকে যখন শিয়াবে আবি তালেবে অবরুদ্ধ থাকে, তখন একমাত্র এই

---

[১] ইবনে ইসহাক 'এবাদ' এবং ইবনে হিশাম 'আববাদ' লিখেছেন। -গ্রন্থকার

আবু লাহাবই ছিল যে আপন পরিবারের সাথে না থেকে কুরাইশ কাফেরদের সাথে মিলিত হয়। এ অবরোধ তিন বছর স্থায়ী থাকে এবং এ সময়ে বনী হাশিম ও বনী আল মুত্তালিব অনাহারে দিন কাটাতে থাকে। কিন্তু আবু লাহাবের আচরণ এমন ছিল যে, মক্কায় কোন ব্যবসায়ী কাফেলা এলে শিয়াবে আবি তালেবের অবরুদ্ধ কোন ব্যক্তি যদি কোন খাদ্য দ্রব্য খরিদ করতে মক্কায় আসতো, তাহলে আবু লাহাব এসব ব্যবসায়ীদের একথা বলতো- এদের কাছে এমন মূল্য চাইবে যেন মোটেও খরিদ করতে না পারে। এতে তোমাদের কোন লোকসান হলে তা আমি পূরণ করব। ব্যবসায়ীরা চরম মূল্য দাবী করতো এবং খরিদদারগণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় শূন্য হস্তে সন্তানদের নিকটে ফিরে যায়। তারপর আবু লাহাব ঐসব ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে বাজার দরে পণ্যদ্রব্য খরিদ করতো।

তার বিরোধিতা ইসলামী দাওয়াতের কাজে কোন্ ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো

মক্কার বাইরের আরববাসী হজ্বের জন্য মক্কায় আসতো অথবা বিভিন্ন স্থানে যে বাজার বসতো সেখানে জমায়েত হতো। তাদের সামনে যখন নবী (স) এর আপন চাচা তাঁর পেছনে লেগে থেকে বিরোধিতা করতো, তখন আরবের প্রসিদ্ধ ঐতিহ্য অনুযায়ী এটা আশা করা যেতোনা যে কোন চাচা বিনা কারণে অপরের সামনে আপন ভাইপো সম্পর্কে মন্দ কিছু বলবে, তাকে পাথর মারবে এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। এজন্য তারা আবু লাহাবের কথায় প্রভাবিত হয়ে রসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়তো এবং বলতো আপনার আপনজনই আপনাকে ভালোভাবে জানে।(৮)

তার স্ত্রীর আচরণ

আবু লাহাবের স্ত্রী বনী উমাইয়্যা গোত্রের আবু সুফিয়ানের ভগ্নি ছিল। কুরআনে তাকে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (কাষ্ঠ বহনকারী, চোগলখোর) বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার প্রকৃত নাম ছিল, আরওয়া এবং উম্মে জামিল ছিল কুনিয়াত। নবীর শত্রুতায় সে স্বামী থেকে কোন দিক দিয়ে কম ছিলনা। হযরত আবু বকরের (রা) কন্যা হযরত আসমা (রা) বলেন, যখন সূরায়ে লাহাব নাযিল হলো এবং উম্মে জামিল তা শুনলো, তখন সে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে রসূলুল্লাহকে (স) খুঁজতে বেরুলো। তার হাতে ছিল এক মুষ্টি পাথর যা সে নবীকে ছুঁড়ে মারবে। নবীর প্রতি বিদ্রূপাত্মক কিছু কবিতা পড়তে পড়তে সে যাচ্ছিল। হেরেমে কাবায় পৌঁছার পর সে দেখলো হযরত আবু বকরের (রা) সাথে হুযুর (স) বসেছিলেন। আবু বকর (রা) বল্লেন, হে আল্লাহর রসূল। ঐ দেখুন সে আসছে। আমার ভয় হয় সে আপনার প্রতি কোন কটুক্তি করবে। হুযুর (স) বল্লেন, সে আমাকে দেখতে পাবেনা। আর তাই হলো, হুযুরের (স) উপস্থিতি সত্ত্বেও তাকে সে দেখতে পেলনা এবং সে আবু বকরকে (রা) বল্লো, শুনতে পেলাম, তোমার সাহেব নাকি আমার প্রতি বিদ্রূপ করেছে? হযরত আবু বকর (রা) বল্লেন, এ ঘরের খোদার কসম, তিনি তো তোমার প্রতি কোন বিদ্রূপ করেননি। তারপর সে ফিরে গেল (ইবনে আবি হাতেম, ইবনে হিশাম, বায্যার হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে এরা একই ধরনের ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন)।(৯)

আবু লাহাবের পরিণাম

যদিও কুরআন মজিদে সূরায়ে লাহাব নাযিল হওয়াতে আবু লাহাব ও তার স্ত্রী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে, কিন্তু তার মধ্যে যা বলা হয়েছিল তা ছিল, প্রস্তর রেখা। বলা হলো, "ভেঙে গেল আবু লাহাবের হাত"। এ ছিল এক ভবিষ্যদ্বাণী যা ক্রিয়ার অতীত কালে এ জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, তা কার্যকর হওয়া ছিল অতি নিশ্চিত এবং তা হয়েছেও। হাত ভাঙার অর্থ দেহের হাত ভাঙা নয় বরঞ্চ কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়া, যার জন্য সে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। প্রকৃত পক্ষে এই হয়েছে যে, হুযুরের (স) বিরোধিতা শুরু করার পর কয়েক বছরের মধ্যেই আবু লাহাব এমন ব্যর্থতার সম্মুখীন হয় যা ছিল অত্যন্ত দৃষ্টান্তমূলক। বদর যুদ্ধে কুরাইশের প্রধান প্রধান সর্দারদের মধ্যে অধিকাংশই নিহত হয় যারা ইসলাম দুশমনীতে তার সহযোগী ছিল। মক্কায় এ পরাজয়ের সংবাদ যখন পৌঁছলো তখন সে এতোটা দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়েছিল যে, সে এক সপ্তাহকালও জীবিত থাকতে পারেনি। আদামা (MALIGNANT PUTULE) নামক এক রোগে তার মৃত্যু হয় যা ছিল প্রায় প্লেগের মত। তার পরিবারের লোকজন তার মৃত্যুর সময় দূরে সরে ছিল। কারণ তাদের উক্ত রোগের ছোঁয়া লাগার ভয় ছিল। মৃত্যুর পরও তিনদিন তার কাছে কেউ যায়নি। তার লাশ পঁচে দুর্গন্ধ বেরুতে থাকে। অবশেষে মহল্লার লোকজন তার পুত্রদেরকে ভর্ৎসনা করতে থাকে, তখন একটি বর্ণনা এমন যে, তারা কতিপয় হাবশী শ্রমিককে পারিশ্রমিক দিয়ে তার লাশ উঠিয়ে দাফন করে। অন্য বর্ণনায় আছে যে, তারা একটি গর্ত খনন করে কাঠের সাহায্যে ঠেলে তার লাশ গর্তে ফেলে দিয়ে মাটি ও পাথর দিয়ে তা ঢেকে দেয়। অতঃপর তার চূড়ান্ত পরাজয় এভাবে হয় যে, যে দ্বীন নির্মূল করার জন্য সে সর্বশক্তি নিয়োগ করে, সে দ্বীন তার আপন সন্তানগণ গ্রহণ করে। সর্ব প্রথম তার কন্যা দুররা (রা) হিজরত করে, মক্কা থেকে মদীনায় পৌঁছে এবং ইসলাম কবুল করে। অতঃপর মক্কা বিজয়ের পর তার দুই পুত্র ওত্‌বা (রা) ও মুয়াত্তেব (রা) হযরত আব্বাসের (রা) মাধ্যমে হুযুরের (স) সামনে হাযির হয়ে তাঁর মুবারক হাতে বয়আত করেন।

সর্ব সাধারণের মধ্যে ইসলাম প্রচার

আপন পরিবার ও গোত্রের কাছে খোদার পয়গাম পৌঁছাবার পর রসূলুল্লাহ্ (স) মক্কা ও আরবের লোকদের মধ্যে সাধারণ তবলীগের ধারাবাহিকতা শুরু করেন এবং যতোদিন তিনি মক্কায় ছিলেন, দশ বছর ক্রমাগত প্রত্যক অবস্থায় এবং প্রত্যেক স্থানে লোককে কুরআন শুনাতেন ও আল্লাহ্‌র দ্বীন কবুল করার দাওয়াত দিতেন। এ দাওয়াতের কাজ তিনি করতেন বিশেষ বৈঠকাদিতে, জনসমাবেশে এবং হেরেমে কাবায়। তিনি এ কাজ অব্যাহত রাখেন এবং কোন শক্তিই তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। বাহির থেকে যারা ব্যবসা, ওমরা, যিয়ারত অথবা অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে মক্কায় আসতো, তাদের সাথেও তিনি সাক্ষাৎ করতেন। ওকাজ, মাজান্না এবং যিল্‌মাজাযের[১] মেলাগুলোতে গিয়ে

---

১. মিনা ছাড়াও এ তিনটি স্থান এমন ছিল যেখানে আরবের প্রত্যেক অঞ্চলের লোক আসতো এবং বড়ো বড়ো মেলা বসতো। সবচেয়ে বড়ো মেলা ওকাজের ছিল যেখানে উটের গতিতে গেলে তায়েফ থেকে একদিন এবং মক্কা থেকে তিনদিন লাগতো। এখানে শওয়ালের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিরাট লোক সমাগম হতো। এখানে শুধু কেনাবেচাই হতোনা, বরঞ্চ কবি, বক্তা, আমীর-ওমরা সকলেই আসতো। কবিতা পাঠের ও ভাষণদানের প্রতিযোগিতা হতো। উপজাতীয়দের পরস্পরের ঝগড়া বিবাদেরও

উপজাতীয় লোকদেরকে তিনি দ্বীনে হকের দিকে ডাকতেন। হজ্বের সময় যখন লোক মিনায় অবস্থান করতো, তখনও তিনি এক এক গোত্রের শিবিরে যেতেন এবং বিশেষ ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষ সকলের সামনে হকের দাওয়াত পৌঁছাতে তিনি কোন ক্রটি করতেননা। তারা কবুল করুক বা না করুক, নীরবে শুনুক অথবা কঠোর জবাব দিক, কঠোরতাসহ সামনে আসুক অথবা কুরাইশ দুর্বৃত্তগণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করুক- সকল অবস্থায় তিনি তাঁর নিজের কাজ করে যেতেন। এর থেকে কেউ তাঁকে বিরত রাখতে পারেনি।

ইবনে জারীর তাবারী তাঁর ইতিহাসে লিখেছেন এবং ইবনুল আমীরও লিখেছেন যে, কুরাইশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং শিয়াবে আবি তালেবে অবরুদ্ধ থাকার কঠিন অবস্থাতেও নবী (স) দাঁওয়াত ও তাবলিগের কাজ থেকে বিরত থাকেননি। বরঞ্চ প্রকাশ্যে ও গোপনে, দিনে ও রাতে দাওয়াত দানের কাজ অব্যাহত রেখেছেন। কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ যা বৃষ্টি ধারার মতো নাযিল হচ্ছিল, সেসব তিনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিতেন। কাফেরদের যুক্তি তর্কের দাঁত ভাঙা জবাব দিতেন এবং সত্যকে মেনে নেয়ার জন্য তাদেরকে সম্মত করার চেষ্টাও তিনি অব্যাহত রাখেন।

ইবনে সা'দ বলেন, গোপনে দাওয়াত দেয়ার কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর দশ বছর যাবত তাঁর কর্মপন্থা এ ছিল যে, তিনি মিনা, ওকাজ ও যিল মাজাযে এক একটি গোত্রের শিবিরে তশরিফ নিয়ে যেতেন এবং বলতেন-

ياايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا و تملكوا بها العرب و تذل لكم العجم واذا أمنتم كنتم ملوكا فى الجنة -

-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বল, সাফল্য লাভ করবে। আর এ কালেমার বদৌলতে আরবের শাসক হয়ে যাবে এবং আজমবাসী তোমাদের অনুগত হবে। আর যখন তোমরা ঈমান আনবে, তখন জান্নাতে তোমরা বাদশাহ্ হবে।

এদিকে আবু লাহাব পেছনে পেছনে গিয়ে যখন তাঁর বিরোধিতা করতো তখন তারা বলতো, তোমার পরিবার, গোত্র ও বস্তির লোক তোমাকে ভালোভাবে জানে। তারাই যখন তোমার আনুগত্য মেনে নেয়নি, তো আমরা কি করে নেব? এ জবাব শুনার পর হুযুর (স) ব্যস এতোটুকু বলতেন-

اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا -

- হে খোদাওন্দ্! যদি তুমি চাইতে তো তারা এমনটি হতোনা।

তাবারী হারস বিন আল্ হারস এবং মন্‌বেতু আয্‌দী থেকে প্রায় একই ধরনের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যাতে বলা হয়েছে, আমরা একস্থানে দেখলাম রসূলুল্লাহ্ (স) লোকদেরকে তৌহীদের দাওয়াত দিচ্ছেন এবং বলছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বল সাফল্য লাভ করবে।

মীমাংসা হতো। বন্দীদের মুক্ত করাবার জন্য মুক্তিপণও আদায় করা হতো। একে অপরের বিরুদ্ধে লোকের দাবীও পঞ্চায়েতের নিকটে পেশ করা হতো। অতঃপর পয়লা যিলকাদ থেকে 'মাররুয্ যাহিরান' (বর্তমান ফাতেমা উপত্যকা)-এ লোক জমায়েত হওয়া শুরু হতো। যিলকাদের শেষ দশ দিনের মধ্যে মাজান্না নামক পাহাড়ের নিকটে মেলা লাগতো। অতঃপর যিলহজ্বে প্রথম আট দিনের মধ্যে মিনা ও আরাফাতের মধ্যবর্তী স্থানে যিল্ মাজাযের শেষ মেলা লাগতো। তারপর হজ্বের দিনগুলো শুরু হতো। গোটা আরব থেকে হজ্বের উদ্দেশ্যে আগত লোকেরা মিনায় একত্র হতো। - গ্রন্থকার

আমরা দেখতাম যে লোকে তাঁকে নানান ভাবে কষ্ট দিচ্ছে। কেউ থুথু এবং কেউ মাটি নিক্ষেপ করছে, কেউ তাঁকে গালি দিচ্ছে। তারপর বেলা দুপুর হওয়ার পর তারা সব চলে গেল। তারপর দেখলাম একটি মেয়ে পানির একটি বড়ো পাত্র ও রুমাল নিয়ে এলো। তার গলা সামনের দিক থেকে খোলা ছিল। রসূলুল্লাহ (স) পানি পান করলেন এবং অযু করলেন। তারপর মেয়েটিকে বল্লেন, বেটি, তোমার গলা ঢাক। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে, মেয়েটি তাঁর কন্যা হযরত যয়নব (রা)।

ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে বলেন, হুযুর (স) প্রত্যেক মেলা ও সমাবেশে গিয়ে দাওয়াত পেশ করতেন। এভাবে আরবের কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি মক্কায় এলে তার সাথে দেখা করে তিনি খোদার দ্বীনের দাওয়াত তার নিকটে পৌঁছাতেন।

ইবনে কাসীর আল বেদায়া ওয়ান্নেহায়ায় লিখেছেন যে, হুযুর (স) দিন রাত গোপনে এবং প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে থাকেন এবং কারো বাধাদানে তিনি বিরত হননি। লোকের সমাবেশে গিয়ে তিনি দাওয়াত দিতেন। মেলায় এবং হজ্বের সময় হজ্বযাত্রীগণ যেসব স্থানে থাকতো, সেসব স্থানে গিয়ে তিনি দাওয়াত পেশ করতেন। স্বাধীন, গোলাম, দুর্বল, সবল, ধনী, গরীব সকল শ্রেণীর লোকের সাথে মিলিত হয়ে তাদেরকে তিনি আল্লাহর দিকে ডাকতেন।

এসব ঐতিহাসিক বর্ণনার পূর্ন সমর্থন কুরআন পাকের মক্কী সূরাগুলোতে পাওয়া যায় যা কুরাইশদের বিভিন্ন আপত্তি অভিযোগের জবাবে পরিপূর্ণ। একথা সুস্পষ্ট যে, যদি কুরআন তাদেরকে প্রকাশ্যে শুনানো না হতো এবং মুহাম্মদ মুস্তাফা (স) তাঁর নবুওত মেনে নেয়ার প্রকাশ্য দাওয়াত যদি না দিতেন, তাহলে তারা তাঁর বিরুদ্ধে কুরআন ও আখেরাতের এবং ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তি অভিযোগ ও সংশয় সন্দেহের ঝড় সৃষ্টি হবে কেন এবং কিভাবে করতো? তারপর তাদের জবাব কুরআনে দেয়ার কি অর্থ হতো, যদি বিরোধিদেরকে তা শুনানো না হতো?

নবী পাক (স) এর নৈতিক প্রভাব

প্রশ্ন এই যে, এমন কি কারণ ছিল যার জন্য কুরাইশের লোকেরা না হুযুরকে (স) হেরেমে নামায পড়া থেকে বিরত রাখতে পেরেছে আর না প্রকাশ্যে কুরআন শুনানো থেকে বিরত রাখতে পেরেছে। বস্তুতঃ এ দুটি জিনিসই তাদের ছিল অসহনীয়। অন্য কোন মুসলমান এ দুটির একটিও করার সাহস করতোনা। আর কেউ তা করার সাহস করলে প্রচন্ড মার খেতে হতো, প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তার আসল কারণ শুধু এ ছিলনা যে, বনী হাশেম ও বনু আল মুত্তালিব নবীর সমর্থনে জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল এবং কুরাইশের লোকেরা এ জন্য ভীত ছিল, বরঞ্চ তার কারণ হুযুর (স) এর বিরাট প্রভাব ছিল যা কুরাইশের লোকদেরকে অভিভূত করে রেখেছিল। তারা তাঁর দাওয়াতে বেশামাল হয়ে পড়তো, গালি দিত, পাথর মারতো, নানানভাবে তাঁর মনে কষ্ট দিত। কিন্তু তাঁর সে নৈতিক প্রভাব তাদেরকে ভেতর থেকে এতোটা শূন্য গর্ভ করে দিয়েছিল যে, তারা তাঁকে রেসালতের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারতোনা।

ভীতি সঞ্চারকারী এ প্রভাবের কয়েকটি কারণ ছিল। একটি কারণ এ ছিল যে, তাঁর শৈশবকাল থেকে ক্রমাগত তাঁর সম্পর্কে তাদের জ্ঞান, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার দ্বারা তারা এ সত্য অবগত ছিল যার দরুন গোটা জাতি প্রথম থেকেই তাঁর সম্পর্কে এটা জানতো যে, এ এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব যা তাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে। এ জন্য নবুওতের পূর্বেও

মক্কায় তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হতো। দ্বিতীয় কারণ এ ছিল যে, তাঁর পবিত্র মুখ থেকে কেউ কোনদিন কোন ভুল কথা শুনেনি। আর লোক মনে করতো যে, যে কথা তাঁর মুখ থেকে বেরুতো, তা সত্যে পরিণত হয়। এ জন্য তারা ভয় করতো যে তাঁর মুখ থেকে তাদের সম্পর্কে এমন কথা যেন না বের হয় যাতে তাদের কোন দুর্ভাগ্য ডেকে আনে। একটু উপরে এ কাহিনী বয়ান করা হলো যে, আবু লাহাবের মতো দুশমন যখন তার পুত্রের প্রতি হুযুরের (স) বদদোয়ার কথা শুনলো, তখন সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। শামদেশ ভ্রমণ কালে সে তার সাথীদেরকে তার পুত্রের হেফাজতের জন্য তাকে সাহায্য করার আবেদন জানালো। কারণ নবী মুহাম্মদ (স) তার পুত্র সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন তাতে সে তার পুত্রের প্রাণের আশংকা করছিল। কিন্তু তার সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়ে যায়। তার সে পুত্রকে খোদার এক 'কুকুর' উটের আবেষ্টনী অতিক্রম করে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে খেয়ে ফেল্লো।

তৃতীয় কারণ হচ্ছে, নবী পাকের (স) নিষ্কলুষ চরিত্র যার প্রতি দোষারোপ করার কোন অবকাশই ছিলনা। সমগ্র জাতি তাঁর এ মহৎ চরিত্র সম্পর্কে অবগত ছিল এবং তার স্বীকৃতিও দিয়েছিল। তাঁর মন জয়কারী আচরণে মক্কা ও তার চতুষ্পার্শস্থ অঞ্চলের শত শত লোক অভিভূত হয়ে পড়েছিল, তাঁর সততা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর জন্য দুশমনও তার প্রতি আস্থা পোষণ করতো। এমনকি মদীনায় হিজরত করার সময় পর্যন্ত ইবনে জারীরের বর্ণনা অনুযায়ী অবস্থা এমন ছিল যে, মক্কায় এমন কোন ব্যক্তি ছিলনা যে তার মূল্যবান সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের অভিলাষী ছিল এবং তার জন্য নবী মুহাম্মদ (স) ব্যতীত অন্য কারো প্রতি আস্থা পোষণ করতে পারতো। এ নৈতিক প্রভাবের কারণেই তাঁর চরম দুশমণও তাঁর মুকাবিলায় এসে সকল মনোবল হারিয়ে ফেলতো এবং তাঁর সামনে কথা বলার সাহস করতোনা। আবু জাহলের সাথে হুযুরের (স) সংঘটিত দুটি ঘটনা এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে।(১১)

আবু জাহলের আতংকিত হওয়ার ঘটনা

ইবনে ইসহাক বলেন, একবার 'এরাশ' নামক স্থানের[১] এক ব্যক্তি কয়েকটি উট নিয়ে বিক্রি করার জন্য মক্কায় আসে। আবু জাহল তার উট খরিদ করে। বিক্রেতা তার মূল্য চাইতে এলে আবু জাহল নানান টালবাহানা করতে থাকে। এরাশী নিরাশ হয়ে অবশেষে একদিন হেরমে কা'বায় কুরাইশ সর্দারদের কাছে গিয়ে সব কথা বল্লো এবং সমবেত লোকদের কাছে প্রতিকারের জন্য আকুল আবেদন জানালো। অন্যদিকে হারামের এক কোণে নবী (স) বসেছিলেন। কুরাইশ সর্দারগণ লোকটিকে বল্লো, আমরা কিছু করতে পারবনা। ঐ দেখ কোণায় যে লোকটি বসে আছে তার কাছে গিয়ে বল, সে তোমার পাওনা আদায় করে দেবে।

এরাশী নবী (স) এর দিকে চল্লো। এদিকে কুরাইশ সর্দারগণ পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, আজ মজা দেখা যাবে। এরাশী নবী (স) কে তার অভিযোগ করার সাথে সাথে

---

১. এ একটি স্থানের নাম যেমন মায়াজেমুল বুলদানে বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ সেখানে বসবাসকারী গোত্রের নামও এরাশ-গ্রন্থকার।

তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং লোকটিকে সাথে নিয়ে আবু জাহলের বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। নবী পাক (স) সোজা আবু জাহলের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়তে শুরু করলেন। ভেতর থেকে সে বল্লো, 'কে'? হুযুর (স) জবাব দিলেন, মুহাম্মদ (স)। সে হতবুদ্ধি হয়ে বাইরে এলো। নবী (স) তাকে বল্লেন, এ ব্যক্তির পাওনা পরিশোধ কর। সে কোন কথা না বলে ভেতরে চলে গেল এবং উটের মূল্য এনে লোকটির হতে দিয়ে দিল।

কুরাইশের গুপ্তচর এ অবস্থা দেখার পর হেরমে কাবার দিকে দ্রুতপদে ছুটে গিয়ে কুরাইশ সর্দারদের কাছে ঘটনা বিবৃত করলো। সে বল্লো, কসম খোদার, আজ যা দেখলাম তা আর কোনদিন দেখিনি। আবু জাহল বাইরে এসে মুহাম্মদকে (স) দেখা মাত্র তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপর মুহাম্মদ (স) যখন তাকে বল্লেন যে, তার পাওনা পরিশোধ কর, তখন মনে হলো তার দেহ প্রাণহীন হয়ে পড়েছে- (ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃষ্টা ২৯-৩০, বালাযুরীর আনসাবুল আশরাফ- ১ম খন্ড, পৃঃ ১২৮-১২৯)।(১২)

দ্বিতীয় ঘটনা

দ্বিতীয় ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন কাজী আবুল হাসান আল মাওয়ারদী তাঁর 'আ'লামুন্নবুওত' اعـلام النـبـوّة গ্রন্থে। তিনি বলেন, আবু জাহল একটি এতিম শিশুর অসি ছিল, এই শিশুটি একেবারে বিবস্ত্র অবস্থায় আবু জাহলের নিকটে এসে বল্লো, আমার পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে আমাকে কিছু দিয়ে দেন। কিন্তু জালেম তার দিকে মোটেও ফিরে তাকালেননা। সে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে হতাশ হয়ে ফিরে গেল। কুরাইশ সর্দারগণ দুষ্টামির নিয়তে তাকে বল্লো, তুমি মুহাম্মদের (স) নিকটে গিয়ে নালিশ কর। তিনি আবু জাহলের কাছে সুপারিশ করে তোমার জন্য কিছু আদায় করে দেবেন। হতভাগা শিশুটির জানা ছিলনা যে আবু জাহলের সাথে মুহাম্মদের (স) সম্পর্ক কিরূপ ছিল এবং এ জঘণ্য লোকগুলো কোন্ উদ্দেশ্যে এ পরামর্শ দিচ্ছে, সে সোজা হুযুরের (স) নিকটে গিয়ে তার অবস্থা বর্ণনা করলো। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে সাথে নিয়ে আবু জাহলের বাড়ি গেলেন। আবু জাহল হুযুরকে (স) সাদরে গ্রহণ করলো। তিনি বল্লেন, এ শিশুটির হক আদায় করে দাও। সে সংগে সংগে রাজী হয়ে গেল এবং তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এনে এতিম শিশুকে দিয়ে দিল।

এদিকে কুরাইশ সর্দারগণ এ প্রতীক্ষায় ছিল যে, দেখা যাক তাদের উভয়ের মধ্যে কোন্ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। কিন্তু তারা যখন প্রকৃত ঘটনা জানতে পারলো তখন বিস্ময়ের সাথে আবু জাহলের নিকটে এসে এই বলে ভর্ৎসনা করতে লাগলো, তুমি আপন দ্বীন পরিত্যাগ করলে? সে বল্লো, খোদার কসম, আমি আমার দ্বীন পরিত্যাগ করিনি। কিন্তু আমার এমন মনে হলো যে, তার ডানে ও বামে এক একটি মারাত্মক অস্ত্র। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করলেই তা আমার দেহ দ্বিখন্ডিত করবে।

এসব ঘটনা থেকে জানা যায় যে, হুযুরের (স) প্রভাব কতখানি তার দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল।(১৩)

তৃতীয় ঘটনা

বালাযুরীর বর্ণনা মতে একদিন নবী (স) হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা) ও হযরত সা'দ বিন ওক্কাস (রা) মসজিদে হারামে বসেছিলেন। এমন সময়ে বনী যুবায়েদের এক ব্যক্তি এলো। সে বল্লো, হে কুরাইশের লোকেরা! তোমাদের এখানে কে পণ্য দ্রব্য নিয়ে আসবে? কারণ বাইর থেকে যারা আসে তাদেরকে তোমরা লুঠপাট করে নিয়ে নাও। হুযুর (স) বল্লেন, তোমার উপর কে জুলুম করেছে? সে বল্লো, আবুল হাকাম অর্থাৎ আবু জাহল। সে আমার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তিনটি উট খরিদের ইচ্ছা করে তার অতি সামান্য মূল্য নির্ধারণ করে দেয় । এখন তার চেয়ে অধিক মূল্য দিতে কেউ রাজী নয়। আর এ মূল্যে বিক্রি করলে আমার ভয়ানক লোকসান হয়। হুযুর (স) তার তিনটি উটই খরিদ করলেন। আবু জাহল দূর থেকে চুপচাপ এসব দেখছিল। হুযুর (স) তার নিকটে গিয়ে বল্লেন, তুমি এ বেদুইনের সাথে যে আচরণ করেছ, খবরদার, এমনটি আর কারো সাথে করবেনা। নতুবা তোমার সাথেও এমন আচরণ করব। সে বলতে থাকলো, ভবিষ্যতে আর এমন কখনো করবনা। উমাইয়া বিন খালফ এবং আরও যেসব মুশরিক সেখানে উপস্থিত ছিল, আবু জাহলকে এই বলে ধিক্কার দিতে লাগলো, তুমি মুহাম্মদের (স) সামনে এমন দুর্বলতা প্রদর্শন করলে যে আমাদের সন্দেহ হয়, তুমি বুঝি তার অনুগত হয়ে পড়েছ। সে বল্লো, খোদার কসম! আমি কখনো তার আনুগত্য করবনা। কিন্তু আমি দেখলাম তার ডানে ও বামে কয়েকজন বল্লমধারী দাঁড়িয়ে আছে। মুহাম্মদের (স) হুকুম একটু অমান্য করলেই তারা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে মনে হলো (আন সাবুল আশরাফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩)।

বিরুদ্ধবাদিগণ নবীর (স) সততা ও সত্যবাদিতা স্বীকার করতো

উপরন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটাও ছিল যে, নবীর (স) চরম বিরোধীও মনে মনে তাঁর সততা ও সত্যবাদিতা স্বীকার করতো এবং নিজেদেরকে মিথ্যা মনে করতো। কিন্তু দুরভিসন্ধি, জাহেলী আত্মমর্যাদা, পূর্ব পুরুষের ধর্মের গোড়ামি ও ব্যক্তি স্বার্থের কারণে বিরোধিতা করতো। যাদের মনে এ দুর্বলতা ছিল, তারা তার পথ রুদ্ধ করার সকল প্রকার হীন কৌশল অবলম্বন করতো। কিন্তু নবীকে সত্য এবং নিজেদেরকে মিথ্যা মনে করার কারণে সামনা সামনি তাঁর মুকাবিলা করার সাহস তাদের ছিলনা। এ বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আমরা করবো। এখানে শুধু আবু জাহল সম্পর্কে বলতে চাই যে, নবীর (স) সবচেয়ে বড়ো দুশমন কিভাবে বার বার তাঁর সততা ও সত্যবাদিতার স্বীকৃতি দিয়েছে এবং নিজের বিরোধিতায় প্রকৃত কারণ কত কদর্য পন্থায় বর্ণনা করছে।

বায়হাকী যায়েদ বিন আসলামের বরাত দিয়ে হযরত মুগীরা বিন শা'বার বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, শির্কের যমানায় তার প্রথম সাক্ষাৎ কিভাবে নবীর (স) সাথে হয়েছিল। তিনি বলেন, আমি এবং আবু জাহল মক্কার একটি পথ দিয়ে চলছিলাম। এমন সময়ে নবীর (স) সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি আবু জাহলকে বল্লেন, "হে আবুল হাকাম! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে এসো। আমি তোমাকে আল্লাহর দিকে ডাকছি।" সে বল্লো, হে মুহাম্মদ (স)! তুমি কি আমাদের মাবুদদের গালমন্দ করা থেকে বিরত থাকছ? তুমি তো এটাই চাও যে আমরা এ সাক্ষ্য দেই যে, তুমি তোমার কথা পৌছে দিয়েছ। তো আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমি তোমার কথা পৌছে দিয়েছ। কিন্তু খোদার কসম! আমি যদি জানতাম যে,

তুমি হকের উপর আছ, তাহলে তোমার আনুগত্য করতাম।

তারপর নবী (স) সামনে অগ্রসর হয়ে গেলেন। তারপর আবু জাহল আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লো, খোদার কসম! আমি জানি যে, এ ব্যক্তি যা বলে তা সত্য। কিন্তু একটি জিনিস আমাকে বাধা দেয়। কুসাইয়ের সন্তানগণ বল্লো, (হজ্বের সময়) হাজীদের আহার করাবার দায়িত্ব আমাদের থাকবে তো? বল্লাম, হ্যাঁ।

তারা বল্লো- পানি পান করাবার দায়িত্ব আমাদের থাকবে তো?

বল্লাম- হ্যাঁ।

- নাদ্ওয়া আমাদের?

- হ্যাঁ।

- পতাকা আমাদের নিকটে থাকবে তো?

- হ্যাঁ।

তারপর তারা আমাদেরকে আহার করালো। আমরাও করালাম। তারপর আমাদের হাঁটুর সাথে তাঁদের হাঁটু মিলিত হলো, তখন তারা বল্লো- আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন।

বল্লাম, খোদার কসম, এ আমি মানবোনা।

ইবনে আবি হাতেম, আবু ইয়াযিদ মাদানীর বরাত দিয়ে বলেন যে, একবার আবু জাহলের সাথে নবী (স) এর সাক্ষাৎ হয় এবং সে তাঁর সাথে মুসাফা করে। একজন তাকে বল্লো- একি আমি তোমাকে যে একজন সাবীর (দ্বীন থেকে বিমুখ) সাথে মুসাফা করতে দেখছি। আবু জাহল তাকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে চুপে চুপে বলে, খোদার কসম! আমি জানি এ প্রকৃতপক্ষে নবী। কিন্তু আমরা কখন বনী আব্দে মানাফের অধীন হলাম?

ইমাম সুফিয়ান সাওরী, তিরমিযি এবং হাকেম হযরত আলী (রা) এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, আবু জাহল নবী (স) কে বলে, আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করিনা। কিন্তু তুমি যা নিয়ে এসেছ তা মিথ্যা মনে করি।

বায়হাকী ও ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাক থেকে এবং তিনি ইমাম যুহরী থেকে এ মজার ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন যে, একদিন রাতে আবু জেহল, আবু সুফিয়ান এবং আখনাস্ বিন শুরাইক- পৃথক পৃথক ভাবে বেরিয়ে পড়লো- রাতে নবী (স) নামাযে যে কুরআন পড়তেন তা শুনার জন্য। তিন জনের মধ্যে কেউ কারো খবর জানতোনা। সকাল হলে তারা একে অপরকে দেখে ফেলে। পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করলো এবং শপথ করলো যে, এমনটি তারা আর করবেনা। কারণ যদি লোকে তাদেরকে এভাবে কুরআন শুনতে দেখে ফেলে তাহলে এ জিনিস তাদের মনের মধ্যে স্থান করে নেবে। দ্বিতীয় দিনেও এরূপ ঘটলো। তারা একে অপরকে দেখার পর আবার শপথ করলো যে, এমনটি আর তারা করবেনা। তৃতীয় দিন যখন একই ঘটনা ঘটলো এবং যা না করার তারা শপথ করেছিল, তখন আখনাস্ লাঠি হাতে নিয়ে আবু সুফিয়ানের কাছে গিয়ে বল্লো, আবু হানযালা! তুমি আমাকে সত্য কথা বলবে- মুহাম্মদের (স) নিকটে তুমি যা শুনেছ, সে সম্পর্কে তোমার অভিমত কি?

সে বল্লো, আবু সা'লাবা! খোদার কসম, আমি এমন সব কথা শুনেছি যা আমি বুঝতে পারি এবং এটাও বুঝি যে তার অর্থ কি, আর কিছু কথা এমনও আছে যার অর্থ আমি বুঝতে পারিনি। আখনাস্ বলে, আমার অবস্থাও তাই।[১] তারপর সে আবু জাহেলের নিকটে

১. হাফেজ ইবনে হাজার 'ইসাবা'তে ইমাম যুহরীর যে বর্ণনা এ ঘটনা সম্পর্কে হযরত সাঈদ বিন আল্

গিয়ে বল্লো, আবুল হাকাম, তুমি মুহাম্মদের (স) নিকটে যা কিছু শুনলে, সে সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? সে বল্লো, কি শুনেছি? আমাদের এবং বনী আবেদ মানাফের মধ্যে এ প্রতিযোগিতা চলছিল যে, আমাদের মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে বড়ো কে। তারাও আহার করায়, আমরাও করায়। তারাও দায়িত্বের বোঝা বহন করে, আমরাও করি। তারাও অর্থ সম্পদ দান করে, আমরাও করি। শেষ পর্যন্ত যখন সব বিষয়ে আমরা সমান সমান হয়ে যাই তখন তারা বলতে থাকে, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন যার কাছে আসমান থেকে অহী আসে। এখন এ আমরা কোথা থেকে পাব। খোদার কসম! আমরা তাকে মানবনা এবং তার সত্যতাও স্বীকার করবনা। প্রায় একই রকম কথা আবু জাহল আখনাস্ বিন শুরাইককে সে সময়ে বলে যখন বদর যুদ্ধের সময় আখনাস্ নির্জনে তার সাথে দেখা করে। ইবনে জারীর তাবারী তাঁর তফসীরে সুদ্দীর বরাত দিয়ে এ কথা উদ্ধৃত করেছেন যে, আখনাস্ আবু জাহলকে বলে, এ সময়ে এখানে তুমি ও আমি ছাড়া আর কেউ নেই। তুমি
১ আমাকে সত্য কথা বল যে মুহাম্মদ (স) মিথ্যাবাদী, না সত্যবাদী। সে বলে, কসম খোদার! মুহাম্মদ (স) সত্যবাদী। সে কখনো মিথ্যা বলেনি। কিন্তু যখন বনী কুসাই লেওয়া, হেজাবাত ও সেকায়েতসহ* নবুওতও নিয়ে যায়, তাহলে কুরাইশের নিকটে অবশিষ্ট কি রইলো?

আবু জাহলের মতো কট্টর ইসলাম দুশমনের অবস্থাই যখন এমন ছিল, তখন অন্যান্যদের অবস্থা কেমন ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

নবী (স) সম্পর্কে কুরাইশদের ধারণা বিশ্বাস

এ সম্পর্কে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, কুরাইশের ওসব লোকই, যারা তাঁর

মুসায়্যাব থেকে উদ্ধৃত করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে, আবু সুফিয়ান আখনাসকে জিজ্ঞেস করে, তোমার কি মত? সে বলে আমি তো তাকে সত্য মনে করি। এ কথার অতিরিক্ত সমর্থন হযরত মুয়াবিয়ার (রা) সে বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়- যা তাবারানী 'আওসাতে' উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, একবার আমার পিতা আবু সুফিয়ান আমার মা হিন্দকে একটি গাধার উপর বসিয়ে মরু অঞ্চলের দিকে যাচ্ছিলেন। আমি অন্য একটি গাধার পিঠে চড়ে তাদের আগে আগে যাচ্ছিলাম। এমন সময় পথে নবী (স) এর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। আমার পিতা আমাকে বল্লেন, মায়াবিয়া! তুমি নেমে যাও যাতে মুহাম্মদ (স) তোমার গাধায় সওয়ার হতে পারে। অতএব আমি নেমে পড়লাম এবং নবী (স) তার পিঠে উঠে বসলেন। তারপর তিনি আমার পিতা ও মাতাকে সম্বোধন করে বল্লেন, হে আবু সুফিয়ান এবং হে হিন্দ বিনতে ওত্‌বা। খোদার কসম, তোমরা সকলে এক সময় মরে যাবে। তারপর পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে। তারপর যে সৎ হবে সে জান্নাতে যাবে এবং যে পাপী হবে সে জাহান্নামে যাবে। তারপর তিনি সূরা- হা-মীম-আস্‌সাজদাহর প্রথম এগারো আয়াত পড়ে শুনালেন। তারপর তিনি গাধার পৃষ্ঠ থেকে নেমে পড়লেন এবং আমি চড়ে বসলাম। পথে আমার মা আমার পিতাকে বল্লেন, তুমি আমার ছেলেকে গাধার উপর থেকে নামিয়ে এ মিথ্যাবাদী ও যাদুকরকে বসালে? আমার পিতা বল্লেন, খোদার কসম, এ ব্যক্তি না যাদুকর, না মিথ্যাবাদী।-গ্রন্থকার

* কাবা ঘরের কর্তৃত্ব বনী কুসাইয়ের হাতে আসার পর হজ্জের সময় তাদের কিছু দায়িত্ব পালন করতে হতো। তাদের মধ্য থেকেই একজন পতাকাবাহী হতো। এ পদের নাম ছিল আল্লেওয়া (اللواء)। তাদের একটি দায়িত্ব ছিল হাজীদেরকে পানি পান করানো। একে বলা হতো আসসেকায়াহ (السقاية)। কাবা ঘরের চাবি তাদের হাতে থাকতো। হাজীদের জন্য খানায়ে কাবা খুলে দেয়া ও বন্ধ করা তাদের দায়িত্বে ছিল। একে বলা হতো আল হেজাবাহ (الحجابة)। এ কথা এ গ্রন্থে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। -অনুবাদক

বিরোধিতায় সোচ্চার ছিল, নবীর (স) শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল। যখন নবী (স) এবং মুসলমানদের সাথে তাদের চরম সংঘাত সংঘর্ষ চলছিল, ঠিক সে সময়ে মক্কায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। তখন সকল অধিবাসী আর্তনাদ শুরু করে দেয়। তখন মক্কার সর্দারগণ নবীকে (স) অনুরোধ করে- এ বিপদ থেকে তাঁর জাতিকে রক্ষা করার জন্য দোয়া করতে। ইমাম বোখারী এবং বায়হাকী কিছু শাব্দিক পার্থক্যসহ মাসরুকের বরাত দিয়ে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদের (রা) এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন যে, যখন রসূলুল্লাহ (স) দেখলেন যে, কুরাইশ তাঁর মুকাবেলায় বিদ্রোহ করার জন্য বদ্ধপরিকর, তখন তিনি দোয়া করেন, হে খোদা! হযরত ইউসুফের (আ) সাত বছর ব্যাপী দুর্ভিক্ষের ন্যায় এসব লোকের মুকাবেলায় আমাকেও সাত বছরের দুর্ভিক্ষ দ্বারা সাহায্য কর। ফলে এমন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয় যে, লোক মৃতজীব, হাড়হাড্ডি এবং পশুর চামড়াও খেতে থাকে। অবশেষে আবু সুফিয়ান এবং মক্কার বিভিন্ন লোক হুযুর (স) এর নিকটে এসে আবেদন জানালো, হে মুহাম্মদ (স)! আপনি দাবী করেন যে, আপনাকে রহমত স্বরূপ পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এখন অবস্থা এই যে, আপনার কওম ধ্বংস হতে চলেছে। আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন।

এ আবেদনের পর হুযুর (স) দোয়া করেন এবং এতো অধিক বৃষ্টি হয় যে, লোক অতি বর্ষণ থেকে বাঁচার জন্য আবার তাকে দোয়া করতে বলতে থাকে। তিনি দোয়া করলেন, হে খোদা! আমাদের উপরে না হয়ে চারদিকে হোক। তারপর আকাশ মেঘমুক্ত হয়।

ইমাম বোখারী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন যে, আবু সুফিয়ান অনাহার থেকে বাঁচার আবেদন নিয়ে নবীর (স) কাছে এলো। তাঁর দোয়ায় দুর্ভিক্ষের বিপদ দূর হয়।

এসব ঘটনা থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় কুরাইশ সর্দারগণ সরাসরি নবীর সাথে সংঘর্ষে আসতে এবং বলপূর্বক তাঁর প্রচার বন্ধ করতে কেন সাহস করতোনা। কিন্তু সেই সাথে তাঁরা এটাও বরদাশত করতোনা যে, তাঁর প্রচার হতে থাক, তাদের পূর্ব পুরুষদের দ্বীন নির্মূল হয়ে যাক, তাদের জীবন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত অন্য একটি জীবন ব্যবস্থা প্রসার লাভ করুক এবং মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে থাক। এ জন্য তাদের সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, তাঁর দাওয়াত যেন কিছুতেই প্রসার লাভ করতে না পারে এবং যে কোন মূল্যে তা বাধাগ্রস্ত করতে হবে। এ আক্রোশে তারা কোন কোন সময়ে তার প্রতি অত্যাচারও করে বসতো।(১৪)

নির্দেশিকা

১. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন।
২. তাফহীমুল কুরআন ৬ষ্ঠ খন্ড- ভূমিকা সূরা 'আলাক'।
৩. গ্রন্থকারের সংযোজন।
৪. তাফহীমুল কুরআন- ৩য় খন্ড- শুয়ারা-টীকা ৩৫
৫. তাফহীমুল কুরআন- ৩য় খন্ড- শুয়ারা-টীকা ৩৫
৬. তাফহীমুল কুরআন- ষষ্ঠ খন্ড- ভূমিকা- সূরা লাহাব।
৭. সংযোজন।

৮. তাফহীমুল কুরআন, ৬ষ্ঠ খন্ড- ভূমিকা- সূরা লাহাব।
৯. তাফহীমুল কুরআন, ৬ষ্ঠ খন্ড- টীকা-৩।
১০. তাফহীমুল কুরআন, ৬ষ্ঠ খন্ড- টীকা ১।
১১. সংযোজন।
১২. তাফহীমুল কুরআন- ৩য় খন্ড- আম্বিয়া- টীকা-৫।
১৩. তাফহীমুল কুরআন- ৬ষ্ঠ খন্ড- মাউন, টীকা-৫।
১৪. সংযোজন।

অষ্টম অধ্যায়

ইসলামী দাওয়াত প্রতিরোধের জন্য কুরাইশের ফন্দি-ফিকির

এ আলোচনার পূর্বে প্রথমেই এটা জেনে রাখা দরকার যে, ইসলাম ও রসূলুল্লাহ (স) এর ব্যাপারে সকল কুরাইশ গোত্রের আচরণ একই রকম ছিলনা। বরঞ্চ তারা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

একটি শ্রেণী ছিল চরম বিরোধী। এ ছিল বড়ো বড়ো সমাজপতি বা সর্দারদের নিয়ে। ইবনে সাদ, তাবকাতে তাদের নাম নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেনঃ আবু জাহ্ল, আবু লাহাব, আসওয়াদ বিন আব্দে ইয়াগুস্ (এ ছিল বনী যোহ্রার লোক এবং নবীর (সা) মামাতো ভাই), হারেস বিন কায়েস বিন আদী (এ ছিল বনী সাহম গোত্রের এবং ইবনুল গায়তালা নামে পরিচিত), অলীদ বিন মগীরা (বনী মাখযূম), উমাইয়্যা বিন খালাফ এবং উবাইবিন খালাফ (বনী জুমাহ), আবু কায়েস বিন ফাকেহ্ বিন মগীরাহ (বনী মাখযূম), আস বিন ওয়ায়েল সাহ্মী (আমর বিন আসের পিতা), নযর বিন আল হারেস (বনী আবদুল্লাহ্র), মুনাব্বেহ্ বিন আল হাজ্জাজ (বনী সাহম), যুহাইর বিন আবি উমাইয়া (বনী মাখযূম), সায়েব বিন সায়ফী বিন আবেদ (বনী মাখযুম), আসওয়াদ বিন আবদুল আসাদ মাখযুমী, আস বিন সাঈদ বিন আল আস্ (বনী উমাইয়া), আবুল বাখতারী আস বিন হিশাম (বনী আসাদ), ওকবা বিন আবি মুয়াইত (বনী উমাইয়া), ইবনুল আসদী আল হুযালী হাকাম বিন আবিল আস (বনী উমাইয়া) এবং সাদী বিন হামরা আস্সাকফী।

দ্বিতীয় শ্রেণীটি ছিল ওসব কুরাইশ সর্দারদের নিয়ে যারা দুশমন তো অবশ্যই ছিল, কিন্তু এমন দুশমন ছিলনা যে উপরে উল্লিখিত দলের ন্যায় সর্বশক্তি দিয়ে নবী (স) এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ করছিল। অবশ্যি ইসলামের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপই নেয়া হতো, ওসব দুশমনের এরা সহযোগিতা করতো। ইবনে সা'দ ওত্বা বিন রাবিয়া, শায়বা বিন রাবিয়া এবং আবু সুফিয়ানকে এ ধরনের দুশমনের মধ্যে গণ্য করতেন। তথাপি যারা সকলের চেয়ে বিরোধী ছিল তাদের কাজের ধরন কুরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-

اَلَا اِنَّـهُـمْ يَـثْـنُـوْنَ صُـدُوْرَهُـمْ لِـيَـسْـتَـخْـفُـوْا مِـنْـهُ -(هـود: ٥)

দেখ, এরা তাদের বক্ষদেশ গুরিয়ে রাখে যাতে তারা তাঁর থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখতে পারে (হুদ ঃ ৬)।

অর্থাৎ তারা নবী (স) এর দাওয়াতের প্রতি এতো বীতশ্রদ্ধ ছিল যে, তারা তাঁকে এড়িয়ে চলতে চাইতো। কোথাও তাঁকে বসে থাকতে দেখলে তারা কেটে পড়তো। সামনে থেকে আসতে দেখলে অন্যদিকে চলে যেতো অথবা কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে

চলতো। এ ভয়ে যে সামনা সামনি হলে যদি তাদের সম্বোধন করে তিনি কিছু কথা বলে ফেলেন।

এখন রইলো, মক্কার সাধারণ লোক। তো তাদের মধ্যে কিছু ছিল নিরপেক্ষ, কিছু মনে মনে ইসলাম সমর্থন করতো। কিন্তু তাদের ইসলাম গোপন রাখতো। কিছু লোক আবার ইসলাম গ্রহণ করতো। একটি বিরাট সংখ্যক লোক তাদের সর্দারদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পৈত্রিক ধর্মের মর্যাদা রক্ষার্থে তাদের ওসব অপতৎপরতায় লিপ্ত হতো যা ইসলামের বিরুদ্ধে করা হতো।

এখন আমরা এসব ক্রিয়াকৌশল পৃথক পৃথক বর্ণনা করব যা ইসলামী দাওয়াতের পথ রুদ্ধ করার জন্য অবলম্বন করা হতো।

এক. নবী (স) এর সাথে আপোসের চেষ্টা

যেহেতু বিরোধীগণ হুযুর (স) এর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং কুরআনের অপ্রতিহত প্রভাব অনুভব করছিল, সে জন্য তারা বার বার এ চেষ্টা করে যে, নবী (স) এর সাথে আলাপ আলোচনা করে দ্বীন সম্পর্কে তাঁকে কোন প্রকারে একটা আপোসে উপনীত হওয়ার জন্য সম্মত করা যায় কিনা। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রতিনিধি দল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিও তাঁর সাথে কথা বলে।

তাঁর সাথে ওত্বা বিন রাবিয়ার সাক্ষাৎ

এসব সাক্ষাৎকারের মধ্যে ওত্বা বিন রাবিয়ার সাক্ষাৎকার ছিল গুরুত্বপূর্ণ যা বিভিন্ন মুহাদ্দিসগণ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ফলাফল সম্পর্কে অধিক মতপার্থক্য ছিলনা। ইবনে আবি শায়বাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে এবং আবদুল্লাহ্ বিন হামিদ, আবু ইয়ালা ও বায়হাকী জাবেদ বিন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেন যে, একদিন কুরাইশের কিছু লোক একত্রে সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরে বলে দেখ, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশী যাদুবিদ্যা, ভবিষ্যদ্বাণী ও কবিতা রচনায় পারদর্শী। সে এ ব্যক্তির কাছে যাবে যে আমাদের দলে ভাঙন সৃষ্টি করেছে, আমাদের ব্যাপার-স্যাপার ও বিষয়াদিতে অমংগল অঘটন ঘটিয়েছে, আমাদের ধর্মকে কলুষিত করেছে। তার সাথে কথা বলে দেখা যাক সে কি জবাব দেয়। লোকেরা বলে, আমাদের মতে এমন লোক ওত্বা বিন রাবিয়া ছাড়া আর কেউ নেই। অতএব সকলে বলে, আবুল অলীদ! তুমিই এ কাজ কর। অতএব সে নবীর (স) নিকটে যায়।(১)

দ্বিতীয় বর্ণনাটি মুহাম্মদ বিন ইসহাক ও বায়হাকী, মুহাম্মদ বিন কায়াব আল কুরাযী থেকে উদ্ধৃত করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে, একবার কুরাইশের কতিপয় সর্দার মসজিদে হারামে একত্রে বসেছিল এবং মসজিদের অন্যদিকে রসূলুল্লাহ (স) একাকী বসেছিলেন। এ এমন সময়ের কথা যখন হযরত হামযা (রা) ঈমান এনেছেন এবং কুরাইশের লোকেরা মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলছিল দেখে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিল। এ অবস্থায় ওত্বা বিন রাবিয়া (আবু সুফিয়ানের শ্বশুর) কুরাইশ সর্দারদেরকে বল্লো, তোমরা যদি ভালো মনে কর তাহলে আমি মুহাম্মদ (স) এর সাথে কথা বলি এবং তার কাছে কিছু প্রস্তাব পেশ করি। হয়তো তিনি কোন প্রস্তাব মেনে নিতে পারেন এবং আমরাও তা মেনে নিতে পারি। এভাবে তিনি আমাদের বিরোধিতা থেকে বিরত থাকতে পারেন। উপস্থিত সকলেই এ ব্যাপারে একমত হয় এবং বলে আবুল অলীদ! তোমার উপর পূর্ণ আস্থা আছে, তুমি অবশ্যই তার সাথে কথা বল।

ওত্‌বা উঠে নবীর (স) কাছে গিয়ে বসলো। তিনি তার প্রতি মনোযোগী হলে সে বল্লো, ভাতিজা! তুমি আমাদের যে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলে তা তোমার জানা আছে, আর বংশের দিক দিয়েও তুমি এক সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। এখন তুমি আমাদের কওমের উপর কি বিপদ এনে দিয়েছ? তুমি আমাদের দলে ভাঙন সৃষ্টি করেছ। গোটা কওমকে নির্বোধ মনে কর। আমাদের ধর্ম ও দেব-দেবীদের তুমি গালমন্দ করে থাক। আমাদের মৃত বাপদাদাকে তুমি কাফের মনে কর। এখন তুমি আমার কিছু কথা শুনো। আমি তোমার কাছে কিছু প্রস্তাব রাখছি। চিন্তাভাবনা করে দেখ। হয়তো তার মধ্যে একটা তুমি গ্রহণও করতে পার।

রসূলুল্লাহ (স) বল্লেন, আবুল অলীদ! আপনি বলুন, আমি শুনবো।

সে বল্লো, ভাতিজা! যে কাজ শুরু করেছ, তার উদ্দেশ্য যদি ধন-সম্পদ লাভ করা হয়, তাহলে আমরা সকলে মিলে তোমাকে এতো দিয়ে দেব যে তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী হয়ে যাবে। তুমি যদি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাও তো আমরা তোমাকে আমাদের সর্দার বানিয়ে নেব। তুমি ছাড়া আমাদের কোন বিষয়ের ফয়সালা করবনা। আর যদি বাদশাহী চাও, তাহলে তোমাকে আমাদের বাদশাহ বানিয়ে নেব। আর যদি তোমার উপর কোন জ্বিনের ক্রিয়া হয়ে থাকে যা দূর করতে তুমি সক্ষম নও এবং নিদ্রায় ও জাগরণে তুমি কিছু দেখতে পাও তাহলে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডেকে আনব এবং সকলে মিলে তোমার চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করব। ওত্‌বা বলে যাচ্ছিল এবং হুযুর (স) তা নীরবে শুনে যাচ্ছিলেন।

অতঃপর তিনি বলেন, আবুল অলীদ! আপনার যা কিছু বলার ছিল তা শেষ হয়েছে, না আর কিছু বলার আছে? সে বল্লো, না, যা কিছু বলার ছিল তা বলেছি। নবী (স) বল্লেন, আচ্ছা! তাহলে এবার আমার কথা শুনুন। তারপর তিনি বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে সূরা- হা-মীম-আস্‌ সাজদাহ তেলাওয়াত করা শুরু করেন। ওত্‌বা তার দু'হাত পেছনের দিকে ঠেস দিয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে। সেজদার আয়াত (আয়াত নং ৩৮) পৌঁছার পর হুযুর (স) সেজদা করেন এবং মাথা উঠাবার পর বলেন, আবুল অলীদ! আমার জবাব তো আপনি শুনলেন। এখন আপনি জানেন এবং আপনার কাজ জানে।

ওত্‌বা উঠে কুরাইশ সর্দারদের বৈঠকের দিকে চল্লো। দূর থেকে লোক তাকে দেখে মন্তব্য করলো, খোদার কসম! ওত্‌বার চেহারায় পরিবর্তন হয়েছে। যে চেহারা নিয়ে সে গিয়েছিল এখন তা আর নেই। তারপর যখন সে তাদের মধ্যে গিয়ে বসলো, তখন তারা বল্লো, কি শুনে এলে?

সে বল্লো, খোদার কসম! আমি এমন কালাম শুনলাম যা আমি পূর্বে কখনো শুনিনি। কসম খোদার, এ না কবিতা, না যাদু আর না ভবিষ্যদ্বাণী, হে কুরাইশের লোকেরা! আমার কথা শুনো এবং তাকে তার অবস্থার উপরেই থাকতে দাও। আমার মনে হয়, এ কথাগুলো বাস্তবে রূপলাভ করবেই। মনে কর, যদি আরববাসী তার উপর জয়লাভ করে তাহলে আপন ভাইয়ের উপর হাত উঠানো থেকে তোমরা বেঁচে যাবে। অন্য লোকই তাকে সামলিয়ে নেবে। কিন্তু যদি সে আরবাসীর উপর বিজয়ী হয়, তাহলে তার বাদশাহী তো হবে তোমাদেরই বাদশাহী। তার মানসম্মান হবে তোমাদেরই মানসম্মান।

কুরাইশ সর্দারগণ তার কথা শুনে বল্লো, অলীদের পিতা! শেষে তার যাদু তোমার উপরেও ক্রিয়া করলো?

ওত্‌বা বল্লো, আমার অভিমত তোমাদেরকে বল্লাম। এখন তোমাদের যা খুশী করতে থাক।

বায়হাকী এ ঘটনা সম্পর্কে যে সব বর্ণনা সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে অতিরিক্ত এ কথা ছিল, যখন হুযুর (স) হা-মীম-সাজ্দার ১৩ নং আয়াত-

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ -

(যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদেরকে বলে দাও, আমি তো তোমাদেরকে সেই ধরনের হঠাৎ আপতিত হওয়া শাস্তির ভয় দেখালাম যেমনটি হয়েছিল আদ ও সামুদের উপর) পর্যন্ত পৌছলেন তখন ওত্‌বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হুযুরের (স) মুখের উপর তার হাত রাখলো এবং আত্মীয়তার বরাত দিয়ে বলতে লাগলো, এমন কথা বলোনা। লোকের কাছে সে এরূপ বলার কারণ এই বল্লো, তোমরাতো জান যে মুহাম্মদ (স) যখন কোন কথা বলে তা বৃথা যায়না। এজন্যে আমার শাস্তির ভয় হয়েছিল।(২)

আর একটি প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

মুহাম্মদ বিন ইসহাক ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন যে, একবার ওত্‌বা বিন রাবিয়া শায়বা বিন রাবিয়া, আবু সুফিয়ান বিন হারাব, নযর বিন হারেস, আবুল বাখতারী বিন হিশাম, আসওয়াদ বিন আল মুত্তালিব, উমাইয়া বিন খালাফ, আস বিন ওয়াইল এবং হাজ্জাজ বিন শাহ্‌মীর পুত্র নুবাইয়া ও মুনাব্বে সূর্যাস্তের পর কাবার দেওয়ালের নিকটে সমবেত হলো এবং পরস্পর বলতে লাগলো, মুহাম্মদকে (স) ডেকে কথা বল এবং তার সাথে আলোচনা করে তাকে শেষ কথা বলে দেয়া হোক। এদিকে হুযুর (স) কেও বলে দেয়া হলো যে, তাঁর কওমের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ একত্র হয়েছেন তাঁর সাথে কথা বলার জন্য। তিনি যেহেতু তাঁদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য খুবই অধীর হয়ে পড়েছিলেন, সে জন্য তিনি সাথে সাথেই তাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁরা বল্লেন, হে মুহাম্মদ (স)! আমরা তোমাকে এ জন্য ডেকেছি যে, তোমার ব্যাপারে শেষ কথা বলে দেয়া হবে। খোদার কসম! আমরা জানিনা যে, আরববাসীর মধ্যে কোন ব্যক্তি নিজের কওমের মধ্যে এমন কোন ফেৎনা সৃষ্টি করেছে যা তুমি তোমার জাতির জন্য করেছ। তুমি বাপ-দাদাকে গালমন্দ করেছ, ধর্মের মধ্যে দোষ বের করেছ, লোকদেরকে বোকা গণ্য করেছ, দেব-দেবীদের বিরুদ্ধে কথা বলছ, দলের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করেছ এবং এমন কোন অপ্রীতিকর বিষয় নেই যা তুমি তোমার ও আমাদের মধ্যে সংঘটিত করনি। যদি তুমি এসব অর্থ লাভের উদ্দেশ্যে করে থাক, তাহলে আমরা অর্থ জমা করে তোমাকে এতো পরিমাণে দেব যে, তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনশালী হয়ে যাবে। যদি আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাও, তাহলে তোমাকে আমাদের সর্দার বানিয়ে নিচ্ছি। যদি তুমি বাদশাহী চাও, তাহলে তোমাকে বাদশাহ্ বানিয়ে দিচ্ছি। আর যদি কোন জ্বিন এসে তোমার উপর চেপে বসে থাকে তাহলে নিজেদের অর্থ ব্যয় করে তোমার চিকিৎসা করব যাতে জ্বিনের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পার। এসব করার পর যেন অন্ততঃপক্ষে আমাদের পক্ষ থেকে ওজর পূর্ণ করা হয়।

জবাবে হুযুর (স) বলেন, আমার সেসব কোন রোগ নেই যার কথা তোমরা বলছ। তোমাদের কাছে আমি যা এনেছি তার জন্য কোন অর্থ দাবী করছি তাও নয়। অথবা তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করি অথবা তোমাদের বাদশাহ্ হই এমন অভিলাষও আমার নেই। বরঞ্চ আল্লাহ্ আমাকে তোমাদের জন্য রসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন। আমার উপর

একটি কিতাব নাযিল করছেন এবং আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাদের জন্য (ঈমান আনার কারণে) সুসংবাদদাতা এবং (ঈমান না আনার জন্য) ভীতি প্রদর্শনকারী হওয়ার জন্য, অতএব আমি আমার রবের পয়গাম তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের উপদেশ দিয়েছি। এখন যে জিনিস আমি এনেছি তা যদি গ্রহণ কর। তাহলে তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্যের কারণ হবে। আর যদি তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কর তাহলে আমি আল্লাহর হুকুমে সবর করতে থাকব যতোক্ষণ না আল্লাহ্ আমার এবং তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেন। এর জবাবে কাফের সর্দারগণ তাঁর কাছে বিভিন্ন প্রকারের মোজেযার দাবী করে।[১]

ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাক থেকে এ ঘটনার যে বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন, তাতে এ কথা অতিরিক্ত রয়েছে যে, মোজেযা দাবী করার পর হুযুর (স) বলেন, এ সব কাজের জন্য আমি তোমাদের নিকটে আসিনি। যে কথা পেশ করার জন্য আল্লাহ্ আমাকে পাঠিয়েছেন, তা আমি তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছি।

অবশেষে তারা হুযুরকে (স) ধমক দিয়ে বলে, কসম খোদার! তোমার এসব কাজ কর্মের জন্য তোমাকে আমরা এমনি ছেড়ে দেবনা। হয় আমরা তোমাকে শেষ করে দেব, অথবা তুমি আমাদেরকে শেষ করে দেবে।(৩)

আপোসের আরও কিছু চেষ্টা

এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে কুরাইশের লোকেরা হুযুর (স) এর নিকটে বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করতে থাকে যাতে কোন একটি গ্রহণ করলে উভয়ের মধ্যকার সংঘাত সংঘর্ষ দূর হতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) বলেন, কুরাইশের লোকেরা হুযুরকে (স) বল্লো, আমরা আপনাকে এতো ধন-সম্পদ দান করব যে, আপনি মক্কায় সবার চেয়ে ধনী ব্যক্তি হয়ে যাবেন। আপনি যে মেয়েকে পছন্দ করেন তার সাথে আপনার বিয়ে দিয়ে দেব। আমরা আপনার পেছনে চলতে রাজী আছি। আপনি শুধু আমাদের এ কথাটি মেনে নিন যে, আমাদের দেব-দেবী সম্বন্ধে গাল-মন্দ করা থেকে বিরত থাকুন। যদি এ কথা মানতে না

---

১. টীকা- দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুরআনে বলা হয়েছে-

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ -(الانعام:٧)

- যদি আমরা তোমার উপরে কাগজে লেখা কোন কিতাব নাযিল করতাম এবং এ সব লোক তা নিজেদের হস্তদ্বারা স্পর্শ করেও দেখে নিত, তাহলে যারা মানেনি তারা বলতো এতো সুস্পষ্ট যাদু- (আনয়ামঃ৭)।

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ
لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ -

- আমরা যদি আসমানের কোন দরজা যদি এদের উপর খুলে দিতাম এবং তারা এতে চড়তে লাগতো তাহলে এরা বলতো, আমাদের চোখ প্রতারিত হচ্ছে- বরঞ্চ আমাদের উপর যাদু করা হয়েছে- (হিজ্‌র-১৪-১৫)।

চান, তাহলে আর একটা প্রস্তাব পেশ করছি, যাতে আপনারও মংগল আমাদেরও মংগল।

হুযুর (স) বল্লেন, তা কি?

তারা বল্লো, এক বছর আপনি আমাদের মাবুদ লাত ও ওয্যার এবাদত করুন, আর এক বছর আমরা আপনার মাবুদের এবাদত করব।

হুযুর (স) বল্লেন, আচ্ছা, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি দেখি আমার রবের পক্ষ থেকে কোন্ হুকুম আসে।[১] এতে অহী নাযিল হলোঃ

يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ-

(বলে দাও), হে কাফেরগণ! আমি তাদের এবাদত করিনা, যাদের তোমরা এবাদত কর। আর না তোমরা তাঁর এবাদতকারী যাঁর এবাদত আমি করি। আর না আমি তাদের এবাদতকারী যাদের এবাদত তোমরা করেছ। না তোমরা তাঁর এবাদতকারী যাঁর এবাদত আমি করি। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্য আমার দ্বীন।

قُلْ أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُوْنِّيْ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ. (الزمر: ٦٤)

তাদেরকে বল, হে নির্বোধেরা! তোমরা কি আমাকে এ কথা বলছ যে, আল্লাহ ছাড়া আমি আর কারো এবাদত করি (ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতেম, তাবারানী)।

ইবনে আব্বাস (রা) এর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, কুরাইশের লোকেরা হুযুর (স) কে বল্লো, হে মুহাম্মদ (স)! যদি তুমি আমাদের দেব-দেবীকে চুমো দাও, তাহলে আমরা তোমার মাবুদের বন্দেগী করবো। এর জবাবে সূরা কাফেরুন নাযিল হয় (আব্দ বিন হামীদ)।

সাঈদ বিন সীনা (আবুল বাখতারীর আযাদ করা গোলাম) থেকে বর্ণিত আছে যে, অলীদ বিন মুগীরা, আস বিন ওয়াইল, আসওয়াদ বিন আল্ মুত্তালিব এবং উমাইয়া বিন খালাফ রসূলুল্লাহ (স) এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলে, হে মুহাম্মদ (স)! এসো আমরা তোমার মাবুদের এবাদত করি এবং তুমি আমাদের মাবুদের এবাদত কর। তারপর আমরা তোমাকে আমাদের যাবতীয় কাজকর্মে শরীক করে নিচ্ছি। তুমি যা এনেছ তা যদি আমাদের কাছে যা আছে তার থেকে উত্তম হয়, তাহলে আমরা তার মধ্যে অংশীদার হয়ে যাব এবং আমাদের অংশ পেয়ে যাব। আর যদি আমাদের কাছে যা আছে তা তোমার আনীত জিনিস থেকে ভালো হয়, তাহলে তুমি আমাদের সাথে তাতে অংশীদার হবে এবং

---

১. এর অর্থ এ নয় যে, রসূলুল্লাহ (স) কোন দিক দিয়ে এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য কেন, বিবেচনার যোগ্য মনে করতেন। এবং মায়াযাল্লাহ কাফেরদেরকে এ জবাব এ আশায় দিয়েছিলেন যে, হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে তার অনুমোদন আসবে। বরঞ্চ প্রকৃত পক্ষে এ কথাটি একেবারে এমনটি ছিল, যেমন কোন অধীন অফিসারের নিকট কোন অসংগত প্রস্তাব পেশ করা হলো এবং তিনি জানেন যে তাঁর সরকার এ দাবী কিছুতেই মেনে নিতে পারেননা। কিন্তু তিনি এ দাবী প্রত্যাখ্যান না করে দাবী উত্থাপনকারীদের বলে দিলেন, আমি আপনাদের আবেদন কর্তৃপক্ষের নিকটে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারপর যে নির্দেশ আসে তা আপনাদের জানিয়ে দেব। এতে পার্থক্য এই যে, নিম্নস্থ কর্মচারী যদি স্বয়ং দাবী প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে লোকে জিদ করতেই থাকবে। কিন্তু তিনি যদি বলেন, কর্তৃপক্ষের জবাব তোমাদের দাবীর বিরুদ্ধে এসেছে, তাহলে তারা নিরাশ হয়ে যাবে। -গ্রন্থকার

তার থেকে তুমি তোমার অংশ পেয়ে যাবে। এর জবাবে অহী নাযিল হয় قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ। (ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে হিশাম এবং বালাযুরীও এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন)।

ওহাব বিন মুনাব্বেহ্ বর্ণনা করেন যে, কুরাইশের লোকেরা নবীকে (স) বলে, যদি তুমি পছন্দ কর তো এক বছর তোমার দ্বীনে আমরা প্রবেশ করব এবং এক বছর তুমি আমাদের দ্বীনে প্রবেশ করতে থাকবে (আবদ বিন হামীদ, ইবনে আবি হাতেম)।

এসব বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, একবার একই বৈঠকে নয়, বরঞ্চ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নবীর (স) সামনে তারা এ ধরনের প্রস্তাবাদি পেশ করে এবং প্রয়োজন ছিল যে, একবার চূড়ান্ত জবাব দিয়ে তাদের এ আশা চিরতরে ব্যর্থ করে দেয়া যে, রসূল (স) দ্বীনের ব্যাপারে কিছু দেয়া-নেয়ার পদ্ধতি (GIVE AND TAKE POLICY) অবলম্বন করে তাদের সাথে কিছুটা আপোস করে নেবেন।(৪)

হযরত আবু তালিবের উপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা

রসূলুল্লাহ (স) এর দাওয়াত রুখবার জন্য কুরাইশদের দ্বিতীয় কৌশল এ ছিল যে, ক্রমাগত আবু তালিবের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করা এবং এ কথা বলা, তাঁর (মুহাম্মদ (স)) প্রতি আপনার সমর্থন প্রত্যাহার করুন এবং তাঁর উপরেও চাপ সৃষ্টি করুন যাতে তিনি তাঁর কাজ থেকে বিরত থাকেন।

প্রথম প্রতিনিধি দল

মুহাম্মদ বিন ইসহাক বলেন, কুরাইশরা যখন দেখলো যে, আবু তালেব হুযুরকে (স) সমর্থন করছেন এবং তাঁকে সেসব কাজ থেকে নিবৃত্ত করছেননা যা তাদের জন্য অসহনীয়, তখন কুরাইশদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে গেল। তাদের মধ্যে ছিল বনী আবেদ শামস্ বিন আবেদ মানাফের ওত্বা বিন রাবিয়া ও শায়বা বিন রাবিয়া; বনী উমাইয়ার আবু সুফিয়ান; বনী আসাদ বিন আবদুল ওয্যার আবুল বাখতারী আস্ বিন হিশাম ও আসওয়াদ বিন আল মুত্তালেব; বনী মাখযূমের আবু জাহল ও অলীদ বিন মগীরা; বনী সাহমের হাজ্জাজের পুত্র নুবাইয়া ও মুনাব্বেহ। আস বিন ওয়ায়েলও তাদের মধ্যে শামিল ছিল। তারা বল্লো, হে আবু তালেব! আপনার ভাইপো আমাদের দেবদেবীর প্রতি গালমন্দ করেছে। আমাদের দ্বীনের প্রতি দোষারোপ করেছে, আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে নির্বুদ্ধিতা বলে গণ্য করেছে, আমাদের বাপদাদাকে পথভ্রষ্ট বলেছে। এখন আপনি তাকে আমাদের মনে আঘাত দেয়া থেকে বিরত রাখুন, অথবা আমাদের এবং তার মধ্য থেকে সরে পড়ুন। কারণ আপনিও স্বয়ং আমাদের মতো তার আনীত দ্বীনের বিরোধী। তারপর আমরা তাকে দেখে নেব।

আবু তালেব খুব নম্র ভাষায় কথা বলে তাদেরকে শান্ত করেন এবং তারা চলে যায় (ইবনে হিশাম, তাবারী, আল্ বেদায়া ওয়ান্নেহায়া)।

দ্বিতীয় প্রতিনিধি দল

অতঃপর রসূলুল্লাহ (স) যখন তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন, তখন কুরাইশদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। তখন দ্বিতীয় একটি প্রতিনিধি দল আবু তালেবের নিকটে যায়। তারা বলে, হে আবু তালেব! আপনি আমাদের মধ্যে সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ সম্মানিত ব্যক্তি।

আমরা আপনাকে বলেছিলাম তাকে সমর্থন করা থেকে বিরত থাকুন। কিন্তু বিরত থাকলেননা। আমাদের বাপদাদাকে গা'লমন্দ করা, আমাদের বুদ্ধিবিবেকের অবমাননা এবং আমাদের দেবদেবীর দোষত্রুটি বের করা আমরা কিছুতেই বরদাশ্ত করবনা। হয় তাকে বিরত রাখুন, নতুবা আপনার সাথে আমাদের মুকাবেলা হবে, যতোক্ষণ না এক পক্ষ ধ্বংস হয়েছে। তারপর বর্ণনায় মতভেদ রয়েছে।

ইমাম বুখারী ইতিহাসে এবং হাফেজ আবু ইয়া'লী তাঁর মুসনাদে আকীল বিন আবু তালেবের যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তাতে রয়েছে যে, তাদের উপস্থিতিতেই আমার পিতা (আবু তালেব) আমাকে বল্লেন, মুহাম্মদকে (স) ডেকে আন। আমি প্রচন্ড গরমের মধ্যে তাঁকে খুঁজে বের করে নিয়ে এলাম। তিনি আসার পর আবু তালেব তাকে বল্লেন, ভাইপো, তোমার জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা তোমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করছে যে, তুমি তাদের বৈঠকাদিতে এবং মসজিদে হারামে তাদের মনে আঘাত কর। তুমি এসব বন্ধ কর।

এ কথা শুনার পর, হুযুর (স) আসমানের দিকে তাকিয়ে কুরাইশ সর্দারদের বল্লেন, আপনারা কি এ সূর্য দেখছেন? তারা বল্লো- হ্যাঁ। হুযুর (স) বল্লেন, এ সূর্য যেমন তার আলোক রশ্মি বন্ধ করতে সক্ষম নয়, তেমনি আমিও এ কাজ ছেড়ে দিতে সক্ষম নই। এ কথা বলে তিনি উঠে গেলেন। তারপর আবু তালেব বলেন, আমার ভাইপো কখনো মিথ্যা কথা বলেনি। অতএব আপনারা চলে যেতে পারেন। তাবারানী আওসাত এবং কবীর এ বর্ণনা উদ্ধৃতি করেছেন এবং আবু ইয়া'লা সংক্ষেপে এর উল্লেখ করেছেন।

ইবনে হিশাম, তাবারী, বায়হাকী এবং বালাযুরী এ ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, লোকেরা চলে যাওয়ার পর আবু তালিব হুযুরকে (স) ডেকে বলেন, ভাইপো! তোমার কওম আমার কাছে এসে এসব কথা বলেছে। তুমি আমার জন্যও এবং তোমার জন্যও বেঁচে থাকার কিছু অবকাশ রাখ। তুমি আমার উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিওনা যা বহন করার শক্তি আমার নেই এবং তোমারও নেই। অতএব তুমি এমন সব কথা বলা বন্ধ কর যা তাদের নিকট অসহনীয়। আবু তালিবের কথা শুনে হুযুর (স) মনে করলেন যে, আমাকে সমর্থন করা চাচার জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। তিনি এ দায়িত্ব ত্যাগ করতে এবং আমাকে আমার নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দিতে তৈরী হচ্ছেন। তারপর তিনি বল্লেন, চাচাজান! যদি সূর্য আমার ডান হাতে এবং চন্দ্র বাম হাতে দিয়ে দেয়া হয় তথাপি আমি এ কাজ পরিত্যাগ করবনা। আল্লাহ হয় এ কাজ সফল করবেন অথবা আমি ধ্বংস হয়ে যাব। অতঃপর হুযুর (স) ব্যথিত হয়ে কেঁদে ফেল্লেন এবং চলে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলেন। আবু তালিব অনুভব করলেন যে, তাঁর কথায় হুযুর (স) কত ব্যথা পেয়েছেন। তারপর তিনি তাঁকে ডাকলেন এবং ফিরে এলে বল্লেন, তুমি তোমার কাজ করতে থাক এবং যা করতে চাও কর। খোদার কসম! আমি কোন কারণেই তোমাকে দুশমনের হাতে তুলে দেবনা।

আবু জাহল হুযুরকে (স) হত্যা করার ইচ্ছা করে

মুহাম্মদ বিন ইসহাক বলেন, আবু জাহল কুরাইশের লোকদেরকে বলে, হে কুরাইশ দল! তোমরা দেখলে তো মুহাম্মদ (স) কেমন পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, আমাদের দ্বীনের অবমাননা করা,আমাদের বাপদাদাকে পথভ্রষ্ট বলা, দেবদেবীদের গালি দেয়া প্রভৃতি কাজ থেকে সে কিছুতেই বিরত থাকবেনা। এখন আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে, আগামীকাল আমি একটি পাথর নিয়ে বসে থাকবো এবং যখন সে নামাযের সিজদায় যাবে, তখন তার মস্তক চূর্ণ করে দেব। তারপর বনী আবেদ মানাফ যা ইচ্ছা করুক।

দ্বিতীয় দিন পাথর নিয়ে সে হুযুরের (স) প্রতীক্ষায় রইলো। অভ্যাস মত নবী (স) এসে নামাযে মশগুল হয়ে পড়লেন। কুরাইশের লোকেরাও কি হয় তা দেখার জন্য সমবেত হলো। হুযুর (স) সিজদায় যাওয়ার পর আবু জাহল পাথরসহ সম্মুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু সে তাঁর নিকটবর্তী হয়ে হঠাৎ পেছনে ফিরে এলো। সে ভয়ানক ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। পাথরও তার হাত থেকে পড়ে গেল। কুরাইশের লোকেরা উঠে তার কাছে গেল এবং বল্লো, আবুল হাকাম! তোমার এ কি হলো? সে বল্লো, যে কাজের কথা তোমাদেরকে বলেছিলাম তা করার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হয়েছিলাম। কিন্তু যখন নিকটবর্তী হলাম তখন আমার সামনে এমন এক বিরাট উট এসে গেল। এতো বড়ো মাথা, এমন গলা ও এমন কুঁজধারী উট আমি কখনো দেখিনি। সে আমাকে চাবিয়ে খাওয়ার জন্য উদ্যত হলো।

পরে হুযুর (স) বলেছিলেন যে, হযরত জিব্রিল (আঃ) এ আকৃতিতে এসেছিলেন।

তৃতীয় প্রতিনিধি দল

ইবনে সা'দ বলেন, কুরাইশ দলপতিরা আর একবার আবু তালিবের কাছে এসে বলে, আপনি আমাদের সকলের বড়ো এবং সর্দার। আপনার নিকটে আমরা ইনসাফ করার কথা বলছি। আপনিও আমাদের ও তার মধ্যে সুবিচার করুন। আপনার ভাইপোকে ডেকে পাঠান এবং বলুন যে, সে যেন আমাদের দেবদেবীর বিরুদ্ধে কটূ কথা বলা পরিত্যাগ করে। আর আমরাও তাকে এবং তার খোদাকে তার অবস্থার উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। তারপর আবু তালিব হুযুরকে (স) ডেকে পাঠালেন। তিনি তাঁকে বল্লেন, ভাইপো! এই যে তোমার চাচারা, তোমার কওমের সম্ভ্রান্ত ও দলপতিগণ এসেছেন এবং তোমার সাথে একটা ইনসাফ পূর্ণ মীমাংসা করতে চান।

হুযুর (স) বল্লেন, আপনারা বলুন, আমি শুনছি। তারা বল্লো, তুমি আমাদেরকে ও আমাদের দেবদেবীকে আপন আপন অবস্থায় থাকতে দাও এবং তাদের প্রতি গালমন্দ করা থেকে বিরত থাক। আমরা তোমাকে এবং তোমার খোদাকে তোমাদের অবস্থায় ছেড়ে দিচ্ছি।

আবু তালিব বলেন, এ তো তারা সুবিচার পূর্ণ কথাই বলছেন, এ কথা মেনে নাও।

হুযুর (স) বল্লেন, চাচাজান! আমি কি তাদেরকে এর থেকে উৎকৃষ্টতর বিষয়ের দিকে আহ্বান জানাব? আবু তালিব বল্লেন, তা কি?

হুযুর (স) বল্লেন, আমি এমন এক কালেমার প্রতি দাওয়াত দিচ্ছি, তা যদি তাঁরা মেনে নেন, তাহলে তাঁরা আরবের শাসক হয়ে যাবেন এবং আজমও তাঁদের অনুগত হয়ে পড়বে।

আবু জাহল বল্লো, এ তো বড়ো মুনাফার সওদা। তোমার বাপের কসম, আমরা একটি নয়, এমন দশটি কালেমাও মেনে নিতে প্রস্তুত।

হুযুর (স) বল্লেন, তাহলে বলুন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

এতে তারা ক্রোধান্বিত হয়ে ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চল্লো-

اِصْبِرُوْا عَلٰى اٰلِهَتِكُمْ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ - (ص ٦:)

নিজেদের দেবদেবীর পূজা অর্চনায় অটল থাক। এ কথার তো অন্য কিছু অর্থ হয়।(৫)

এ ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনায় মতপার্থক্য আছে। ইবনে সা'দ তাবকাতে এবং তাবারী ইতিহাসে তার সময়কাল নির্দিষ্ট না করেই বর্ণনা করেছেন। ইবনে ইসহাক এটাকে হযরত হাম্যা (রা) এবং হযরত ওমরের (রা) ইসলাম গ্রহণের পরবর্তী ঘটনা বলে বর্ণনা

করেছেন। আর এ মতই অবলম্বন করেছেন যামাখ্‌শারী, রাযী ও নায়শাপুরী প্রমুখ তফসীরকারগণ। কিন্তু অন্যান্য বিভিন্ন বর্ণনায় এটাকে সে সময়ের ঘটনা বলা হয়েছে, যখন আবু তালিব মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন। ইমাম আহমদ, নাসায়ী, তিরমিযি, বায়হাকী, ইবনে আবি শায়বাহ্ এবং ইবনে জারীর তাবারী তাদের তফসীর ও ইতিহাসে যে ঘটনা বিবৃত করেছেন তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

যখন আবু তালিব পীড়িত হয়ে পড়েন এবং কুরাইশ সর্দারগণ অনুভব করলো যে, এ তাঁর শেষ সময় তখন তারা পরামর্শ করে ঠিক করলো যে এখন তাঁর সাথে কথা বলা দরকার। তিনি আমাদের ও তাঁর ভাইপোর মধ্যকার ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করে যান তো ভালো কথা। এমন যেন না হয় যে, তাঁর মৃত্যু হলো এবং তারপর আমরা মুহাম্মদের (স) ব্যাপারে কোন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করলাম। আর আরববাসী আমাদের এই বলে তিরস্কার করা শুরু করলো যে, যতোদিন মুরুব্বী জীবিত ছিলেন ততোদিন এরা তাঁকে সম্মান করে চলেছে। এখন তাঁর মৃত্যুর পর তারা তাঁর ভাইপোর উপর হস্তক্ষেপ করে বসলো। একথার প্রতি সকলেই একমত হলো এবং প্রায় পঁচিশ জন কুরাইশ দলপতি আবু তালিবের নিকট হাযির হলো। তাদের মধ্যে, উল্লেখযোগ্য আবু জাহল, আবু সুফিয়ান, উমাইয়া বিন খালাফ, আস বিন ওয়াইল, আসওয়াদ বিন আল মুত্তালিব, উকবা বিন আবি মুয়াইত, ওত্‌বা ও শায়বাহ্। তারা প্রথমে নবী (স) এর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উত্থাপন করে। তারপর বলে, আমরা আপনার কাছে একটি সুবিচারের কথা বলতে এসেছি। তা এই যে, আপনার ভাইপো আমাদেরকে আমাদের দ্বীনের উপর থাকতে দিক এবং আমরাও তাকে তার দ্বীনের উপর থাকতে দেব। সে যে মাবুদেরই এবাদত করতে চায় করুক, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সে যেন আমাদের দেবদেবীর সমালোচনা না করে। আর এ চেষ্টা করে না বেড়ায় যে আমরা যেন আমাদের দেবদেবীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। এ শর্তে আপনি তার সাথে আমাদের আপোস করিয়ে দিন।

আবু তালিব নবীকে (স) ডেকে পাঠালেন এবং বল্লেন, ভাতিজা, তোমার কওমের লোকেরা আমার কাছে এসেছে। তাদের ইচ্ছা এই যে, তুমি একটি সুবিচারপূর্ণ কথায় তাদের সাথে একমত হয়ে যাও। যাতে তোমার ও তাদের ভেতরের ঝগড়া বিবাদ খতম হয়ে যায়। তারপর তিনি নবীকে (স) সে কথাটি বল্লেন, যা কুরাইশ সর্দারগণ তাঁকে বলেছিল।

নবী (স) জবাবে বলেন, চাচাজান! আমি তো তাদের সামনে এমন একটি কালেমা পেশ করেছি, তা যদি তারা মেনে নেয় তাহলে আরব দেশ তাদের অনুগত এবং আজম (অনারব) কর দাতা হবে।[১] এ কথা শুনে তারা তো প্রথমে একটু বেশামাল হয়ে পড়লো। তারা বুঝতে পারছিলনা যে কোন্ কথা বলে এমন এক কল্যাণকর কালেমা প্রত্যাখ্যান

---

১. হুযুরের (স) এ কথা বিভিন্ন বর্ণনাকারী বিভিন্ন শব্দাবলী প্রয়োগে উদ্ধৃত করেছেন। এসব শাব্দিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সকলের উদ্দেশ্য একটাই ছিল। অর্থাৎ হুযুর (স) তাদেরকে বলেন, যদি আমি তোমাদের সামনে এমন এক কালেমা পেশ করি এবং তা যদি তোমরা মেনে নাও তাহলে আরব ও আজম তোমাদের অধীন হয়ে যাবে। তাহলে বল- এটা কি অধিকতর ভাল কথা, না ইনসাফের কথা বলে যেটা তোমরা আমার সামনে পেশ করছ? তোমাদের মংগল কি এ কালেমা মেনে নেয়ার মধ্যে নিহিত, না এতে যে অবস্থায় তোমরা আছ সে অবস্থায় তোমাদের থাকতে দেব এবং নিজের বেলায় শুধু খোদার এবাদত করতে থাকব?(৭)

করবে। পরে কিছুটা শামলে নিয়ে বল্লো, তুমি একটি কালেমার কথা বলছ? আমরা এমন দশটি কালেমা বলতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু বল তো সে কালেমাটা কি?
নবী (স) বল্লেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"। এরপর তারা একত্রে উঠে পড়লো এবং একথা বলতে বলতে বের হয়ে গেল যা সূরা- সোয়াদের প্রথম অংশে বলা হয়েছে।(৬)

চতুর্থ প্রতিনিধি দল

ইবনে হিশাম, ইবনে জারীর তাবারী, ইবনে সা'দ বালাযুরী এবং ইবনে কাসীর বলেন, কুরাইশরা যখন দেখলো যে, আবু তালিব কিছুতেই হুযুরকে (স) ছাড়তে রাজী নয়, এবং তিনি কওমের শত্রুতা ও তার থেকে শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকিও আপন ভাইপোর জন্য নিতে প্রস্তুত, তখন তারা অলীদ বিন মগীরার পুত্র উমারাহ্ বিন অলীদকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল এবং বল্লো, হে আবু তালেব, এ হচ্ছে উমারাহ বিন অলীদ, কুরাইশের প্রসিদ্ধ ও সুদর্শন যুবক। একে পুত্র বানিয়ে নিন এবং তার বিনিময়ে আপনার এ ভাইপোকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। কারণ সে আপনার ও আপনার বাপদাদার দ্বীনের বিরোধিতা করেছে, আপনার কওমের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করেছে এবং আমাদের সবাইকে নির্বোধ বলে গণ্য করছে। আমরা একজনকে দিয়ে অন্য একজন নিচ্ছি যেন তাকে হত্যা করতে পারি।

আবু তালিব জবাবে বল্লেন, খোদার কসম! তোমরা আমার সাথে অতি নিকৃষ্ট দর কষাকষি করেছ। নিজের পুত্র আমাকে দিচ্ছ যে, আমি তাকে লালনপালন করি এবং আমার পুত্র তোমরা চাচ্ছ তাকে হত্যা করার জন্য। এ কখনো হতে পারেনা। হাশিমের ভাই নাওফেলের বংশধর মুতয়েম বিন আদী বল্লো, খোদার কসম, হে আবু তালিব, তোমার কওম তোমার সাথে ইনসাফ করেছে এবং তুমি যে বিপদে পড়েছ তার থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমি দেখছি যে তুমি তাদের কোন কথাই মানছনা।

আবু তালিব জবাবে বলেন, খোদার কসম, তারা আমার প্রতি কোনই সুবিচার করেনি, কিন্তু তুমি আমাকে ছেড়ে আমার বিরুদ্ধে তাদের সাথে চলে গেছ। ঠিক আছে যা ইচ্ছে করগে।

ইবনে ইসহাক বলেন, এতে কথা কাটাকাটি হওয়ার পর লড়াইয়ের পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং একে অপরের মুকাবেলা করার সিদ্ধান্ত করে।

আবু তালিব বনী হাশিম ও বনী আল মুত্তালিবকে একত্রে সমবেত করেন

ইবনে ইসহাক বলেন, তারপর আবু তালিব বনী হাশিম ও বনী আল্ মুত্তালিবকে একত্রে সমবেত করে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন যে, সকলে একমত হয়ে রসূলুল্লাহ (স) কে সমর্থন ও হেফাজত করতে হবে। এ কথা সকলে মেনে নেয় এবং আবু তালিবকে সাহায্য করার জন্য তৈরী হয়, শুধু আবু লাহাব ভিন্ন মত পোষণ করে।

কুরাইশদের প্রতি আবু তালিবের হুমকি প্রদর্শন

ইবনে সা'দ বলেন, যখন নবী পাকের (স) চরম বিরোধিতা করা হচ্ছিল, কিন্তু তখনো আবিসিনিয়ায় হিজরত শুরু হয়নি, এমন সময়ে একদিন আবু তালিব এবং পরিবারের অন্যান্যরা হুযুরের (স) বাড়ি এসে তাঁকে দেখতে পেলেননা। আবু তালিবের সন্দেহ হলো যে, হুযুরকে (স) হত্যা করা হয়েছে। তক্ষুণি তিনি বনী হাশিম ও বনী আল মুত্তালিবের

যুবকদেরকে একত্র করলেন। অতঃপর তাদেরকে বল্লেন, প্রত্যেকে এক একটি তলোয়ার বা অন্য কোন অস্ত্র কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখে আমার পেছনে পেছনে আস। যখন আমি মসজিদে হারামে প্রবেশ করব, তখন তোমরা দেখবে কুরাইশ দলপতিদের কোন বৈঠকে ইবনুল হান্যালিয়্যা (আবু জাহল) বসে আছে। ব্যস তারপর সে বৈঠকের কাউকে জীবিত ছেড়ে দেবেনা। কারণ অবশ্যই তারা মুহাম্মদকে (স) হত্যা করেছে।

এ অভিপ্রায়ে আবু তালিব রওয়ানা হন এবং পথিমধ্যে যায়েদ বিন হারেসার (রা) সাথে দেখা হয়। তিনি জানতে পারেন হুযুর (স) ভালো আছেন।

দ্বিতীয় দিন আবু তালিব সকাল বেলা হুযুরের (স) বাড়ি এলেন এবং তার হাত ধরে বনী হাশিম ও বনী আল্ মুত্তালিবের যুবক বৃদ্ধসহ কুরাইশ দলপতিদের বৈঠকে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে বল্লেন, হে কুরাইশের লোকেরা! তোমরা কি জান আমি কি করতে চেয়েছিলাম? তারা বল্লো, না জানিনা। আবু তালিব সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন এবং যুবকদেরকে বল্লেন, তোমাদের চাদর সরিয়ে ফেল। তাদের চাদর সরাবার পর সকলে দেখতে পেল প্রত্যেকের হাতে একটি করে ধারালো অস্ত্র। আবু তালিব বল্লেন, খোদার কসম! যদি তোমরা মুহাম্মদকে (স) হত্যা কর, তাহলে তোমাদের কাউকেও জীবিত রাখবনা। তারপর আমরা লড়াই করতে করতে খতম হয়ে যাব।

এ ঘটনার পর কুরাইশদেরকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, মুহাম্মদের (স) প্রতি কোন রূপ হস্তক্ষেপ করা সহজ কাজ নয়। আর এ ঘটনাটি সবচেয়ে বেশী আবু জাহলের জন্য নৈরাশ্যজনক ছিল।

৩. কুরাইশের বালসুলভ ও হীন আচরণ

হুযুরের (স) বিরুদ্ধে কুরাইশের লোকেরা যে আচরণ করছিল তা ছিল অত্যন্ত হীন ও বালসুলভ ও তার উদ্দেশ্য ছিল, তাঁকে নিরোৎসাহ করা এবং বিব্রত করে রাখা।

হযরত যয়নবকে (রা) তালাক দেয়াবার চেষ্টা

তাদের একটি তৎপরতা এ ছিল যে, তারা হুযুরের (স) জামাতা আবুল আস বিন আররাবী'র উপর চাপ সৃষ্টি করছিল যাতে সে হুযুরের (স) বড়ো মেয়ে হযরত যয়নবকে (রা) তালাক দেয়, যেভাবে আবু লাহাব তার পুত্রদ্বয়কে হুযুরের (স) কন্যা হযরত রুকাইয়া (রা) এবং হযরত উম্মে কুলসুমকে (রা) তালাক দিতে বাধ্য করে। এ আবুল আস্ ছিলেন বনী আবদুল ওয্যা বিন আবদে শাম্স গোত্রের লোক। তাঁর মা হালা বিন্তে খুয়াইলেদ হযরত খাদিজার (রা) ভগ্নি ছিলেন। মক্কার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। ধনসম্পদ, ব্যবসা বাণিজ্য ও আমানতদারীর দিক দিয়ে তিনি মক্কায় মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। হুযুরের (স) নবীর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে হযরত যয়নবের (রা) সাথে তাঁর বিয়ে হয়। হযরত খাদিজা (রা) তাঁকে আপন পুত্রের মতোই মনে করতেন। নবুওতের পর যদিও তিনি মুসলমান হননি এবং শির্কের মধ্যেই লিপ্ত ছিলেন, তথাপি তিনি কুরাইশদের চাপের মুখে নতি স্বীকার করেননি এবং হযরত যয়নবকে (রা) তালাকও দেননি।[১] বালাযুরী- আন্সাবুল- আশরাফে বলেছেন, কুরাইশ সর্দারগণ তাঁকে (আবুল

---

১. প্রকাশ থাকে যে হযরত যয়নব (রা) আপন মায়ের সাথেই মুসলমান হন। কিন্তু যেহেতু তখন পর্যন্ত মুমেন ও মুশরিকের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার হুকুম আসেনি। সে জন্য তিনি আবুল আসের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। -গ্রন্থকার

আস) বল্লো, তুমি যয়নবকে তালাক দাও। তারপর কুরাইশের যে নারীকেই তুমি পছন্দ কর তাকে দিয়ে তোমার বিবাহ দেব।

তিনি বলেন, খোদার কসম! আমি আমার স্ত্রীকে ছাড়বনা। সে সর্বোত্তম স্ত্রী।

এ কথাই বলেছেন, তাবারী ও ইবনে হিশাম মুহাম্মদ বিন ইসহাকের বরাত দিয়ে। তাঁরা অতিরিক্ত এ কথাও বলেন যে, কুরাইশের লোকেরা আবু লাহাব পুত্র ওত্বার নিকটে গিয়ে বল্লো, তুমি মুহাম্মদের (স) কন্যাকে তালাক দাও। কুরাইশের যে মেয়েকেই তুমি চাইবে তার সাথে তোমার বিয়ে দিয়ে দেব। সে বল্লো, তোমরা যদি সাঈদ বিন আস অথবা তার পুত্র আবানের মেয়েকে আমার জন্যে ঠিক করে দিতে পার তাহলে তোমাদের কথা মানব। তার ইচ্ছামত মেয়ে তার জন্য সংগ্রহ করে দেয়ার পর সে হুযুরের (স) মেয়েকে তালাক দেয়। তাও রুখসতি বা মেয়ে বিদায়ের পূর্বে।

নবী পুত্রের মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ

এর চেয়েও অধিকতর হীন মানসিকতাসূলভ আচরণ তাদের এ ছিল যে, হুযুরের (স) প্রথম পুত্র সন্তান হযরত কাসেমের (রা) শৈশবকালেই ইন্তেকাল হওয়ার পর যখন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র হযরত আবদুল্লাহও (রা) শৈশবে ইন্তেকাল করেন তখন কুরাইশের লোকেরা হুযুরের (স) শোক দুঃখে সে ধরনের সহানুভূতিও প্রকাশ করেনি, যা ছিল ভদ্রতা ও মানবিকতার সর্বনিম্ন দাবী, বরঞ্চ তার বিপরীত তারা আনন্দ উল্লাস করে এবং তাঁকে ছিন্নমূল বলা শুরু করে। অর্থাৎ তাঁর পরে তাঁর নাম নেয়ার কেউ থাকবেনা।(৮)

ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকের হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রা) বরাত দিয়ে বলেন, নবীর (স) বড়ো পুত্র ছিলেন হযরত কাসেম (রা)। তাঁর ছোট ছিলেন হযরত যয়নব (রা)। তাঁর ছোট হযরত আবদুল্লাহ (রা)। তারপর পর পর তিন কন্যা উম্মে কুলসুম (রা) ফাতেমা (রা) ও রুকাইয়া (রা) ছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রথমে হযরত কাসেমের (রা) ইন্তেকাল হয়, তারপর হযরত আবদুল্লাহরও (রা) ইন্তেকাল হয়। এতে আস বিন ওয়ায়েল বলে, তাঁর বংশ নিঃশেষ হয়ে গেল। তিনি এখন ছিন্নমূল, তাঁর শিকড় কেটে গেছে।

কোন কোন বর্ণনায় অতিরিক্ত একথা বলা হয়েছে যে, আস বলে মুহাম্মদ (স) আবতার (ছিন্নমূল)। তাঁর কোন পুত্র নেই যে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। যখন তিনি মৃত্যুবরণ করবেন তখন তাঁর থেকে তোমরা রেহাই পাবে। আবদে হামীদ ইবনে আব্বাস (রা) এর বরাত দিয়ে বলেন, হুযুরের (স) পুত্র আবদুল্লাহর (রা) মৃত্যুর পর আবু জাহলও এ ধরনের মন্তব্য করে।

ইবনে আবি হাতেম শামির বিন আতিয়্যার বরাত দিয়ে বলেন, হুযুরের (স) এ শোক দুঃখে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করতে গিয়ে ওকবা বিন আবি মুয়াইতও এ ধরনের হীন মানসিকতা ব্যক্ত করে। আতা বলেন, নবী (স) এর দ্বিতীয় পুত্র ইন্তেকালের পর তাঁর আপন চাচা আবু লাহাব (যার বাড়ি হুযুরের (স) বাড়ির সংলগ্ন ছিল) দৌড়ে মুশরিকদের কাছে গিয়ে এ সুসংবাদ (?) দেয় যে আজ রাতে মুহাম্মদ (স) পুত্রহীন হয়ে পড়েছে- অর্থাৎ ছিন্নমূল হয়ে পড়েছে।

এ ছিল অতীব হৃদয় বিদারক অবস্থা যখন সূরা কাওসার নাযিল হয়। কুরাইশের লোকেরা এজন্য নবীর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল যে, তিনি শুধুমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করতেন এবং তাদের শির্ককে প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এজন্য নবুওতের পূর্বে গোটা কওমের মধ্যে তাঁর যে মর্যাদা ও স্থান ছিল তা কেড়ে নেয়া হয়। তাঁকে যেন আপন জ্ঞাতি

গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। তাঁর মুষ্টিমেয় সংগী-সাথীও অসহায় ও বন্ধুহীন হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁদের উপর মারপিটও চলছিল। উপরন্ত পর পর পুত্র হারা হওয়ার ফলে দুঃখের পাহাড় তাঁর উপরে ভেঙে পড়েছিল। এমতাবস্থায় বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, গোত্র ও জ্ঞাতি গোষ্ঠীর লোক এবং প্রতিবেশীদের পক্ষ থেকে সমবেদনা প্রকাশের পরিবর্তে আনন্দ-উল্লাস করা হচ্ছিল। তারা সব এমন মন্তব্যও করছিল, যা এমন এক শরীফ ব্যক্তির জন্য অতীব হৃদয়বিদারক ছিল, যিনি শুধু আপনজনের জন্যই নয় বরঞ্চ অপরের জন্যও অত্যন্ত সদাচরণ করতেন।

এসবের জবাবে আল্লাহ তায়ালা সূরা কাওসারে বল্লেন,

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

- অর্থাৎ তোমার দুশমনই আবতার বা ছিন্নমূল।

এ শুধু নিছক প্রত্যুত্তরমূলক আক্রমণ ছিলনা বরঞ্চ প্রকৃতপক্ষে কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের মধ্যে একটি ছিল, যা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়। যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তখন লোকে নবীকে (স) আবতার (ছিন্নমূল) মনে করছিল এবং কেউ ধারণাও করতে পারতোনা যে, কুরাইশের এ বড়ো বড়ো দলপতি কিভাবে ছিন্নমূল হয়ে পড়বে যারা শুধু মক্কা শহরেই নয় গোটা আরব দেশে সুবিখ্যাত ছিল, সফলকাম ছিল। ধনদৌলত ও সন্তানসন্ততি লাভের সৌভাগ্যই শুধু তাদের হয়েছিল না, বরঞ্চ সমগ্র দেশে স্থানে স্থানে তাদের সহযোগী সাহায্যকারীও ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া সুবিধাভোগী ও হজ্বের ব্যবস্থাপক হওয়ার কারণে সমস্ত আরব গোত্রের সাথে তাদের গভীর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই অবস্থা একেবারে বিপরীতমুখী হয়ে গেল।
যখন পঞ্চম হিজরীতে আহযাব যুদ্ধের সময় কুরাইশগণ বহু আরব ও ইহুদী গোত্রসহ মদীনা অবরোধ করে এবং হুযুরকে (স) অবরুদ্ধ হয়ে খাল খনন করে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল, অথচ মাত্র তিন বছর পর সে সময় এলো যখন অষ্টম হিজরীতে নবী (স) মক্কা আক্রমণ করেন, তখন কুরাইশদের কোন সাহায্যকারী ছিলনা এবং অসহায় অবস্থায় তাদেরকে অস্ত্র সংবরণ করতে হয়। তারপর এক বছরের মধ্যেই গোটা আরব দেশ নবী (স) এর করতলগত হয়। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি দল নবীর হাতে বয়আত করছিল। দুশমন একেবারে অসহায় ও বন্ধুহীন হয়ে রইলো। তাদের নাম নিশানা এমনভাবে মুছে গেল যে তাদের বংশধর কেউ দুনিয়ার কোথাও থাকলেও তাদের মধ্যে আজ কেউ একথা জানেনা যে, সে আবু জাহল, আবু লাহাব, আস বিন ওয়ায়েল অথবা ওকরা বিন আবি মুয়াইত ইত্যাদি ইসলাম দুশমনের বংশধর। আর জানলেও কেউ একথা বলতে রাজী নয় যে তার পূর্ব পুরুষ ওসব লোক ছিল। পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহ (স) এর পরিবার পরিজনের উপর আজ সারা দুনিয়ায় দরূদ পাঠ করা হচ্ছে। কোটি কোটি মুসলমান তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য গর্ববোধ করছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ শুধুমাত্র তাঁরই নয়, বরঞ্চ আপনার পরিবার ও আপনার সংগীসাথীদের পরিবারের বংশধর হওয়াকে গৌরবের বিষয় মনে করে। কেউ সাইয়েদ,কেউ আলাভী, কেউ আব্বাসী, কেউ হাশেমী, কেউ সিদ্দিকী, কেউ ফারুকী, কেউ ওসমানী, কেউ যুবায়রী এবং কেউ আনসারী। কিন্তু আবু জাহালী ও আবু লাহাবী নামের কাউকে পাওয়া যায়না। ইতিহাসে একথা প্রমাণিত যে, আবতার হুযুর (স) ছিলেননা, বরঞ্চ তাঁর দুশমনই ছিল এবং আছে।(৯)

কুরআনের আওয়াজ শুনা মাত্র হৈ চৈ করা

আর একটি হীন ও জঘণ্য আচরণ যা তারা অবলম্বন করেছিল তা এই যে, যখন কুরআন পাঠ করা হতো তখন তারা হৈ চৈ করতো এবং চারদিক থেকে দৌড়ে পালাতো যাতে তারা নিজেও শুনতে না পায় এবং অপরেও শুনতে না পারে। কুরআনে বলা হয়েছে-

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ - (حٰمٓ السجدة ٢٦)

- এ সত্য অস্বীকারকারীগণ বলে, এ কুরআন কখনো শুনবেনা এবং যখন শুনানো হবে তখন হৈ চৈ শুরু করে দাও, সম্ভবত এভাবে তোমরা বিজয়ী হবে (হা-মীম-আসসিজদাহ-২৬)।

এ ছিল মক্কার কাফেরদের পরিকল্পনাগুলোর একটি। এর দ্বারা নবীর (স) দাওয়াত ও তবলীগ তারা ব্যর্থ করে দিতে চাইছিল। তারা ভালোভাবে জানতো যে, কুরআনের মধ্যে কোন যাদুকরী প্রভাব ছিল এবং যিনি তা পাঠ করে শুনাতেন তিনি কোন্ উচ্চস্তরের লোক ছিলেন। আর এ ব্যক্তিত্বসহ তার পঠনভংগী কত হৃদয়গ্রাহী। তারা মনে করতো যে, এমন উচ্চস্তরের ব্যক্তির মুখ থেকে এমন মন মাতানো ভংগিমায় এ তুলনাবিহীন কথা যে শুনবে সেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়বে। এ জন্য তারা এ কর্মসূচী তৈরী করলো যে, এ কালাম তারা নিজেরাও শুনবেনা এবং অপরকেও শুনতে দেবেনা। মুহাম্মদ (স) যখনই তা শুনাতে শুরু করবেন, তখন হৈ চৈ করবে, হাত তালি দেবে, চিৎকার করবে, ঘোর আপত্তি জানাবে এবং আওয়াজ এতো উচ্চ করবে যেন তাঁর আওয়াজ তলিয়ে যায়। এ কৌশল অবলম্বন করে তারা এ আশা পোষণ করতো যে, আল্লাহর নবীকে তারা পরাজিত করবে।(১০)

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ - (المعارج : ٣٦-٣٧)

- অতএব (হে নবী) ব্যাপার কি, এ অস্বীকারকারীগণ তোমার ডান ও বামদিক থেকে দলে দলে দৌড়ে তোমার দিকে আসছে?

এ তাদের কথা বলা হচ্ছে, যারা নবীর (স) দাওয়াত, তবলীগ ও কুরআন তেলাওতের আওয়াজ শুনে বিদ্রূপ করার এবং হট্টগোল করার জন্য চারদিক থেকে দৌড়ে আসতো।(১১)

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا -

- নিজের নামায না উচ্চস্বরে অথবা খুব নিম্নস্বরে পড়োনা। এ উভয়ের মধ্যে মধ্যম আওয়াজে পড়।

মুসনাদে আহমদে হযরত ইবনে আব্বাসের এমন বর্ণনা আছে যে, মক্কায় যখন নবী (স) আপন বাড়িতে অথবা দারুল আরকামে নামাযে উচ্চস্বরে কুরআন পড়তেন, তখন কাফেরেরা হৈ চৈ শুরু করতো এবং কখনো গালিও দিত। এর ফলে নির্দেশ হলো, না তুমি এতো উচ্চস্বরে পড় যে কাফেরেরা শুনে ভিড় করে আসে, আর না এতো নিম্নস্বরে পড় যে, তোমার সাথীগণও শুনতে না পায়।(১২)

কুরআনের কদর্থ করে পথভ্রষ্ট করা

মক্কায় কাফেরদের এ কৌশলের উল্লেখ কুরআনে আছে-

إِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ؕ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِىْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ - (حٰمٓ السجدة ٤٠ :)

যারা আমাদের আয়াতের বিকৃত অর্থ পেশ করে তারা আমাদের কাছে গোপন নয়, স্বয়ং চিন্তা করে দেখ যে, সে ব্যক্তি কি উৎকৃষ্ট, যাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, না সে যে নিয়ামতের দিনে নিরাপত্তাসহ হাযির হবে। যা ইচ্ছা করতে থাক। তোমরা যা কিছুই করছ আল্লাহ্ তা দেখছেন।

'ইলহাদ'এর অর্থ পথভ্রষ্ট হওয়া, সরল পথ থেকে বক্র পথে ঘুরে যাওয়া, বক্রতা অবলম্বন করা। আল্লাহর আয়াতে 'ইলহাদ' এর অর্থ এই যে, মানুষ সহজ সরল কথায় কিছু বক্রতা বের করার চেষ্টা করে। আয়াতে ইলাহীর সঠিক ও স্পষ্ট মর্ম তো গ্রহণ করেনা, বরঞ্চ বিভিন্নভাবে তার কদর্থ করে নিজেও পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করে। মক্কার কাফেরগণ কুরআনের দাওয়াত বন্ধ করার জন্য যে সব কূটকৌশল অবলম্বন করেছিল তার মধ্যে একটি এও ছিল যে, তারা কুরআনের আয়াত শুনে যেতো। তারপর কোন আয়াতকে তার পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে, কোন আয়াতের শাব্দিক কদর্থ করে, কোন শব্দ বা বাক্যের ভুল অর্থ করে বিভিন্ন ধরনের আপত্তি উত্থাপন করতো এবং মানুষকে এই বলে বিভ্রান্ত করতো যে, 'এ নবী সাহেব' কি কথা বলেছেন।(১৩)

মুসলমানদেরকে অযথা ও বেহুদা বিতর্কে লিপ্ত করা

কাফেরদের-এ আচরণের উল্লেখ কুরআনে এভাবে করা হয়েছে-

وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ - (الشورى : ١٦)

- আল্লাহর দাওয়াতে সাড়া দেয়ার পর যারা সাড়াদানকারীদের সাথে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে ঝগড়া বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের এ দলিল প্রমাণ উপস্থাপন তাদের রবের নিকট বাতিল বলে গণ্য।

এ সে অবস্থার প্রতি ইংগিত করছে, যা মক্কায় দৈনন্দিন ঘটতো। যখন কারো সম্পর্কে জানা গেল যে, সে মুসলমান হয়েছে, তখন সকলে কোমর বেঁধে তার পেছনে লেগে যেতো। তার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলা হতো। না বাড়িতে, না মহল্লায় আর না জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সে নিশ্চিন্তে থাকতে পারতো।

যেখানে সে যেতো, এক অফুরন্ত বিতর্ক শুরু হয়ে যেতো, এ উদ্দেশ্যে তা করা হতো যেন সে কোন প্রকারে নবী মুহাম্মদের (স) সম্পর্ক ত্যাগ করে, সেই জাহেলিয়াতের দিকে ফিরে আসে যার থেকে সে বেরিয়ে পড়েছিল।(১৪)

মুসলমানদের বিদ্রুপ করা ও তাদেরকে হেয় করা

এ ব্যাপারে কুরআন বলে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ، وَ اِذَا
مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ وَاِذَا انْقَلَبُوْا اِلٰى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا
فَكِهِيْنَ وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْا اِنَّ هٰؤُلَاءِ لَضَالُّوْنَ. وَمَا اُرْسِلُوْا
عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ - (المطففين: ٢٩-٣٣)

অপরাধী লোকেরা ঈমানদার লোকদের বিদ্রুপ করতো এবং তাদের নিকট দিয়ে যাবার সময় চোখ টিপে টিপে তাদের দিকে ইংগিত করতো। আর যখন আপন লোকদের মধ্যে ফিরে যেতো তখন আনন্দে গদ গদ হয়ে ফিরে যেতো। তাদেরকে দেখলে বলতো, এরা সব পথভ্রষ্ট লোক। অথচ তাদেরকে তাদের ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ করে পাঠানো হয়নি। (মুতাফ্‌ফেফীনঃ ২৯-৩৩।

আনন্দে গদ গদ হয়ে ফেরার অর্থ- যখন তারা বাড়ি ফিরতো, তারা মনে করতো, আজ বেশ মজা উপভোগ করা গেল। আমরা অমুক মুসলমানকে খুব বিদ্রুপ করলাম, উচ্চস্বরে উপহাস করে আনন্দ পেলাম এবং লোকের মধ্যে তার ভালো প্রতিক্রিয়া হলো।(১৫)

বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফে হযরত ওরওয়া বিন যুবাইয়ের বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, যখন নবী (স) এর সাথে আম্মার বিন ইয়াসের (রা), খাব্বাব বিন আল আরেত (রা), সুহাইব বিন সিনান (রা), বেলাল বিন রাবাহ (রা), আবু ফুকাইহা (রা) এবং আমের বিন ফুহায়রার মতো লোককে কুরাইশরা মসজিদে হারামে বসে থাকতে দেখতো, তখন বিদ্রুপ করে বলতো- এ সব লোকই এ লোকের সংগী সাথী। আমাদের মধ্যে কি শুধু এ সব লোকই আল্লাহর অনুগ্রহের অধিকারী ছিল?

অজ্ঞ লোকদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করা

এ প্রসংগে কুরআন বলে-

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ. (النحل: ٢٤)

- যখন তাদের কেউ জিজ্ঞেস করে, তোমাদের রব এ কোন্ জিনিস নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে, আরে এতো প্রাচীনকালের জরাজীর্ণ কাহিনী (নহলঃ ২৪]।

নবী (স) এর দাওয়াত যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো, তখন মক্কার লোক যেখানেই যেতো, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতো, তোমাদের ওখানে যে ব্যক্তি নবী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁর শিক্ষা কি? কুরআন কোন্ ধরনের কিতাব? তার বিষয়বস্তু কি? ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ ধরনের প্রশ্নের জবাব মক্কার কাফেরগণ সব সময়ে এমন ভাষায় দিত যার দরুন প্রশ্নকারীর মনে নবী (স) এবং আনীত কিতাব সম্পর্কে কোননা কোন প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি হতো অথবা অন্ততঃপক্ষে নবী ও তাঁর নবুওত সম্পর্কে তার মনে কোন অনুরাগ যেন বাকী না থাকে।(১৬)

৪. সাংস্কৃতিক কর্মসূচী

এসব নিকৃষ্ট কলাকৌশল ছাড়াও নবী (স) এর দাওয়াত প্রতিরোধের জন্য আর এক কৌশলঃ অবলম্বন করতো। এ কথাও চিন্তা করা হয়েছিল যে, মানুষকে কেচ্ছা কাহিনী, গান বাদ্য আনন্দ-সম্ভোগে মগ্ন রেখে- তাদেরকে চিন্তা চেতনার দিকে পংগু করে রাখা যাতে তারা যেন কোন গুরুতর বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে না পারে যা কুরআন এবং মুহাম্মদ (স) তাদের সামনে পেশ করছিলেন।

ইবনে হিশাম সীরাতে মুহাম্মদ বিন ইসহাকের বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন যে, বনী আবদুদ্দারের নদর বিন আল হারেস বিন কালাদা কুরাইশের এক সমাবেশে বলে, তোমরা মুহাম্মদের (স) মুকাবেলা যেভাবে করছো তাতে কোন ফল হবেনা। মুহাম্মদ (স) যখন যুবক ছিলেন তখন তিনি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে অমায়িক ছিলেন, সবচেয়ে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ছিলেন। এখন যখন তাঁর চুল শ্বেত বর্ণ ধারণ করেছে, তখন তিনি তোমাদের নিকটে এমন জিনিস এনেছেন যে তোমরা তাঁকে বলছ যাদুকর, গণক, কবি ও পাগল। খোদার কসম! তিনি যাদুকর নন। আমরা যাদুকর দেখেছি, তাদের ঝাড়ফুঁক দেখেছি। খোদার কসম! তিনি গণক নন। আমরা গণকের নীরস ছন্দোবদ্ধ কথা শুনেছি। সে যে আবোল-তাবোল কথা বলে তাও আমাদের জানা আছে। খোদার কসম! তিনি কবিও নন। কবিতার সকল ধারা-পদ্ধতি আমাদের জানা আছে। তাঁর কালাম এ সবের কোন ধারায় পড়েনা। খেদার কসম! তিনি পাগলও নন। পাগলের যে অবস্থা হয়ে থাকে এবং যে ধরনের অর্থহীন কথা বিড় বিড় করে বলে তা কি আমাদের জানা নেই? হে কুরাইশ সর্দারগণ! অন্য কিছু উপায় চিন্তা করে দেখ। যে জিনিসের মুকাবেলা তোমাদের করতে হবে, তা এর চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে তোমরা কিছু রচনা করে তাকে পরাজিত করতে চাও।

তারপর সে প্রস্তাব করে যে, অনারব দেশ থেকে রুস্তম ও ইসফেন্দয়ারের কেচ্ছা কাহিনী সংগ্রহ্ করে এনে ছড়ানো হোক যাতে লোক এর প্রতি অনুরক্ত হতে থাকে এবং তা তাদের কাছে কুরআন থেকে অধিক বিস্ময়কর মনে হয়। তারপর কিছুদিন এ কাজ চলতে থাকে এবং স্বয়ং নদর কেচ্ছা-কাহিনী শুনাতে থাকে।(১৭)

এ বর্ণনাই ওয়াহেদী, কালবী এবং মুকাতেলের বরাত দিয়ে আসবাবুন্ নুযুলে উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) অতিরিক্ত একথা বলেছেন যে, নদর এ উদ্দেশ্যে গায়িকা দাসীও খরিদ করেছিল। যখনই সে এ কথা শুনতো যে অমুক নবী (স) এর কথায় প্রভাবিত হয়ে পড়ছে, তখন তার পেছনে সে একজন দাসী লাগিয়ে দিত এবং তাকে বলতো, তাকে খুব ভালো করে আদর যত্ন করে খেতে দাও এবং গান শুনাতে থাক, যাতে তোমাকে নিয়ে মত্ত থেকে তার মন যেন ওদিক থেকে সরে আসে।(১৮)

৫. মিথ্যার অভিযান ও তার প্রভাব

এসব কৌশল অবলম্বনের সাথে কুরাইশগণ নবী (স) এর সাধারণ দাওয়াত শুরু হওয়ার সাথে সাথে মিথ্যা প্রচারণার এক অভিযানও শুরু করে যাতে মানুষকে তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ করা যায়। এ অভিযানে যেহেতু সত্যের কোন লেশমাত্র ছিলনা, বরঞ্চ নিছক তাঁর বদনাম করা এবং তাঁর থেকে মানুষকে দূরে রাখা উদ্দেশ্য ছিল, সে জন্যে, যার মুখে যা আসতো তাই বলে বেড়াতো। কেউ বলতো, তিনি কবি, কেউ বলতো গণক, কেউ বলতো যাদুকর। কেউ বলতো-তাঁকে যাদু করা হয়েছে। কেউ আবার পাগল বলতো। মোটকথা

কোন একটি মাত্র কথা ছিলনা যা তারা তাঁর সম্পর্কে বলতো। এ সব নিন্দা চর্চা মক্কার আনাচে-কানাচেই করা হতোনা, বরঞ্চ মক্কায় যে ব্যক্তিই আসতো যিয়ারত, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে তাকেই এসব কথা বলা হতো। এর দ্বারা চেষ্টা করা হতো যাতে কেউ তাঁর (নবীর) কথা শুনতেই না পায়, যার দ্বারা তার প্রভাবিত হওয়ার আশংকা করা হতো।(১৯)

হজ্জের সময় কুরাইশদের পরামর্শ

এভাবে কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর হজ্বের সময় এসে গেল। মক্কার লোকেরা এ চিন্তায় পড়ে গেল যে, এ সময়ে গোটা আরব থেকে হাজীদের কাফেলা আসবে। যদি মুহাম্মদ (স) এ সব কাফেলার অবস্থানে গিয়ে গিয়ে হাজীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং হজ্বের সমাবেশগুলোতে স্থানে স্থানে দাঁড়িয়ে কুরআনের মতো নজীর বিহীন ও প্রভাব সৃষ্টিকারী কালাম পাঠ করে শুনাতে থাকেন, তাহলে আরবের প্রতিটি আনাচে-কানাচে তাঁর দাওয়াত পৌছে যাবে। তারপর না জানি কে কে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ইবনে ইসহাক, হাকেম এবং বায়হাকী উৎকৃষ্ট সনদসহ এ ঘটনা বর্ণনা করেন ঃ

এ উদ্দেশ্যে কুরাইশ সর্দারগণ এক সম্মেলন করলো এবং এতে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, হাজীদের আগমনের সাথে সাথেই তাদের মধ্যে হুযুরের (স) বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করা হবে। এতে সকলে একমত হওয়ার পর অলীদ বিন মগীরা সমবেত লোকদেরকে বল্লো, যদি আপনারা মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কথা লোকদেরকে বলেন, তাহলে আমাদের প্রতি আস্থা নষ্ট হয়ে যাবে। এ জন্যে কোন একটি কথা স্থির করে নিন যা সকলে একমত হয়ে বলবে।

কেউ কেউ বল্লো, আমরা মুহাম্মদকে (স) গণক বলবো। অলীদ বল্লো- না, খোদার কসম সে গণক নয়। আমরা গণক দেখেছি। যেভাবে সে গুণ গুণ করে কথা বলে এবং যে ধরনের বাক্য জোড়ে, তার সাথে কুরআনের কোন দূরতম সম্পর্কও নেই। কেউ বল্লো- তাকে পাগল বলা হোক। অলীদ বল্লো- সে পাগলও নয়। আমরা তো পাগলও দেখেছি। সে যেমন মাতালের মতো কথা বলে এবং উল্টা-সিধা ভাব-ভংগী করে তা কারো অজানা নেই। কে এ কথা বিশ্বাস করবে যে, মুহাম্মদ (স) যে কালাম পেশ করছেন, তা পাগলের দম্ভোক্তি অথবা পাগল অবস্থায় মানুষ এমন কথা বলে? লোকে বল্লো, আচ্ছা, তাহলে তাকে আমরা কবি বলব। অলীদ বল্লো, তিনি কবিও নন। আমরা কবিতার সকল ধরন সম্পর্কে অবগত। এ কালামে কবিতা রচনার কোন দিক দিয়েই মিল নেই। লোকে বল্লো, তাহলে তাকে যাদুকর বলা হোক। অলীদ বল্লো- তিনি যাদুকরও নন। যাদুকরদের আমরা চিনি। যাদুর জন্য তারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করে তাও আমাদের জানা আছে। এ কথাও মুহাম্মদের (স) উপর প্রযোজ্য নয়। তোমরা এ সবের মধ্যে যে কথাই বলবে তা মানুষ অন্যায় অভিযোগই মনে করবে। খোদার কসম! এ কালামে বড়ো মিষ্টতা রয়েছে। তার মূল গভীরে এবং শাখা-প্রশাখা ফলবান।

ইবনে জারীর তাঁর তফসীরে এ কথা একরামার বরাত দিয়ে অতিরিক্ত বলছেন যে, এরপর আবু জাহল অলীদকে চাপ দিয়ে বলে, মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে যতোক্ষণ না তুমি কিছু বলেছ, তোমার কওম তোমার উপর সন্তুষ্ট হবেনা। অলীদ বলে, আচ্ছা আমাকে চিন্তা করতে দাও। তারপর চিন্তাভাবনা করে বলে, কমপক্ষে যে কথাটা বলা যায় তাহলো এই যে, তোমরা আরবের লোকদেরকে বল- এ ব্যক্তি যাদুকর। এ ব্যক্তি এমন কালাম পেশ

করে যা মানুষকে তার বাপ, ভাই, বিবি-বাচ্চা ও গোটা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অলীদের একথা সকলে মেনে নিল। তারপর এক পরিকল্পনা মুতাবেক হজ্বের সময় কুরাইশদের প্রতিনিধি দল, হাজীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তারা আগমনকারীদেরকে সতর্ক করে দিতে লাগলো যে এখানে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে যে বড়ো যাদুকর। তার যাদু পরিবারের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করে। তার থেকে সতর্ক থাকতে হবে।(২০)

এ ঘটনার বিষয়ে কুরআনের পর্যালোচনা

অলীদ বিন মুগীরার এ প্রস্তাবনা সম্পর্কে সূরায়ে মুদ্দাসিরের ১১-২৫ আয়াতে পর্যালোচনা করা হয়েছেঃ ছেড়ে দাও আমাকে এবং সে ব্যক্তিকে। অর্থাৎ তাকে আমিই দেখে নেব। তার ব্যাপারে তোমার চিন্তার কোন দরকার নেই। আমি তাকে একাকী ও নিঃসংগ অবস্থায় পয়দা করেছি। অর্থাৎ সে দুনিয়ায় সাথে করে কিছু নিয়ে আসেনি। আমি তাকে বহু ধনসম্পদ দিয়েছি এবং তার সাথে হাযির থাকার জন্য বহু পুত্র সন্তানও দিয়েছি। অর্থাৎ তাকে দশ-বারো জন যুবক পুত্র সন্তান দিয়েছি- যারা সব নামকরা। বৈঠকাদিতে তার সাথে থাকতো (খালিদ বিন অলীদ (রা) এর মতো যোগ্য পুত্রও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন)। তার জন্য নেতৃত্ব কর্তৃত্বের পথ সুগম করে দিয়েছি। এতদসত্ত্বেও সে লালসা করতো যে আমি তাকে আরও দিই, কক্ষনোও না। আমি তো তাকে একটা চড়াইতে চড়াব। সে চিন্তা করলো এবং কিছু কথা রচনা করার চেষ্টা করলো। খোদার মার তার উপর- কেমন কথা রচনার চেষ্টা সে করেছে। হ্যাঁ, খোদার মার তার উপর কেমন কথা রচনার চেষ্টা সে করেছে। পরে লোকদের প্রতি তাকালো। পরে কপাল সংকোচিত করলো, মুখ বাঁকা করলো, পরে ফিরে গেল এবং অহংকারে পড়ে গেল। শেষে বল্লো, এ কুরআন তো কিছু নয়। একটি যাদু যা পূর্ব থেকে চলে আসছে। এ তো এক মানব রচিত কালাম।"

উপরে যে ঘটনার উল্লেখ আমরা করেছি তার থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, কুরআন আল্লাহর কালাম এ সম্পর্কে অলীদের মন নিশ্চিত ছিল। তারপর তার কওমের মধ্যে তার নেতৃত্ব কর্তৃত্ব ও মানসম্মান রক্ষা করার জন্য নিজের বিবেকের সাথে যেভাবে সংগ্রাম করলো এবং যে ধরনের মানসিক সংঘাতে বহুক্ষণ যাবত লিপ্ত থাকার পর সে কুরআনের বিপক্ষে যে একটি কথা রচনা করলো- তার চিত্র এ আয়াতগুলোতে অংকিত করা হয়েছে।(২১)

স্থায়ীভাবে ও ব্যাপক আকারে মিথ্যা প্রচারণা

এ মিথ্যার অভিযান শুধু হজ্বের সময়েই চলতোনা। বরঞ্চ বছরের বারো মাসে এবং মাসের তিরিশ দিন- দিবারাত্রি এ অভিযান চালানো হতো। মক্কার জনসাধারণকেও সর্বদা নবীর (স) বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তোলা হতো। বহিরাগতদেরকে সতর্ক থাকতে এবং নবীর নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য তাকীদ করা হতো। আরবের মেলাগুলোতে, যেমন ওকাজ, মাজান্না ও যুল্-মাজায- কুরাইশের প্রতিনিধিগণ ছড়িয়ে পড়তো এবং নবীর (স) বিরুদ্ধে হরেক রকমের প্ররোচনা তাদের দেয়া হতো। বিশেষ করে প্রতি বছর হজ্বের সময় তাদের প্রতিনিধি হাজীদের শিবিরে শিবিরে যেতো এবং নবীর (স) বিরুদ্ধে সব কথা ছড়িয়ে দিত যাতে লোক তাঁর কথা শুনা থেকে দূরে থাকে এবং তাঁকে নিজেদের জন্য একটি বিপদ মনে করে।

মক্কার বাইরে ইসলামের প্রচার

কুরাইশরা একথা মনে করতো যে, এভাবে তারা নবী মুহাম্মদ (স) ও কুরআন প্রতিহত করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এভাবে তারা স্বয়ং আরবের আনাচে কানাচে তাঁর নাম পৌঁছিয়ে দেয়। বছরের পর বছর ধরে মুসলমানদের চেষ্টায় যতোটা তাঁর নাম ও দাওয়াতের প্রচার সম্ভব হয়নি, কুরাইশদের এ অভিযানে অল্প সময়ে তা সম্ভব হয়। সাধারণ মানুষ এতে খারাপ ধারণা পোষণ করলেও অনেকের মনে আপনা আপনি এ প্রশ্নের উদয় হয়। জানাতো দরকার যার বিরুদ্ধে এ ঝড় উঠেছে, সে কেমন লোক? অনেকে এরূপ চিন্তাও করতে থাকে যে, যার এতো ভয় আমাদের দেখানো হচ্ছে, তার কথাটাতো শুনা যাক। এভাবে মক্কার বাইরে অন্যান্য অঞ্চলেও ইসলাম পৌছার পথ খুলে যায়।

তুফাইল বিন আমর দাওসীর ইসলাম গ্রহণ

ইনি দাওস গোত্রের একজন সম্ভ্রান্ত দলপতি ছিলেন। ইবনে ইসহাক এবং ইবনে সা'দ তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা স্বয়ং তাঁর বর্ণনা মুতাবিক বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করেছেন। দাওসী বলেন, আমি দাওস গোত্রের একজন কবি ছিলাম। কোন কাজে মক্কা গিয়েছিলাম। সেখানে পৌঁছার পর পরই কুরাইশের কিছু লোক ঘিরে ধরলো এবং নবীর (স) বিরুদ্ধে আমার কান ঝালাপালা করে দিল। ফলে আমি তাঁর প্রতি খুব বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লাম। আমি স্থির করলাম যে, তাঁর থেকে আমি সরেই থাকব। দ্বিতীয় দিন আমি হেরেমে হাযির হয়ে দেখলাম তিনি নামায পড়ছেন। আমার কানে তাঁর পঠিত কিছু কথা পড়তেই অনুভব করলাম, এ তো বড়ো সুন্দর কথা। আমি মনে মনে ভাবলাম, আমি একজন কবি, যুবক মানুষ, জ্ঞান বিবেক রাখি, কচি খোকাও নই যে, ভালোমন্দ পার্থক্য করতে পারবনা। এ লোকের সাথে সাক্ষাৎ করে জানিনা কেন, এ কি বলে। বস্তুতঃ নবী (স) যখন নামায শেষ করে ঘরে ফিরছিলেন, তখন আমি তাঁর পেছনে পেছনে চল্লাম। তাঁর বাড়ি পৌঁছার পর আমি তাঁকে বল্লাম, আপনার কওম আপনার সম্পর্কে আমাকে এ ধরনের কথা বলেছিল তার দরুন আপনার প্রতি আমার এমন খারাপ ধারণা হয় যে, আমি কানে তুলো দিয়েছিলাম যাতে আপনার কোন কথা শুনতে না পাই। কিন্তু এই মাত্র আপনার মুখ থেকে যে কয়টি কথা শুনলাম, তা আমার কাছে খুব ভালো মনে হয়েছে। আপনি একটু বিস্তারিত বলুন- আপনি কি বলতে চান। জবাবে নবী (স) আমাকে কুরআনের একটি অংশ পড়ে শুনান, এর দ্বারা আমি এতোটা প্রভাবিত হয়ে পড়লাম যে, তখনই ঈমান আনলাম। তারপর যখন বাড়ি ফিরে গেলাম, তো আমার বৃদ্ধ পিতা সামনে এলেন। বল্লাম, আব্বা, আমার থেকে দূরে থাকবেন। না আমি আপনার কেউ, আর না আপনি আমার কেউ। তিনি বল্লেন, কেন? বল্লাম, আমি মুসলমান হয়েছি এবং দ্বীনে মুহাম্মদীর আনুগত্য অবলম্বন করেছি। তিনি বল্লেন, বাপু তোমার যা দ্বীন আমারও তাই দ্বীন। বল্লাম, তাহলে গোসল করে পাক-পবিত্র কাপড় পরে আসুন। তারপর আমি আপনাকে সে দ্বীনের তালীম দেব- যা আমি শিক্ষা গ্রহণ করে এসেছি। তিনি তাই করলেন এবং মুসলমান হয়ে গেলেন। তারপর আমার বিবি এলো, আমি তাকেও সে কথাই বল্লাম যা পিতাকে বলেছিলাম। সে বল্লো, আমার মা-বাপ তোমার উপর কুরবান, তুমি এ কি বলছ? বল্লাম, আমার এবং তোমার মধ্যে ইসলাম পার্থক্য সূচিত করেছে। আমি দ্বীনে মুহাম্মদীর অনুগত হয়ে পড়েছি। সে বল্লো, তোমার দ্বীন আমাকে বলে দাও। বল্লাম, যুশ্‌শারার (দাওসী গোত্রের প্রতিমা)

হেমাতে[১] (চত্বরে) যাও এবং পাহাড় থেকে প্রবাহিত ঝর্ণায় গোসল কর। সে বল্লো, যুশ্‌শারা থেকে আমার সন্তানদের কোন বিপদের আশংকা নেই তো? বল্লাম, না। আমি সে দায়িত্ব নিচ্ছি। সে গিয়ে গোসল করে এলো। তার কাছে আমি ইসলাম পেশ করলাম। সে মুসলমান হয়ে গেল। তারপর আমি দাওস গোত্রের মধ্যে ইসলামের তবলিগ শুরু করলাম। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করছিল। আমি মক্কায় হুযুরের (স) কাছে ফিরে এসে বল্লাম, দাওস গাফলতির শিকার এবং আমার পথে প্রতিবন্ধকতা করছে। তিনি তাদের জন্য দোয়া করলেন। তিনি বল্লেন, হে খোদা! দাওসকে হেদায়েত কর। তারপর আমাকে এভাবে নসিহত করলেন- গিয়ে তাদের মধ্যে আবার তবলিগ কর এবং তাদের সাথে নম্র আচরণ করবে। তারপর আমি দাওসের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করতে থাকলাম এবং শেষ পর্যন্ত খয়বর অভিযানের সময় সেখান থেকে সত্তর-আশি পরিবার সহ উপস্থিত হই।

হযরত আবুযর গিফারীর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ

তিনি ছিলেন বনী গিফার গোত্রের লোক। এরা রাজপথে ডাকাতির জন্য মশহুর ছিল। এক সময় স্বয়ং আবুযরও এমন দুরন্ত ডাকাত ছিলেন যে, একাকী কোন কাফেলার উপর এমনভাবে আক্রমণ করতেন যেন কোন হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হয়েছে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের তিন বছর পূর্বে তাঁর মনের পরিবর্তন হয়েছিল এবং কোন না কোনভাবে নামায পড়া শুরু করে দিয়েছিলেন। মুসনাদে আহমদ ও ইবনে সা'দের বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলতেন, আমি তিন বছর পূর্ব থেকেই আল্লাহর জন্য যেদিকেই মুখ করতাম নামায পড়তাম।

তাঁর প্রকৃত নাম ছিল, জুন্দুব বিন জুনাদাহ্। বোখারীতে বর্ণিত আছে যে, যখন হুযুরের (স) আবির্ভাবের কথা তাঁর কাছে পৌঁছলো, তখন তিনি তাঁর ভাই উনাইস্‌কে (মুসনাদে আহমদের বর্ণনা মতে) মক্কা পাঠালেন, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে যিনি বলেন, 'আমি নবী'। তিনি গেলেন এবং ফিরে এসে বল্লেন, তিনি অতি উন্নতমানের চারিত্রিক শিক্ষা দেন এবং এমন কালাম পেশ করেন যা কবিতা নয়। হযরত আবুযর (রা) বল্লেন, আমি যা জানতে চেয়েছিলাম তা তুমি জেনে আসতে পারনি। অতঃপর তিনি স্বয়ং মক্কায় গেলেন এবং মসজিদে হারামে হুযুরকে (স) তালাশ করতে থাকেন। কিন্তু যেহেতু তিনি নবীকে চিনতেননা এবং কাউকে জিজ্ঞেস করতেও চাইতেননা, সে জন্য তাঁকে পেলেননা। হযরত আলী (রা) তাঁকে দেখে মনে করলেন কোন অপরিচিত মুসাফির হবে। তাঁর সাথে কোন কথাবার্তাও হয়না। তৃতীয় দিন হযরত আলী (রা) তাঁকে বল্লেন, তুমি কি জন্য এসেছ? তিনি বল্লেন, যদি তুমি ওয়াদা কর যে, তুমি যদি আমাকে আমার ইপ্সিতের নিকটে পৌঁছিয়ে দাও তাহলে বলব কি জন্য এসেছি। হযরত আলী (রা) ওয়াদা করলেন, তখন তিনি তাঁর উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন। আলী (রা) বল্লেন, তিনি নিশ্চিত রূপে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহর রসূল। আগামীকাল সকালে তুমি আমার পেছনে পেছনে আসবে। যদি আমি চলতে থাকি, তুমিও চলতে থাকবে। যেখানে আমি প্রবেশ করি তুমিও সেখানে প্রবেশ করবে। আমি যদি এমন কিছু দেখি- যা তোমার জন্য আশংকাজনক মনে করব,

---

১. হেমা সে চত্বর বা প্রাংগণকে বলে যা কোন সর্দার, নেতা বা দেবতার জন্য নির্দিষ্ট। তার মধ্যে প্রবেশ করার অর্থ তাদের বিরাগভাজন হওয়া- গ্রন্থকার।

তাহলে এমনভাবে দাঁড়িয়ে পড়ব যেন পানি ঢালছি। তা দেখে তুমি দাঁড়িয়ে যাবে। মোটকথা এভাবে আবুযর (রা) হুযুরের (স) নিকটে পৌঁছলেন। তাঁর কথা শুনামাত্র মুসলমান হয়ে গেলেন। হুযুর (স) বল্লেন, তুমি তোমার কওমের কাছে ফিরে যাও এবং লোকদেরকে দ্বীন সম্পর্কে অবগত করতে থাক। শেষ পর্যন্ত তুমি আমার অবস্থা যেন জানতে পার। হযরত আবুযর (রা) বলেন, যে খোদা আপনাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম! আমি মক্কাবাসীদের কাছে সত্য প্রকাশ করে ছাড়ব। অতঃপর তিনি মসজিদে হারামে পৌঁছে উচ্চস্বরে বল্লেন- "আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ।" একথা শুনামাত্র লোক তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এমন মার দিল যে তিনি পড়ে গেলেন। এ অবস্থা দেখে হযরত আব্বাস (রা) তাঁর এবং লোকদের মধ্যে মধ্যস্থ হয়ে বল্লেন, ওরে হতভাগার দল, তোমাদের কি জানা আছে যে ইনি বনী গিফার গোত্রের লোক। তোমাদের শামদেশে ব্যবসার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে এরা অবস্থান করে? এভাবে হযরত আব্বাস (রা) তাঁকে রক্ষা করেন। দ্বিতীয় দিনেও তারা তাঁর সাথে এরূপ ব্যবহারই করে এবং হযরত আব্বাস (রা) তাঁকে ছাড়িয়ে নেন।

ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে স্বয়ং আবুযরের (রা) এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি (আবু যর) বলেন, আমি ও আমার ভাই উনাইস্ এবং আমার মা বাইরে অবস্থান করছিলাম। উনাইস্ বলেন, আমি একটু মক্কা শহর থেকে ঘুরে আসি। তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা কর। তারপর তিনি অনেক বিলম্বে ফিরলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এতো বিলম্ব করলেন কোথায়? তিনি বল্লেন, এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় যিনি বলেন যে, তিনি আল্লাহর রসূল এবং আল্লাহ্ তাঁকে সে দ্বীনের উপরেই পাঠিয়েছেন যা তোমার দ্বীন (অর্থাৎ শির্ক প্রত্যাখ্যান এবং তৌহীদের স্বীকৃতি)।

"আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকে তাঁকে কি বলে? তিনি বল্লেন, তারা বলে যে, তিনি কবি, গণক, যাদুকর। উনাইস্ স্বয়ং কবি ছিলেন, তিনি বল্লেন, আমি গণকদের কথাও শুনেছি। কবিতা রচনা করতেও জানি। কিন্তু এ সবের সাথে তাঁর কথার কোন সম্পর্কই নেই। খোদার কসম, তিনি সত্য এবং ঐ লোকগুলোই মিথ্যাবাদী।

আমি বল্লাম, আমার স্থলে তুমি কি একটু দেখাশুনা করবে যাতে আমি স্বয়ং সেখানে যেতে পারি? তিনি বল্লেন, ঠিক আছে, তবে মক্কাবাসীদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। কারণ তারা তাঁর বিরোধিতার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

আমি মক্কায় পৌঁছলাম। তারপর এক ব্যক্তিকে একটু দুর্বল মনে করে জিজ্ঞেস করলাম, সে ব্যক্তি কোথায় যাকে লোকে 'সাবী' (দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাওয়া) বলে? তারপর সে ব্যক্তি আমার দিকে ইংগিত করা মাত্র লোক আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাদের হাতে যা কিছু ছিল, আমার উপর নিক্ষেপ করলো। অতঃপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেল্লাম। জ্ঞান ফেরার পর হেরেমে গেলাম, যমযম পানি পান করলাম এবং আহতস্থান ধুয়ে ফেল্লাম। ত্রিশ দিন যাবত কাবায় পর্দার অন্তরালে লুকিয়ে থাকলাম। এ সময় যমযম পানি ব্যতীত আর কোন কিছু আমার আহার্য বস্তু ছিল না। তথাপি আমি মোটা তাজা হয়ে পড়ি।

তারপর হযরত আবুযর (রা) বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ্ (স) ও হযরত আবু বকর (রা) হেরেমে এলেন, হিজরে আসওয়াদে জুমো দিলেন, তাওয়াফ করলেন ও নামায পড়লেন।

আমি বের হয়ে প্রথম বার ইসলামী পদ্ধতিতে তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বল্লেন- 'আলায়কাস্ সালাম'। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? বল্লাম, বনী গিফারের একজন। বল্লেন,

কবে থেকে এখানে আছ? বল্লাম- ত্রিশ দিন ও রাত যাবত। বল্লেন, তোমাকে আহার করাতো কে? বল্লাম, যমযম ব্যতীত আমার আহারের আর কিছু ছিলনা। তার দ্বারা আমার শুধু ক্ষুধা নিবৃত্তই হয়নি,বরঞ্চ কিছুটা মোটা তাজা হয়েছি। তিনি বল্লেন, ওতো বরকতপূর্ণ পানি। শুধু পানিই নয়, আহারও।

হযরত আবু বকর (রা) বল্লেন, অনুমতি হলে রাতে ইনি আমার বাড়ি খাবেন। হুযুর (স) অনুমতি দিলেন। তারপর তিনি চলে গেলেন এবং আমি আবু বকরের (রা) ওখানে গেলাম। তিনি আমাকে তায়েফের কিশ্‌মিশ্‌ খাওয়ালেন। আমি কিছুকাল তাঁর ওখানে অবস্থান করলাম। তারপর হুযুর (স) বল্লেন, এমন এক ভূখন্ডের দিকে আমাকে ইংগিত করা হয়েছে, যেখানে খেজুরের বাগান আছে এবং আমার মনে হয় সে স্থান ইয়াস্‌রেব ব্যতীত আর কোন স্থান নয়। তুমি কি আমার পয়গাম তোমার কওমের কাছে পৌছাবে? সম্ভবতঃ এতে তাদেরও উপকার হবে এবং তোমারও প্রতিদান মিলবে।

হযরত আবুযর (রা) বলেন, তারপর আমি আমার মা ও ভাইয়ের কাছে ফিরে গেলাম। তাঁরা বল্লেন, কি করে এলে? বল্লাম, ইসলাম নিয়ে এসেছি এবং তার সত্যতারও সাক্ষ্য দিয়েছি। উনাইস বলেন, আমিও তোমার দ্বীন থেকে দূরে থাকতে চাই না। আমিও ইসলাম কবুল করলাম এবং তার সত্যতার সাক্ষ্য দিলাম। আমাদের মা বল্লেন, আমিও তোমাদের দু'জনের দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চাইনা। আমিও ইসলাম কবুল করলাম এবং সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছি। তারপর আমরা আমাদের কওম গিফারে ফিরে গেলাম। তাদের মধ্যে কিছু লোক হুযুরের (স) মদীনায় হিজরত করার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে। তাদেরকে খুফাফ বিন আয়মা বিন রাহাদাতুল গিফারী নামায পড়াতেন। কারণ তিনিই কওমের সর্দার ছিলেন। হিজরতের পর অবশিষ্ট গিফারীগণও ইসলাম গ্রহণ করেন (ইমাম মুসলিমও এ কাহিনী এভাবেই বর্ণনা করেছেন। তাবারানী আওসাতে এ কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন)।

ইবনে সা'দের বর্ণনায়- যদিও এ কাহিনী উপরের মতোই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তবুও তার মধ্যে আবু যর গিফারীর (রা) নিম্নলিখিত বক্তব্যও সংযোজিত করা হয়েছে। তিনি বলেন-

'যখন কাবায় পর্দার পেছনে লুকিয়ে ছিলাম, তখন তাওয়াফের স্থানে দু'জন মহিলা ব্যতীত আর কেউ ছিল না। আমি তাদেরকে এসাফ্‌ ও নায়েলার উল্লেখ করতে শুনলাম। তা আমার সহ্য হলোনা, তাই বল্লাম- এ দু'জনের মধ্যে বিয়ে দিয়ে দাও। এতে তাঁরা ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে বলতে লাগলো, আহা, আমাদের কোন লোক যদি এখানে থাকতো। ওদিকে পাহাড় থেকে রসূলুল্লাহ (স) ও হযরত আবু বকর (রা) নেমে এদিকে আসছিলেন। এ মহিলাদ্বয়- সম্ভবতঃ তাঁদেরকে চিনতোনা। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এতো ক্ষুব্ধ কেন? তারা বল্লো, একজন সাহাবী কাবায় পর্দার আড়ালে লুকিয়ে আছে। হুযুর (স) বল্লেন, সে তোমাদের কি বলেছে? তারা বল্লো, সে এমন কথা বলেছে, যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।'

আমর বিন আবাসা সুলামীর ইসলাম গ্রহণ

তিনি ছিলেন বনী সুলায়েমের লোক। তাঁর ধারণা ছিল যে তিনি চতুর্থ মুসলমান। কিন্তু তাঁর মুসলমান হওয়ার যে বর্ণনা তিনি স্বয়ং দিয়েছেন, তার থেকে জানা যায় যে সাধারণ দাওয়াত শুরু হওয়ার পর তিনিও নবী (স) এর দাওয়াতে মুসলমান হয়েছিলেন। ইবনে

সা'দের একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তিনি ওকাজের বাজারে নবী (স) এর সাথে মিলিত হন। সেখানেই তিনি মুসলমান হন। তার অর্থ এই যে, হুযুর (স) সে সময়ে দাওয়াতী কাজে বের হওয়া শুরু করেছেন। দ্বিতীয় বর্ণনা যা ইবনে সা'দ ও মুসলিম আবু উমামা বাহেলীর বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেছেন- তাতে আমর বিন আবাসা স্বয়ং বলেন, আমি জাহেলিয়াতের যুগে মানুষকে পথভ্রষ্ট মনে করতাম এবং প্রতিমাগুলোকে অর্থহীন মনে করতাম। তারপর শুনলাম যে, মক্কায় এক ব্যক্তি আছেন যিনি কিছু খবর দেন এবং কিছু কথাও বলেন। অতএব আমি মক্কায় গেলাম এবং দেখলাম যে হুযুর (স) আত্মগোপন করে রয়েছেন এবং তাঁর ব্যাপারে কওম দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আমি সতর্কতার সাথে তাঁর সাথে মিলিত হই এবং জিজ্ঞেস করি, আপনি কে? বল্লেন, নবী। আমি বল্লাম- নবী কাকে বলে? তিনি বল্লেন- আল্লাহর রসূল। বল্লাম- আল্লাহ্ কি আপনাকে পাঠিয়েছেন? বল্লেন- হ্যাঁ। বল্লাম- কোন্ শিক্ষাসহ পাঠিয়েছেন? বল্লেন- একমাত্র আল্লাহকে মাবুদ মানতে হবে, তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করা যাবে না। আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। জিজ্ঞেস করলাম- আপনার সাথে কারা রয়েছে? বল্লেন, স্বাধীন ও গোলাম উভয়ে, সে সময় হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত বেলাল (রা) উপস্থিত ছিলেন । (এর থেকে তাঁর এ ভ্রান্ত ধারণা হয় যে, তিনি চতুর্থ ব্যক্তি)

আমি বল্লাম- আমি আপনার সাথে থাকব। তিনি বল্লেন- এ সময়ে তুমি এমন করতে পারনা। যখন তুমি শুনবে যে আমি প্রকাশ্যে কাজ শুরু করেছি, তখন তুমি এসে আমার সাথে মিলিত হবে।

"অতএব আমি আমার লোকদের কাছে ফিরে গেলাম।"

দিমাদুল আযদীর (রা) ইসলাম গ্রহণ

তিনি ছিলেন আযদে শানুয়া গোত্রের লোক। তাদের পেশা ছিল ঝাড়-ফুঁক করা। হাফেজ ইবনে আবদুল বারর, হাফেজ ইবনে হাজার এবং হাফেজ ইবনে হিব্বান বলেন, জাহেলিয়াতের যুগে তিনি হুযুরের (স) বন্ধু ছিলেন। মুসলিম, নাসায়ী, বায়হাকী এবং ইবনে সাদ' বলেন, তিনি মক্কায় এলে মক্কাবাসী বলে যে, তিনি পাগল হয়ে গেছেন। আযদী বল্লেন, তোমরা আমাকে বল তিনি কোথায়? সম্ভবতঃ আমার দ্বারা আল্লাহ্ তাঁকে আরোগ্য দান করবেন।

অতঃপর তিনি হুযুরের (স) নিকটে এলেন এবং বল্লেন, আমি ঝাড়-ফুঁকের কাজ করি। আমার হাতে আল্লাহ্ যাকে চান আরোগ্য দান করেন। আসুন, আপনার চিকিৎসা করি।

হুযুর (স) প্রথমে কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করেন। তারপর আল্লাহর হামদ ও কিছু কালেমা পাঠ করেন। এসব কথা দিমাদুল আযদীর খুব ভালো লাগলো। তিনি বল্লেন, আবার বলুন। হুযুর (স) তিনবার তার পুনরাবৃত্তি করেন। দিমাদ বলেন, আমি এমন কথা কোনদিন শুনিনি। আমি গণকদের কথা শুনেছি, কবিদের কথা শুনেছি, যাদুকরদের কথা শুনেছি। কিন্তু এমন কথা কখনো শুনিনি। এ তো সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং নিজের ও নিজের কওমের পক্ষ থেকে নবীর হাতে বয়আত করেন।

হযরত আবু মুসা আশয়ারীর (রা) ইসলাম গ্রহণ

ইনি ইয়ামেন থেকে এসে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর দেশে ফিরে গিয়ে

আপন ভাই আবু বুরদা ও আবু রহম এবং প্রায় পঞ্চাশজনকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। তারপর এসব মুসলমান একটি নৌকায় চড়ে রওয়ানা হন এবং বাতাস তাঁদেরকে আবিসিনিয়ার তীরে পৌঁছিয়ে দেয়- সেখানে তাঁরা হযরত জাফর বিন আবি তালেব এবং অন্যান্য মুহাজিরদের সাথে মিলিত হন। এ হচ্ছে ইবনে সা'দ এবং ইবনে আবদুল বাররের বর্ণনা। ইবনে হাজার বলেন, তাঁরা আবিসিনিয়ায় যাননি, বরঞ্চ যখন তাঁরা মক্কা থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা হন, তখন তাঁদের নৌকা এসব মুহাজিরদের নৌকার সাথে মিলিত হয়- যা মদীনার দিকে যাচ্ছিল। তারপর তাঁরা এক সাথে খায়বরে হুযুরের (স) নিকটে পৌছেন।

মুয়ায়কীব বিন আবি ফাতেমা আদ্দাউসীর ইসলাম গ্রহণ

ইবনে সা'দ বলেন, ইনিও দাউস গোত্রের ছিলেন এবং মক্কায় মুসলমান হন। একটি বর্ণনা অনুযায়ী ইনি মুসলমান হওয়ার পর আপন দেশে ফিরে যান। অন্য একটি বর্ণনা মতে আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরতে ইনি শামিল ছিলেন। ইবনে হাজার ও ইবনে আবদুল বারর বলেন, তিনি ওসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরতে শামিল হন।

জুয়াল বিন সুরাকা (রা)

ইনি ছিলেন বনী যামরার লোক। ইবনে সা'দ ও ইবনে আবদুল বারর বলেন, ইনিও মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

আবদুল্লাহ (রা) ও আবদুর রহমান কিনানী (রা)

ইবনে সা'দের বর্ণনা মতে এ দু'ভাই বনী মিসানার এক ব্যক্তি লুহাইবের পুত্র ছিলেন। তাঁরাও মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

বুরায়দাহ বিন্ আল মুসাইবের ইসলাম গ্রহণ

ইবনে সা'দ ও ইবনে আবদুল বারের মতে ইনি বনী খুযায়ার একটি শাখা সম্ভূত ছিলেন, যে শাখাটি খুযায়ার পরিবার বর্গ থেকে পৃথক হয়ে পড়েছিল। হিজরতের সময় যখন নবী (স) মক্কা থেকে মদীনা যাচ্ছিলেন, তখন গামীম নামক স্থানে এ ব্যক্তি হুযুরের (স) সাথে মিলিত হন এবং তাঁর সাথে আশিটি পরিবারের লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। এই কথাই ইবনে হাজার ইসাবায় লিখেছেন। তার অর্থ এই যে, পূর্বে থেকেই এসব লোক ইসলামের প্রতি প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। নতুবা পথ চলতে চলতে হঠাৎ সাক্ষাতের ফলে এতো লোক মুসলমান হতে পারেনা।

এ হচ্ছে কয়েকটি দৃষ্টান্ত যার থেকে জানতে পারা যায় যে, যদিও কুরাইশগণ নবী (স) এর বিরুদ্ধে মিথ্যার অভিযান চালিয়ে আরবের লোকদেরকে নবীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি, তথাপি এ পন্থা অবলম্বন করে স্বয়ং নবীকে আরবের লোকদের মধ্যে শুধু তারা সুপরিচিতই করেনি, বরঞ্চ তাঁর প্রতি বহু পবিত্র আত্মার

মনোযোগও আকৃষ্ট করে দিয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রের লোক এ অভিযানের ফলে সত্যানুসন্ধানের জন্য নবীর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এভাবে মক্কার বাইরে অন্যান্য গোত্রের নিকটে ইসলাম পৌঁছে যায়। এ জন্যই সূরা আলাম নাশ্‌রায় বলা হয়েছে وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ - অর্থাৎ এ মিথ্যা প্রচারণায় মনমরা হচ্ছো কেন? আমরা তো তোমার দুশমনদের দ্বারাই তোমার খ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছি।

৬. মুসলমানদের উঁপর জুলুম নির্যাতন

বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতার অন্যান্য কলাকৌশল অবলম্বনের সাথে সাথে কুরাইশ কাফেরগণ চরম নিষ্ঠুর আচরণ এই করছিল যে, যার সম্পর্কেই তারা জানতে পারতো যে, সে মুসলমান হয়েছে, অথবা যে ব্যক্তিই কোনভাবে তার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছে, তার উপর তারা চরম নির্যাতন নিষ্পেষণ শুরু করেছে। ইসলাম থেকে ফিরে আসার জন্য তার প্রতি চাপ সৃষ্টি করার কোন চেষ্টাও করাও বাকী রাখেনি। প্রথম প্রথম তারা এ পন্থা অবলম্বন করে যে, ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে যারা কিছুটা মানসম্মান পারিবারিক মর্যাদা ও সমর্থন লাভ করতো, তাদেরকে এই বলে তিরস্কার করা হতো, "তুমি তোমার বাপদাদার দ্বীন পরিত্যাগ করেছ। অথচ তারা তোমার চেয়ে বেশী ভালো-মন্দের জ্ঞান রাখতেন। এখন যদি তুমি ফিরে না আস তাহলে আমরা তোমাকে অপদস্ত ও অপমানিত করব, তোমাকে আহমক গণ্য করব এবং তোমার মানসম্মান ধূলোয় ধুসরিত করে দিব।"

যারা ব্যবসা বাণিজ্য করতো তাদেরকে এই বলে হুমকি দেয়া হতো, "ইসলাম পরিত্যাগ কর, নতুবা তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং তোমাদের পেশা অচল করে দেয়া হবে। তারপর তোমাদেরকে অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে হবে।"

তারপর যারা ছিল সহায় সম্বলহীন ও দুর্বল, তাদেরকে নির্মম নির্যাতন ভোগ করতে হতো। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, সম্ভ্রান্ত লোকদেরকেও বন্দী করে দৈহিক শাস্তি দেয়া হতো।

পরিবারের অধীন লোকদের উপর জুলুম নির্যাতন

ইবনে ইসহাক ও তাবারী হযরত ওরওয়া বিন যুবাইয়ের (রা) বরাত দিয়ে বলেন, কুরাইশ সর্দারগণ পরস্পর মিলিত হয়ে এ সিদ্ধান্ত করে যে, তাদের পুত্র, ভাই এবং গোত্রের যারাই রসূলুল্লাহ (স) এর আনুগত্য মেনে নিয়েছে, তাদের উপর নির্যাতন চালিয়ে বলপূর্বক ইসলাম থেকে ফেরাবার চেষ্টা করতে হবে, ফলে নবীর (স) অনুসারীগণ বিরাট অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হন।

হযরত আবু বকরের (রা) মতো সম্মানিত ব্যক্তিকে নওফল বিন খুয়ায়লিদ বিন আল্ আদাবিয়্যা, যাকে কুরাইশের সিংহ পুরুষ বলা হতো, হযরত তালহার (রা) সাথে একত্রে বেধে ফেলে। তাঁদের পরিবার বনু তায়েম তাদেরকে বাঁচাবার কোন চেষ্টা করেনি। এর জন্য হুযুর (স) দোয়া করেন- হে খোদা, ইবনে আল্ আদাবিয়্যার অনিষ্ট থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য তুমিই দায়িত্ব গ্রহণ কর (বায়হাকী, ইবনে সা'দ)। হযরত যুবাইর বিন আল্ আওয়ামকে (রা) তাঁর চাচা একটি চাটায়ে পেঁচিয়ে লটকিয়ে দিত। তারপর নীচ দিক থেকে ধোঁয়া দিয়ে সে বলতে থাকতো, ইসলাম থেকে ফিরে এসো। জবাবে তিনি বলতে থাকেন, আমি কখনো কুফর করবনা (ইবনে সা'দ, তাবারানী)। হযরত ওসমানকে (রা)

তাঁর চাচা হাকাম (মারওয়ানের পিতা) বেঁধে ফেলে বলে, তুমি বাপদাদার দ্বীন পরিত্যাগ করে মুহাম্মদের (স) দ্বীন কবুল করেছ? আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়বনা যতোক্ষণ না তুমি সে দ্বীন ছেড়ে দিয়েছ। তিনি জবাবে বলতেন আমার যা কিছুই হোকনা কেন, এ দ্বীন কিছুতেই ছাড়বনা- (ইবনে সা'দ)। হযরত মুস্য়াব বিন ওমায়রকে (রা) তাঁর চাচাতো ভাই ওসমান বিন তালহা (কাবার চাবি রক্ষক) ভয়ানক নির্যাতন করে। তাঁর পরিবারবর্গ তাঁকে বন্দী করে রাখে। তিনি কোনভাবে পালিয়ে যান এবং আবিসিনিয়ার হিজরতকারী প্রথম দলের সাথে মিলিত হয়ে হিজরত করেন (ইবনে সা'দ)। হযরত সা'দ বিন আবি ওককাস (রা) এবং তাঁর ভাই আমেরকে (রা) তাঁদের মা তাঁদেরকে নানানভাবে নির্যাতন করেও দ্বীন ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি (ইবনে সা'দ) মুসনাদে আহমদ, মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ এবং নাসায়ীতে বলা হয়েছে যে, হযরত সা'দ বিন ওককাসের মা হাম্না বিন্তে সুফিয়ান বিন উমায়্যা (আবু সুফিয়ানের ভাতিজি) তাঁদেরকে বলে, যতোক্ষণ না তোমরা মুহাম্মদের (স) দ্বীন পরিত্যাগ করবে, আমি পানাহারও করবনা, ছায়াতে গিয়েও বসবনা। মায়ের হক আদায় করাতো আল্লাহর হুকুম। আমার কথা না মানলে আল্লাহরও নাফরমানি করা হবে। এতে হযরত সা'দ খুব পেরেশান হয়ে নবীর দরবারে গিয়ে সব কথা পেশ করলেন। জবাবে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে এ আয়াত নাযিল হলো-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. (العنكبوت : ٨)

এবং আমরা মানুষকে তার মা বাপের সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু যদি তারা তোমার উপর এমন পীড়াপীড়ি করতে থাকে যে, তুমি আমার সাথে এমন কাউকে শরীক করবে যাকে তুমি জাননা, তাহলে তাদের কথা মানবেনা। (আনকাবুতঃ ৮)

হযরত খালেদ বিন সাঈদের (রা) বর্ণনা

হযরত খালেদ (রা) বিন সাঈদ বিন আল্ আস্ যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর মুসলমান হওয়ার কথা তাঁর পিতা আবু উহায়হা জানতে পেরেছে, তখন তিনি ভয়ে আত্মগোপন করলেন। তারপর তাঁর পিতা তাঁকে খুঁজে বের করার পর বকাঝকা করে এমনভাবে মারতে থাকলো যে, যে কাষ্ঠখন্ড দিয়ে মারা হচ্ছিল তা ভেঙে গেল। তারপর সে বল্লো, তুই মুহাম্মদের (স) আনুগত্য মেনে নিয়েছিস, অথচ তুই দেখছিস যে, সে আপন কওমের বিরোধিতা করছে, পৈত্রিক দ্বীনের দোষক্রটি বের করছে এবং পূর্ব পুরুষদেরকে পথভ্রষ্ট বলছে, যাঁরা এ দ্বীনের অনুসরণ করতে থাকেন।

হযরত খালেদ (রা) বলেন, খোদার কসম তিনি সত্যবাদী এবং আমি তাঁর অনুগামী।

আবু উহায়হা পুনরায় তাঁকে মারপিট করে বকুনি দেয় এবং বলে, লায়েক, তুই যেখানে ইচ্ছা চলে যা, আমার বাড়িতে তোর আহার বন্ধ। তিনি বলেন, আপনি আমার রিযিক বন্ধ করে দিলে আল্লাহ্ আমাকে রিযিক দেবেন। তারপর তিনি হুযুরের (স) নিকটে অবস্থান করতে থাকেন। একদিন মক্কায় পার্শ্ববর্তী এক নির্জন স্থানে তিনি নামায পড়ছিলেন। একথা তাঁর পিতা উহায়হা জানতে পারে। সে ডেকে তাঁকে বল্লো, মুহাম্মদের (স) দ্বীন ছেড়ে দাও। জবাবে তিনি বলেন, আমরণ এ দ্বীন তিনি পরিত্যাগ করবেননা। উহায়হা রাগান্বিত হয়ে একখন্ড কাঠ দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করতে থাকে এবং শেষে কাষ্ঠখন্ড ভেঙে যায়। তারপর তাঁকে তিনদিন অভুক্ত অবস্থায় বন্দী করে রাখা হয়। মক্কায় প্রাণান্তকর গরমে তিনি

এ শাস্তি ভোগ করতে থাকেন। তারপর এক সুযোগে তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তারপর মক্কার চারপাশে ঘুরাফেরা করতে থাকেন। অবশেষে মক্কা থেকে আবিসিনিয়ায় হিজ্বরতকারী প্রথম দলভুক্ত হয়ে হিজ্বরত করেন। ইবনে সা'দ এবং বায়হাকীও সংক্ষেপে এ ঘটনা উল্লেখ করেন।

হযরত আবু বকরের (রা) উপর অমানুষিক জুলুম

একদিন নবী করিম (স) এবং হযরত আবু বকর (রা) 'দারে আরকাম' থেকে বেরিয়ে মসজিদে হারামে যান। সেখানে হঠাৎ আবু বকর (রা) দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি লোকদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে আহ্বান জানান। এভাবে ঘোষণা দিয়ে মসজিদে হারামে ইসলামী দাওয়াত দেয়ার এ ছিল প্রথম ঘটনা। মুশরিকগণ এ বক্তৃতা শুনার সাথে সাথে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাঁকে মাটিতে ফেলে পদদলিত করে। ওত্বা বিন রাবিয়া তাঁর মুখে জুতা দিয়ে এমন আঘাতের উপর আঘাত করে যে, সমগ্র মুখমন্ডল ফুলে ওঠে এবং রক্তে নাক ডুবে যায়। এ অবস্থা দেখার পর তাঁর গোত্রীয় লোকজন (বনু তায়েম) সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁকে উদ্ধার করে তাঁর বাড়ি পৌছিয়ে দেয়। তাদের এ বিষয়ে কণা মাত্র সন্দেহ্ ছিলনা যে, তিনি এখন মারা যাবেন। এ জন্যে পুনরায় তারা মসজিদে গেল এবং বল্লো, খোদার কসম, যদি আবু বকর মারা যান, তাহলে আমরা ওত্বাকে জীবিত ছেড়ে দেবনা। সন্ধ্যা পর্যন্ত হযরত আবু বকর (রা) সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে রইলেন। জ্ঞান লাভের পর তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিল, রসূলুল্লাহ্ (স) এর অবস্থা কি? এ কথায় বনু তায়েম তাঁকে গালিগালাজ করলো, ভর্ৎসনা করলো। তারপর তারা চলে গেল। যাবার আগে হযরত আবু বকরের (রা) মা উম্মুল খায়রকে তারা বলে গেল যেন তাকে পানাহার করানো হয়। মাতা ও পুত্র ব্যতীত আর যখন কেউ ছিলনা, তখন হযরত আবু বকর (রা) পুণরায় সেই প্রশ্নই করলেন তিনি বল্লেন, খোদার কসম, তোমার বন্ধুর অবস্থা আমার জানা নেই। হযরত আবু বকর (রা) বল্লেন, উম্মে জামিলকে (হযরত ওমরের (রা) ভগ্নি[১] ফাতেমা বিন্তে খাত্তাব) গিয়ে জিজ্ঞেস কর। তখন তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণ গোপন রেখেছিলেন। হযরত আবু বকরের মা যখন তাঁকে বল্লেন, আবু বকর (রা) মুহাম্মদ (স) বিন আবদুল্লাহ্র অবস্থা জানতে চাইছে, তখন তিনি বল্লেন, আমিতো মুহাম্মদ (স) বিন আবদুল্লাহ্কেও চিনিনা, আবু বকরকেও চিনিনা। তবে যদি আপনি চান তো আমি আবু বকরের নিকটে যাব। তিনি বল্লেন, আচ্ছা চল।

তিনি এসে দেখলেন, হযরত আবু বকর (রা) খুব আশংকাজনক অবস্থায় পড়ে আছেন। দেখা মাত্র তিনি আর্তনাদ করে বল্লেন, খোদার কসম, যারা আপনার সাথে এ আচরণ করেছে, তারা কাফের ও ফাসেক। আশা করি আল্লাহ্ তাদের প্রতিশোধ নেবেন।

আবু বকর বল্লেন, রসূলুল্লাহ্ (স) এর অবস্থা কি? তিনি চুপে চুপে বল্লেন, আপনার মা শুনছেন। আবু বকর (রা) বল্লেন, তাঁর জন্যে ভয়ের কোন কারণ নেই। তখন উম্মে জামিল

---

১. তাবারানী বিশদভাবে বলেন যে, হযরত ওমরের (রা) ভগ্নি ফাতেমা বিন্তে খাত্তাবের কুনিয়াত ছিল উম্মে জামিল। আবদুর রাজ্জাক আল্ মুসান্নাফে ইমাম যুহরীর বরাত দিয়ে বলে, হযরত ওমর (রা) তাঁর ভগ্নি উম্মে জামিলের বাড়িতে কুরআন শুনে ঈমান আনেন। অন্য বর্ণনায় এ মহিলার নাম ফাতেমা বিন্তে খাত্তাব বলা হয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ওমরের সেই ভগ্নির নাম ছিল ফাতেমা। আর তাঁর কুনিয়াত ছিল উম্মে জামিল।

বল্লেন, হুযুর (স) বিলকুল সুস্থ্য আছেন। আবু বকর (রা) বল্লেন, কোথায় আছেন? তিনি বল্লেন, দারে আরকামে আছেন। হযরত আবু বকর (রা) বলেন, খোদার কসম, হুযুর (স) এর নিকটে না যাওয়া পর্যন্ত আমি পানাহার করবনা। উম্মে জামিল বলেন, একটু সবর করুন। অতঃপর যখন শহরের অবস্থা শান্ত হলো, তখন তিনি এবং উম্মুল খায়ের উভয়ে মিলে তাঁকে ধরাধরি করে দারে আরকামে নিয়ে গেলেন। তাঁর অবস্থা দেখে রসূলুল্লাহ (স) স্নেহবিহ্বল হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে তাঁকে চুম্বন করলেন। অন্যান্য যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও ঝুঁকে পড়ে তাঁর অবস্থা দেখলেন।

হযরত আবু বকর (রা) বল্লেন, আমার মা বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক, আমার বিশেষ কষ্ট হয়নি। তবে ঐ পাপাচারী আমার মুখে তার জুতার আঘাত করে যে কষ্ট দিয়েছে, তাছাড়া আর কোন কষ্ট নেই। এ আমার মা তার পুত্রসহ এখানে হাযির। আপনি পরম শুভানুধ্যায়ী। তাঁকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিন এবং দোয়া করুন যেন, আল্লাহ তাঁকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেন। তারপর হুযুর (স) তাঁর জন্য দোয়া করেন, তাঁকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন এবং তিনি মুসলমান হয়ে যান। এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন হাফেজ ইবনে কাসীর আল্ বেদায়া ওয়ান্নেহায়াতে, হাফেজ আবুল হাসান খায়সামা বিন সুলায়মান আল আত্বা, বুলসীর কেতাব 'ফাযায়েলুস্ সাহাবা' থেকে বিশদভাবে উদ্ধৃত করেছেন। আর হাফেজ ইবনে হাজার এসাবাতে উম্মুল খায়েরের অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।(২২)

হযরত আবদুল্লাহ বিন্ মাস্উদকে নির্মমভাবে প্রহার করা হয়

ইবনে ইসহাক হযরত ওরওয়াহ বিন যুবাইর থেকে এ ঘটনা উদ্ধৃত করে বলেন যে, একদিন সাহাবায়ে কেরাম (রা) পরস্পর বলাবলি করছিলেন যে, কুরাইশগণ আমাদের মধ্যে কাউকেও প্রকাশ্যে উচ্চ শব্দে কুরআন পড়তে শুনেনি। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, একবার তাদেরকে এ কালামপাক শুনিয়ে দেবে?

হযরত আবদুল্লাহ বিন্ মাসউদ (রা) বলেন, এ কাজ আমি করব। সাহাবায়ে কেরাম বল্লেন, আমাদের ভয় হয় তারা তোমার উপর বাড়াবাড়ি করবে। আমাদের মতে এমন এক ব্যক্তির এ কাজ করা উচিত যার বংশ পরিবার খুব শক্তিশালী। কারণ কুরাইশগণ যদি তার উপর কোন অন্যায় হস্তক্ষেপ করে তাহলে তার পরিবারের লোকজন তার সমর্থনে এগিয়ে আসবে।

হযরত আবদুল্লাহ বলেন, এ কাজ আমাকে করতে দাও। খোদা আমার রক্ষক।

তারপর তিনি একটু বেলা হওয়ার পর হেরেমে পৌছেন যখন কুরাইশ সর্দারগণ তাদের নিজ নিজ স্থানে বৈঠকে বসা ছিল। হযরত আবদুল্লাহ মকামে ইব্রাহীমে পৌছে উচ্চস্বরে সূরায়ে আর-রহমান তেলাওয়াত শুরু করেন। কুরাইশের লোকেরা প্রথমে বুঝবার চেষ্টা করে যে আবদুল্লাহ কি পড়ছেন। কিন্তু যখন বুঝতে পারলো যে, এ সেই কালাম যা মুহাম্মদ (স) খোদার কালাম হিসাবে পেশ করেন। তখন তারা তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখে চড়-থাপ্পড় মারতে থাকে। কিন্তু আবদুল্লাহ কোন পরোয়া না করে অটল থাকেন। যতোই তারা মারতে থাকে ততোই তিনি পড়তে থাকেন। যতোক্ষণ তাঁর সাধ্য ছিল কুরআন শুনাতে থাকেন। অবশেষে যখন তিনি তাঁর ক্ষত-বিক্ষত মুখ নিয়ে ফিরে আসেন, তখন তাঁর সাথীরা বল্লো, আমরা তো এ ভয় করেছিলাম। তিনি বল্লেন, আজকের দিনের চেয়ে আর

কোনদিন এ খোদার দুশমনেরা আমার জন্য দুর্বল ছিলনা। যদি বল তো আগামীকাল আবার তাদেরকে কুরআন শুনিয়ে দিই। সকলে বলেন, ব্যস্ যথেষ্ট হয়েছে। যা তারা শুনতে চাচ্ছিল না, তা তুমি শুনিয়ে দিয়েছ (ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা)।(২৩)

অসহায় দাস-দাসীদের উপর জুলুম নির্যাতন

সবচেয়ে বেদনাদায়ক নির্যাতন নিষ্পেষণ ওসব দাসদাসীদের প্রতি করা হয়, যারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং মক্কায় যাদের কোন পৃষ্ঠপোষক ছিলনা। তাদের কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ ঃ

হযরত বেলাল

তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত বেলাল বিন রাবাহ্। তিনি বনী জুমাহ্র জনৈক ব্যক্তির গোলাম ছিলেন এবং গোলামীর অবস্থায় তার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাবশী বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে উমাইয়া বিন খালাফ জুমাহী তাঁকে নানানভাবে নির্যাতন করে। ইবনে হিশাম ও বালাযুরী বলেন, সে দুপুরের প্রচন্ড রোদের মধ্যে তাঁকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে মক্কার উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর শায়িত করে বুকের উপর ভারী পাথর চাপা দিয়ে রাখতো। তারপর বলতো, খোদার কসম, তুমি এ অবস্থায় পড়ে থাকবে যতোক্ষণ না মুহাম্মদকে (স) অস্বীকার করে লাত্ ও ওয্যার এবাদত করেছ। কিন্তু তিনি (বেলাল) জবাবে শুধুমাত্র 'আহাদ' 'আহাদ' ই বলতে থাকেন।

বালাযুরী হযরত আমর বিন আল আসের বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, "আমি বেলালকে (রা) এমন উত্তপ্ত মাটির উপর পড়ে থাকতে দেখেছি যার উপর গোশত রেখে দিলে তা পাক করা হয়ে যেতো। কিন্তু এ অবস্থাতেও তিনি স্পষ্ট করে বলতেন, আমি লাত্ ও ওয্যাকে অস্বীকার করি।

হযরত হাস্সান বিন সাবেত তাঁর চোখে দেখা অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, আমি (হাস্সান বিন সাবেত) হজ্ব অথবা ওমরার জন্য মক্কায় গিয়ে দেখতে পেলাম, বেলালকে একটি দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে এবং ছেলে ছোকরার দল তাঁকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চলেছে। কিন্তু তিনি এ কথা বলতে থাকেন, আমি লাত, ওয্যা, হুবাল, ইসাফ, নায়েলা এবং বুয়ানা- সকলকে অস্বীকার করছি। স্বয়ং হযরত বেলালের (রা) বর্ণনা বালাযুরী এভাবে উদ্ধৃত করেছেন, আমাকে একদিন ও একরাত পিপাসার্ত রাখা হয়, তারপর উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর নিক্ষেপ করা হয়।

ইবনে সা'দ বলেন, গলায় রশি বেঁধে তাঁকে বালকদের হাতে ছেড়ে দেয়া হতো। তারা তাঁকে মক্কায় উপত্যকাগুলোতে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে বেড়াতো। তারপর উত্তপ্ত বালুর উপর উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে পাথর চাপা দিত। কিন্তু তিনি শুধু 'আহাদ' 'আহাদ' বলতেন। হযরত আবু বকরের (রা) বাড়ি বনী জুমাহের মহল্লাতেই ছিল। তিনি এ জুলুম অত্যাচার দেখে অধীর হয়ে পড়েন। তিনি স্বাস্থ্যবান একজন হাবশী গোলামের বিনিময়ে হযরত বেলালকে খরিদ করে আযাদ করে দেন।

হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা)

ইবনে সা'দ বলেন, ইয়াসির ছিলেন ইয়েমেনের অধিবাসী। সেখান থেকে মক্কা আসেন এবং আবু হুযায়ফা বিন মুগিরা মাখযুমীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। আবু

হুযায়ফা তাঁর দাসী সুমাইয়ার সাথে তাঁর বিয়ে করিয়ে দেন। ইসলাম আগমনের পর ইয়াসির, সুমাইয়া,আম্মার ও তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ সবাই মুসলমান হয়ে যান। এর ফলে গোটা পরিবারকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। বালাযুরী উম্মেহানী থেকে এবং তাবারানী হযরত ওসমান (রা) থেকে এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (স) সে স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে তাঁদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। তিনি বড়ো দুঃখ পেলেন এবং বল্লেন,

صبرًا آل ياسر فان موعدكم الجنة

- হে আলে ইয়াসির, সবর কর। তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের ওয়াদা।

ইমাম আহমদ ও ইবনে সা'দ হযরত ওসমানের (রা) বরাত দিয়ে বলেন, একবার তিনি হুযুর (স) এর সাথে ঐ স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে এ পরিবারকে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। হুযুর (স) বল্লেন, সবর কর। হে খোদা! আলে ইয়াসিরকে মাগফেরাত দান কর। আর তুমিতো তাদের মাগফেরাত করেই দিয়েছ।

ইবনে সা'দ মুহাম্মদ বিন কা'য়াব কুরাযীর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আম্মারকে তাঁর জামা খোলা অবস্থায় দেখলো যে, সারা পিঠে শুধু আগুনে পুড়ে যাওয়ার দাগ। জিজ্ঞেস করলো, এসব কি? তিনি বল্লেন, এ সব সেই শাস্তির চিহ্ন যা মক্কার উত্তপ্ত যমীনের উপর আমাকে দেয়া হয়েছিল।

আমর বিন মাইমুন এর বরাত দিয়ে ইবনে সা'দ বলেন, মুশরিকদের পক্ষ থেকে হযরত আম্মারকে জ্বলন্ত অংগারের দাগ দেয়া হয় এবং হুযুর (স) বলেন, হে আগুন, তুমি আম্মারের প্রতি সেরূপ শীতল হয়ে যাও, যেমন হযরত ইব্রাহীমের (আ) প্রতি হয়েছিলে। তাঁর পিতা ইয়াসির অমানুষিক শাস্তি সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করেন। তারপর আবু জাহল তাঁর মা সুমাইয়াকে হত্যা করে। তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্কে নিহত করা হয়। শুধু হযরত আম্মার রয়ে যান। তাঁকে পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হতো। তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল এবং তিনি নবীকে অস্বীকার ও তাদের দেবদেবীর প্রশংসা করে জীবন রক্ষা করেন। তারপর ক্রন্দনরত অবস্থায় নবীর দরবারে হাযির হয়ে সকল কথা বল্লেন। তিনি বল্লেন, তোমার মনের অবস্থা কি ছিল? তিনি বলেন, একেবারে ঈমানের উপর নিশ্চিত আছি। নবী (স) বল্লেন, ভবিষ্যতে এমন অবস্থার শিকার হলে, এসব কথাই বলবে। বায়হাকী, ইবনে সা'দ, ইবনে জারীর, বালাযুরী, আওফী প্রমুখ মনীষীগণ এ ঘটনা বিবৃত করে বিভিন্ন তাফসীরকারগণের এ উক্তি উদ্ধৃত করেন যে, সূরা নহলের ১০৪ আয়াত এ ব্যাপারেই নাযিল হয় যাতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফর করলো, কিন্তু এ কাজে তাকে বাধ্য করা হয়েছিল অথচ মন তাঁর ঈমানের উপর নিশ্চিন্ত ছিল, তাহলে তাকে মাফ করা হবে। কিন্তু যে সন্তুষ্ট চিত্তে কুফর অবলম্বন করবে তার উপর খোদর গজব এবং তার জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে।

হযরত খাব্বাব বিন আল আরাত

তিনি ছিলেন মূলতঃ ইরাকী। রাবিয়া গোত্রের একটি দল তাঁকে ধরে গোলাম বানায় এবং মক্কায় এনে বনী খুযায়ার একটি পরিবার 'আলে-সাবা'-এর নিকট বিক্রি করে দেয় এবং তারা ছিল বনী যুহরার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তিতে আবদ্ধ। তিনি ছিলেন একজন কারিগর শিল্পী। তিনি কর্মকারের পেশা অবলম্বন করতেন এবং তরবারী নির্মাণ করতেন। মুসলমান হওয়ার অপরাধে প্রথমে তাকে আর্থিক দিক দিয়ে পথে বসানো হলো। মুসনাদে আহমদ,

বুখারী ও মুসলিমে স্বয়ং তাঁর বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি বলেন, আস বিন ওয়ায়েল সাহ্মীর নিকট থেকে আমার কিছু পাওনা ছিল। তা আদায় করার জন্য তার কাছে গেলে সে বলতো, তোমাকে কিছুই দেবনা যদি না তুমি মুহাম্মদকে (স) অস্বীকার কর। তাকে এ জবাব দিতাম, আমি কখনোই তাঁকে অস্বীকার করবনা, যদি তুমি মরে আবার জীবিত হও- তবুও না। ইবনে সা'দ বলেন, এর জবাবে আস বলতো, ঠিক আছে, আমি মরার পর যখন পুনরায় আমার মাল ও আওলাদের নিকট ফিরে আসব, তখন তোমার ঋণ শোধ করব।

ইবনে হিশাম ঘটনাটি এভাবে বয়ান করেছেন যে, আস তাঁর কাছে অনেক তলোয়ার বানিয়ে নেয় এবং ঋণ বাড়তে থাকে। তিনি যখন কর্জ পরিশোধের জন্য তাকীদ করেন তখন সে বলে, তোমার এ সাহেব মুহাম্মদ (স) যার দ্বীন তুমি গ্রহণ করেছ, বলেন যে, জান্নাতে বহু সোনা-চাঁদি, কাপড় ও খেদমতগার আছে।

খাব্বাব বলেন, হ্যাঁ। সত্য কথা। সে বলে, তাহলে আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দাও। সেখানে আমি কর্জ পরিশোধ করব। কারণ সেখানে তুমি ও তোমার সাহেব মুহাম্মদ (স) আমার চেয়ে বেশী প্রিয়পাত্র হবেনা।

এভাবে আর্থিক দিক দিয়ে পংগু করেও যখন জালেমদের তৃপ্তি হলোনা, তখন তারা তাঁকে কঠিন শাস্তি দেয়া শুরু করলো। ইবনে সা'দ ও বালাযুরী শা'বীর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন- একবার হযরত উমরের (রা) খেলাফতকালে তিনি (খাব্বাব) তার পিঠ খুলে দেখালেন যা একেবারে শ্বেতকুষ্ঠ ব্যাধির মতো দেখাচ্ছিল। তিনি বল্লেন, মুশরিকরা আগুন জ্বালিয়ে তার উপর দিয়ে আমাকে ছিঁচড়ে নিয়ে যেতো, একজন আমার বুকের উপর দাঁড়াতো। তারপর আমার চর্বি গলে গিয়ে আগুন নিভে যেতো।(২৪)

হুযুরের (স) নিকটে হযরত খাব্বাবের ফরিয়াদ এবং তাঁর জবাব

এ ধরনের নির্যাতন চলাকালেই সে ঘটনা যা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, বুখারী, আবু দাউদ এবং নাসায়ী স্বয়ং হযরত খাব্বাব থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, যে সময়ে মুশরিকদের অত্যাচার নির্যাতনে আমরা অতীষ্ট হয়ে পড়েছিলাম, সে সময়ে একদিন আমি দেখি যে, নবী (স) কাবার দেয়ালের ছায়ায় বসে আছেন। আমি নিকটে গিয়ে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রসূল! জুলুমতো এখন চরমে পৌঁছেছে। আপনি কি আমাদের জন্যে দোয়া করছেননা?

একথা শুনার পর নবী (স) এর মুখমন্ডল লালবর্ণ ধারণ করে এবং তিনি বলেন, তোমাদের পূর্বে যে সকল আহলে ঈমান অতীত হয়েছেন, তাঁদের উপর এর চেয়ে অধিক নির্যাতন করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কাউকে গর্ত খনন করে তাতে বসানো হতো এবং করাত দিয়ে মাথা থেকে দ্বিখন্ডিত করা হতো। কারো জোড়ায় জোড়ায় লোহার চিরুণী বিদ্ধ করে দেয়া হতো, যাতে ঈমান পরিহার করে। তথাপি তাঁরা দ্বীন থেকে ফিরে যেতেননা। বিশ্বাস কর, আল্লাহ এ কাজ সমাধা করেই ছাড়বেন। অবশেষে এমন একদিন আসবে যখন এক ব্যক্তি সান্‌আ থেকে হাদারামাওত পর্যন্ত দ্বিধাহীনচিত্তে সফর করবে এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ভয় তার থাকবেনা। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছ। (২৫)

হযরত আবু বকর (রা) কর্তৃক মজলুম গোলামদের খরিদ করে আযাদ করা

এ অত্যাচার নির্যাতনের সময়ে হযরত আবু বকর (রা) প্রভূত অর্থ ব্যয় করে বহু সংখ্যক মজলুম গোলাম ও বাঁদী খরিদ করে, আযাদ করে দেন। ইবনে হিশাম এমন সাত জনের নাম করেছেন। কিন্তু বায়হাকী, ইবনে ইসহাক, ইবনে আবদুল বারর এবং ইবনে হাজার প্রমুখ ব্যক্তিগণ যে নাম গণনা করেছে, তাতে মোট সংখ্যা হয় নয়।

১. হযরত বেলাল (পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)।

২. তাঁর মাতা- হামামা। ইবনে আবদুল বারর বলেন, তাঁকেও রাহে খোদায় শাস্তি দেয়া হতো।

৩. আমের বিন ফুহায়রা। ইবনে সা'দ, তাবারী ও বালাযুরী বলেন, ইনি হযরত আয়েশার (রা) আপন ভাই তুফাইল বিন আল হারেসের গোলাম ছিলেন এবং সে সব মজলুমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁদেরকে শাস্তি দেয়া হতো।

৪. আবু ফুকায়হা তাঁর সম্পর্কে ইবনে ইসহাক বলেন, উমাইয়া বিন খালাফ তাঁকে কঠোর শাস্তি দিত। তাবাকাতে ইবনে সা'দ এবং উস্‌দুল গাবাতে আছে যে, বনী আবদুদ্দারের কিছু লোক যাদের গোলামী তিনি করতেন, দুপুরের প্রচন্ড গরমে তাঁকে ঘর থেকে বের করতো, লোহার বেড়ী পরিধান করিয়ে উত্তপ্ত মাটির উপর উপুড় করে শুইয়ে রাখতো। পিঠের উপরে ভারী পাথরও রেখে দেয়া হতো। অবশেষে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন।

৫. লুবায়না অথবা লুবায়বা। বালাযুরী তাঁর নাম উলেখ করেছেন এবং ইবনে হিশাম নাম উল্লেখ না করে বনী মুয়াম্মাল-এর (বনী আদীর একটি শাখা) দাসী বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা) তাঁর কুফরী অবস্থায় তাঁকে খুব মারতেন এবং মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে বলতেন, আমি শুধু ক্লান্ত হওয়ার জন্যে তোমাকে ছেড়ে দিলাম। তিনি জবাবে বলতেন, আল্লাহ্ তোমার সাথে এরূপ আচরণ করুন।

৬ ও ৭. নাহ্‌দিয়্যা ও তাঁর কন্যা। উভয়ে বনী আবদুদ্দারের জনৈক মহিলার দাসী ছিলেন। তাঁদের কর্তাও তাঁদের উপর জুলুম করত।

৮. যিন্নিরা (ইস্তিয়াবে তাঁর নাম বলা হয়েছে যাম্বারা)। ইবনে আসীরের একটি বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি বনী আদীর দাসী ছিলেন এবং ওমর বিন খাত্তাব (রা) তাঁকে শাস্তি দিতেন। দ্বিতীয় এক বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি বনী মাখ্‌যুমের দাসী ছিলেন এবং আবু জাহল তাঁকে শাস্তি দিত। অবশেষে তাঁর দৃষ্টি শক্তি রহিত হয়ে যায়। আবু জাহল বলে, লাত এবং ওয্যা তোমাকে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, লাত ও ওয্যা জানেই না যে কে তার পূজা করছে। এ ফয়সালাতো আসমান থেকে হয় এবং আমার রবের এ ক্ষমতা আছে যে তিনি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারেন। সত্যি সত্যিই পরদিন যখন তিনি ঘুম থেকে উঠলেন তখন দেখা গেল আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। বালাযুরী এ বর্ণনাই লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইবনে হিশাম পক্ষান্তরে বলেছেন যে, হযরত আবু বকর (রা) যখন তাঁকে খরিদ করে আযাদ করে দেন, তখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেতে থাকে। এতে কুরাইশের লোকেরা বলতে থাকে যে, লাত ও ওয্যা তাকে অন্ধ করে দিয়েছে। তিনি বল্লেন, বায়তুল্লাহ কসম, এরা মিথ্যা বলছে। ওয্যা না কারো কোন উপকার করতে পারে, না ক্ষতি করতে পারে। তারপর আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন।

৯. উম্মে উবাইস্। কেউ উনায়েস এবং কেউ উমায়েস বলেছেন। বালাযুরী বলেন, ইনি

বনী যোহ্‌রার দাসী ছিলেন। আস্‌ওয়াদ বিন আব্‌দে ইয়াগুখ তাঁর উপর অত্যাচার করতো।(২৬)

হযরত আবু বকরের (রা) পিতার আপত্তি ও তাঁর জবাব

ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর এবং ইবনে আসাকের হযরত আমের বিন আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা) এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন যে, হযরত আবু বকরকে (রা) এভাবে হতভাগ্য দাসদাসীদের মুক্ত করতে গিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে দেখে তাঁর পিতা আবু কুহাফা (তখনও তিনি মুশরিক ছিলেন) তাঁকে বলেন, বৎস, আমি দেখছি তুমি দুর্বল লোকদেরকে আযাদ করে দিচ্ছ। তুমি যদি শক্তিশালী যুবকদের আযাদীর জন্য এ অর্থ ব্যয় করতে, তাহলে তারা তোমার শক্তিশালী দক্ষিণ হস্ত হতো। হযরত আবু বকর (রা) জবাবে বলেন, আব্বাজান, আমি তো সেই প্রতিদান চাই, যা রয়েছে আল্লাহর নিকটে।

এ ঘটনাটি সূরায়ে 'লায়ল' এর সে আয়াতগুলো সুন্দর স্বাক্ষর বহন করে, যাতে বলা হয়েছে, আর জাহান্নামের সে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে সেই অত্যন্ত খোদাভীরু লোককে, যে পবিত্রতা অর্জনের জন্য তার ধনসম্পদ ব্যয় করে। তার উপর কারো কোন অনুগ্রহ নেই যার বদলা তাকে দিতে হবে। সে তো নিছক তার মহান খোদার সন্তোষলাভের জন্য এ কাজ করে (আয়াত ১৭-২০)।

অর্থাৎ তিনি তাঁর ধনসম্পদ যাদের জন্য ব্যয় করেন, তাঁর উপর তাদের কোন অনুগ্রহ পূর্ব থেকেও ছিল না এবং না ভবিষ্যতে তাদের নিকট থেকে অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য তাদেরকে কোন হাদিয়া তোহ্‌ফা দিচ্ছেন। বরঞ্চ তিনি তাঁর মহান খোদার সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য এমন সব লোকের সাহায্য করছেন যাদের তাঁর উপরে পূর্বে কোন অনুগ্রহ ছিলনা, আর না ভবিষ্যতে তাদের অনুগ্রহের কোন আশা তিনি করেন।(২৭)

অত্যাচার উৎপীড়নের পরিণাম

কুরাইশগণ মুসলমানদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন চালিয়ে প্রকাশ্যতঃ এ সুবিধা লাভ করতে চাচ্ছিল যে, মুসলমানদের উপর বিভীষিকা সৃষ্টি করে ইসলামের প্রচার ও প্রসার বন্ধ করে দেবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার যে পরিণাম হলো তা ছিল তাদের চিন্তার অতীত। প্রথমতঃ এর থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ইসলাম যে চরিত্র ও যুক্তি প্রমাণ নিয়ে এসেছে, তার কোন জবাব মানবতা বিরোধী কূটকৌশল ব্যতীত কুফরের কাছে ছিলনা। দ্বিতীয়তঃ এ নিষ্ঠুরতা দেখার পর প্রত্যেক সৎ প্রকৃতির লোক কুফর ও তার পতাকাবাহীদেরকে ঘৃণার চোখে দেখতে লাগলো এবং যে সবর ও অবিচলতার সাথে মুসলমানগণ এ অন্যায় জুলুম বরদাশত করে তার ফলে সকল নিরপেক্ষ মনে তাদের জন্য সহানুভূতির সৃষ্টি হয় এবং সেই সাথে সম্মান শ্রদ্ধাও। বরঞ্চ প্রকৃত পক্ষে তা ইসলামের মর্যাদা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যে, মক্কার সমাজ থেকেই এমন পাকাপোক্ত, দৃঢ়সংকল্প এবং ঈমানী শক্তিতে শক্তিমান লোক পাওয়া যায়, যাঁরা কোন পার্থিব স্বার্থের জন্যে নয়, শুধু সত্যের জন্যে বিরাট বিরাট বিপদ মুসিবত সহ্য করেন। তারপর কাফেরদের এসব অপকৌশল ইসলামের প্রচার-প্রসার রুখতে পারেনি। এসব অত্যাচার সত্ত্বেও এমন সব আল্লাহর বান্দাহ আন্দোলনের জন্যে বেরিয়ে আসেন, যাঁরা কাফেরদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং অনেকে মনে মনে ঈমান নিয়ে আসেন কিন্তু প্রকাশ করেননি। এ

কারণে ইসলামের দুশমনগণ সঠিক ধারণা করতে পারেনি যে, তাদের মধ্যে এ দ্বীন সমর্থনকারী কত লোক আত্মগোপন করে আছে। তাদের এ গোপন সমর্থন কুফরের দূর্গে ফাটল ধরাতে পারে।

এসব জুলুম অত্যাচারে ইসলামের সবচেয়ে যে বড়ো উপকার হয়েছে তা হলো এই যে, এ অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে যাঁরা নবী করিমের (স) সাথে এসেছেন তাঁরা মানব জাতির সর্বোত্তম মানুষ। এ অবস্থায় কোন দুর্বল চরিত্রের লোক এদিকে আসার সাহসই করতে পারেনা।(২৮)

অহী বন্ধের কাল

আল্লাহ্ তায়ালার হিকমতপূর্ণ কাজ এমন এক বিচিত্র ধরনের যে, বিবেক তা উপলব্ধি করতে পারেনা। এমন এক সময় যখন কুফর ও ইসলামের পারস্পরিক সংঘাত-সংঘর্ষ এমন চরমে পৌছেছিল এবং নবী (স) এবং মুসলমানদের জীবনে প্রতিটি মুহূর্ত দুঃসহ হয়ে পড়েছিল, তখন স্বভাবতঃই আশা করা হচ্ছিল যে, নবীর (স) এর উপরে অহী নাযিল হওয়া অব্যাহত থাকবে। এর দ্বারা প্রতিদিনের সংঘটিত নিত্য নতুন পরিস্থিতিতে পথ নির্দেশনা দেয়া হতো। নবী (স) ও তাঁর সংগী সাথীদেরকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দান করা হতো এবং কাফেরদেরকে তাদের জুলুম অত্যাচারের জন্যে শাসিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু এ সময়ে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে অহী নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে গেল।এ জন্যে নবীও (স) ভয়ানকভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং কাফেরদেরও ঠাট্টা বিদ্রুপ করার সুযোগ হলো।

এ অহী নাযিল বন্ধ হওয়ার সময়টা কখন ছিল তা জানা নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে যে সমস্ত বর্ণনা হাদিসে পাওয়া যায়, তার থেকে এবং স্বয়ং ঐ দুটি সূরার বিষয়বস্তু থেকে যা এ অহী বন্ধের সমাপ্তির পর নাযিল হয়, এর থেকে সুস্পষ্ট রূপে জানা যায় যে, এ ঘটনা (অহী নাযিল বন্ধ হওয়া) সাধারণ দাওয়াত শুরু হওয়া এবং ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্ব তীব্র হওয়ার পর সংঘটিত হয়। বিভিন্ন বর্ণনায় এ অহী বন্ধের মুদ্দৎ বিভিন্ন প্রকার বলা হয়েছে। ইবনে জুরাইজ বার দিন, কালবী পনেরো দিন, ইবনে আব্বাস (রা) পঁচিশ দিন, সুদ্দী ও মুকাতিল চল্লিশ দিন এর মুদ্দৎ বর্ণনা করেছেন। যাই হোক, এ সময়কাল এতো দীর্ঘ ছিল যে, নবী (স) এর জন্যে বড়োই দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিলেন। বিরোধীরাও তাঁকে বিদ্রুপ করতে থাকে। কারণ তাঁর উপরে কোন নতুন সূরা নাযিল হলে তা তিনি লোকদেরকে পড়ে শুনাতেন। এ জন্যে যখন বেশ কিছু কাল যাবত তিনি নতুন অহী লোকদেরকে শুনাতে পারলেননা, তখন বিরোধীরা মনে করলো সে উৎস বন্ধ হয়ে গেছে যেখান থেকে এ কালামপাক আসতো। জুন্দুব বিন আবদুল্লাহিল বাজালী বলেন যে, যখন জিব্রিল (আ) এর আগমন বন্ধ হয়ে গেল, তখন মুশরিকগণ বলা শুরু করলো যে, মুহাম্মদকে (স) তাঁর রব পরিত্যাগ করেছেন (ইবনে জারীর, তাবারী, তাবারানী, আবদ বিন হামীদ, সাঈদ বিন মনসুর, ইবনে মারদুইয়া)।

অন্যান্য বর্ণনায় আছে, আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল- হুযুরের (স) চাচী এবং অতিনিকট প্রতিবেশিনী, নবীকে (স) বলে, মনে হচ্ছে তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করেছে!

আওফী ও ইবনে জারীর ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, কয়েকদিন যাবত জিব্রিলের আগমন বন্ধ হওয়াতে নবী (স) পেরেশান হয়ে পড়েন এবং মুশরিকগণ বলতে থাকে, তাঁর রব তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন।

কাতাদাহ্ এবং দাহ্হাকের মুরসাল রেওয়ায়েতে প্রায় একই রকম কথা বলা হয়েছে। এ অবস্থায় হুযুর (স) এর দুঃখ বেদনার অবস্থাও বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে। আর এমনটি হবেই না কেন যখন প্রিয় সত্তার পক্ষ থেকে উদাসীনতা, কুফর ও ঈমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ শুরু হয়ে যাওয়ার পর সেই শক্তির উৎস থেকে বঞ্চনা- যা এমন প্রাণান্তকর সংঘাতের প্রবল স্রোতের মধ্যে তাঁর একমাত্র সহায় ছিল, উপরন্তু দুশমনের হাসিঠাট্টা এসব কিছু একত্র হয়ে নবী (স) এর জন্যে ভয়ানক পেরেশানীর কারণ হয়ে পড়েছিল যার জন্যে তিনি মনে করছিলেন কি জানি কোন ভুলত্রুটি হয়ে যায়নিতো যার জন্যে আমার রব আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং হক ও বাতিলের লড়াইয়ে একাকী ছেড়ে দিয়েছেন।

সূরা 'দোহা' নাযিল হওয়া

এ অবস্থায় সূরা 'দোহা' নাযিল হয় যাতে বলা হয় ঃ

وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجٰى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى -

- উজ্জ্বল দিনের কসম এবং রাতের যখন তা প্রশান্তিসহ ছেয়ে পড়ে, হে নবী। তোমার রব তোমাকে কখনো পরিত্যাগ করেননি। আর না তিনি নারাজ হয়েছেন।

অর্থাৎ যেভাবে দিন উজ্জ্বল হওয়া এবং অন্ধকার ও প্রশান্তিসহ রাতের ছেয়ে যাওয়া এর ভিত্তিতে হয়না যে, আল্লাহ্ তায়ালা দিনের বেলা মানুষের প্রতি সন্তুষ্ট এবং রাতে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। বরঞ্চ এ উভয় অবস্থা এক বিরাট হিকমত ও উপযোগিতার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এর কোন সম্পর্ক এ বিষয়ের সাথে নেই যে, যখন আল্লাহ্ তোমার প্রতি খুশী থাকবেন তখন অহী পাঠাবেন, আর যখন অহী পাঠাবেননা তখন তার অর্থ এই হবে যে, তিনি তোমার উপর অসন্তুষ্ট এবং তার জন্যে তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন। দিনের আলো যদি ক্রমাগতভাবে মানুষের উপর পতিত হতে থাকে তাহ্লে তা মানুষকে শ্রান্ত ক্লান্ত করে দেবে। এ জন্যে যৌক্তিকতার দাবী এই যে, দিনের পর রাত আসুক যাতে মানুষ প্রশান্তি লাভ করতে পারে। এভাবে অহীর আলো যদি তোমার উপর অবিরাম পড়তে থাকে তাহ্লে তোমার শিরা উপশিরা তা বরদাশ্ত করতে পারবেনা। এজন্যে মাঝে মধ্যে অহী বন্ধ রাখার সময়কালও এ যুক্তিসংগত কারণে আল্লাহ্ তায়ালা নির্ধারণ করে রেখেছেন, যাতে করে অহী নাযিলের যে গুরুভার তোমার উপর পড়ে তার প্রতিক্রিয়া তিরোহিত হয় এবং তুমি প্রশান্তি লাভ কর।[১]

তারপর বলা হয়েছে-

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى -

---

১. অহী নাযিলের গুরুভার নবীর (স) কতটা কঠিন ও কষ্টদায়ক হতো তা ওসব বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়- যা এ সম্পর্কে হাদীসমূহে পাওয়া যায়। হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা) বলেন, একবার রসূলুল্লাহ্ (স) এর উপর অহী এমন অবস্থায় নাযিল হয়- যখন তিনি আমার হাঁটুর উপর তাঁর হাঁটু রেখে বসেছিলেন। তখন আমার হাঁটুর উপর এমন কঠিন চাপ পড়লো যে মনে হলো যে, হাঁটু চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে।
হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তীব্র শীতের মধ্যে নবীর উপর অহী নাযিল হতে দেখেছি। তখন তাঁর কপাল দিয়ে টপ্ টপ্ করে ঘাম পড়তো- (বোখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা ইমাম মালেক, তিরমিযি, নাসায়ী)। হযরত আয়েশা (রা) আরও বলেন, যখন তাঁর উপর এমন অবস্থায় অহী নাযিল হতো যে তিনি উটনীর উপর বসে আছেন, তখন উটনী তার বুক যমীনের উপর ঠেস দিয়ে রাখতো এবং ততোক্ষণ পর্যন্ত নড়াচড়া করতোনা যতোক্ষণ না অহী নাযিল হওয়া শেষ হতো (মুসনাদে ইমাম আহমদ, হাকেম, ইবনে জারীর)।(২৯)

- এবং নিশ্চিত রূপে তোমার জন্যে পরবর্তী যুগ প্রথম যুগ থেকে শ্রেয়।

এ সুসংবাদ নবী (স) কে এমন সময়ে আল্লাহ্ তায়ালা দিয়েছিলেন- যখন মুষ্টিমেয় লোক তাঁর সাথে ছিলেন। ইসলামের প্রদীপ মক্কাতেই মিট মিট করে জ্বলছিল। তা নিভানোর জন্যে চারদিকে তুফান উঠছিল। সমগ্র জাতি বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর ছিল এবং প্রকাশ্যতঃ মুসলমানদের সাফল্যের কোন লক্ষণ দূর-দূরান্ত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিলনা। সে সময়ে আল্লাহ্ তায়ালা নবী (স) কে বলেন, প্রাথমিক যুগের দুঃখ কষ্ট ও মুসিবতে উদ্বিগ্ন হবেননা। প্রতিটি পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তীযুগ থেকে উৎকৃষ্ট প্রমাণিত হবে। আপনার শক্তি, সম্মান, প্রতিপত্তি, ও পদমর্যাদা বাড়তে থাকবে এবং আপনার প্রভাবও বেড়ে চলবে। আর এ ওয়াদা দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরঞ্চ আখেরাতও আপনার জন্যে দুনিয়া থেকে উৎকৃষ্টতর হবে।

তারপর বলা হয়-

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

আর শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এতোটা দেবেন যে তুমি খুশী হয়ে যাবে। (আয়াত নং ৫)

অর্থাৎ যদিও দিতে কিছু বিলম্ব হবে, কিন্তু সে সময় দূরে নয় যখন তোমার উপর তোমার রবের দান এমনভাবে বর্ষিত হবে যে তুমি খুশী হয়ে যাবে। এ ওয়াদা নবী পাকের (স) জীবদ্দশাতেই এমনভাবে পূরণ করা হয় যে, গোটা আরব দেশ- দক্ষিণের সমুদ্র তটভূমি থেকে শুরু করে উত্তরে রোম সাম্রাজ্যের শাম এবং পারস্য সাম্রাজ্যের ইরাক সীমান্ত পর্যন্ত এবং পূর্বে পারস্য উপসাগর থেকে পশ্চিমে লোহিত সাগর পর্যন্ত সমগ্র এলাকা তাঁর পদানত হয়ে পড়ে। আরবের ইতিহাসে প্রথম বার এ ভূখন্ড এক আইন শৃংখলার অধীন হয়ে পড়ে। যে শক্তিই তার সাথে টক্কর দিতে এসেছে সেই চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছে। সমগ্র ভূখন্ডে কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ গুঞ্জরিত হয়। এখানকার মুশরিক ও আহলে কিতাব তাদের মিথ্যা কালেমা বুলন্দ রাখার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেও ব্যর্থ হয়। আনুগত্যে তাদের মস্তকই শুধু অবনত হয়নি মনও বশীভূত হয়েছে। বিশ্বাস ও আমল-আখলাকে এক বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়। গোটা মানব জাতির ইতিহাসে এর কোন দৃষ্টান্ত মেলেনা যে, জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত একটি জাতি মাত্র তেইশ বছরে এতোটা পরিবর্তিত হয়েছে। তারপর নবী পাকের (স) প্রতিষ্ঠিত আন্দোলন এতোটা শক্তিশালী হয় যে, এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের বিরাট অংশে তা বিস্তার লাভ করে এবং দুনিয়ার নিভৃত গ্রামগঞ্জ ও পথে প্রান্তরে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এ কিছুতো আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রসূলকে দুনিয়ায় দিয়েছেন। আখেরাতে যা কিছু দেবেন তার মহত্ত্বের ধারণাও করা যেতে পারেনা।

সূরা 'আলাম নাশ্‌রাহ্‌'- অবতরণ

এর অল্পকাল পরে ইসলামী আন্দোলনের সূচনায় যেসব অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল এবং যার জন্য নবী (স) অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছিলেন। তখন তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য 'আলাম নাশ্‌রাহ্‌' সূরা নাযিল হয়। এর সংশ্লিষ্ট অংশগুলো এখানে ব্যাখ্যাসহ উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ -

- হে নবী! আমি কি তোমার বক্ষ তোমার জন্য উন্মুক্ত করে দিইনি? (আয়াত নং ১)

এ প্রশ্নের মাধ্যমে বক্তব্যের সূচনা এবং পরবর্তী বিষয়বস্তু স্বয়ং একথা সুস্পষ্ট করে

দিচ্ছে যে, রসূলুল্লাহ (স) সে সময়ে ঐ সব অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে ভয়ানক বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন যা প্রকাশ্যে ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করার পর প্রাথমিক যুগে তিনি যেসব বাধাবিপত্তি ও অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। এ অবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে সম্বোধন করে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন, হে নবী! আমি কি তোমাকে এই এই অনুগ্রহ দান করিনি? তাহলে এ প্রাথমিক পর্যায়ের এ সব অসুবিধার জন্য বিব্রত হচ্ছ কেন?

বক্ষ উন্মুক্ত করা শব্দ কুরআন মজিদে যেসব ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য করলে জানতে পারা যায় যে, এর দুটি অর্থ রয়েছে।

১. সূরা আন্‌য়ামের ১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ

-অতএব যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তায়ালা হেদায়াত দান করবেন, তার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। সূরায়ে যুমারের ২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ

- তাহলে যার বক্ষ আল্লাহ্ ইসলামের জন্য খুলে দিয়েছেন, সেতো তার রবের পক্ষ থেকে এক আলোকের উপর চলছে।

এ দুটি স্থানে 'বক্ষ উন্মুক্ত করণ'-এর অর্থ হরেক রকমের উদ্বেগ ও দ্বিধা দ্বন্দ্ব মুক্ত হয়ে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যে ইসলামের পথই সত্য, সেই আকীদাহ বিশ্বাস, চারিত্রিক মূলনীতি, সভ্যতা সংস্কৃতি সেই নির্দেশাবলী ও হেদায়াত বিলকুল সত্য ও সঠিক যা ইসলাম মানুষকে দিয়েছে।

২. সূরা শুয়ারা- ১২ এবং ১৩ নং আয়াতে উল্লেখ আছে যে, হযরত মূসাকে (আ) যখন আল্লাহ্ তায়ালা নবুওতের পদমর্যাদায় ভূষিত করে ফেরাউন ও তার বিরাট রাষ্ট্রশক্তির মুকাবিলা করার নির্দেশ দেন, তখন তিনি আরজ করলেন-

رَبِّ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ

- হে আমার রব! আমার ভয় হচ্ছে যে তারা আমাকে মিথ্যা মনে করে প্রত্যাখ্যান করবে। (ভয়ে ও নৈরাশ্যে) আমার বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে আসছে।

সূরা তাহা ২২-২৫ নং আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে- সে সময় হযরত মূসা (আ) আল্লাহর নিকটে দোয়া করেন-

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْۤ اَمْرِيْ -

- আমার রব। আমার বক্ষ আমার জন্য উন্মুক্ত করে দাও এবং আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও।

এখানে বক্ষের সংকীর্ণতার অর্থ এই যে, নবুওতের মতো কঠিন কাজের গুরুভার বহন করার এবং একাকী এক বিরাট কুফরী শক্তির সাথে টক্কর দেয়ার সাহস না হওয়া। পক্ষান্তরে বক্ষ উন্মোচন এর অর্থ মানুষের সাহস ও উৎসাহ্ উদ্যম বেড়ে যাওয়া। কোন প্রাণান্তকর অভিযান পরিচালনার জন্য এবং ভয়ানক কঠিন কাজ করার ব্যাপারে বিমুখ না হওয়া। যার ফলে নবুওতের বিরাট দায়িত্ব পালনে সাহসের সঞ্চার হয়।

চিন্তা করলে অনুভব কর যায় যে, এ আয়াতে (আলাম নাশরাহ্) রসূলুল্লাহ (স) এবং বক্ষ উন্মুক্ত করার মধ্যে উপরের দুটি অর্থই নিহিত রয়েছে। প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে তার মর্ম এ হবে যে, নবুওত পূর্ব কালে রসূলুল্লাহ (স) আরবের মুশরিক, নাসারা, ইহুদী, অগ্নিপূজক- সকলের ধর্মকে ভ্রান্ত মনে করতেন। উপরন্তু সেই আল্লাহমুখীতার প্রতিও সন্তুষ্ট

ছিলেননা যা আরবের কতিপয় তাওহীদপন্থীদের মধ্যে পাওয়া যেতো। কারণ এ ছিল একটা দ্ব্যর্থবোধক আকীদাহ-বিশ্বাস! যার মধ্যে সঠিক পথের কোন বিবরণ পাওয়া যেতোনা (তাফহীমুল কুরআনে- সূরা হা মীম সাজদার ৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু যেহেতু সঠিক পথের সন্ধান তাঁরও (নবীর) জানা ছিলনা, সে জন্য তিনি কঠিন দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। নবুওত দান করে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করেন এবং সত্য সঠিক পথ তাঁর কাছে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেন, যার ফলে তিনি নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হন।

দ্বিতীয় অর্থ ধরা হলে তার মর্ম এ হবে যে, নবুওত দান করার পর আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে উৎসাহ উদ্যম, সাহস, দৃঢ় সংকল্প এবং মনের সে প্রশস্ততা দান করেন যা এ পদের গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন ছিল। তিনি যে ব্যাপক ও বিশাল জ্ঞানের অধিকারী হন যা কোন মানুষ তা ধারণ করতে পারেনা। তিনি সে হিকমত ও বিজ্ঞতা লাভ করেন- যা চরম অবনতি দূর করতঃ তা সুবিন্যস্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত করার যোগ্যতা রাখতো। তিনি এমন যোগ্যতা লাভ করেন যে, জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত ও অজ্ঞতার দিক দিয়ে অসভ্য ও বর্বর সমাজে উপায় উপকরণহীন অবস্থায় এবং প্রকাশ্যতঃ কোন পৃষ্ঠপোষক শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে ইসলামের পতাকাবাহী রূপে দন্ডায়মান হন। বিরোধিতা ও শত্রুতার ঝড়-ঝঞ্ঝার মুকাবিলা করতে হতভম্ব হয়ে যাননি। এ পথে যেসব দুঃখ কষ্ট ও মুসিবতের সম্মুখীন হন তা সহনশীলতার সাথে বরদাশত করেন। কোন শক্তিই তাঁকে তাঁর আপন অবস্থান থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। অতএব আল্লাহ্ তায়ালার ইরশাদের অর্থ এই যে, হে নবী! শরহে সদরের (বক্ষ উন্মোচনের) অফুরন্ত সম্পদ যখন আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে দান করেছেন- তখন তুমি ওসব অসুবিধার জন্য মনঃক্ষুণ্ণ হচ্ছ কেন যেসব কাজের সূচনা কালের এ পর্যায়ে দেখা দিচ্ছে।[১]

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ -

- এবং তোমারই জন্য তোমার উল্লেখ ধ্বনী বুলন্দ করে দিয়েছি। এ কথা সে সময়ে বলা হয়েছিল, যখন কুরাইশের সকল ইসলাম দুশমন নবী (স) এর অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছিল। বিশেষ করে হজ্বের সময়ে অলীদ বিন মুগীরার প্রস্তাবিত স্কীম অনুযায়ী হাজীদের এক একটি শিবিরে গিয়ে নবী সম্পর্কে এমন সব কথা প্রচার করা হতো যার ফলে মানুষ তাঁর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করে তাঁর থেকে দূরে পলায়ন করতো। তাহলে এ অবস্থায় নবীর স্মরণ সমুন্নত করার সুসংবাদ কি করে হতে পারে?

সর্ব প্রথমে তাঁর স্মরণ সমুন্নত করার কাজ আল্লাহ্ স্বয়ং দুশমনদের দ্বারাই নিয়েছেন। মক্কায় কাফেরগণ তাঁকে লাঞ্ছিত করার জন্য যেসব পন্থা অবলম্বন করে তার কারণেই তাঁর নাম আরবের সর্বত্র গ্রামেগঞ্জে পৌঁছে যায় এবং মক্কার নিভৃত কোণ থেকে বের হয়ে স্বয়ং শত্রুগণই তাঁকে দেশের সকল গোত্রের নিকটে পরিচিত করে দেয়। আর এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল যে মানুষ জানতে চায় সে ব্যক্তিটি কে। কি বলে? কেমন লোক সে? তার

---

১. কোন কোন তফসীরকার শরহে সদরকে বক্ষবিদীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং এ আয়াতকে বক্ষবিদীর্ণ হওয়ার সে মুজেযার প্রমাণ হিসাবে গণ্য করেছেন যা হাদীসের বর্ণনাগুলোতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এ মুজেযার প্রমাণ হাদীসের বর্ণনার উপর নির্ভর করে। কুরআন থেকে তা প্রমাণের চেষ্টা করা ঠিক নয়। আরবী ভাষার দিক দিয়ে 'শরহে সদর'কে কিছুতেই বক্ষবিদীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা যায়না। আল্লামা আলুসী রুহুল মায়ানীতে বলেন,

حمل الشرح في الآية على شق الصدر ضعيف عند المحققين

গবেষকদের নিকটে এ আয়াতে 'শরহ'কে বিদীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা একটি দুর্বল কথা।

যাদু দ্বারা প্রভাবিত লোকগুলো কেমন? তাদের উপর তার যাদুর কি প্রভাব পড়েছে? মক্কার কাফেরদের এ প্রচার প্রপাগান্ডা যতোই বাড়তে থাকে, লোকের মধ্যে এ অনুসন্ধিৎসাও ততোই বাড়তে থাকে। অতঃপর এ অনুসন্ধিতার ফলে লোক যখন তাঁর (নবীর) চরিত্র ও আচার-আচরণ জানতে পারলো, যখন লোকে কুরআন শুনলো, আর জানতে পারলো, সে শিক্ষা কি যা তিনি পরিবেশন করছেন এবং যখন দর্শকেরা এটা দেখলো যে, যাকে যাদু বলা হচ্ছে তার দ্বারা যারা প্রভাবিত তাদের জীবন আরবের সাধারণ মানুষ অপেক্ষা কত উচ্চ ও পবিত্র হয়ে পড়েছে, তখন সেই কুখ্যাতি সুখ্যাতিতে পরিবর্তিত হতে থাকলো। অবশেষে মদীনায় হিজরতের সময় আসা পর্যন্ত অবস্থা এই হয়ে পড়ে যে, দূর ও নিকটের আরব গোত্রদের মধ্যে এমন কোন গোত্র ছিলনা যার কোন না কোন ব্যক্তি বা পরিবার ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং যাদের মধ্যে কিছু লোক নবী (স) ও তাঁর দাওয়াতের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েনি। এ হচ্ছে হুযুর (স) এর স্মরণ সমুন্নত করণের প্রথম পর্যায় যা এ সূরা নাযিলের সময় অতিবাহিত হচ্ছিল এবং সকলে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিল।

এর কয়েক বছর পর তার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় যা সে সময়ে কেউ দেখতে পারতনা আর না তার ধারণা করতে পারতো। শুধু আল্লাহ তায়ালাই তার জ্ঞান রাখতেন এবং তিনিই তার সুসংবাদ নবীকে দেন। হিজরতের পর, মুনাফিক, ইহুদী এবং আরবের সকল প্রভাবশালী মুশরিক একদিকে নবীর বদনাম রটাবার ব্যাপারে সক্রিয় ছিল এবং অপরদিকে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র খোদা পুরস্তি, খোদাভীতি, পূতপবিত্র নৈতিকতা, সুখী ও সুন্দর সামাজিকতা, সুবিচার, সাম্য, ধনীদের বদান্যতা, গরীবদের দেখাশুনা, চুক্তি ও অংগীকার সংরক্ষণ এবং কার্যকলাপে সততা প্রভৃতির যে বাস্তব নমুনা পেশ করছিল, তা মানুষের মন জয় করছিল। দুমশন যুদ্ধের মাধ্যমে এ উদীয়মান প্রভাব প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কিন্তু নবীর নেতৃত্বে ঈমানদারগণের যে দল তৈরী হয়েছিল, তা স্বীয় আইন শৃংখলা, বীরত্ব, মৃত্যুভয় না থাকা, যুদ্ধাবস্থায়ও নৈতিক সীমারেখা মেনে চলা প্রভৃতি গুণাবলীর দরুন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব এমনভাবে প্রমাণ করেন যে, গোটা আরব দেশ তাঁদের সে শ্রেষ্ঠত্ব, মেনে নেয়। দশ বছরের মধ্যে নবী (স) এর স্মরণ বুলন্দ এমনভাবে হয় যে, যে দেশে তাঁকে বদনাম করার জন্য বিরোধিগণ সর্বশক্তি প্রয়োগ করে, সে দেশেরই প্রতিটি আনাচে-কানাচে اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ -এর ধ্বনি গুঞ্জরিত হয়। অতঃপর খেলাফতে রাশেদার যুগে তাঁর পবিত্র নাম সারা দুনিয়ায় সমুন্নত হতে থাকে। এ ধারাবাহিকতা আজ পর্যন্ত বেড়েই চলেছে এবং ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত বেড়েই চলবে। দুনিয়ার এমন কোন স্থান নেই যেখানে মুসলমানদের কোন বস্তি আছে এবং সেখানে দৈনিক পাঁচ বার আযানে উচ্চস্বরে মুহাম্মদ (স) এর রেসালাতের ঘোষণা করা হয়না। নামাযে তাঁর প্রতি দরূদ পড়া হয়না, জুমার খুৎবায় তাঁর নাম স্মরণ করা হয়না এবং বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন দিন ও দিনের ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোন সময় এমন নেই যখন দুনিয়ার কোথাও না কোথাও তাঁর নাম নেয়া হয়না। অতএব আয়াতের মর্ম এই যে, হে নবী। এ সময়ের কঠিন বিপদ মুসিবতে তুমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছ কেন? তোমার স্মরণ সমুন্নত করার তো এমন ব্যবস্থা আমি করেছি যা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। হাদীসে হযরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় আছে যে, নবী (স) বলেন, জিব্রিল আমার নিকটে আসে এবং আমাকে বলে, আমার রব এবং তোমার রব জিজ্ঞেস করে কিভাবে আমি তোমার স্মরণ সমুন্নত করেছি? আমি বল্লাম, আল্লাহই ভালো জানেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালার এরশাদ হচ্ছে যে, যখন আমার ইয়াদ বা স্মরণ করা হয়, তখন আমার সাথে তোমারও

ইয়াদ করা হয়- (ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতেম, আবু ইয়া'লা, ইবনুল মুনযের, ইবনে হাব্বান, ইবনে মারদুইয়া, আবু নঈম)।

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - (الم نشرح : ٥-٦)

অতএব সত্য কথা এই যে, সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও আছে। নিঃসন্দেহে সংকীর্ণতার সাথে প্রশ্বস্ততা আছে।

একথা দু'বার আবৃত্তি করা হয়েছে এ যাতে করে নবী (স) কে ভালোভাবে সান্ত্বনা দেয়া যায় যে, যে কঠিন অবস্থায় তিনি কালাতিপাত করছেন তা বেশী দিন স্থায়ী থাকার নয়। বরঞ্চ তারপর সত্ত্বরই ভালো অবস্থা এসে যাচ্ছে। দৃশ্যতঃ এ কথা স্ববিরোধী মনে হচ্ছে যে, সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততা হবে। কারণ এ দুটি অবস্থা একই সময়ে একত্র হতে পারেনা। কিন্তু সংকীর্ণতার পর প্রশ্বস্ততা একথা বলার পরিবর্তে সংকীর্ণতার সাথে প্রশ্বস্ততা শব্দগুলো এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে, প্রশস্ততার সময় এতোটা নিকটবর্তী যে, যেন তা প্রথমটির সাথে মিলিত হয়েই আসছে।(৩২)

নির্দেশিকা

১. গ্রন্থকার কর্তৃক পরিবর্ধন।
২. তাফহীম ৩য় খন্ড- আম্বিয়া- টীকা ৫, ৪র্থ খন্ড- ভূমিকা- হা-মীম-আস সাজদা।
৩. গ্রন্থকার কর্তৃক পরিবর্ধন।
৪. তাফহীম ৬ষ্ঠ খণ্ড- সূরা কাফেরুন-এর ভূমিকা।
৫. পরিবর্ধন গ্রন্থকার।
৬. তাফহীম ৪র্থ খন্ড- সূরা সোয়াত-এর ভূমিকা।
৭. তাফহীম ৪র্থ খন্ড- সূরা সোয়াত-এর ভূমিকা।
৮. পরিবর্ধন।
৯. তাফহীম ৬ষ্ঠ- সূরা কাওসার- ভূমিকা, টীকা-৪।
১০. তাফহীম ৪র্থ খন্ড- হা-মীম-সাজদা- টীকা ৩০।
১১. তাফহীম ৬ষ্ঠ খন্ড- মায়ারেজ- টীকা ২৪।
১২. তাফহীম ২য় খন্ড- বনী ইসরাইল- টীকা ১২৪।
১৩. তাফহীম ৪র্থ খন্ড- হা-মীম-সাজদা- টীকা ৪৯।
১৪. তাফহীম ৪র্থ খন্ড- শুরা- টীকা ৩১।
১৫. তাফহীম ৬ষ্ঠ খন্ড- মুতাফ্‌ফেফীন- টীকা ১২।
১৬. তাফহীম ২য় খন্ড- নাহাল- টীকা ২২।
১৭. তাফহীম ৩য় খন্ড- আম্বিয়া- টীকা ৭।
১৮. তাফহীম ৪র্থ খন্ড- লোকমান- টীকা ৬।
১৯. পরিবর্ধন।
২০. তাফহীম ৬ষ্ঠ খন্ড- সূরা মুদ্দাসসেরের ভূমিকা।
২১. তাফহীম ৬ষ্ঠ খন্ড-সূরা মুদ্দাস্‌সেরের তাফ্‌সীর।

২২. পরিবর্ধন।
২৩. তাফহীম ৫ম খন্ড- সূরা রহ্মানের ভূমিকা।
২৪. পরিবর্ধন।
২৫. তাফহীম ৩য় খন্ড- সূরা মরিয়মের ভূমিকা- সূরা আনকাবুত- টীকা ১।
২৬. পরিবর্ধন।
২৭. তাফহীম ৬ষ্ঠ খন্ড- লায়ল- টীকা ১।
২৮. পরিবর্ধন।
২৯. তাফহীম ৬ষ্ঠ খন্ড- মুজাম্মেল টীকা ৫।
৩০. তাফহীম ৬ষ্ঠ খন্ড- দোহা- টীকা- ৩-৫।
৩১. তাফহীম ৬ষ্ঠ খন্ড- আলাম নাশরাহ্- টীকা ১।
৩২. তাফহীম ৬ষ্ঠ খন্ড- আলাম নাশরাহ্- টীকা- ১, ৩, ৪।

নবম অধ্যায়

আবিসিনিয়ায় হিজরত

দ্বীন ইসলামে হিজরতের গুরুত্ব

কুরআনে জিহাদের পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য জিনিস হচ্ছে হিজরত। ইসলামে হিজরতের এতো গুরুত্ব কেন? তার কারণ এই যে, একজন মুসলমানের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু থাকলে তা না তার আপন জন্মভূমি, না তার জাতি, আর না তার রুটি অথবা পেট। বরঞ্চ তার জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, যে সব মূলনীতির উপর সে ঈমান এনেছে তদনুযায়ী জীবন যাপন করে সে যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে। যদি সে সে মূলনীতি অনুযায়ী জীবন যাপন করতে না পারে, তাহলে তার জন্যে স্বাধীনতা কেন স্বয়ং তার জীবনই অর্থহীন হয়ে পড়বে। যে সব মূলনীতির উপর তার ঈমান নির্ভরশীল এবং যেসব সম্পর্কে তার দৃঢ়বিশ্বাস যে তা হক (অতি সত্য) যা খোদা ও রসূল প্রদত্ত, সে সব বিসর্জন দেয়ার পরিবর্তে সে বরঞ্চ খোদার পথে তার জীবন বিসর্জন দেয়াকেই শ্রেয়ঃ মনে করবে।

রসূলের যে সব অনুসারী আরব থেকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন, তাঁরা এ জন্যে করেছিলেন যে, আরব, কুরায়শী ও মক্কী হওয়ার জন্যে আপন দেশে, গোত্রে ও শহরে সকল প্রকার স্বাধীনতা তাঁদের ছিল। কিন্তু যে স্বাধীনতা থেকে তাঁরা বঞ্চিত ছিলেন, তাহলো মুসলমান হওয়ার স্বাধীনতা। এ জন্যে তাঁরা জন্মভূমি পরিত্যাগ করে অন্য এক দেশে চলে গেলেন যেখানে অন্য একজাতি বসবাস করতো এবং সে জাতির হাতেই শাসন ক্ষমতা ছিল। এভাবে যখন রসূলুল্লাহ (স) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন, তো কেন করেছিলেন? তিনি মক্কার অধিবাসী ছিলেন। মক্কায় তিনি সে সব অধিকার লাভ করেন যা মক্কায় যে কোন নাগরিক লাভ করতো। তাঁর সংগী সাথীরাও সে সকল অধিকার লাভ করেছিলেন যা কোন কুরায়শী হওয়ার দিক দিয়ে লাভ করতো। কিন্তু যে কারণে তিনি ও তাঁর সংগী সাথীগণ ঘরদোর ছাড়লেন, আত্মীয় স্বজন ছাড়লেন, বিষয় সম্পদ ছাড়লেন এবং শুধু গায়ে পরিহিত কাপড়সহ বেরিয়ে পড়লেন, তা এ ছিল যে, মুসলমান হওয়ার দিক দিয়ে তাঁদের কোন স্বাধীনতা ছিলনা। এ স্বাধীনতার জন্যেই তাঁরা জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন এবং অন্য শহরে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন।(১)

কুরআনে মুসলমানদেরকে হিজরতের জন্য তৈরী করা হয়

মক্কায় মুসলমানদের উপর অত্যাচার নির্যাতন যখন চরমে পৌছলো, তখন কুরআনে তাঁদেরকে হিজরতের জন্য তৈরী করার কাজ শুরু হলো। এরশাদ হলোঃ

يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اَرْضِىْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ كُلُّ
نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِىْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ
الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ
لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ، اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

- হে আমার বান্দাহগণ, যারা ঈমান এনেছ! আমার পৃথিবী প্রশস্ত। অতএব তোমরা আমারই বন্দেগী কর- (হুকুম শাসন মেনে চল)। প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তারপর তোমাদের সবাইকেই আমার দিকে ফিরে আনা হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদেরকে আমি বেহেশতের সুউচ্চ অট্টালিকাগুলোতে স্থান দেব যার তলদেশে স্রোতস্বিনী প্রবাহমান থাকবে। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আমলকারীদের কি উৎকৃষ্ট প্রতিদান। এ সব তাদের জন্যে যারা সবর করেছে এবং আপন রবের উপর ভরসা করে। এমন বহু প্রাণী আছে যারা তাদের রিযিকসহ চলাফেরা করেনা। আল্লাহই তাদেরকে রিযিক দেন এবং তোমাদেরকেও। আর তিনি সব কিছু শুনেন এবং জানেন। (আন্‌কাবূত- ৫৬-৬০)

প্রথম আয়াতে হিজরতের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদি মক্কায় খোদার বন্দেগী করা কষ্টকর হয়ে থাকে তাহলে দেশ ছেড়ে চলে যাও- খোদার যমীন সংকীর্ণ নয়। যেখানেই তোমরা খোদার বান্দাহ হয়ে থাকতে পারবে, সেখানে চলে যাও। তোমাদের কওম ও জন্মভূমির বন্দেগী নয়, খোদার বন্দেগী করতে হবে। এতে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, প্রকৃত জিনিস কওম, জন্মভূমি বা দেশ নয়, বরঞ্চ আল্লাহর বন্দেগী। যদি কখনো কওম, জন্মভূমি ও দেশের ভালোবাসার দাবী আল্লাহর বন্দেগীর দাবীর সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে সে সময়টাই হয় মুমেনের ঈমানের পরীক্ষা। যে সাচ্চা মুমেন, সে আল্লাহর বন্দেগীই করবে এবং কওম, জন্মভূমি ও দেশ প্রত্যাখ্যান করবে। যে ঈমানের মিথ্যা দাবীদার, সে ঈমান পরিহার করে আপন জাতি ও দেশের সাথে আঁকড়ে থাকবে। এতে বিশদভাবে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, একজন খাঁটি খোদা পুরস্ত ব্যক্তি জাতি ও দেশ প্রেমিকও হতে পারে কিন্তু কওম ও দেশ পূজারী হতে পারেনা। তার নিকটে খোদার বন্দেগী সকল বস্তু থেকে অধিক প্রিয় যার জন্যে সে দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু কুরবান করে দেবে কিন্তু দুনিয়ার কোন বস্তুর জন্যে খোদার বন্দেগী বিসর্জন দেবেনা।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা আপন জীবনের চিন্তা করোনা। এতো যে কোন সময়ে শেষ হবে। চিরকাল থাকার জন্যে কেউতো দুনিয়ায় আসেনি। অতএব তোমাদের জন্যে চিন্তার বিষয় এ নয় যে, এ দুনিয়ায় জীবন কিভাবে বাঁচানো যায়। বরঞ্চ প্রকৃত চিন্তার বিষয় এই যে, ঈমান কিভাবে বাঁচানো যায় এবং খোদা পুরস্তির দাবী কিভাবে মেটানো যায়। অবশেষে তোমাদেরকেও ফিরে আমার কাছেই আসতে হবে। যদি দুনিয়ায় জীবন বাঁচাবার জন্যে ঈমান হারিয়ে ফেলে আস, তো তার পরিণাম একরূপ হবে এবং ঈমান বাঁচাবার জন্যে জীবন হারিয়ে আস তো তার পরিণাম আর একরূপ হবে। অতএব চিন্তা যা কিছু দরকার তা এ জন্যে কর যে, আমার কাছে যখন ফিরে আসবে তখন কি নিয়ে আসবে। জীবনের উপর কুরবান করা ঈমান নিয়ে, না ঈমানের উপর কুরবান করা জীবন

নিয়ে?

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, মনে কর যদি তোমরা- ঈমান ও সৎ কাজের রাস্তায় চলে দুনিয়ার সকল নিয়ামত থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছ এবং দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যর্থ হয়ে গেছ, তাহলে বিশ্বাস কর তার ক্ষতি পূরণ অবশ্যই হবে। নিছক ক্ষতি পূরণই নয়- বরঞ্চ সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিদান লাভ করবে। যারা বিভিন্ন রকমের দুঃখ কষ্ট, বিপদ মুসিবত ও ক্ষতির মুকাবেলায় ঈমানের উপর সুদৃঢ় রয়েছে, যারা ঈমান আনার সকল প্রকার ঝুঁকি কাঁধে নিয়েছে, তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি, যারা ঈমান পরিহার করার সুযোগ সুবিধা ও পার্থিব কল্যাণ স্বচক্ষে দেখেছে কিন্তু তার প্রতি সামান্যতম অনুরাগ প্রদর্শন করেনি, যারা কাফের ও ফাসেকদেরকে চোখের সামনে আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে দেখেছে এবং তাদের ধনদৌলত ও প্রভাবপত্তির প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করেনা; যারা ভরসা তাদের বিষয় সম্পত্তির উপর, ব্যবসা বাণিজ্য ও গোত্রের উপর না করে, করে আপন রবের উপর; যারা পার্থিব উপায় উপাদানের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে নিছক আপন রবের উপর ভরসা করে, ঈমানের খাতিরে প্রত্যেক বিপদ সহ্য করতে এবং প্রতিটি শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তৈরী থেকেছে এবং সময়ের ডাকে ঘরদোর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে, এমন মুমেন ও সৎ কর্মশীল বান্দাহদের প্রতিদান তাদের রবের নিকটে কখনো বিনষ্ট হবেনা। তিনি এ দুনিয়াতেও তাদের পৃষ্টপোষকতা ও সাহায্য করবেন এবং আখেরাতেও তাদের আমলের উৎকৃষ্ট প্রতিদান দেবেন।

শেষে এ প্রেরণা দান করা হয় যে, হিজরত কালে জীবনের চিন্তার ন্যায় জীবিকার চিন্তায়ও তোমাদের বিব্রত হওয়া উচিত নয়। এই যে অসংখ্য পশু-পাখী ও জলজ প্রাণী আকাশে বাতাসে, জলে স্থলে বিচরণ করছে তাদের মধ্যে কে আপন জীবিকাসহ চলাফেরা করছে? একমাত্র আল্লাহই তো তাদেরকে লালন পালন করছেন। যেখানেই তারা যাক না কেন, আল্লাহর ফযলে কোন না কোন ভাবে তারা জীবিকা লাভ করছে। অতএব আহলে ঈমান এ চিন্তাভাবনা করে যেন হিম্মৎ হারিয়ে না ফেলে যে, যদি ঈমানের খাতিরে ঘরদোর ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় তাহলে খেতে পাবে কোথা থেকে। আল্লাহ যেখান থেকে তাঁর অগণিত সৃষ্টিকে রিযিক দিচ্ছেন, তাদেরকেও দেবেন।

দাওয়াতে হকের পথে এ পর্যায় এমনও এসে যায়- যখন একজন হক দুরন্ত লোকের জন্যে এ ছাড়া কোন উপায় থাকেনা যে, উপায় উপকরণের জগতের সকল সহায় সম্বল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিছক আল্লাহর ভরসায় জীবনের ঝুঁকি নেবে। এমন অবস্থায় ওসব লোক কিছুই করতে পারেনা যারা হিসাব কষে ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় যাঁচাই পর্যালোচনা করে এবং কোন পদক্ষেপ করার পূর্বে জীবনের নিরাপত্তা এবং জীবিকার নিশ্চয়তা তালাশ করে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের অবস্থার পরিবর্তন হয় তাদের ক্ষতির দ্বারা যারা মাথায় কাফন বেঁধে দাঁড়িয়ে যায় এবং সকল বিপদ মুসিবত বরণ করার জন্যে বেধড়ক তৈরী হয়ে যায়। তাদেরই কুরবানী অবশেষে সে শুভ মুহূর্ত এনে দেয় যখন আল্লাহর কালেমা বুলন্দ হয় এবং তার মুকাবিলায় সকল বাতিল কালেমা হীন ও অবনমিত হয়।(২)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۔ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ، وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ۔ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۔(الزمر: ١٠)

(হে নবী) বল, হে আমার বান্দাহগণ যারা ঈমান এনেছ, আপন রবকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়ায় সৎকর্মশীলতার আচরণ করেছে, তাদের জন্যে কল্যাণ। এবং খোদার যমীন প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদের তো তাদের প্রতিদান অগণিত দেয়া হবে। (যুমারঃ ১০)

এখানেও আহলে ঈমানদারদের হেদায়াত দেয়া হচ্ছে যে, যদি আল্লাহর বন্দেগীর জন্যে কোন এক স্থান সংকীর্ণ হয়ে থাকে, তাঁর যমীনতো প্রশস্ত। নিজের দ্বীন বাঁচাবার জন্যে অন্য কোন দিকে বেরিয়ে পড়। সেই সাথে তাদেরকে এ সুসংবাদও দেয়া হয়েছে যে, তাদের জন্যে দুনিয়াতেও কল্যাণ আখেরাতেও কল্যাণ। তাদের দুনিয়াও সুবিন্যস্ত হবে এবং আখেরাতও। কারণ তারা দ্বীনকে দুনিয়া ও তার ভোগ বিলাসের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। নিছক দ্বীনের খাতিরে গৃহ থেকে গৃহহীন, দেশ থেকে দেশহীন হয়ে অন্য শহর বা অঞ্চলে হিজরত করেছে। একটি শহর, অঞ্চল বা দেশ যখন আল্লাহর বন্দেগীর জন্যে সংকীর্ণ হয়ে পড়লো তখন তারা অন্যত্র চলে গেল। অতএব এমন লোকদের জন্যে অগণিত প্রতিদান যারা খোদাপরস্তি ও নেকীর পথে চলার জন্যে হরেক রকম বিপদ মুসিবত ও দুঃখ কষ্ট বরদাশত করেছে এবং হক পথ থেকে সরে পড়েনি। এ অগণিত প্রতিদানের ওয়াদা শুধু হিজরতকারীদের জন্যেই করা হয়নি, বরঞ্চ তাদের জন্যেও যারা জুলুম নির্যাতনের ভূখন্ডে অনড় থেকে প্রত্যেক বিপদের মুকাবেলা করতে থাকে।(৩)

হিজরতের সময় হেদায়াত

কুরআন মজিদে মক্কার মজলুম মুসলমানদেরকে শুধু হিজরতের প্রেরণাই দান করা হয়নি, বরঞ্চ দু'ধরনের হেদায়াত দেয়া হয়েছে। যেহেতু মুসলমানগণ হিজরত করে একটি ঈসায়ী দেশে যাচ্ছিলেন, সে জন্যে এ পরিস্থিতিতে সূরা মরিয়ম নাযিল করা হয়, যার প্রথম দু'রুকুতে হযরত ইয়াহ্ইয়া এবং হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তার অর্থ এই যে, যদিও মুসলমানরা এক মজলুম আশ্রয় প্রার্থী হিসাবে সেখানে যাচ্ছে, তথাপি এ অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের দ্বীনের ব্যাপারে সামান্যতম নমনিয়তা প্রদর্শনের শিক্ষা দেননি, বরঞ্চ যাবার সময় পাথেয় স্বরূপ এ সূরা তাঁদের সাথে দিয়ে দেন যাতে তাঁরা ঈসায়ীদের দেশে ঈসা (আ) এর সঠিক পরিচয় ও মর্যাদা পেশ করতে পারেন এবং তাঁর 'খোদার পুত্র হওয়ার'বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করতে পারেন- তার পরিণাম যাই হোক না কেন।

দ্বিতীয় হেদায়াত এ করা হলো ঃ

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، إِلَّا الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْهُمْ ، وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلٰهُنَا
وَإِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ .(العنكبوت: ٤٦)

- আর আহলে কিতাবদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে ছাড়া বিতর্ক করোনা, যারা জালেম তাদের কথা আলাদা। এবং তাদেরকে বল, আমরা ঈমান এনেছি ওসবের উপরে যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে এবং ওসবের উপরেও যা তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে। আমাদের খোদা এবং তোমাদের খোদা এক এবং আমরা তাঁরই অনুগত। (আনকাবুতঃ ৪৬)

অর্থাৎ আহলে কিতাবদের (ঈসায়ী) সম্মুখীন যখন হবে তখন তাদের মধ্যে যারা জালেম তাদের সাথে বিতর্ক এড়িয়ে যারা সমঝদার তাদের সাথে নেহায়েত যুক্তিসংগত

উপায়ে ভদ্র ও শালীন ভাষায় এবং হৃদয়গ্রাহী ভংগিমায় আলোচনা কর। তাদেরকে বল, আমরা এমন গোঁড়া দল নই যে, আমাদের নিকটে প্রেরিত কিতাব আমরা মানি এবং তোমাদের নিকট প্রেরিত কিতাব মানিনা। আমরাও হকপুরস্ত অর্থাৎ হক মেনে চলি। খোদার পক্ষ থেকে যা কিছু আমাদের কাছে এসেছে তা যেমন হক বলে মানি, ঠিক তোমাদের নিকট যে এসেছে তার উপরও ঈমান রাখি, আমাদের ও তোমাদের খোদা পৃথক পৃথক নয়। বরঞ্চ একই খোদা যাকে আমরাও মানি তোমরাও মান। আমরা সেই একই খোদার বন্দেগী ও আনুগত্য করার পন্থা অবলম্বন করেছি।(৪)

আবিসিনিয়ার প্রথম হিজরত

পরিস্থিতি যখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিল, তখন নবুওতের পঞ্চম বর্ষে রজব মাসে হুযুর (স) তাঁর সংগীসাথীদের বল্লেন,

لَوْ خَرَجْتُمْ اِلَى اَرْضِ الْحَبَشَةِ فَاِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ اَحَدٌ وَهِىَ اَرْضُ صِدْقٍ حَتّٰى يَجْعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ فَرَجًا مِمَّا اَنْتُمْ فِيْهِ-

- ভালো হয় যদি তোমরা বেরিয়ে হাবশে অর্থাৎ আবিসিনিয়ায় চলে যাও। সেখানে এমন এক বাদশাহ্ আছেন, যেখানে কারো উপর জুলুম করা হয়না। তা হলো কল্যাণের দেশ। যতোক্ষণ আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের এ বিপদ দূর করার কোন ব্যবস্থা না করছেন তোমরা সেখানে অবস্থান করতে থাক।

এ নির্দেশ অনুযায়ী আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে এগারোজন পুরুষ এবং চারজন নারী অংশ গ্রহণ করেন। কুরাইশের লোকেরা সমূদ্রতীর পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় শুয়ায়বাহ্ সমূদ্র বন্দরে- যথা সময়ে তাঁরা আবিসিনিয়াগামী নৌকা পেয়ে যান এবং তারা ধরা পড়া থেকে বেঁচে যান।

প্রথম হিজরতে অংশ গ্রহণকারী

ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে বলেন, এ হিজরতে মুহাজেরীনের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

১. বনী উমাইয়া থেকে হযরত ওসমান বিন আফফান (রা)।
২. তাঁর বিবি হযরত রুকাইয়া (রা) বিন্তে রসূলুল্লাহ্ (স)।
 (ইবনে আবদুল বারর বলেন, তাঁদের সাথে উম্মে আয়মানও ছিলেন।)
৩. বনী আবেদ শামস বিন আবদে মানাফ থেকে হযরত আবু হুযায়ফা বিন উৎবা বিন রাবিয়া (রা)।
৪. তাঁর বিবি হযরত সাহ্‌ল বিনতে সুহাইল বিন আমর।
৫. বনী আসাদ বিন আবদুল ওয্যা বিন কুসাই থেকে হযরত যুবাইর বিন আওয়াম (রা)।
 (তিনি ছিলেন হযরত খাদিজার (রা) ভাতিজা এবং হুযুর (স) এর ফুফাতো ভাই।)
৬. বনী আবদুদ্দার বিন কুসাই থেকে হযরত মুসয়াব বিন উমাইর (রা)।
৭. বনী যুহ্‌রা বিন কিলাব থেকে হযরত আবদুর রহ্‌মান বিন আওফ (রা)।
৮. বনী মাখযূম থেকে হযরত আবু সালমা বিন আবদুল আসাদ (রা)।
৯. তাঁর বিবি উম্মে সাল্‌মা (রা) (আবু জাহ্‌লের আপন চাচাতো ভগ্নি)।

১০. বনী জুমাহ্ থেকে হযরত ওসমান বিন মায্‌উন (রা)- (উম্মুল মুমেনীন হযরত হাফ্‌সার (রা) মামু)।
১১. হুলাফায়ে বনী আদী থেকে হযরত আমের বিন রাবিয়া আল্ আন্‌যী (রা)।
১২. তাঁর বিবি লায়লা বিন্তে আবি হাস্‌মা (রা)।
১৩. বনী আমের বিন লুয়াই থেকে আবু সাব্‌রাহ্ (রা) বিন আবি রুহ্‌ম।
১৪. বনী আল্ হারেস বিন ফিহ্‌র থেকে সুহাইল বিন বায়দা (রা)।

ইবনে সাদ ওয়াকেদীর বরাত দিয়ে আরও দুটি নাম যোগ করেন- হাতেব বিন আমর বিন আবদে শামস এবং আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) (বনী যোহ্‌রার চুক্তি বদ্ধ মিত্র)। ইবনে ইসহাক বলেন পরবর্তীকালে হযরত জা'ফর বিন আবি তালেবও তাঁদের মধ্যে শামিল হন। কিন্তু মূসা বিন ওকবা মাগাযীতে বলেন যে, তিনি প্রথম হিজরতে নয়, দ্বিতীয় হিজরতে শামিল হন। ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) প্রথম হিজরতে নয়, দ্বিতীয় হিজরতে ছিলেন। উপরন্তু যুরকানী কতিপয় সীরাত রচয়িতার বরাত দিয়ে বলেন যে, আবু সাবরার (রা) সাথে তাঁর বিবি উম্মে কুলসূমও ছিলেন যিনি সুহাইল বিন আমরের দ্বিতীয়া কন্যা ছিলেন। সকলের আগে বেরিয়ে পড়েছিলেন হযরত ওসমান (রা)। (বায়হাকী)

আবিসিনিয়ায় মুহাজিরদের সাথে আচরণ

ইবনে জারীর তাবারী বলেন, হাবশা (আবিসিনিয়া) কুরাইশদের প্রাচীন বাণিজ্যস্থল ছিল। সেখানে তারা প্রভূত পরিমাণে জীবিকা অর্জন করতো এবং ব্যবসায় খুব লাভবান হতো। এ কারণে মুহাজিরগণকে সেখানে কোন কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়নি। মুহাজিরদের নিজস্ব বক্তব্য ছিল এই, আমরা সেখানে খুব ভালো ভাবে ছিলাম। আপন দ্বীনের ব্যাপারে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ছিল। আল্লাহর এবাদত করতাম। কোন প্রকার কষ্ট আমাদের দেয়া হতোনা। এমন কোন কথাও আমাদের শুনতে হয়নি যা আমাদের জন্যে অপ্রীতিকর ছিল।

তাঁদের পেছনে কুরাইশ প্রতিনিধি দলের গমন

কুরাইশগণ যখন দেখলো যে, এসব লোক আবিসিনিয়ায় গিয়ে নিরাপদে অবস্থান করছে তখন তারা আমর বিন আল্ আস এবং আবদুল্লাহ্ বিন আবি রাবিয়াকে বহু মূল্যবান উপঢৌকনসহ নাজ্জাশীর[1] নিকটে পাঠালো যেন তাদেরকে মক্কায় ফিরে আনা হয়। বোখারীতে এ শাহের নাম বলা হয়েছে আসহামা (أَصْحَمَة)। কিন্তু নাজ্জাশী তাদের কথায় কোন কর্ণপাত করেননা এবং তাদেরকে ব্যর্থতাসহকারে মক্কায় ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। এ প্রতিনিধি দল সম্পর্কে বর্ণনায় মত পার্থক্য দেখা যায়। কোন কোন বর্ণনা মতে এ দু'জন প্রতিনিধির সাথে ওমারা বিন অলীদ বিন মগীরাকে পাঠানো হয়। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, আমর বিন্ আস্‌কে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় হিজরতের সময় নাজ্জাশীর নিকটে পাঠানো হয়। কিন্তু প্রথম প্রতিনিধি দলের সাথে ওমারা ছিল এবং দ্বিতীয়টিতে আবদুল্লাহ্ কিন্তু ইবনে ইসহাক উভয় প্রতিনিধি দলের মধ্যে আবদুল্লাহর নাম উল্লেখ করেন।(৬)

মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন ও তার কারণ

এ বছরে রমযান মাসে এমন এক ঘটনা ঘটে যার সংবাদ আবিসিনিয়ায় এভাবে পৌছে

---

১. আবিসিনিয়ার রাজার উপাধি ছিল- নাজ্জাশী- (NEGUS)।

যে, মক্কায় কাফেরগণ মুসলমান হয়েছে।

ঘটনাটি ছিল এরূপ ঃ

একদিন হেরেমে পাকে যখন কুরাইশের লোকেরা একত্রে সমবেত ছিল, তখন হঠাৎ রসূলুল্লাহ (স) বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর মুখ দিয়ে সূরা নজম জারী করে দিলেন। আল্লাহর কালামের প্রভাব এতোটা তীব্র ও শক্তিশালী ছিল যে, নবী (স) যখন শুনাতে থাকেন- তখন বিরোধিদের হট্টগোল করার চেতনাই বিলুপ্ত হয়ে যায়। আবৃত্তি শেষে যখন তিনি সিজদা করেন তখন সমবেত সব লোকই সিজদা করে। বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ এবং নাসায়ীতে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাস্উদের (রা) বর্ণনা মতে এ ছিল কুরআন মজিদের প্রথম সূরা- যা নবী (স) কুরাইশদের সাধারণ সমাবেশে শুনিয়েছিলেন। ইবনে মারদুইয়ার বর্ণনা মতে হেরেমে সমাবেশে কাফের-মুমেন উভয়ই ছিল। অবশেষে নবী (স) যখন সিজ্দার আয়াত পাঠ করে সিজদা করেন, সাথে সাথে উপস্থিত সকলেই সিজ্দা করে। মুশরিকদের প্রভাবশালী সর্দারগণ যারা বিরোধিতায় অগ্রণী ভূমিকা রাখতো তারাও সিজদা না করে পারেনি। কাফেরদের মধ্যে শুধু একজন উমাইয়া বিন খালাফকে দেখা গেল যে, সে এক মুষ্টি মাটি মুখমন্ডলে মেখে বল্লো- ব্যস্ এই যথেষ্ট।

এ ঘটনার দ্বিতীয় চাক্ষুষ সাক্ষী ছিলেন হযরত মুত্তালিব বিন আবি ওয়াদায়া যিনি তখনো মুসলমান হননি। নাসায়ী এবং মুসনাদে আহমদে তাঁর নিজস্ব বর্ণনা এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ

যখন হুযুর (স) সূরা নজম পড়ে সিজদা করলেন এবং উপস্থিত সকলেই সিজদায় পড়ে গেল, তো আমি সিজদা করলামনা। তার ক্ষতিপূরণ এখন আমি এভাবে করি যে, ঐ সূরা তেলাওতের সিজদা না করে ছাড়িনা।

ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর সনদ উদ্ধৃত করে বলেন, অলীদ বিন মুগীরাও এক মুষ্টি মাটি মুখে লাগায়। কারণ বার্ধক্যের কারণে সে সিজদা করতে পারেনি। আবু উহায়হা সাঈদ বিন আল্আসও মুখে মাটি লাগায় বার্ধক্যের কারণে।

এভাবে এ ঘটনাটি জনশ্রুতিতে পরিণত হয়ে আবিসিনিয়ায় এরূপে পৌঁছে যে, কুরাইশ মুশরিকরা সব মুসলমান হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ছিল ভিন্ন। কুরআনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সিজদাকারীগণ তো সে সময়ে সিজদা করে ফেলে কিন্তু পরবর্তীকালে তারা এমনভাবে বিব্রত হয়ে পড়ে যে, তাদের দ্বারা এ কোন্ দুর্বলতা প্রদর্শন করা হলো। লোকেরা তাদেরকে এই বলে ভর্ৎসনা করতে লাগলো যে, অপরকে তো সে কালাম শুনতে নিষেধ করা হয় কিন্তু নিজেরা কান পেতে শুনেইনি, বরঞ্চ মুহাম্মদ (স) এর সাথে সিজদাও করলো। অতঃপর তারা একটা বানোয়াট কাহিনী রচনা করে- তাদের নিরস্ত করে। তারা বলে, আরে আমরা তো

اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى وَ مَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى

-এর পরে মুহাম্মদের (স) মুখ দিয়ে এ কথাগুলো শুনলাম-

تلك الغرانقة العُلٰى وانّ شفاعتهن لترجٰى -

- (এ সব উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন দেবী এবং তাদের শাফায়াত অবশ্যই আশা করা যায়)। এ জন্য আমরা মনে করলাম যে, মুহাম্মদ (স) আমাদের পথে এসে গেছেন। অথচ কোন পাগলও কি কখনো এ চিন্তা করতে পারে যে, সূরা নজমের পূর্বাপর বক্তব্যের মধ্যে এ কথাগুলোর কোন স্থান হতে পারে? আর তারা দাবী করতো যে, তারা আপন কানে হুযুরের (স) মুখে সে কথা শুনেছে।(৭)

গারানিক কাহিনীর রহস্য

দুঃখের বিষয় স্বয়ং আমাদের তাফসীরকার ও মুহাদ্দেসীনের মধ্যে কিছু এ ধরনের বর্ণনা মশহুর হয়ে পড়ে যার ফল এ দাঁড়ায় যে, হুযুর (স) এর মুখ থেকে কাফেরগণ যে কথা শুনার দাবী করে, তা প্রকৃত পক্ষে হুযুর (স) এর মুখ থেকেই বেরয়। আর এ অভিলাষ থেকে বেরয় যে, কোন প্রকারে তাঁর এবং কাফেরদের মধ্যে যে ঘৃণা বিদ্বেষ রয়েছে তা দূর হয়ে যাক। আর শয়তান তাঁর এ অভিলাষের সুযোগে এ কথাগুলো তাঁর মুখ থেকে বের করে দেয়।

কাহিনীটি এভাবে বলা হয় যে, নবী (স) এর মনে আকাংখা পয়দা হয় যে, হায়রে যদি কুরআনে এমন কথা নাযিল হয়ে যায় যাতে ইসলামের বিরুদ্ধে কুরাইশ কাফেরদের ঘৃণা দূর হয়ে যায় এবং তারা কিছুটা নিকটে এসে যায়। অন্ততঃ পক্ষে তাদের দ্বীনের বিরুদ্ধে এমন কঠোর সমালোচনা না হয় যা তাদেরকে উত্তেজিত করে দেয়। এ অভিলাষ তাঁর মনের মধ্যেই ছিল এমন সময়ে একদিন কুরাইশদের এক বিরাট সমাবেশে বসা অবস্থায় তাঁর উপর সূরা নজম নাযিল হয় এবং তিনি তা পড়তে থাকেন। তিনি যখন-

افرأيتم اللت والعزى ومنوة الثالثة الاخرى

পর্যন্ত পৌঁছেন তখন হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে এ কথাগুলো বেরয়ঃ

تلك الغرانقة العلى وان شفاعتهن لترجى -

তারপর সূরায় পরবর্তী আয়াতগুলো তিনি পড়তে থাকেন। তারপর সূরা শেষ করে যখন তিনি সিজদা করেন, তখন মুশরিক ও মুসলমান সকলেই সিজদায় পড়ে যায়। কুরাইশ কাফেরগণ বলে, এখন আমাদের এবং মুহাম্মদের (স) মধ্যে কি মতপার্থক্য রইলো? আমরা তো এ কথাই বলতাম যে, খালেক ও রাযেক তো আল্লাহই বটে, অবশ্যি আমাদের এসব মাবুদ তাঁর দরবারে আমাদের জন্য শাফায়াতকারী। সন্ধ্যায় জিব্রিল (আ) এসে বলেন, এ আপনি কি করলেন? এ দু'টি বাক্য তো আমি নিয়ে আসিনি। এতে তিনি (নবী (স)) খুব দুঃখিত হন। ফলে আল্লাহ্ তায়ালা- এ আয়াত নাযিল করেন যা সূরা বনী ইসরাইলের ৮ম রুকুতে-আছে-[১]

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ .... ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا -

- অর্থাৎ (হে নবী) এ সব লোক এ চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি যে, তোমাকে ফেৎনার মধ্যে নিক্ষেপ করে সেই অহী থেকে তোমাকে সরিয়ে দেবে যা আমি তোমার প্রতি পাঠিয়েছি যাতে তুমি আমার নাম করে নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা রচনা কর...। তারপর আমার মুকাবিলায় কোন সাহায্যদাতা পাবেনা।

এ বিষয়টি সর্বদা নবীর মন দুঃখ ভরাক্রান্ত করে রাখতো। অবশেষে সূরা হজ্বের ৫২ নং আয়াত নাযিল হয়, যাতে হুযুরকে (স) এ ভাবে সান্ত্বনা দেয়া হয়- তোমার পূর্ববর্তী নবীগণের বেলায়ও এরূপ ঘটেছে যে, কোন নবী কোন অভিলাষ পোষণ করেছেন আর

---

১. পশ্চিমী জগতের একজন প্রাচ্যবিদ সততাহীন মনগড়া উক্তি করেছেন যে সে সব শয়তানী আয়াত মনসূখ করে সেস্থানে সূরা নজমের ২১ নং ও ২২ নং আয়াত নাযিল করা হয়েছে। অথচ এ একেবারে যুক্তি প্রমাণহীন কথা যার কোন সনদের উল্লেখ তিনি করেননি এবং কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পেশ করতেও তিনি অক্ষম- গ্রন্থকার।

শয়তান তাতে হস্তক্ষেপ করেছে। এভাবে শয়তান যা কিছুই হস্তক্ষেপ করে আল্লাহ্ তা মিটিয়ে দেন এবং নিজের আয়াত সেখানে সুদৃঢ় করে দেন।

এদিকে কুরআন শুনার পর কুরাইশের লোকজন নবীর সাথে সিজদা করেছে- এ খবরটি এমন রঙে রঞ্জিত করে আবিসিনিয়ায় পৌছানো হলো যে, নবী (স) এবং মক্কায় কাফেরদের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেছে। ফলে বহু মুহাজির মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু এখানে আসার পর তাঁরা জানতে পারেন যে, সন্ধির খবরটি মিথ্যা। ইসলাম ও কুফরের সংঘাত সংঘর্ষ আগের মতোই আছে।

এ কাহিনী ইবনে জারীর এবং অনেক তাফসীরকার তাঁদের তাফসীরে, ইবনে সাদ তাবাকাতে; আলওয়াহেদী আসবাবুন্নুযুলে, মূসা বিন ওকবা মাগাযীতে, ইবনে ইসহাক সীরাতে, ইবনে আবি হাতেম, ইবনুল মুনযের, বায্যার, ইবনে মারদুইয়া এবং তাবারানী তাঁদের হাদীসসমূহে উদ্ধৃত করেছেন। যেসব সনদের ভিত্তিতে এ উদ্ধৃত হয়েছে তা মুহাম্মদ বিন কায়েস, মুহম্মদ বিন কাব কুরাযী, ওরওয়া বিন যুবাইর, আবু সালেহ, আবুল আলীয়া, সাঈদ বিন জুবাইর, দাহ্হাক, আবু বকর বিন আবদুর রহমান বিন হারেস, কাতাদা, মুজাইদ, সুদ্দী, ইবনে শিহাব যুহরী, সর্বশেষে ইবনে আব্বাস (রা)। (ইবনে আব্বাস ব্যতীত এঁদের মধ্যে কেউ সাহাবী ছিলেননা)। কাহিনী বিস্তারিত বিবরণে ছোটোখাটো মতপার্থক্য ছাড়াও দুটি অতি বড়ো মতপার্থক্য রয়েছে। এক- দেবদেবীর প্রশংসায় যেসব কথা নবীর প্রতি আরোপ করা হয়েছে-তার প্রতিটি বর্ণনা অন্য বর্ণনা থেকে ভিন্ন। দ্বিতীয় বিরাট মতপার্থক্য এই যে, কোন বর্ণনা মতে- এ কথাগুলো অহী নাযিল হওয়া অবস্থায় নবীর উপর শয়তান ইলকা করেছে বা মনের উপর চাপিয়ে দিয়েছে এবং তিনি মনে করলেন যে, এ কথাগুলো জিব্রিল (আ) এনেছেন। কোন বর্ণনায় আছে যে, এ শব্দগুলো তাঁর অভিলাষের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভুলক্রমে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কারো বর্ণনায় আছে যে, কথাগুলো তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবেই বলেছেন- তবে অস্বীকার করার অর্থে প্রশ্নোবোধক বাক্যে বলেছেন। কারো বর্ণনায় আছে যে, শয়তান নবীর আওয়াজে তার আওয়াজ মিলিয়ে এ শব্দগুলো বলেছে এবং মনে করা হয়েছে যে, এগুলো তিনি (নবী) বলেছেন। আবার কারো বর্ণনা মতে, মুশরিকদের মধ্যে কেউ এ শব্দগুলো বলেছে।

ইবনে কাসীর, বায়হাকী, কাজী এয়ায, ইবনে খুযায়মা, কাজী আবু বকর ইবনুল আরবী, ইমাম রাযী, কুরতুবী, বদরুদ্দীন আয়নী, শাওকানী, আলুসী প্রমুখ মনীষী এ কাহিনীকে একেবারে মিথ্যা বলেছেন। ইবনে কাসীর বলেন, যতো সনদে এ কথার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সব মুরসাল এবং মুন্‌কাতা। কোন সঠিক মুত্তাসিল সনদে আমি এ কাহিনী পাইনি। বায়হাকী বলেন, উদ্ধৃতির দিক দিয়ে এ কাহিনী প্রমাণিত নয়। এ সম্পর্কে ইবনে খুযায়মাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ যিন্দীকদের মনগড়া কাহিনী, এর দুর্বলতা এর থেকে প্রমাণ হয় যে, সিহাহ্ সিত্তার প্রণেতাগণের মধ্যে কেউ এ কথা তাঁদের গ্রন্থে উদ্ধৃত করেননি। আর না এ কোন সহিহ্ মুত্তাসিল নির্দোষ সনদসহ নির্ভরযোগ্য রাবীগণ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম রাযী, কাজী আবু বকর এবং ইমাম আলুযী বিস্তারিত আলোচনার পর শক্তিশালী যুক্তিসহ একে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অপর দিকে হাফেজ ইবনে হাজর এর মতো উন্নতমানের মুহাদ্দেস এবং আবু বকর যাস্‌সাসের মতো প্রখ্যাত ফেকাহ্‌বিদ, যামাখ্‌শারী, ইবনে জারীর এতে সঠিক মনে করেন, আর একে সূরা হজ্বের ৫২ নং আয়াতের তাফসীর গণ্য করেন। ইবনে হাজারের যুক্তি নিম্নরূপঃ

সাঈদ বিন জুবাইরের পদ্ধতি ব্যতীত আর যেসব পদ্ধতিতে এ বর্ণনা পাওয়া যায়- তা হয় দুর্বল নতুবা মুন্‌কাতা। কিন্তু পদ্ধতির আধিক্য এ কথা প্রমাণ করে যে, এর একটা মূল অবশ্যই আছে।

উপরন্তু এ এক পদ্ধতি সহীহ্ সনদে মুত্তাসিল রূপে উদ্ধৃত হয়েছে যা বায্‌যার বের করেছেন (অর্থাৎ ইউসুফ বিন হাম্মাদ আন্ উমাইয়া বিন খালেদ আশ্ শু'বা বিন আবি বিশর আন্ সাঈদ বিন জুবাইর আন্ আবি আব্বাস)। আর দু' পদ্ধতিতে এ যদিও মুরসাল কিন্তু রাবীগণ সহীহাইনের শর্ত মুতাবিক। এ দুটি বর্ণনা তাবারী উদ্ধৃত করেছেন। একটি ইউনুস বিন ইয়াযিদ আন ইবনে শিহাবের পদ্ধতিতে অন্যটি মু'তাসের বিন সুলায়মান ও হাম্মাদ বিন সালামা আন্ দাউদ বিন আবি হিন্দ আন্ আবিল আলীয়ার পদ্ধতিতে। সমমনাদের কথা বলতে গেলে, তাঁরা তো একে সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন। বিরোধিগণও সাধরণতঃ এ ব্যাপারে যাঁচাই বাছাই ও সমালোচনার হক আদায় করেননি। একদল একে এ জন্য রদ করে যে, তার সনদ তাঁদের নিকটে সহীহ্ নয়। এর অর্থ এই যে, সনদ শক্তিশালী হলে এ হযরতগণ কাহিনীকে সত্য বলে মেনে নিতেন। অন্য দল একে এ জন্য প্রত্যাখ্যান করে যে, এর থেকে তো সমগ্র দ্বীনই সন্দেহ যুক্ত হয়ে পড়বে এবং দ্বীনের প্রতিটি বিষয়ের প্রতি সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হবে, এটা মনে করে যে কি জানি আর কোথায় কোথায় শয়তানী কুপ্ররোচনা অথবা কুপ্রবৃত্তির হস্তক্ষেপ হয়ে পড়েছে। অথচ এ ধরনের যুক্তি তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে যারা ঈমান আনার সংকল্পে অটল। কিন্তু অন্যান্য লোক যারা প্রথম থেকেই সন্দেহ পোষণ করতো অথবা যারা এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করতে চায় যে, ঈমান আনবে কি আনবেনা, তাদের মনে তো এ প্রেরণা সৃষ্টি হবেনা যে, যেসব বিষয়ের দ্বারা দ্বীন সন্দেহ যুক্ত বলে গণ্য হয়, সেসব প্রত্যাখ্যান করা। তারা তো বলবে, যখন অন্ততঃপক্ষে একজন প্রখ্যাত সাহাবী এবং বহু সংখ্যক তাবেয়ীন, তাব্‌য়ে তাবেয়ীন এবং বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারীর বর্ণনায় একটি ঘটনা প্রমাণিত হচ্ছে, তখন তা এ কারণে কেন প্রত্যাখ্যান করা হবে যে, তার দ্বারা আপনাদের দ্বীন সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ছে? এর স্থলে আপনাদের দ্বীন কেন সন্দেহযুক্ত মনে করা হবেনা যখন এ ঘটনা তাকে সন্দেহযুক্ত করছে?

এখন দেখার বিষয় এই যে, সমালোচনা বা যাঁচাই বাছাইয়ের সে সঠিক পদ্ধতি কি হতে পারে যার দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখলে এ অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হয়- তার সনদ যতোই শক্তিশালী হোকনা কেন।

প্রথম জিনিস স্বয়ং তার আভ্যন্তরীন সাক্ষ্য যা তাকে মিথ্যা প্রমাণ করে। কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, এ ঘটনা তখন সংঘটিত হয় যখন আবিসিনিয়ার প্রথম হিজরত সমাপ্ত হয়েছে এবং এ ঘটনার খবর পেয়ে মুহাজিরদের একটি দল মক্কায় ফিরে এসেছে। এখন তারিখের পার্থক্য লক্ষ্য করুনঃ

- নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে আবিসিনিয়ার হিজরত সংঘটিত হয় নবুওতের পঞ্চম বর্ষে রজব মাসে। মুহাজিরদের একটি দল সন্ধির ভুল খবর শুনে তিন মাস পর (অর্থাৎ সে বছরেই সম্ভবতঃ শওয়াল মাসে) মক্কায় ফিরে আসে। এর থেকে জানা গেল যে, এ ঘটনা নবুওতের পঞ্চম বর্ষে সংঘটিত হয়।

- সূরা বনী ইসরাইলের একটি আয়াত সম্পর্কে বলা হয় যে এ নবী (স) এর এ কাজের জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করে নাযিল করা হয় এবং তা মে'রাজের পর। আর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে মে'রাজ সংঘটিত নবুওতের একাদশ অথবা দ্বাদশ বৎসরে। তার

অর্থ এই যে, এ ঘটনার পাঁচ ছয় বছর পর আল্লাহ্ তায়ালা তার অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

- তারপর সূরা হজ্বের ৫২ নং আয়াতের পূর্বাপর বক্তব্য এ কথাই বলে যে, তা প্রথম হিজরী সনে নাযিল হয়। অর্থাৎ নবীর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করার দু'আড়াই বছর পর ঘোষণা করা হলো যে, এ সংমিশ্রণ যেহেতু শয়তানের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল সেহেতু তা মনসুখ বা রহিত করা হলো।

কোন বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি কি একথা বিশ্বাস করতে পারে যে, সংমিশ্রণের কাজ হলো আজ, অসন্তোষ প্রকাশ করা হলো ছ'বছর পর এবং সংমিশ্রণ রহিত করার ঘোষণা হলো নয় বছর পর?

অতঃপর এ কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, এ সংমিশ্রণ হয় সূরা নজমে এবং এভাবে যে প্রথম থেকেই নবী (স) আসল সূরার শব্দগুলো পড়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ومناة الثالثة الاخرى পর্যন্ত পৌছার পর তাঁর নিজের দ্বারা অথবা শয়তানী প্ররোচনায় এ বাক্যটি যোগ করা হয়। তারপর সূরা নজমের পরবর্তী আয়াতগুলো তিনি পড়তে থাকেন। এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, মক্কার কাফেরগণ তা শুনে খুব আনন্দিত হয় এবং বলে এখন আমাদের এবং মুহাম্মদের (স) মতপার্থক্য শেষ হয়ে গেল। কিন্তু সূরা নজমের বচনের ধারাবাহিকতায় এ সংযুক্ত বাক্যটি শামিল করে দেখুন।

- "অতঃপর তুমি কি চিন্তা করে দেখেছ এ লাত ও ওয্যা এবং তৃতীয় আর এক দেবী মানাত সম্পর্কে? এ সব উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দেবী। এদের শাফায়াত অবশ্যই আশা করা যায়। তোমাদের জন্য কি হবে পুত্র এবং তাঁর (আল্লাহর) জন্য কন্যা? এতো বড়ো অবিচারপূর্ণ বন্টন। প্রকৃত পক্ষে এ সব কিছুই না, শুধুমাত্র কয়েকটি নাম যা তোমরা ও তোমাদের বাপদাদা রেখে দিয়েছ, তাদের (সত্য হওয়ার) কোন সনদ আল্লাহ্ নাযিল করেননি। মানুষ শুধু আন্দাজ অনুমান ও মনগড়া ধারণার অনুসরণ করছে। অথচ তাদের রবের পক্ষ থেকে সঠিক পথ নির্দেশনা এসে গেছে।

দেখুন, উপরের বক্তব্যের মধ্যে নিম্নরেখাংকিত বাক্য দুটি কিরূপ সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতা সৃষ্টি করছে। এক নিঃশ্বাসে বলা হচ্ছে যে, সত্যি সত্যি তোমাদের দেবীগণ বড়ো উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এবং তাদের শাফায়াত অবশ্যই আশা করা যায়। পরবর্তী নিঃশ্বাসে তাদের উপর আঘাত করে বলা হচ্ছে ওরে নির্বোধেরা! তোমরা খোদার জন্য কন্যার প্রস্তাব কিভাবে করে রেখেছ? এ কেমন অবৈধ পন্থা যে, তোমরা তো লাভ করবে পুত্র সন্তান আর খোদার ভাগে পড়বে কন্যা? এসব তোমাদের মনগড়া কথা, খোদার পক্ষ থেকে যার কোন সনদ নেই। কিছুক্ষণের জন্য এ প্রশ্ন ছেড়ে দিন যে, এ অর্থহীন কথা কোন জ্ঞানী ব্যক্তির মুখ থেকে বেরুতে পারে কিনা। একথা মেনে নিন যে, শয়তান কর্তৃত্ব লাভ করে এ শব্দগুলো মুখ থেকে বের করিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কুরাইশের যে গোটা সমাবেশ তা শুনছিল তা কি পাগল ছিল যে, পরবর্তী বাক্যগুলো তো ঐ প্রশংসাসূচক কথাগুলোর সুস্পষ্ট খন্ডন শুনার পরও এ কথাই মনে করতে থাকে যে, তাদের দেবীদের প্রকৃতপক্ষে প্রশংসাই করা হয়েছে? সূরা নজমের শেষ পর্যন্ত গোটা প্রসংগটাই এই প্রশংসা সূচক বাক্যের একেবারে বিপরীত। কিভাবে বিশ্বাস করা যায় যে, কুরাইশের লোকেরা তা শেষ পর্যন্ত শুনার পরও আনন্দে চীৎকার করে বলে- চল আজ আমাদের ও মুহাম্মদের (স) মধ্যকার মতপার্থক্য শেষ হয়ে গেল?

এ তো হলো কাহিনীটির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য যা তাকে বানোয়াট ও অর্থহীন হওয়ার কথাই বলছে। তার পর দ্বিতীয় জিনিস যা দেখার তাহলো এই যে, এতে তিনটি আয়াতের

যে শানে নুযুল বর্ণনা করা হচ্ছে, কুরআনের ক্রমাগত ধারাবাহিকতা তা গ্রহণ করছে কিনা। কাহিনীতে বলা হচ্ছে যে, সংমিশ্রণ সূরায়ে নজমে হয়েছে যা নবুওতের পঞ্চম বৎসরে নাযিল হয়। এ সংমিশ্রণের জন্য সূরা বনী ইসরাইলে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। তারপর তার খন্ডন ও ব্যাখ্যা প্রদর্শন করা হয়, সূরা হজ্বের আয়াতে। এখন অবশ্যম্ভাবী রূপে দুটি অবস্থার যে কোন একটিই ঘটে থাকবে। হয় অসন্তোষ প্রকাশকারী ও খন্ডনকারী আয়াতগুলোও ঐ সময়ে নাযিল হয় যখন সংমিশ্রণের ঘটনা ঘটে। অথবা তারপর অসন্তোষ প্রকাশকারী আয়াত সূরা বনী ইসরাইলের সাথে এবং খন্ডনকারী আয়াত সূরা হজ্বের সাথে নাযিল হয়। প্রথম অবস্থা হলে এ কেমন আজব কথা যে, এ দুটি আয়াতই সূরা নাজমেই শামিল করা হয়নি, বরঞ্চ অসন্তোষ প্রকাশকারী আয়াতকে ছ'বছর পর্যন্ত এমনিতেই ফেলে রাখা হলো এবং সূরা বনী ইসরাইল যখন নাযিল হলো তখন তা তার মধ্যে এক স্থানে বসিয়ে দেয়া হলো। তারপর সংমিশ্রণ খন্ডনকারী আয়াত দু' আড়াই বছর ফেলে রাখা হলো এবং সূরা হজ্ব নাযিল হওয়া পর্যন্ত কোথাও তা সন্নিবেশিত করা হলোনা। কুরআনের অনুক্রমিক ধারাবাহিকতা কি এভাবে হয়েছে যে, এক সময়ের নাযিলকৃত আয়াতগুলো পৃথক পৃথক ও বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকতো এবং কয়েক বছর পর কোনটিকে কোন সূরার সাথে এবং কোনটিকে অন্য কোন সূরার সাথে গেঁথে দেয়া হতো?

কিন্তু যদি দ্বিতীয় অবস্থা হয় যে, অসন্তোষ প্রকাশকারী আয়াত ঘটনার ছ'বছর পর এবং খন্ডনকারী আয়াত আট নয় বছর নাযিল হয়েছে, তাহলে যে অপ্রাসংগিকতার (irrelevence) উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে করেছি তাছাড়া এ প্রশ্ন জাগে যে, সূরা বনী ইসরাইল ও সূরা হজ্বে তা নাযিল হওয়ার অবকাশ কোথায়?

এখানে পৌছার পর সমালোচনা ও যাঁচাই বাছাইয়ের সঠিক পদ্ধতি আমাদের সামনে এসে যায়। অর্থাৎ এই যে, কোন আয়াতের যে তাফসীর বর্ণনা করা হয়- তা দেখতে হবে যে কুরআনের পূর্বাপর প্রসংগ তা গ্রহণ করে কিনা। সূরা বনী ইসরাইলের অষ্টম রুকু পড়ে দেখুন এবং তার আগের এবং পরের বক্তব্যের উপরও চোখ বুলিয়ে নিন। এ বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় এ কথার কি সুযোগ আছে যে, ছ'বছর পূর্বের একটি ঘটনা প্রসংগে নবীকে তিরস্কার করা হচ্ছে। (অবশ্যি এটাও দেখার বিষয় যে وَإِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ আয়াতে নবীকে (স) তিরস্কার করা হয়েছে কিনা এবং আয়াতের শব্দগুলো কাফেরদের সৃষ্ট ফেৎনায় নবীর লিপ্ত হওয়ার প্রতিবাদ করছে, না তার সত্যতা স্বীকার করছে? এ ভাবে সূরা হজ্ব পড়ে দেখুন- ৫২ নং আয়াতের পূর্ববর্তী বক্তব্য পড়ুন এবং পরবর্তী বক্তব্যও। কোন যুক্তিসংগত কারণ আপনি খুঁজে পাচ্ছেন যে, এ পূর্বাপর প্রসংগের মধ্যে হঠাৎ একথা কি করে এসে গেল যে- "হে নবী! নয় বছর পূর্বে কুরআনের মধ্যে সংমিশ্রণ করার যে কাজ তোমার দ্বারা হয়েছিল, তার জন্য চিন্তা করোনা। পূর্ববর্তী নবীগণের দ্বারাও শয়তান এ কাজ করিয়েছে এবং নবীগণ যখন এ কাজ করেছেন তখন আল্লাহ্ তা মনসূখ করে স্বীয় আয়াতকে পুনরায় পাকাপোক্ত করে দেন।"

আমরা ইতিপূর্বে বার বার একথা বলেছি এবং পুনরায় তার পুনরাবৃত্তি করছি যে, কোন রেওয়ায়েত (বর্ণনা) সনদের দিক দিয়ে সূর্য অপেক্ষাও উজ্জ্বল হোক না কেন, এমন অবস্থায় গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা যদি দেখা যায় যে তার মূল বচন (মতন) তার ভুল হওয়ার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং কুরআনের শব্দগুলো তার পূর্বাপর উক্তি ক্রমবিন্যাস প্রভৃতি প্রতিটি বস্তু তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। এ যুক্তিসমূহ তো একজন সন্দেহ পোষণকারী এবং নিরপেক্ষ গবেষকের মনেও দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করবে যে, এ কাহিনী একেবারে মিথ্যা। এখন

রইলো একজন মুমেনের ব্যাপার। তো সে একে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনা যখন সে প্রকাশ্যতঃ দেখতে পাচ্ছে যে, এ বর্ণনা কুরআনের একটি নয় বরঞ্চ বহু আয়াতের সাথে সংঘর্ষিক। একজন মুসলমানের জন্য একথা মেনে নেয়া অতি সহজ যে, এ বর্ণনার (রেওয়াতের) প্রণেতাগণকে বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। পক্ষান্তরে সে কিছুতেই একথা বিশ্বাস করতে পারেনা যে, রসূলুল্লাহ (স) কখনো তাঁর মনের ইচ্ছামত কুরআনের মধ্যে একটি শব্দও সংযোজন করতে পারেন। অথবা হুযুর (স) এর মনে কখনো মুহূর্তের জন্য এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, তৌহীদের সাথে শির্কের কিছু সংমিশ্রণ করে কাফেরদেরকে খুশী করবেন। অথবা তিনি আল্লাহ্ তায়ালার ফরমানগুলো সম্পর্কে এমন অভিলাষ পোষণ করতে পারতেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা এমন কোন কথা বলে না ফেলেন যাতে কাফেরগণ নারাজ হয়ে যায়। অথবা এমন ধারণা যে, তার উপর অরক্ষিত ও সন্দেহযুক্ত পন্থায় অহী আসতো যাতে জিব্রিল (আ) এর সাথে শয়তানও তাঁর উপর কোন শব্দ অন্তর্নিবিষ্ট করে দেয় এবং তিনি এ ভুল ধারণা করেন যে, এও জিব্রিল (আ) এনেছেন। এ সবের প্রতিটি কথাই কুরআনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসমূহের পরিপন্থী। উপরন্তু তা ঐসব প্রমাণিত আকীদারও পরিপন্থী যা আমরা কুরআন এবং মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে পোষণ করে থাকি। এমন এক রেওয়ায়েত পুরস্তি (অন্ধভাবে মেনে নেয়ার প্রবণতা) যা নিছক সনদের ইত্তেসাল, রাবীগণের বিশ্বস্ততা এবং বর্ণনা পদ্ধতির আধিক্য দেখে কোন মুসলমানকে খোদার কিতাব ও তাঁর রসূল সম্পর্কে এমন কঠিন কথাও মেনে নিতে প্রস্তুত করে তার থেকে খোদার পানাহ্ বা আশ্রয় চাই।

রাবীগণের এত বিরাট সংখ্যাকে এ কাহিনী বর্ণনায় লিপ্ত দেখে মনে যে সন্দেহের উদ্রেক হয়-তা দূর করাও সমীচীন মনে করছি। কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, এ কাহিনীর যদি কোন ভিত্তিই না থাকে, তাহলে নবী (স) এবং কুরআনের উপর এতো বড়ো মিথ্যাচার হাদীসের এমন সব নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করলো কিভাবে? তার জবাব এই যে, তার কারণগুলো স্বয়ং হাদীসের ভান্ডার থেকেই পাওয়া যায়। বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী এবং মুসনাদে আহমদে প্রকৃত ঘটনা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

নবী (স) সূরা নজম তেলাওত করেন এবং শেষে যখন তিনি সিজদা করেন, তখন উপস্থিত সকলে, মুসলিম ও মুশরিক, সিজদায় পড়ে যায়। ঘটনা শুধু এতোটুকু। আর এ কোন বিস্ময়কর ব্যাপার ছিলনা। প্রথমত কুরআনের শক্তিশালী বক্তব্য হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা ভংগী, এবং তারপর নবী (স) এর মুখে তা অহীর মর্যাদাসহ আবৃত্তি করা। তা শুনার পর যদি গোটা সমাবেশ আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়ে সকলে নবী (স) এর সাথে সিজদারত হয়ে যায় তো এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। এটাই তো সেই বস্তু যার জন্য কুরাইশের লোকেরা বলতো যে, এ লোকটি একজন যাদুকর। অবশ্যি একথা জানা যায় যে, পরে কুরাইশের লোকেরা তাদের এ সামাজিক প্রতিক্রিয়ার জন্য লজ্জিত হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি অথবা কতিপয় লোক তাদের এ কাজের কারণ এটা নির্ণয় করে, মুহম্মদের (স) মুখে আমরাতো আমাদের আপন কানে আমাদের মা'বুদদের প্রশংশায় কিছু কথা শুনতে পেয়েছিলাম যার জন্য আমরা তাঁর সাথে সিজদা করি।[১]

---

১. ইয়াকুত মু'জামুল বুলদানে 'ওয্যা' শব্দের শিরোনামে একথা লিখেছেন যে, কুরাইশের লোকেরা কাবার তাওয়াফ করতে করতে বলতো-

অন্যদিকে এ ঘটনা মুহাজিরদের নিকটে এভাবে পৌঁছে যে, নবী (স) এবং কুরাইশদের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেছে। কারণ দর্শকেরা নবী (স) ও মুশরিকদেরকে একত্রে সিজদা করতে দেখে। এ গুজব এমন উত্তাপ সৃষ্টি করে যে, সকল মুহাজির অথবা তাদের অধিকাংশ মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। এক মতকের মধ্যে এ তিনটি কথা অর্থাৎ কুরাইশদের সিজদা, সিজদার এ কারণ এবং মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন একত্রে মিলিত হয়ে এ কাহিনীর রূপ পরিগ্রহ করে এবং কতিপয় নির্ভরযোগ্য লোক এ বর্ণনায় লিপ্ত হয়ে পড়েন। মানুষ তো মানুষই বটে। বিরাট নেক ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ব্যক্তিও অনেক সময় ভুল করে ফেলেন। তাঁদের ভুল সাধারণ মানুষের ভুল থেকে অধিকতর ক্ষতিকর হয়ে থাকে। শ্রদ্ধায় সীমালংঘনকারীগণ এসব বুযুর্গের সঠিক কথার সাথে ভুল কথাকেও চক্ষু বন্ধ করে মেনে নেয়। আর বিদ্বেষ পরায়ণ লোক বেছে বেছে তাঁদের ভুলগুলো একত্র করে এবং সেগুলোকে এ কথার যুক্তি প্রমাণ হিসাবে পেশ করে যে, তাঁদের মাধ্যমে যে সব আমাদের নিকটে পৌঁছেছে তা সবই প্রত্যাখ্যানযোগ্য।(৮)

প্রত্যাবর্তনকারী মুহাজিরগণের অবস্থা

মক্কাবাসীদের মুসলমান হওয়ার কথা শুনে নবুওতের ৫ম বৎসর শওয়াল মাসে মুহাজিরগণ আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইবনে সা'দ বলেন, সকল মুহাজির মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু ইবনে ইসহাক বলেন, কিছু সংখ্যক আসেন আর কিছু সংখ্যক আসেননি। বালাযুরী আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরতকারীদের সকলের প্রত্যাবর্তনের কথাই শুধু বলেননি, বরঞ্চ তাঁদের সকলের তালিকা পেশ করে বলেন, কে কার আশ্রয়ে মক্কা প্রবেশ করেন। তাঁরা মক্কার নিকটে পৌঁছার পর বনী কিনানার এক ব্যক্তির সাথে তাঁদের দেখা হয়। তার নিকটে তাঁরা কুরাইশদের অবস্থা জানতে চান। সে বলে, মুহাম্মদ (স) তাদের মাবুদদের প্রশংসাসূচক উল্লেখ করেন। ফলে তারা সব মুহাম্মদের (স) পক্ষ হয়ে যায়। অতঃপর তাঁরা (মুহাজিরগণ) পূর্বের ন্যায় তাদের মাবুদদের নিন্দা করতে থাকলে তারাও তাঁদের সাথে কঠোর আচরণ করে।

এ অবস্থায় মুহাজিরগণ পরস্পর এ বিষয়ে পরামর্শ করে বলেন, আমরা কি পুণরায় আবিসিনিয়ায় চলে যাব, না এসেই যখন পড়েছি তো মক্কায় প্রবেশ করিনা কেন। তারপর দেখা যাবে কি করা যায়। অতএব তাঁদের প্রত্যেকে কারো না কারো আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। ব্যতিক্রম শুধু ইবনে মাস্‌উদ (রা) যিনি কারো আশ্রয় ব্যতিরেকেই মক্কায় প্রবেশ করেন এবং কিছু সময় অবস্থান করে আবিসিনিয়া চলে যান। ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কে এ কথা বলেন- ইবনে সাদ, বালাযুরী এবং অন্যান্যগণ। কিন্তু ইবনুল কাইয়েম, যাদুল মায়াদে বলেছেন যে, তিনি মক্কাতেই রয়ে যান। অপরদিকে ইবনে ইসহাকের বক্তব্য আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি যে, তিনি মোটেই হিজরত করেননি।

বালাযুরী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যাবর্তনকারী মুহাজিরদের মক্কা প্রবেশ করতে গিয়ে কে কার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

واللّٰت والعزّٰى ومنوٰة الثالثة الاخرى فانهن غرانيق العلى
وان شفاعتهن لترجىٰ -

এর থেকে এ অনুমান করা যায় যে, হুযুরের (স) মুখে লাত ও ওয্যার উল্লেখ শুনার পর কেউ তাঁর আওয়াজের সাথে আওয়াজ মিলিয়ে এ কথাগুলো বলে থাকবে এবং দূর থেকে যারা শুনেছে তাদের মধ্যে এর থেকে ভুল ধারণা হয়ে থাকবে- গ্রন্থকার।

১. হযরত ওসমানকে (রা) আশ্রয় দেন আবু ওহায়না সাঈদ বিন আল্ আস্।
২. হযরত আবু হুযায়ফা (রা) বিন ওত্বা বিন রাবিয়াকে আশ্রয় দেন- উমাইয়া বিন খালাফ।
৩. হযরত যুবাইর (রা) বিন আল্ আওয়াম- আশ্রয়দাতা- যামায়া বিন্ আল্ আসওয়াদ।
৪. হযরত মুসয়াব (রা) বিন ওমাইর- আশ্রয়দাতা- নদর বিন আল হারেস বিন কালাদাহ্ (অথবা আবু আযীয বিন ওমাইর)।
৫. হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ- আশ্রয়দাতা- আসওয়াদ বিন্ আব্দে ইয়াগুস্।
৬. হযরত আমের বিন রাবিয়া- আশ্রয়দাতা- আস্ বিন ওয়াইল সাহ্মী।
৭. হযরত আবু সাব্রা (রা) বিন আবি রুহ্ম- আশ্রয়দাতা- উখনাস্ বিন্ শুরাইক।
৮. হযরত হাতেব (রা) বিন আমর- আশ্রয়দাতা- হুয়ায়তিব বিন আবদুল ওয্যা।
৯. হযরত সুহাইল (রা) বিন বায়দা- আশ্রয়দাতা- তাঁর গোত্রের কোন ব্যক্তি। (অন্য বর্ণনা মতে তিনি মক্কায় আত্মগোপন করে থাকেন। অতপর আবিসিনিয়া চলে যান)।

বালাযুরী- ওয়াকেদীর- বরাত দিয়ে এবং ইবনে হিশাম কিছু মতপার্থক্যসহ ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে বলেন যে, হযরত ওসমান (রা) বিন মযউন- অলীদ বিন মগীরার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, অন্যান্য মুসলমানদের উপর চরম নির্যাতন চলছে এবং অলীদের আশ্রয়ে বড়ো শান্তিতে আছেন ও চলাফেরা করছেন, তখন তিনি লজ্জাবোধ করেন এবং মনে মনে ভাবতে থাকেন যে, যখন আমার সংগীসাথী আহ্লে দ্বীন বিপদে আছেন আর আমি একজন মুশরিকের আশ্রয়ে রয়েছি- এ আমার মনের বিরাট দুর্বলতা। অতএব তিনি অলীদকে বল্লেন, আপনি আমাকে আপনার আশ্রয় থেকে মুক্ত করে দিন। অলীদ বলেন, বৎস তুমি কি আমার আশ্রয়ে মংগল ছাড়া অন্য কিছু দেখেছ? কেউ কি তোমার সাথে কোন কদাচারণ করেছে? হযরত ওসমান (রা) জবাবে কোন অভিযোগ না করে বলেন, আমি আল্লাহ্র আশ্রয় চাই। তিনি ব্যতীত অন্যের আশ্রয়ে থাকা পছন্দ করিনা। অলীদ বলেন, তাহ্লে চল হেরেমে গিয়ে আশ্রয় থেকে মুক্ত হওয়ার ঘোষণা কর- যেমন আমি আশ্রয়দানের ঘোষণা করেছিলাম। হযরত ওসমান (রা) সন্তুষ্টচিত্তে তৈরী হয়ে যান। তিনি এবং অলীদ একত্রে হেরেমে যান। অলীদ বলেন, এ ওসমান আমার আশ্রয় ফিরে দিতে এসেছে। হযরত ওসমান (রা) বলেন, ঠিক কথা। আমি অলীদের আশ্রয়কে একজন সম্ভ্রান্ত ও বিশ্বস্ত লোকের আশ্রয় হিসাবে পেয়েছি। কিন্তু আমি এখন আল্লাহ্ ছাড়া কারো আশ্রয়ে থাকতে চাইনা। এজন্য তাঁর আশ্রয় আমি ফিরে দিয়েছি। সে সময়ে আরবের প্রখ্যাত কবি লাবীদ বিন রাবিয়া মক্কায় এসেছিলেন। তিনি তাঁর কবিতা শুনাতে গিয়ে এ ছত্রটিও বলেন-

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلٌ

"সাবধান থেকো। আল্লাহ্ ছাড়া সব কিছুই মিথ্যা।"

হযরত ওসমান (রা) বিন মযউন চিৎকার করে বলেন, আপনি ঠিক বলেছেন।

তারপর তিনি যখন দ্বিতীয় ছত্রটি পড়েন-

وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ

"এবং প্রত্যেক নিয়ামত অবশ্যই ধ্বংসশীল।"

হযরত ওসমান (রা) বলেন, এ মিথ্যা কথা। বেহেশতের নিয়ামত ধ্বংস হবার নয়।

লাবীদ এতে রেগে যান এবং কুরাইশদের লক্ষ্য করে বলেন- আপনাদের সাথে বসা কোনদিন অপমানজনক ছিলনা এবং বদতমিজি ও বেয়াদবি আপনাদের জন্য শোভনীয় ছিলনা। এতে বনী মগীরার এক ব্যক্তি উঠে হযরত ওসমানের মুখে সজোরে থাপ্পড় মারে যার ফলে তার চোখ নীল বর্ণ ধারণ করে। অলীদ উপহাস করে বলেন, বৎস এতে তোমার কি লাভ হলো? জবাবে ওসমান বলেন, আমার দ্বিতীয় চোখটিও সে আঘাতের প্রত্যাশী যা তার সাথী পেয়েছে। অলীদ বলেন, তুমি এমন লোকের জিম্মায় ছিলে যে তোমার হেফাজতকারী। হযরত ওসমান (রা) বলেন, খোদার কসম! এখন আমি আল্লাহর আশ্রয় ব্যতীত অন্য কারো আশ্রয় গ্রহণ করবনা। এ আলোচনার সময় আবদুল্লাহ বিন আবি উমাইয়া বিন মগীরা সেই ব্যক্তির নাকে আঘাত করে ক্ষতবিক্ষত করে দেয় যে হযরত ওসমানকে থাপ্পড় মেরেছিল।

ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে ইবনে হিশাম বলেন, হযরত আবু সালামা তাঁর মামু আবু তালেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কারণ তিনি আবু তালেবের ভগ্নি বাররা বিন্তে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র ছিলেন। বনী মাখযুম আবু তালেবকে বলে, আপন ভাতিজাকে তো আপনি নিজের আশ্রয়ে রেখেছেন, কিন্তু আমাদের লোকের সাথে আপনার কি সম্পর্ক যে তাকে আপনি আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন? তিনি বলেন, মুহাম্মদ (স) আমার ভাতিজা, আর আবু সালামা আমার ভাগ্না। ভাতিজাকে যদি আশ্রয় দিতে পারি তো ভাগ্নাকে কেন পারবনা? বনী মাখযুম কিছু ঝগড়া করতে যাচ্ছিল এমন সময় আবু লাহাব দাঁড়িয়ে বল্লো, হে আহলে কুরাইশ! তুমি আমাদের মুরুব্বীর সাথে অনেক কিছু করলে এবং তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছ যাতে তিনি নিজের কওমের মধ্যে যাকে আশ্রয় দেন তাকে তাঁর আশ্রয় থেকে বের করে নেবে। খোদার কসম! হয় তুমি তাঁকে বিরক্ত করা থেকে বিরত হও, নতুবা আমিও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে যাব।

বনী মাখযুম আবু লাহাবের একথা শুনে ঘাবড়ে যায় এবং বলে, হে আবু ওত্‌বা, আমরা আপনাকে নারাজ করতে চাইনা।

তাবারী বলেন, প্রত্যাবর্তনকারীদের মধ্যে হযরত ওসমান (রা) বিন আফফান ও তাঁর স্ত্রী হযরত রুকাইয়া (রা) বিন্তে রসূলুল্লাহ (স), হযরত আবু হুযায়ফা (রা) ও তাঁর স্ত্রী সাহ্‌লা বিন্তে সুহাইল বিন আমর মক্কায় রয়ে যান এবং মদীনায় হিজরত করা পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেন। কিন্তু এ বর্ণনায় সন্দেহ রয়েছে। কারণ ইবনে ইসহাক আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরতকারীদের মধ্যে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর নাম তেত্রিশজন পুরুষ ও আটজন মহিলার সে দলটির মধ্যে শামিল করেছেন- যা হুযুরের (স) মদীনায় হিজরত করার পূর্বে আবিসিনিয়া থেকে মক্কা আসে। যাদের মধ্যে দু'জন মৃত্যুবরণ করেন, সাতজন বন্দী হয় এবং চব্বিশ জন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় বার হিজরত

মক্কার মুসলমানদের উপর নির্যাতন- নিষ্পেষণ, যখন চরমে পৌছলো এবং নবী (স) দেখলেন যে, আবিসিনিয়া মুসলমানদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় স্থান প্রমাণিত হলো, তখন তিনি পুনরায় নির্দেশ দেন যে, মজলুম লোক আবিসিনিয়ায় চলে যাক। অতএব নবুওতের ষষ্ঠ বৎসর (৬১৫ খৃঃ) দ্বিতীয় হিজরত অনুষ্ঠিত হয়। যদিও কুরাইশ হিজরতে বাধা দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে, হিজরতকারীদের নানানভাবে ত্যক্ত বিরক্ত করে, তথাপি এবার আশিরও অধিক পুরুষ এবং আঠার উনিশ জন মহিলা নিরাপদে আবিসিনিয়ায় পৌছে যান। ইবনে

সা'দ পুরুষের সংখ্যা ৮৩ জন বলেছেন এবং মহিলাদের ১১ জন কুরায়শী এবং ৭ জন অকুরাইশীর উল্লেখ করেছেন। ৮৩ জন পুরুষের মধ্যে আম্মার বিন ইয়াসেরের (রা) নামও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ইবনে ইসহাক তাঁর শরীক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন। ওয়াকেদী, ইবনে ওকবা প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলেছেন যে, তিনি তাদের মধ্যে শামিল ছিলেননা। পক্ষান্তরে ইবনে আবদুল বার্‌র দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, তিনি তাঁদের মধ্যে ছিলেন। এভাবে এসব মুহাজিরদের মধ্যে হযরত আবু মূসা আশয়ারীর (রা) নামও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সত্য কথা এই যে, তিনি মক্কা থেকে হিজরত করেননি। বরঞ্চ তিনি প্রথমে এসে মুসলমান হয়ে ইয়ামেনে ফিরে যান এবং সেখানে ইসলাম প্রচারের কাজ করতে থাকেন। তারপর আপন কওমের কিছু সংখ্যক লোকসহ (যাদের সংখ্যা ৫২/৫৩ জন বলা হয়েছে) একটি নৌকা যোগে ইয়ামেন থেকে রওয়ানা হন। কিন্তু বাতাস তাঁদের নৌকাকে আবিসিনিয়ার তীরে পৌঁছিয়ে দেয়। এভাবে তাঁরা মুহাজিরদের সাথে মিলিত হন। বোখারী ও মুসলিমে আবু মূসার (রা) নিজস্ব বর্ণনা এরূপই আছে। তিনি বলেন, আমরা যখন রসূলুল্লাহর (স) নবুওতের ঘোষণা শুনলাম এবং যখন আমরা ইয়েমেনে ছিলাম, তখন আমরা একটি নৌকা যোগে যাত্রা করলাম। কিন্তু আমাদের নৌকা আমাদেরকে আবিসিনিয়ায় পৌঁছিয়ে দিল। সেখানে আমরা হযরত জাফর বিন আবি তালেবের সাথে মিলিত হলাম। অতঃপর খায়বর বিজয়ের সময় তাঁর সাথে খায়বর পৌঁছি। ইবনে সা'দ হযরত আবু মূসার এরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করেন, আমরা ইয়েমেন থেকে আপন কওমের পঞ্চাশেরও বেশী লোকসহ বেরিয়ে পড়ি এবং আমাদের নৌকা আমাদেরকে নাজ্জাশীর (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) এলাকায় পৌঁছিয়ে দেয়। প্রথম থেকেই সেখানে হযরত জাফর (রা) বিন আবু তালেব অবস্থান করছিলেন।

মুহাজিরগণের তালিকা

মুহাজিরগণের এ তালিকা দৃষ্টে এ হিজরতের গুরুত্ব অনুমাণ করা যায় যা ইবনে হিশাম- ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে সন্নিবেশিত করেছেন।

বনী হাশেম থেকে

১. হযরত জাফর বিন আবি তালেব (রা)।

২. তাঁর স্ত্রী আস্‌মা বিন্তে ওমাইস খাশ্‌য়ামিয়া।

বনী উমাইয়া থেকে

৩. হযরত ওসমান বিন আফফান (রা)।

৪. তাঁর বিবি হযরত রুকাইয়া (রা) বিন্তে রসূলুল্লাহ (স)।

৫. আমর বিন সাঈদ বিন আল্‌ আস (রা)।

৬. তাঁর বিবি ফাতেমা বিন্তে সাফওয়ান।

৭. তাঁর ভাই খালেদ বিন সাঈদ বিন আল্‌ আস (রা)।

৮. তাঁর বিবি উমাইনা খালাফ।

বনী উমাইয়ার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ কওম থেকে

৯. হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহশ (রা)। (বনী গানম বিন দুদান থেকে এবং উম্মুল মুমেনীন হযরত যয়নবের (রা) ভাই)

১০. তাঁর ভাই ওবায়দুল্লাহ বিন জাহশ (রা)।

১১. তাঁর বিবি উম্মে হাবিবা।
১২. কায়েস বিন আবদুল্লাহ (রা)।
১৩. তাঁর বিবি বারাকা বিন্তে ইয়াসার।
১৪. মুয়াইকিব বিন আবি ফাতেমা।

বনী আব্দে শামস বিন আব্দে মানাফ থেকে
১৫. আবু হুযায়ফা (রা) বিন ওত্বা বিন রাবিয়া।
১৬. ওত্বা বিন গায্ওয়ান (রা)।
১৭. যুবাইর (রা) বিন আল আওয়াম বিন খুয়ায়লেদ।
১৮. আস্ওয়াদ (রা) বিন নাওফাল বিন খুয়ায়লেদ,
(যুবাইর ও আস্ওয়াদ হযরত খাদিজার (রা) ভাতিজা ছিলেন)।
১৯. ইয়াযিদ (রা) বিন যামায়া বিন আসওয়াদ বিন মুত্তালিব।
২০. আমর (রা) বিন উমাইয়া বিন হারেস বিন আসাদ।

বনী আবদ বিন কুসাই থেকে
২১. তুলাইব (রা) বিন উমাইর বিন ওহাব (ইনি হুযুরের (স) ফুফাতো ভাই)।

বনী আবদুদ্দার বিন কুসাই থেকে
২২. মুস্আব (রা) বিন ওমাইর বিন হাশেম।
২৩. সুয়ায়বেত (রা) বিন সাদ।
২৪. জাহ্ম (রা) বিন কায়েস।
২৫. তাঁর বিবি উম্মে হারমালা (রা) বিন্তে আবদুল আসওয়াদ।
২৬. তাঁর পুত্র আমর (রা) বিন জাহ্ম।
২৭. তাঁর অন্য পুত্র খুযায়মা (রা) বিন জাহ্ম।
২৮. আবুর রুম্ (রা) বিন ওমাইর বিন হাশেম।
২৯. কিরাম (রা) বিন নাদার বিন হারেস বিন কালাদা।
৩০. আবদুর রহমান বিন আওফ (রা)।
৩১. আমের বিন আবি ওক্কাস (রা)।
(সা'দ বিন আবি ওক্কাসের ভাই)
৩২. মুত্তালিব বিন আয্হার (রা)।
৩৩. তাঁর বিবি রামলা বিন্তে আবি আওফ।

বনী যুহরার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ
৩৪. আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা)।
৩৫. তাঁর ভাই ওত্বা মাসউদ (রা)।
৩৬. মিকদাদ বিন আমর (রা)।

বনী তাইম থেকে
৩৭. হারেস বিন খালেদ (রা)।
৩৮. তাঁর বিবি রায়তা (রা) বিন্তে আল হারেস বিন হাবালা।
৩৯. আমর বিন ওসমান (রা)।

বনী মাখযুম থেকে

৪০. আবু সালামা বিন আবদুল আসাদ (রা)।
৪১. তাঁর বিবি উম্মে সালামা।
৪২. শাম্মাস বিন ওসমান (রা)।
৪৩. হাববার বিন সুফিয়ান (রা)।
৪৪. তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ বিন সুফিয়ান (রা)।
৪৫. হিশাম বিন আবি হুযায়ফা বিন মগীরা (রা)।
৪৬. সালামা বিন হিশাম বিন মুগীরা (রা)।
৪৭. আয়য়াশ বিন আবি রাবিয়া (রা)।

বনী মাখযুমের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ

৪৮. মুয়াত্তিব বিন আওফ (রা)।

বনী জুমাহ্ থেকে

৪৯. ওসমান বিন মাযউন (রা)।
৫০. তাঁর পুত্র সায়েব বিন ওসমান (রা)।
৫১. কুদামা বিন মাযউন (ওসমানের ভাই) (রা)।
৫২. দ্বিতীয় ভাই আবদুল্লাহ্ বিন মাযউন (রা)।
৫৩. হাতেব বিন আল্ হারেস (রা)।
৫৪. তাঁর বিবি ফাতেমা বিন্তে মুজাল্লেলে আমেরিয়া।
৫৫. তাঁর পুত্র মুহাম্মদ বিন হাতেব (রা)।
৫৬. তাঁর দ্বিতীয় পুত্র হারেস বিন হাতেব (রা)।
৫৭. তাঁর ভাই খাত্তাব বিন হারেস (রা)।
৫৮. তাঁর বিবি ফুকায়হা বিন্তে ইয়াসার।
৫৯. সুফিয়ান বিন মা'মার (রা)।
৬০. তাঁর পুত্র জাবের বিন সুফিয়ান (রা)।
৬১. তাঁর দ্বিতীয় পুত্র জুনাদা বিন সুফিয়ান (রা)।
৬২. তাঁর বিবি হাসানা (রা)- জাবের ও জুনাদার মা।
৬৩. হাসানার দ্বিতীয় স্বামীর পক্ষের পুত্র শুর জাবিল বিন হাসানা (রা)।
৬৪. ওসমান বিন রাবিয়া বিন উহ্বান (রা)।

বনী সাহ্ম থেকে

৬৫. খুনাইস বিন হুযাফা (রা), (হযরত ওমরের (রা) জামাই)।
৬৬. আবদুল্লাহ্ বিন হারেস (রা)।
৬৭. হিশাম বিন আস বিন ওয়ায়েল (রা)।
৬৮. কায়েস বিন হুযাফা (রা)।
৬৯. আবু কায়েস বিন হারেস (রা)।
৭০. আবদুল্লাহ্ বিন হুযাফা (রা)।
৭১. হারেস বিন হারেস বিন কায়েস (রা)।
৭২. মুয়াম্মার বিন হারেস বিন কায়েস (রা)।
৭৩. বিশার বিন হারেস বিন কায়েস (রা)।
৭৪. তাঁর বৈমাত্রিক ভাই সাঈদ বিন আমর (রা)।

৭৫. সাঈদ বিন হারেস বিন কায়েস (রা)।
৭৬. সায়েব বিন হারেস বিন কায়েস (রা)।
৭৭. ওমাইর বিন রিয়াব (রা)।

বনী সাহমের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ

৭৮. মাহমিয়া বিন আল্ জায্য়া (রা)।
৭৯. মুয়াম্মার বিন আবদুল্লাহ্ বিন নাদলা (রা)।
৮০. ওরওয়া (রা) বিন আবদুল ওয্যা।
৮১. আদী বিন নাদলা (রা)।
৮২. তাঁর পুত্র নু'মান বিন আদী (রা)।

বনী আদীর সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ

৮৩. আমের বিন রাবিয়া আল্ আনযী (রা)।
৮৪. তাঁর বিবি লায়লা বিন্তে আবি হাস্মা (রা)।

বনী আমের বিন লুই থেকে

৮৫. আবু সাবরা বিন আবি রুহ্ম (রা)।
৮৬. তাঁর বিবি উম্মে কুলসুম বিন্তে সুহাইল বিন আমর।
৮৭. আবদুল্লাহ্ বিন মাখ্রামা (রা)।
৮৮. আবদুল্লাহ্ বিন সুহাইল বিন আমর (রা)।
৮৯. সলীত বিন আমর (রা)।
৯০. তাঁর ভাই সাকরাম বিন আমর (রা)।
৯১. তাঁর বিবি সাওদা বিন্তে যামায়া (রা)
(পরে তাঁর উম্মুল মুমেনীন হওয়ার সৌভাগ্য হয়)।
৯২. মালেক বিন যামায়া (রা) (হযরত সওদার ভাই)।
৯৩. তাঁর বিবি আমরা বিন্তে আস্সা'দী (রা)।
৯৪. হাতেব বিন আমর (রা)।

বনী আমেরের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ

৯৫. সা'দ বিন খাওলা (রা)।

বনী হারেস বিন ফিহ্র থেকে

৯৬. আবু ওবায়দা বিন আল্ জাররাহ্ (রা)।
৯৭. সুহাইল বিন বায়দা (রা)।
৯৮. আমর বিন আবি সারহ্ (রা)।
৯৯. ইয়াদ বিন যুহাইর (রা)।
১০০. আমর বিন আল হারেস বিন যুহাইর (রা)।
১০১. ওসমান বিন আবেদ গানাম বিন যুহাইর (রা)।
১০২. সা'দ বিন আবদে কায়স (রা)।
১০৩. হারেস বিন আবদে কায়েস (রা)।(৯)

মক্কায় এ হিজরতের প্রতিক্রিয়া

এ হিজরতের ফলে মক্কার ঘরে ঘরে বিলাপ ও আর্তনাদ শুরু হয়। কারণ কুরাইশের বড়ো ও ছোট পরিবারের এমন কেউ ছিলনা যার প্রাণপ্রিয় সন্তান এ হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। কারো পুত্র গিয়েছেতো কারো জামাতা। কারো কন্যা গিয়েছে তো কারো ভাই অথবা ভগ্নি। আবু জাহলের ভাই সালামা বিন হিশাম (রা), তাঁর চাচাতো ভাই হিশাম বিন আবি হুযায়ফা (রা) ও আয়্যাশ বিন আবি রাবিয়া (রা), তার চাচাতো ভগ্নি হযরত উম্মে সালমা (রা), আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবা (রা), ওত্বা বিন রাবিয়ার পুত্র এবং কলিজা ভক্ষণকারী হিন্দের সহোদর ভাই আবু হুযায়ফা (রা), সুহাইল বিন আমরের পুত্র, কন্যাগণ এবং জামাতা। এভাবে অন্যান্য কুরাইশ সর্দার ও প্রখ্যাত ইসলাম দুশমনদের আপন সন্তানাদি দ্বীনের খাতিরে বাড়িঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। এ জন্য এমন কোন গৃহ ছিলনা যা এ ঘটনায় বেদনাহত হয়নি। কতিপয় লোক পূর্ব থেকে অধিকতর ইসলাম দুশমন হয়ে পড়ে। আবার কিছু লোকের মনে এর এমন প্রভাব পড়ে যে, তারা মুসলমান হয়ে যায়।(১০)

হযরত আবু বকরের (রা) হিজরতের ইচ্ছা

এরপর আর এক আঘাত কুরাইশগণ পেল যখন হযরত আবু বকরের (রা) মতো একজন সম্মানিত ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (স) নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়েন যাতে অন্যান্য মুহাজিরদের সাথে মিলিত হতে পারেন। বোখারীতে, হযরত আয়েশার (রা) বর্ণনা মতে, যখন তিনি বারকুল গেমাদ[১] নামক স্থানে পৌছেন (মক্কা থেকে ইয়ামেনের দিকে পাঁচ দিনের পথে)। তখন কারা গোত্রের সর্দার ইবনুদ্ দুগুন্নার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ইবনে ইসহাক যুহরী, তারপর ওরওয়া, তারপর হযরত আয়েশার (রা) সনদে বর্ণনা করেন যে, আবু বকর (রা) মক্কা থেকে এক অথবা দু'দিনের পথ অতিক্রম করার পর ইবনুদ দুগুন্নার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি সেকালে আহাবিশের দলপতি ছিলেন। তিনি বল্লেন, আবু বকর! কোথায় চলেছ? জবাবে তিনি বলেন, আমার কওম আমাকে বের করে দিয়েছে। বড় কষ্ট দিয়েছে এবং জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। তিনি বলেন, কেন বল দেখি? আবু বকরের মতো লোকতো বের হতে পারেনা, তাকে কেউ বের করে দিতেও পারেনা। খোদার কসম, তুমিতো সমাজের ভূষণ। অকর্মন্নকে উপার্জন করে দাও, আত্মীয়ের সাথে সদাচার কর, অক্ষম ব্যক্তিদের বোঝা বহন কর, মেহমানদারী কর, ভালো কাজে সাহায্য কর, ফিরে চল আমি তোমাকে আমার আশ্রয়ে নেব। আপন শহরে আপন রবের এবাদত কর। তারপর তিনি হযরত আবু বকরকে (রা) সাথে নিয়ে মক্কায় আসেন এবং কুরাইশদের সম্ভ্রান্ত দলপতিদের কাছে গিয়ে বলেন, আবু বকরের মতো লোক বেরিয়ে যেতে পারেনা, তাকে বের করে দেয়াও যেতে পারেনা। যার মধ্যে এমন এমন গুণাবলী আছে তাকে তোমরা বের করে দিতে পার? ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আছে যে, তিনি মক্কায় ঘোষণা করেন, আমি

---

১. এর উচ্চারণে পার্থক্য রয়েছে। আমরা যে উচ্চারণ লিখেছি তা ফতহুল বারী থেকে নেয়া হয়েছে। মু'জামুল বুলদানে 'বেরকুল গেমাদ' برك الغماد লেখা হয়েছে। এক উচ্চারণ বেরকল গুমাদ برك الغماد করা হয়েছে- গ্রন্থকার।

কুহাফার পুত্রকে আশ্রয় দিয়েছি- এখন তার সাথে কেউ সদাচরণ ব্যতীত আর কিছু যেন না করে। কুরাইশ তাঁর এ আশ্রয় নাকচ করেনি। কিন্তু এ শর্ত আরোপ করলো যে, আবু বকর (রা) তাঁর আপন ঘরে যেভাবে ইচ্ছা তাঁর আপন রবের এবাদত করুক এবং যা ইচ্ছা তাই পড়ুক। কিন্তু উচ্চস্বরে পড়ে আমাদেরকে যেন কষ্ট না দেয় অথবা ঘরের বাইরে পড়া শুরু না করে। কারণ এতে আমরা আশংকা করি যে, আমাদের মহিলা ও ছেলেমেয়ে ফেৎনায় পতিত হবে। তারপর আবু বকর (রা) তাঁর বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে একটি মসজিদ তৈরী করে তাঁর মধ্যে নামায পড়া এবং কুরআন তেলাওতের কাজ শুরু করলেন। তাঁর তেলাওতের মধ্যে আবেগের এমন তীব্রতা ও উত্তাপ এবং এমন আকর্ষণ ছিল যে, মুশরিকদের মহিলা বালক যুবক নির্বিশেষে কুরআন শুনার জন্য প্রচন্ড ভিড় করতো। কুরআন পড়তে পড়তে আবু বকর (রা) কান্না শুরু করতেন এবং শ্রোতাগণও অভিভূত হয়ে পড়তো। এতে মুশরিক দলপতিগণ বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা ইবনুদ দুগুন্নাকে ডেকে পাঠালেন এবং বল্লেন, আমরা তোমার খাতিরে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলাম যাতে তিনি তাঁর বাড়িতে আপন রবের এবাদত করতে পারেন। কিন্তু তাঁর বাড়ির চতুঃসীমার মধ্যে এক মসজিদ তৈরী করে প্রকাশ্যে নামায ও কুরআন পড়তে শুরু করেছেন। আমাদের আশংকা হয় যে, এতে আমাদের মহিলা ও ছেলেমেয়েরা পথভ্রষ্ট হবে। তাকে একাজ থেকে বিরত রাখ। হয় চুপচাপ তিনি আপন বাড়িতে আপন রবের এবাদত বন্দেগী করবেন। নতুবা প্রকাশ্যে এ কাজ করার জন্য যদি জিদ করেন তাহলে তাঁকে বলে দাও যে, তোমার জিম্মা তিনি ফেরৎ দিয়ে দিন। আমরা কিন্তু তোমার জিম্মা বিনষ্ট করতে চাইনা।

অতঃপর ইবনুদ্ দুগুন্না গিয়ে হযরত আবু বকরকে (রা) এ কথা বলেন। তিনি বলেন, আমি চাইনা যে, আরবে এ কথা ছড়িয়ে পড়ুক যে আমি এক ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এবং আমার এ আশ্রয় ভংগ করা হয়েছে। জবাবে হযরত আবু বকর (রা) বলেন, আচ্ছা তাহলে আমি আপনার আশ্রয় আপনাকে ফেরৎ দিচ্ছি এবং আল্লাহর জিম্মার উপর সন্তুষ্ট আছি। ইবনুদ দুগুন্না উঠে কুরাইশের লোকদের নিকটে গিয়ে বল্লেন, আবু বকর (রা) আমার জিম্মা ফেরৎ দিয়েছেন। এখন তোমরা রইলে এবং তোমাদের লোক।(১১)

মুহাজিরগণকে ফেরৎ আনার জন্য নাজ্জাশীর নিকটে মুশরিকদের প্রতিনিধি

হিজরতের পর কুরাইশ দলপতিগণ একত্রে বসে সিদ্ধান্ত করেন যে, আবদুল্লাহ বিন আবি রাবিয়া[১] (আবু জাহলের বৈমাত্রিক ভাই) এবং আমর বিন আস্‌কে বহু মূল্যবান উপঢৌকনসহ আবিসিনিয়া পাঠানো হোক এবং তাঁরা যেন কোন না কোন প্রকারে নাজ্জাশীকে (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) রাজী করেন যাতে তিনি মুহাজিরদেরকে মক্কায় ফেরৎ পাঠান।

হযরত উম্মে সালমার (রা) বর্ণনা

উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) মুহাজেরদের মধ্যে একজন, এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন যা ইবনে ইসহাক ও ইমাম আহমদ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি

---

১. অনেকে আবদুল্লাহ বিন রাবিয়া লিখেছেন। কিন্তু ইবনে হিশাম লিখেছেন- বিন আবি রাবিয়া। ইনি হযরত আইয়াশ বিন আবি রাবিয়ার (রা) সহোদর ভাই ছিলেন- গ্রন্থকার।

বলেন যে, এ দু'জন ঝানু রাজনীতিক দূত আমাদের সন্ধানে আবিসিনিয়ায় পৌছেন এবং নাজ্জাশীর সভাসদ বৃন্দকে প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করেন। মুহাজিরগণকে দেশে ফেরৎ পাঠাবার জন্য তাঁরা নাজ্জাশীর উপর সকলে মিলে ভয়ানক চাপ সৃষ্টি করবেন বলে রাজী হয়ে যান। তারপর তাঁরা নজ্জাশীর সাথে সাক্ষাৎ করে মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করে বলেন, আমাদের শহরের কতিপয় নির্বোধ ছেলে ছোকরা পালিয়ে আপনার এখানে এসেছে এবং কওমের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আমাদেরকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, তাদেরকে ফেরৎ পাঠাবার আবেদন জানাতে। এসব ছেলে ছোকরা আমাদের দ্বীন থেকেও বেরিয়ে গেছে। তারা আপনার দ্বীনও গ্রহণ করেনি। বরঞ্চ তারা এক অদ্ভূত দ্বীন বের করেছে।

তার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই রাজ পরিষদগণ চারদিক থেকে বলে উঠলেন, এমন লোকদেরকে অবশ্যই ফেরৎ পাঠানো উচিত। তাদের কওমের লোকই ভালো ভাবে জানে তাদের দোষ-ত্রুটি কি। তাদেরকে রাখা ঠিক হবেনা।

নাজ্জাশী রেগে গিয়ে বল্লেন, এভাবে তো আমি তাদেরকে এদের হাতে ছেড়ে দিতে পারিনা। যারা অন্য দেশ ত্যাগ করে আমার দেশের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এখানে আশ্রয় নিতে এসেছে তাদের সাথে আমি বিশ্বাস ভংগের কাজ করতে পারিনা। প্রথমে তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করব যে, তাদের সম্পর্কে এরা যা কিছু বলছে- তার সত্যতা কতটুকু। অতএব নাজ্জাশী রসূলুল্লাহর (স) সাহাবীগণকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠালেন।

নাজ্জাশীর পয়গাম শুনার পর সকল মুহাজির একত্রে পরামর্শ করলেন যে, বাদশাহের সামনে কি বলা যায়। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, নবী (স) যে শিক্ষা দিয়েছেন অবিকল তাই বলা হবে- তা নাজ্জাশী আমাদেরকে এখানে থাকতে দেন বা বের করে দেন।

দরবারে পৌছার সাথে সাথে নাজ্জাশী প্রশ্ন করেন ঃ

এ তোমরা কি করলে যে, নিজেদের দ্বীনও পরিত্যাগ করলে এবং আমার দ্বীনও গ্রহণ করলেনা? আর না দুনিয়ার কোন একটি দ্বীন গ্রহণ করলে? তোমাদের এ নতুন দ্বীনটাইবা কি?

জবাবে মুহাজিরগণের পক্ষ থেকে হযরত জা'ফর বিন আবি তালেব উপস্থিত মত এক ভাষণ দান করেন- যাতে আরব জাহেলিয়াতের ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক দোষগুলো বর্ণনা করেন। তারপর নবী (স) এর আগমণের উল্লেখ করে বলেন, তিনি কি শিক্ষা দেন। তারপর সেসব জুলুম নির্যাতনের উল্লেখ করেন, যা নবীর আনুগত্যকারীগণের উপর করা হয়। তিনি তাঁর ভাষণ এ কথার উপর শেষ করেন, অন্য কোন দেশে যাওয়ার পরিবর্তে আমরা আপনার দেশে এ জন্য এসেছি যে, এখানে আমাদের উপর কোন জুলুম করা হবেনা।[১]

---

১. হযরত জাফরের (রা) হুবহু ভাষণ যা ইবনে ইসহাক হযরত উম্মে সালমার (রা) বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন- তা নিম্নরূপ ঃ

বাদশাহ্ নামদার। আমরা জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত কওম ছিলাম। প্রতিমা পূজা করতাম, মৃত জীব ভক্ষণ করতাম। অশ্লীল কাজে অভ্যস্থ ছিলাম, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীর সাথে এবং ওয়াদা পালনে খারাপ আচরণ করতাম। সবল দুর্বলকে মেরে ফেলতো। আমরা এমন অবস্থায় ছিলাম যখন আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং আমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল পাঠালেন। তাঁর বংশ পরিচয়, আমানতদারী সততা, নিষ্কলুষ চরিত্র আমাদের জানা ছিল। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান

নাজ্জাশী এ ভাষণ শ্রবণ করে বলেন, আমাকে সে কালাম শুনাও যা তোমরা বলছ খোদার পক্ষ থেকে তোমাদের নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

জবাবে হযরত জা'ফর (রা) সূরায়ে মরিয়মের সে প্রাথমিক অংশ পাঠ করে শুনিয়ে দেন যা ছিল হযরত ইয়াহইয়া (আ) এবং হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কিত। নাজ্জাশী তা শুনতে থাকেন এবং অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন। এমনকি তাঁর দাড়ি অশ্রু সিক্ত হয়ে যায়। তাঁর পাদরীও কেঁদে ফেলেন এবং মুসাহেববৃন্দও কাঁদেন। হযরত জাফরের (রা) তেলাওত শেষ করার পর নাজ্জাশী বলেন, অবশ্য এ কালাম এবং ঈসা (আ) যা এনেছিলেন উভয়ই একই উৎস থেকে উৎসারিত। খোদার কসম! আমি তোমাদেরকে তাদের হাতে তুলে দেবনা। কুরাইশ দূতদেরকে বলেন, তোমরা ফিরে যাও। এদেরকে তোমাদের হাতে কখনোই তুলে দেবনা- তা কখনো হতে পারেনা।

হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, আবদুল্লাহ্ বিন আবি রাবিয়ার আমাদের প্রতি কিছুটা দুর্বলতা ছিল, সে চাচ্ছিল যে আমরা রক্ষা পাই। কিন্তু আমর বিন আস বল্লো, খোদার কসম, কাল আমি এমন কথা বলব- যা তাদের মূল উৎপাটন করবে। আমি নাজ্জাশীকে বলবো এরা ঈসা বিন মরিয়মকে (আ) নিছক বান্দাহ্ গণ্য করে। আবদুল্লাহ্ বলে, এমনটি করোনা। এরা আমাদের বিরোধী হলেও আমাদের ভাইতো বটে। তাদের কিছু হকও তো আমাদের উপর আছে। আমর বিন আস তার কথায় কর্ণপাত করেনা এবং পরদিন নাজ্জাশীকে বলে, তাদেরকে ডেকে এ কথাও জিজ্ঞেস করুন যে, ঈসা বিন মরিয়ম সম্পর্কে তাদের আকীদা কি। তাঁর সম্পর্কে এরা বড়ো কঠিন কথা বলে। নাজ্জাশী পুনরায় মুহাজিরদেরকে ডেকে পাঠান। আমর বিন আসের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁরা ওয়াকেফহাল হয়েছিলেন। তাঁরা একত্র হয়ে পরামর্শ করেন যে, যদি নাজ্জাশী ঈসা (আ) সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেন তো কি জবাব দেয়া যাবে। পরিস্থিতি বড়ই নাজুক। আর সকলে বড়ো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কিন্তু রসূলের সাহাবীগণ সিদ্ধান্ত করেন, যা কিছু হবার তা হোক। আমরা তো

জানান, যাতে আমরা তৌহীদে বিশ্বাসী হই এবং তাঁরই এবাদত করি। আর যেসব পাথরের মূর্তিকে আমরা ও আমাদের বাপ দাদা পূজা করতাম তা যেন পরিত্যাগ করি। তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলা, আমানতদারী, আত্মীয়ের প্রতি সদাচরণ, প্রতিবেশীর প্রতি সাহায্য সহানুভূতি, ওয়াদা পালনের এবং হারাম কাজ ও হত্যাকান্ড থেকে বিরত থাকার আদেশ করেন। আমাদেরকে সকল প্রকার অশ্লীলতা, মিথ্যা কথা, এতিমের মাল ভক্ষণ, সতী সাধ্বী মহিলাদের প্রতি মিথ্যা দোষারূপ করা থেকে বিরত রাখেন। একমাত্র এক আল্লাহর এবাদত করার এবং কোন কিছু তাঁর সাথে শরীক না করার নির্দেশ তিনি আমাদেরকে দেন। নামায পড়া, রোযা রাখা এবং যাকাত দেয়ার হেদায়াতও তিনি করেন। (উম্মে সালমা (রা) বলেন, এভাবে হযরত জাফর (রা) ইসলামের অন্যান্য হুকুম আহকামও বাদশাহকে শুনিয়ে দেন)। অতএব আমরা তাঁর সত্যতা স্বীকার করে নিই এবং তাঁর উপর ঈমান আনি। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যা কিছু নিয়ে আসেন, তা আমরা মেনে চলি। আমরা শুধু আল্লাহর এবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করিনা। তিনি যা আমাদের জন্যে হারাম করেন তা আমরা হারাম করে নেই, আর যা কিছু তিনি আমাদের জন্যে হালাল করেন তা আমরা হালাল করে নিই। এতে আমাদের কওম আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা আমাদেরকে শাস্তি দিতে থাকে এবং দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের উপর এমন জুলুম করে যেন আমরা আল্লাহর এবাদতের পরিবর্তে মূর্তি পূজা করি। আর আমরা সেসব নিকৃষ্ট বস্তু হালাল করে নিই যা পূর্বে হালাল করে নিয়েছিলাম। অবশেষে যখন তারা অত্যাচার উৎপীড়নে আমাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে এবং আমাদের দ্বীনের পথে প্রতিবন্ধক হয় তখন আমরা আপনার দেশের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। অন্য দেশের তুলনায় আপনার দেশ পছন্দ করি এবং আশ্রয় প্রার্থী হই, এ আশায় যে আমাদের উপর কোন জুলুম হবেনা- গ্রন্থকার)।

সেই কথাই বলব যা আল্লাহ্ বলেছেন এবং তাঁর রসূল শিক্ষা দিয়েছেন। অবশেষে তাঁরা যখন বাদশাহের দরবারে গেলেন তখন নাজ্জাশী আমর বিন আসের প্রশ্ন তাঁদের সামনে রাখলেন। জাফর বিন আবি তালেব উঠে দ্বিধাহীন চিত্তে বল্লেন-

هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول -

- তিনি আল্লাহর বান্দাহ, তাঁর রসূল, তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ্ ও একটি কালেমা যা আল্লাহ্ কুমারী মরিয়মের উপর ইল্কা করেন।

নাজ্জাশী তা শুনার পর একটা ঘাস মাটি থেকে তুলে নিয়ে বলেন, খোদার কসম! তুমি যা কিছু বল্লে, ঈসা (আ) তার থেকে বেশী কিছু ছিলেননা। একথায় পাদরীগণ সাপের মতো ফোঁস করে উঠলেন। কিন্তু নাজ্জাশী বলেন, কসম খোদার, কথা এই তোমরা যতোই ফোঁস কর না কেন। তারপর তিনি আমাদেরকে বল্লেন, যাও, তোমরা আমার দেশে নিরাপদে থাক। তোমাদেরকে কেউ মন্দ বল্লে সে শাস্তি পাবে। যদি কেউ আমাকে স্বর্ণের পাহাড় উপঢৌকন দেয়, তার বিনিময়ে তোমাদের কষ্ট দেয়া আমি পছন্দ করবনা। তারপর তিনি আদেশ করেন- এ দু'জন দূতকে তাদের হাদিয়া ফেরৎ দাও- তার কোন প্রয়োজন আমার নেই। আল্লাহ্ যখন আমার রাজ্য আমাকে ফেরৎ দিয়েছিলেন, তখন তিনি আমার কাছ থেকে কোন ঘুষ নেননি যে আমি আল্লাহর ব্যাপারে ঘুষ নেব।(১২)

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদের বর্ণনা

এ ঘটনার আর একজন চাক্ষুষ সাক্ষী হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা)। তিনি সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। মুসনাদে আহমদ ও তাবারানীতে তাঁর বর্ণনা এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ

নাজ্জাশী যখন মুহাজিরগণকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠালেন এবং জাফর বিন আবি তালেবের (রা) মুখে নবী (স) এর শিক্ষার কথা শুনলেন তখন বল্লেন, খোদার কসম! আমরা ঈসা (আ) সম্পর্কে যা বলি, এরা তার চেয়ে কিছু বেশী বলেনা। মারহাবা তোমাদের জন্য এবং সে সত্তার জন্য যাঁর কাছ থেকে তোমরা এসেছ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহর রসূল আর তিনিই সেই ব্যক্তি যাঁর উল্লেখ আমরা ইন্জিলে পাই। আর তিনি সেই রসূল যাঁর সুসংবাদ ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) দিয়েছেন।(১৩)

আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদের (রা) বর্ণনায় এ কথারও উল্লেখ আছে যে, কুরাইশের দূতদ্বয় নাজ্জাশীর দরবারে হাযির হয়ে প্রথমে তাকে সিজদা করে এবং তাঁর ডানে ও বামে তারা বসে পড়ে। তারা বলে, আমাদের জ্ঞাতিদের মধ্য থেকে কিছু লোক আপনার এখানে এসেছে এবং তারা আমাদের ও আমাদের দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তার ফলে নাজ্জাশী মুহাজিরদেরকে ডেকে পাঠান। হযরত জাফর (রা) বলেন, আজ আমি তোমাদের সকলের পক্ষ থেকে কথা বলব। সকলে তাঁর পেছনে চলেন। দরবারে প্রবেশ করে হযরত জাফর (রা) সালাম করেন। পরিষদগণ বলে, সিজদা কেন করলেননা?

জাফর (রা) বল্লেন, আমরা খোদা ব্যতীত কাউকে সিজদা করিনা। তারপর নবী (স) ও তাঁর শিক্ষার উল্লেখ করেন ও তারপর হযরত ঈসা বিন মরিয়ম সম্পর্কে মুসলমানদের আকীদার উল্লেখ করেন। এ বর্ণনায় নাজ্জাশীর এ বক্তব্যও উদ্ধৃত করা হয় যে, তিনি নবী (স) এর সত্যতা স্বীকার করার পর বলেন, খোদার কসম! যদি আমি বাদশাহীর দায়িত্বে

ফেঁসে না থাকতাম, তাহলে তাঁর খেদমতে হাযির হতাম, তাঁর জুতো তুলে নিতাম এবং তাকে অজু করাতাম।

হযরত আবু মূসা আশয়ারীর বর্ণনা

হাফেজ আবু নুয়াইম এবং বায়হাকী প্রায় একই রকমের বর্ণনা হযরত আবু মূসা আশয়ারী থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এতে অতিরিক্ত এ কথা আছে যে, মুহাজিরগণের রাজদরবারে পৌছার পূর্বে কুরাইশ প্রতিনিধি নাজ্জাশীকে উত্তেজিত করার জন্য বলে, দেখবেন এরা আপনাকে সিজদা করবেনা। আমরা দরবারে পৌছলে দরবারীগণ বলে, বাদশাহকে সিজদা কর। জাফর (রা) বলেন, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে সিজদা করিনা। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে যখন নাজ্জাশীর সামনে পৌছলাম তখন তিনি বল্লেন, কোন্ জিনিস আমাকে সিজদা করা থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখলো। তিনি সে জবাবই দেন, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে সিজদা করিনা। তার পরের ঘটনা তাই যা ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন। শেষে নাজ্জাশী আমাদেরকে বলেন, যতোদিন ইচ্ছা তোমরা আমার ভূখন্ডে থাক। তিনি আমাদের খোরাক পোষাকের ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দেন।

স্বয়ং হযরত জা'ফরের (রা) বর্ণনা

হাফেজ ইবনে আসাকের ও তাবারানী হযরত জাফরের (স) বর্ণনা তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ বিন জাফরের বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেছেন। এ বর্ণনায় অতিরিক্ত এ কথা আছে যে, কুরাইশ প্রতিনিধিদের অভিযোগের জবাবে যখন আমরা আমাদের ও তাঁদের দ্বীনী মতপার্থক্যের বিশ্লেষণ করি, তখন নাজ্জাশী কুরাইশ প্রতিনিধিদেরকে জিজ্ঞেস করেন, এরা কি তোমাদের গোলাম? তারা বলে- না। তিনি বলেন, তোমাদের নিকটে এদের কোন ঋণ আছে? তারা না বলে। তিনি বলেন, তাহলে এদেরকে ছেড়ে দাও। অতঃপর হযরত জাফরও (রা) সে কথাই বলেন, যা অন্যান্যগণ বলেছেন যে, আমর বিন আস নাজ্জাশীর সম্মুখে হযরত ঈসা বিন মরিয়ম (আ) সম্পর্কে আমাদের আকীদার বিষয়টি তুলে ধরে। নাজ্জাশী তার সত্যতা স্বীকার করেন এবং আমাদেরকে বলেন, এখানে কেউ তোমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে নাতো? আমরা বল্লাম, হ্যাঁ দিচ্ছে। তারপর তিনি ঘোষণা করেন যে কেউ কষ্ট দিলে তার চার দিরহাম জরিমানা করা হবে। তারপর নাজ্জাশী আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, এটা কি যথেষ্ট। আমরা বলি, না। তখন তিনি জরিমানা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেন।(১৪)

মুহাজিরদের সত্যবাদী ভূমিকা

এভাবে মুহাজেরীনে হাবশা শুধু একথাই প্রমাণ করেননি যে, যে হকের উপর তাঁরা ঈমান এনেছেন তার খাতিরে তাঁরা ঘরদোর, আত্মীয় স্বজন, ব্যবসা বাণিজ্য, সহায় সম্পদ ও মাতৃভূমি সকল কিছুই ছেড়ে নির্বাসন দন্ড ভোগ করতে তৈরী হয়ে যান। বরঞ্চ এটাও প্রমাণ করেন যে, এ নির্বাসন কালেও অসহায় অবস্থায় হকের ব্যাপারে কোন দুর্বলতা প্রদর্শনেও তৈরী ছিলেননা। তাঁদের এ ঈমানী শক্তি ছিল এমন বিস্ময়কর যে, শাহী দরবারের মতো এক নাজুক পরিবেশেও হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে তাঁদের আকীদাহ্ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করেন যখন নাজ্জাশীর সকল পরিষদ ঘুষ গ্রহণ করে তাঁদেরকে দুশমনের হাতে তুলে দিতে উদ্যত ছিল। সে সময়ে এ আশংকা ছিল যে, খৃষ্ট ধর্মের বুনিয়াদী আকীদা সম্পর্কে ইসলামের দ্বিধাহীন মন্তব্য শুনার পর নাজ্জাশীও ক্ষীপ্ত হতে পারতেন এবং মজলুম

মুসলমানদেরকে কুরাইশ কসাইদের হাতে তুলে দিতে পারতেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁরা সত্য কথা পেশ করতে সামান্য পরিমাণে ইতঃস্ততও করেননি। এ বিষয়টিই দুনিয়াকে দেখিয়ে দেয় যে, ইসলামী দাওয়াত কোন্ ধরনের মজবুত চরিত্রের নিবেদিত প্রাণ লোক পৌঁছিয়ে দেয়।(১৫)

আবিসিনিয়া থেকে ঈসায়ী প্রতিনিধিদের আগমন

মুহাজিরগণের চরিত্র ও তাঁদের দাওয়াতের প্রভাব কিরূপ আবিসিনিয়াবাসীর উপর বিস্তার লাভ করেছিল তার অনুমান এ ঘটনা থেকে করা যায় যে, সেখান থেকে বিশ জনের একটি প্রতিনিধি দল মক্কায় আগমন করে নবী (স) এর সাথে মিলিত হয়।

এ ঘটনা ইবনে হিশাম, বায়হাকী প্রমুখ মুহাম্মদ বিন ইসহাকের বরাত দিয়ে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হিজরতে হাবশার পর যখন নবী (স) এর আগমন ও দাওয়াতের প্রচার প্রসার আবিসিনিয়ায় শুরু হয়, তখন সেখান থেকে প্রায় বিশ জনের একটি প্রতিনিধি দল মসজিদে হারামে নবী (স) এর সাথে মিলিত হয় (এক বর্ণনায় আছে মিলিত হয় এবং কিছু প্রশ্ন করে)। কুরাইশের বহু লোকও এ ঘটনা দেখার জন্য চারদিকে দাঁড়িয়ে যায়। প্রতিনিধি দল কিছু প্রশ্ন করলে নবী (স) তার জবাব দেন। তারপর তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং কুরআনের আয়াত তাদের সামনে পাঠ করেন। কুরআন শ্রবণে তাদের চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হয়। এ যে আল্লাহর কালাম এর সত্যতা তাঁরা স্বীকার করেন এবং নবীর উপর ঈমান আনেন। বৈঠক শেষে আবু জাহল এবং তার কতিপয় সংগী সাথী পথে তাঁদের সাথে মিলিত হয়ে এভাবে তিরস্কার করে, তোমাদের জীবন ব্যর্থ হোক। তোমাদের স্বধর্মীগণ তোমাদেরকে এজন্য পাঠিয়েছিল যে, তোমরা এ ব্যক্তির অবস্থা যাচাই করে ঠিক ঠিক খবর দেবে। কিন্তু তোমরা তাঁর কাছে বসতে না বসতেই নিজেদের দ্বীন পরিত্যাগ করে তাঁর উপর ঈমান আনলে। তোমাদের চেয়ে নির্বোধ লোকতো আমরা কখনো দেখিনি। জবাবে তাঁরা বলেন, ভাই তোমাদেরকে সালাম। তোমাদের সাথে আমরা জাহেল সুলভ তর্কবিতর্ক করতে পারিনা। আমাদেরকে আমাদের পথে চলতে দাও আর তোমরা তোমাদের পথে চলতে থাক। আমরা জেনে বুঝে নিজেদেরকে মংগল থেকে বঞ্চিত রাখতে পারিনা। এ ঘটনার উল্লেখ সূরায়ে কাসাসে করা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ
وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْا اٰمَنَّا بِهٖ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَا اِنَّا
كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ - (٥٢-٥٣)

- যাদেরকে আমরা এর আগে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এ কুরআনের উপর ঈমান আনে এবং যখন তা তাদেরকে শুনানো হয় তখন বলে, আমরা এর উপর ঈমান আনলাম। এ প্রকৃতপক্ষে সত্য আমাদের রবের পক্ষ থেকে। এর পূর্বেও আমরা এ দ্বীনে ইসলামের উপর ছিলাম। (কাসাসঃ ৫২-৫৩)

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ
اَعْمَالُكُمْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ - (٥٥)

- যারা যখন বেহুদা কথা শুনে তখন তার থেকে কেটে পড়ে এবং বলে আমাদের কর্ম আমাদের জন্য এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। তোমাদের সালাম আমরা জাহেলসুলভ পন্থা অবলম্বন করতে পারিনা। (কাসাসঃ ৫৫)(১৬)

আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকারী মুহাজিরদের প্রথম তালিকা

উল্লেখ্য যে, মুহাজেরীনের একটি দল হযরত জা'ফরের (রা) সাথে আবিসিনিয়াতেই রয়ে যান এবং খায়বরের যুদ্ধের সময় ফিরে আসেন। নিম্নলিখিত মুহাজিরগণ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে বিভিন্ন সময়ে নবীর মদীনা হিজরতের পূর্বে ফিরে আসেন।

১. হযরত ওসমান (রা) ও তাঁর বিবি হযরত রুকাইয়া বিন্তে রসূল (স)।
২. হযরত আবু হুযায়ফা বিন ওত্বা বিন রাবিয়া (রা) এবং তাঁর বিবি সাহ্লা বিন্তে সুহাইল বিন আমর।
৩. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন জাহ্শ (রা)।
৪. হযরত ওত্বা বিন গায্ওয়ান (রা)।
৫. হযরত যুবাইর বিন আল আওয়াম (রা)।
৬. হযরত মুস্আব বিন ওমাইর (রা)।
৭. হযরত সুয়াইবেত্ বিন সা'দ বিন হারমালা (রা)।
৮. হযরত তুলাইব বিন ওমাইর (রা)।
৯. হযরত আবদুর রহ্মান বিন আওফ (রা)।
১০. হযরত মিকদাদ বিন আমর (রা)।
১১. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা)।
১২. হযরত আবু সালামা (রা) ও তাঁর বিবি হযরত উম্মে সালামা।
১৩. হযরত শাম্মাস বিন ওসমান (রা)।
১৪. হযরত সালামা বিন হিশাম (রা)।
১৫. হযরত আইয়াশ বিন আবি রাবিয়া (রা)।
১৬. হযরত মুয়াত্তেব বিন আওফ (রা)।
১৭. হযরত ওসমান বিন মায্উন (রা), তাঁর পুত্র হযরত সায়েব (রা) এবং দু'ভাই হযরত কুদামা (রা) ও আবদুল্লাহ্ (রা)।
১৮. হযরত খুনাইস বিন হুযাফা (রা)।
১৯. হযরত হিশাম বিন আস বিন ওয়ায়েল (রা)।
২০. হযরত আমের বিন রাবিয়া (রা) ও তাঁর বিবি লায়লা বিন্তে আবি হাস্মা।
২১. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাখযামা (রা)।
২২. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সুহাইল বিন আমর (রা)। তাকে মক্কায় বন্দী করার পর তার পিতা এতো নির্মমভাবে মারপিট করে যে, প্রকাশ্যতঃ কাফের হয়ে যান কিন্তু অন্তরে অন্তরে মুসলমান। বদরের যুদ্ধে কাফেরদের সংগে গিয়ে ঠিক যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সাথে মিলিত হন।
২৩. হযরত আবু সাবরা বিন আবি রুহাম (রা) ও তাঁর বিবি উম্মে কুলসূম বিন্তে সুহাইল বিন আমর।

২৪. হযরত সাকরান বিন আমর (রা), ইবনে ইসহাক ও ওয়াকেদী বলেন, তিনি মক্কায় এসে ইন্তেকাল করেন। মূসা বিন ওক্‌বা ও আবু মা'শার বলেন, আবিসিনিয়ায় তাঁর এন্তেকাল হয়।
২৫. হযরত সাওদা বিন্তে যামায়া (রা)।
২৬. হযরত সা'দ বিন খাওলা (রা)।
২৭. হযরত আবু ওবায়দাহ্ বিন আল্ জাররাহ্ (রা)।
২৮. হযরত আমর বিন হারেস (রা)।
২৯. হযরত সুহাইল বিন বায়দা (রা)।
৩০. হযরত আমর বিন আবি সারাহ্।(১৭)

সূরা রূমের ভবিষ্যদ্বাণী

আবিসিনিয়ায় হিজরত করা কালেই এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যা অবশেষে রসূলুল্লাহ (স) ও কুরআনের সত্যতার এক অনস্বীকার্য প্রমাণ রূপে গণ্য হয়। কুরআন যে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ তায়ালার পাক কালাম যা অহীর মাধ্যমে নবীর (স) উপর নাযিল হয়েছে এর বিরুদ্ধে কোন যুক্তি পেশ করা সম্ভব ছিলনা। এ সূরায়ে রুমের প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত ছিল যাতে বলা হয় ঃ

রোমীয়গণ নিকটবর্তী ভূখন্ডে পরাজিত হয়েছে এবং তাদের এ পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যেই বিজয়ী হয়ে যাবে। পূর্বে ও পরে এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ্‌রই। আর সে এমন একদিন হবে যখন মুসলমানগণ আনন্দ করবে (আয়াত ২ থেকে ৪)। এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা আমরা বর্ণনা করছি।

নবী (স) এর নবুওতের আট বছর পূর্বের ঘটনা এই যে, রোমের বাদশাহ্ মরিসের (MAURICE) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ফলে ফোকাস (PHOCAS) নামে এক ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করে। প্রথমে সে সম্রাট মরিসের চোখের সামনে তাঁর পাঁচজন পুত্রকে হত্যা করে এবং পরে সম্রাটকেও হত্যা করে। অতঃপর পিতা পুত্রের ছিন্ন মস্তকসমূহ কস্‌তুনতানিয়ার উন্মুক্ত স্থানে লটকিয়ে রাখে। তার কিছু দিন পর তাঁর স্ত্রী ও তিন কন্যাকেও হত্যা করে। এতে ইরান সম্রাট খস্‌রু পারভেজ রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করার এক নৈতিক বাহানা পেয়ে যায়। কারণ সম্রাট মরিস তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সাহায্যেই পারভেজ ইরানের সিংহাসন লাভ করেন। তাঁকে তিনি পিতা মনে করতেন। এর ভিত্তিতে তিনি ঘোষণা করেন, আমি বলপ্রয়োগে ক্ষমতাসীন ফোকাসের সেই অত্যাচারের বদলা নিতে চাই যা সে আমার রূপক পিতা ও তাঁর সন্তানদের উপর করেছে। ৬০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রোমীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে তিনি ফোকাসের সেনাবাহিনীকে একটির পর একটিকে পরাজিত করে একদিকে এশিয়া মাইনরের বর্তমান উরাফা পর্যন্ত এবং অপরদিকে শ্যাম দেশের হালাব ও আন্তকিয়া পর্যন্ত বিজয়ীর বেশে পৌছে যান। রোমীয় সাম্রাজ্যের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণ যখন দেখলেন যে ফোকাস দেশ রক্ষা করতে পারবেননা, তখন তাঁরা আফ্রিকার শাসকের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি তাঁর পুত্র হেরাক্লিয়াসকে একটি শক্তিশালী সেনা রেজিমেন্টসহ্ কন্‌স্টান্টিনপল্ পাঠিয়ে দেন। তিনি তথায় পৌছা মাত্র ফোকাসকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং তার স্থলে হেরাক্লিয়াসকে কায়সার তথা রোমীয় সম্রাট বানানো হয়। তিনি ক্ষমতাসীন হওয়ার

পর ফোকাসের সাথে সেই আচরণ করা হয় যা সে মরিসের সাথে করেছিল। এ হলো ৬১০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা এবং এ বছরেই নবী মুহাম্মদকে (স) নবুওতের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়।

খসরু পারভেজ যে নৈতিক বাহানায় যুদ্ধ ঘোষণা করেন, ফোকাসের ক্ষমতাচ্যুতি ও হত্যার পর তা শেষ হয়ে যায়। যদি সত্যিকার অর্থে বলপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী ফোকাসের কৃত জুলুম নিষ্পেষণের বদলা নেয়াই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে তাকে হত্যা করার পর নতুন সম্রাটের সাথে সন্ধি করাই উচিত ছিল। কিন্তু খসরু তারপরেও যুদ্ধ চালিয়ে যান। এ যুদ্ধকে তিনি অগ্নিপূজক ও খৃষ্টীয়দের মধ্যে ধর্মীয় যুদ্ধের রঙে রঞ্জিত করেন। ঈসায়ীদের যে ফের্কাগুলোকে রোমীয় সাম্রাজ্যের সরকারী গির্জা ধর্মদ্রোহী বলে বছরের পর বছর ধরে অত্যাচার নিপীড়নের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করছিল তারা অগ্নিপূজক আক্রমণকারীদের সহযোগী হয়ে যায়। ইহুদী সম্প্রদায়ও তাদের সাথে মিলিত হয়। খসরু পারভেজের সেনাবাহিনীতে ২০৬ হাজার ইহুদী ভর্তি হয়। হেরাক্লিয়াস এ প্লাবনের মুকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়। সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে প্রথম যে সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছে তা এই যে ইন্তাকিয়ার উপর ইরানীদের দখল, তারপর ৬১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁরা দামেশ্‌ক দখল করেন। অতঃপর ৬১৪ খৃষ্টাব্দে বায়তুল মাকদেস্ দখল করে খৃষ্টীয় জগতের উপর চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করেন। এ শহরে নব্বই হাজার ঈসায়ীকে হত্যা করা হয়, তাদের সবচেয়ে সম্মানিত গির্জা 'কানিসাতুল কিয়ামা' ধ্বংস করা হয়। আসল 'ক্রস' যে সম্পর্কে ঈসায়ীদের ধর্মীয় বিশ্বাস যে তার উপরেই মসিহ্ জীবন দেন, ইরানীগণ তা ছিনিয়ে নিয়ে ইরানীদের রাজধানী মাদায়েনে পৌঁছিয়ে দেয়, পাদরী জাকারিয়াকেও তারা ধরে নিয়ে যায় এবং শহরের বড়ো বড়ো গির্জা ধ্বংস করা হয়। এ বিজয়ে খসরু যে পরিমাণে উন্মত্ত হন, তার অনুমান সে পত্র থেকে করা যায় যা তিনি বায়তুল মাকদেস্ থেকে হেরাক্লিয়াসকে লিখেছিলেন। তাতে বলা হয়-

'সকল খোদার বড়ো, বিশ্বজগতের মালিক খসরুর পক্ষ থেকে ইতর ও অবিবেচক বান্দা হেরাক্লিয়াসের নামে।'

তুমি বল যে, তোমার নিজের রবের উপর ভরসা আছে, তাহলে কেন তোমার খোদা জেরুজালেমকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারলোনা?

এ বিজয়ের পর- এক বছরের মধ্যে ইরানী সেনাবাহিনী জর্দান, ফিলিস্তিন ও সিনাই উপত্যকায় সমগ্র অঞ্চল দখল করে মিসরে পৌঁছে যায়। এ ছিল ঠিক সে সময়ের ঘটনা যখন মক্কায় তারচেয়ে অনেক গুণে বেশী ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ তথা দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ চলছিল। এখানে তাওহীদের পতাকাবাহী সাইয়েদুনা মুহাম্মদের (স) নেতৃত্বে এবং শির্কের অনুসারী কুরাইশ সর্দারদের নির্দেশে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, ৬১৫ খৃষ্টাব্দে নবুওতের পঞ্চম বর্ষে মুসলমানদের বিরাট সংখ্যক লোক নিজেদের ঘরদোর ছেড়ে আবিসিনিয়ার ঈসায়ী রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। আবিসিনিয়া তখন রোমের সাথে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিল। রোম সাম্রাজ্যের উপর ইরানের বিজয়ের কথা প্রত্যেকের মুখে শুনা যেতো। মক্কার মুশরিকগণ এতে আনন্দ উল্লাস করতো। তারা মুসলমানদেরকে বলতো, দেখ, ইরানের অগ্নিপূজক মুশরিকগণ জয়লাভ করছে আর তৌহীদ রেসালতে বিশ্বাসী ঈসায়ীগণ শুধু পরাজয় বরণ করছে। এভাবে আমরা আরব পৌত্তলিক তোমাদেরকে ও তোমাদের দ্বীনকে নির্মূল করে দেব।

এ অবস্থায় কুরআনের এ সূরা নাযিল হয় এবং এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, নিকটস্থ ভূখন্ডে রোমীয়গণ পরাজিত হয়ে গেল। কিন্তু এ পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে তারা বিজয়ী হবে এবং সে এমন দিন হবে যেদিন আল্লাহ্ প্রদত্ত বিজয়ে মুসলমানগণ আনন্দিত হবে।

এতে একটির পরিবর্তে দুটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এক- রোমীয়গণ বিজয়ী হবে। দুই- মুসলমানগণও সে সময়ে বিজয় লাভ করবে। প্রকাশ্যতঃ দূর-দূরান্ত পর্যন্ত এর কোন আলামত নজরে পড়তোনা যে এ দুটির কোন একটি ভবিষ্যদ্বাণী কয়েক বছরের মধ্যে কার্যে পরিণত হবে। একদিকে ছিল মুষ্টিমেয় মুসলমান যাদেরকে অত্যাচার নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করা হচ্ছিল। আর এ ভবিষ্যদ্বাণীর পর আট বৎসর যাবত তাদের বিজয়ের কোন সম্ভাবনা দেখা যেতোনা। অপর দিকে রোমের পরাজয় দিন দিন বেড়েই চলছিল। ৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র মিসর ইরানের অধীনে চলে যায়। ইরানী সৈন্যগণ তারাবুলিসের নিকট উপনীত হয়ে নিজের পতাকা উত্তোলন করে। এশিয়া মাইনরে ইরানী সৈন্য রোমীয়দেরকে মারতে মারতে বস্ফোরাসের তটভূমিতে পৌঁছে যায়। ৬১৭ খৃষ্টাব্দে তারা কন্স্টান্টিনপলের সম্মুখে খালেকদুন (CHALCEDON) হস্তগত করে। কায়সার খসরুর নিকটে তাঁর প্রতিনিধি পাঠিয়ে যে কোন মূল্যে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি জবাবে বলেন, আমি কায়সারকে নিরাপত্তা দান করবনা যতোক্ষণ না সে শৃংখলাবদ্ধ হয়ে আমার সামনে হাযির হয় এবং ক্রসের খোদাকে পরিত্যাগ করে অগ্নি খোদার এবাদত কবুল না করেছে। অবশেষে কায়সার এতোটা পরাজয়মনা হয়ে পড়েন যে, তিনি কন্স্টান্টিনপল পরিত্যাগ করে কার্থেজে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা করেন।

ঐতিহাসিক গিবন বলেন, কুরআনের এ ভবিষ্যদ্বাণীর পরও সাত আট বছর অবস্থা ছিল যে, কেউ এ ধারণাই করতে পারতোনা যে রোম সাম্রাজ্য ইরানের উপর বিজয়ী হবে। বরঞ্চ বিজয়তো দূরের কথা সে সময়ে কেউতো এ আশাও পোষণ করতোনা যে এ সাম্রাজ্য জীবিত রয়ে যাবে (Gibbon on Decline and Fall of the Roman Empire- Vot. II P. 788, Modern Library- New York)।

কুরআনের এ আয়াতগুলো যখন নাযিল হয়, তখন মক্কায় কাফেরগণ খুব ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে থাকে এবং উবাই বিন খালাফ হযরত আবু বকরের (রা) সাথে এ বাজি রাখলো- যদি তিন বছরের মধ্যে রোমীয়গণ বিজয়ী হয় তাহলে আমি দশটি উট দেব, নতুবা দশ উট তোমাকে দিতে হবে। নবী (স) যখন একথা জানতে পারলেন তখন বল্লেন, কুরআনে- بِضْعِ سِنِيْنَ শব্দগুলো বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ অর্থ দশের কম ধরা হয়। এ জন্য দশ বছরের মধ্যে শর্ত কর এবং উটের সংখ্যা বাড়িয়ে একশ কর। অতএব হযরত আবু বকর (রা) ওবাইয়ের সাথে পুনরায় কথা বলে নতুন করে এ শর্ত করা হয় যে, উভয় পক্ষের মধ্যে যার কথা ভুল প্রমাণিত হবে তাকে একশত উট দিতে হবে।

এদিকে ৬২২ খৃষ্টাব্দে নবী (স) হিজরত করে মদীনা গমন করেন এবং অন্যদিকে হেরাক্লিয়াস চুপে চুপে কন্স্টান্টিনপল থেকে কৃষ্ণ সাগরের পথে তারাবেযুনের দিকে রওয়ানা হন যেখানে তিনি পশ্চাৎ দিক থেকে ইরানের উপর আক্রমণ চালাবার প্রস্তুতি নেন। এ পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য কায়সার গির্জাগুলোর কাছে আর্থিক সাহায্য চান এবং আর্চবিশপ সার্জিয়াস (SERGIUS) খৃষ্টধর্মকে অগ্নি পূজকদের ধর্ম থেকে রক্ষা করার জন্য গির্জাগুলোতে নজরানা হিসাবে সঞ্চিত বিপুল অর্থ সূদে কর্জ দেন। হেরাক্লিয়াস তাঁর আক্রমণ আরমেনিয়া থেকে শুরু করেন এবং পরের বছর (৬২৪ খৃঃ) তিনি

আজারবাইজানে প্রবেশ করে যরদশতের জন্মস্থান উর্মিয়া ধ্বংস করেন এবং ইরানীদের সর্ববৃহৎ অগ্নি মন্দির ধূলিসাৎ করেন। খোদার কুদরতের বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ দেখুন, এ ছিল সেই বছর যে বছরে বদর প্রান্তরে মুসলমান প্রথমবার মুশরিকদের মুকাবেলার সিদ্ধান্তকর বিজয় লাভ করেন। এভাবে সে দুটি ভবিষ্যদ্বাণী যা কুরআনে করা হয়েছিল দশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই একই সাথে কার্যে পরিণত হয়।

অতঃপর রোমীয় সেনাবাহিনী ইরানীদেরকে ক্রমাগতভাবে পরাভূত করতে থাকে। নিন্ওয়ার সিদ্ধান্তকর যুদ্ধে (৬২৭ খৃঃ) তাঁরা ইরান সাম্রাজ্যের মেরুদন্ড চূর্ণ করে দেন। তারপর ইরান সম্রাটের বাসস্থান দস্তগার্দ ধ্বংস করা হয় এবং রোমীয় সৈন্য সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাইসাফুনের সম্মুখ ভাগে উপনীত হয় যা সেকালে ইরানের রাজধানী ছিল। ৬২৮ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং খসরু পারভেজের বিরুদ্ধে আপন গৃহেই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। তাঁকে বন্দী করা হয়। তাঁর চোখের সামনে তাঁর আঠারজন পুত্রকে হত্যা করা হয়। তাঁর এক পুত্র শেরবায়া সিংহাসনে আরোহণ করে। এ বছরেই হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় যাকে কুরআনে বিরাট বিজয় বলে আখ্যায়িত করা হয়। আর এ বছরেই ইরান সম্রাট রোমের সকল দখলকৃত অঞ্চল থেকে তাঁর অধিকার প্রত্যাহার করে রোমের সাথে সন্ধি করেন। ৬২৯ খৃষ্টাব্দে কায়সার মহান ক্রসকে তার স্থানে রাখার জন্য স্বয়ং বায়তুল মাকদেস যান এবং ঐ বছরেই নবী (স) 'ওমরাতুল কাযা' আদায় করার জন্য হিজরতের পর প্রথমবার মক্কা প্রবেশ করেন।

এর পরে কারো মনে এ সন্দেহের অবকাশ রইলোনা যে- কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী একেবারে সত্য ছিল। বহু মুশরিক এর উপর ঈমান আনে। উবাই বিন খালাফের ওয়ারিশগণকে হার মেনে নিয়ে শর্তের উট আবু বকরকে (রা) দিতে হয়। তিনি তা নিয়ে নবীর (স) খেদমতে হাযির হন। তিনি হুকুম দেন যে, তা সদ্কা করে দেয়া হোক। কারণ এ শর্ত তখন কর হয়েছিল যখন শরিয়তে জুয়া হারাম করা হয়নি। এ সময়ে হারাম হওয়ার নির্দেশ আসে। এ জন্য যুদ্ধকারী কাফেরদের নিকট থেকে শর্তের মাল গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয় এবং তা স্বয়ং ব্যবহার না করে সদকা করতে বলা হয়।(১৮)

নির্দেশিকা

১. প্রচারপত্র- আযাদী (গ্রন্থকার) পৃঃ ১১-১২।
২. তাফহীমুল কুরআন- ৩য় খন্ড- আনকাবুত- টীকা ৯৪-৯৯।
৩. তাফহীমুল কুরআন ৪র্থ খন্ড- যুমার ভূমিকা, টীকা ৩০-৩২।
৪. গ্রন্থকার কর্তৃক পরিবর্ধন।
৫. তাফহীম- ৩য় খন্ড- সূরায়ে রূমের ভূমিকা।
৬. গ্রন্থকার কর্তৃক পরিবর্ধন।
৭. তাফহীম ৫ম খন্ড- সারসংক্ষেপ ও ভূমিকা- নাজম।
৮. তাফহীম ৩য় খন্ড- হজ্ব- টীকা ৯৯।
৯. গ্রন্থকার কর্তৃক পরিবর্ধন।

১০. তাফহীম- ৩য় খন্ড- ভূমিকা সূরা মরিয়ম।
১১. পরিবর্ধন।
১২. তাফহীম- ৩য় খন্ড- সূরা মরিয়মের ভূমিকা।
১৩. তাফহীম ৫ম খন্ড- সূরা সাফ্- টীকা ৮।
১৪. পরিবর্ধন।
১৫. তাফহীম ৩য় খন্ড- মরিয়ম টীকা ২৫।
১৬. তাফহীম ৩য় খন্ড- কাসাস- টীকা ৭২।
১৭. পরিবর্ধন।
১৮. তাফহীম ৩য় খন্ড- সূরা রূমের ভূমিকা।

দশম অধ্যায়

নবুওতের ৬ষ্ঠ বছরের পর থেকে দশম বছরের পর পর্যন্ত

আবিসিনিয়ায় হিজরতের পর মক্কায় নবীর (স) অনেক কম লোকই রয়ে যান যাঁদের সাথে কতিপয় মহিলাও ছিলেন। ইসলামের দুশমনগণ একে তো হিজরতের কারণে এক চরম বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল উপরন্তু তাদের অতিরিক্ত ক্ষোভের কারণ ছিল এই যে, আবিসিনিয়ায় তারা অতি নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেছিল এবং মুশরিকদের প্রতিনিধি দল ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছিল। এ অবস্থায় তারা নবীর (স) উপর আঘাত হানতেও ইতঃস্তত করেনি।(১)

নবী (স) এর উপর কুরাইশদের নির্যাতন

বোখারীতে হযরত ওরওয়া বিন যুবাইয়ের এক বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল আসকে (রা) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি নবী (স) এর উপর মুশরিকদের সবচেয়ে নির্মম আচরণ কি দেখেছেন?

জবাবে তিনি বলেন, একদিন নবী (স) কাবার প্রাংগণে (মতান্তরে হিজরে কাবায়) নামায পড়ছিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ ওক্‌বা বিন আবি মুয়াইত সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাঁর গলায় কাপড় জড়িয়ে পাক দিতে থাকে যাতে তাঁকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলা যায়। ঠিক সে সময়ে হযরত আবু বকর (রা) তথায় পৌঁছে যান। তিনি তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, হযরত আবু বকর (রা) যখন তার সাথে ধস্তাধস্তি করছিলেন তখন তাঁর মুখ দিয়ে এ কথা বেরুচ্ছিল-

أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا أَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ ؟

তুমি কি তাকে শুধু এ অপরাধে মেরে ফেলতে চাও যে তিনি বলেন, আমার রব আল্লাহ? ইবনে জারীর তাঁর ইতিহাসে এ ঘটনা আবু সালমা বিন আবদুর রহমানের বরাত দিয়ে বিবৃত করেছেন। কিন্তু নাসায়ী এবং ইবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহর পরিবর্তে তাঁর পিতা আমর বিন আস থেকে কিছু শাব্দিক পরিবর্তনসহ এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন এবং তাতে ওকবা বিন আবি মুয়াইতের পরিবর্তে একথা বলেছেন যে, কুরাইশের লোকেরা এ কান্ড করেছে। আর হযরত আবু বকর (রা) কাঁদতে কাঁদতে হুযুরকে (স) রক্ষা করতে এবং এ শব্দগুলো উচ্চারণ করতে থাকেন।(২)

ইমাম বোখারী এ ঘটনা তাঁর কিতাবে কয়েক স্থানে উদ্ধৃত করেছেন। কোন স্থানে হযরত আমর বিন আস (রা) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, কোথাও হযরত আবদুল্লাহ বিন

আমর বিন আস থেকে।[১] এক স্থানে হযরত আমর বিন আসের বর্ণনা এমন আছে, আমি কখনো কুরাইশকে নবীকে (স) হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করতে দেখিনি একবার ব্যতীত। তারা কাবা ঘরের ছায়ায় বসেছিল এবং নবী (স) মাকামে ইব্রাহীমে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় তারা একে অপরকে নবীর (স) বিরুদ্ধে উত্তেজিত করলো। শেষে ওকবা বিন মুয়াইত উঠলো এবং তার চাদর নবী (স) এর গলায় পেচায়ে টানতে লাগলো। অবশেষে হুযুর (স) হাঁটু গেড়ে পড়ে গেলেন। ফলে লোকদের মধ্যে শোরগোল শুরু হলো। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা) দৌড়ে সেখানে এলেন এবং পেছন থেকে তাঁর দুটি বাহু ধরে উঠালেন এবং বলতে লাগলেন, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে শুধু এ অপরাধের জন্য মেরে ফেলছ যে তিনি বলেন, আমার রব আল্লাহ?

তারপর লোক তাঁর নিকট থেকে চলে গেল। নামায শেষ করে যখন নবী (স) কুরাইশদের ওসব লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বল্লেন, কসম সেই সত্তার যার মুষ্টিতে আমার জীবন, আমি তোমাদের প্রতি জবাইসহ প্রেরিত হয়েছি। উত্তরে আবু জাহল বলে, হে মুহাম্মদ (স) তুমিতো কখনো নির্বোধ ছিলেনা (আবু ইয়ালা ইবনে হিব্বান, তাবারানী ও বায়হাকী- এ ঘটনা আমর বিন আস (রা) এর বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন)।

সহীহ বোখারীর আর একটি বর্ণনায় আছে যে, মুশরিকরা হুযুরের (স) দাড়ি ও মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলে। হযরত আবু বকর (রা) তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে যান এবং কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে শুধু এ অপরাধে মেরে ফেলতে চাও, যিনি বলেন, আমার রব আল্লাহ?

নবী (স) বল্লেন, আবু বকর (রা) তাকে ছেড়ে দাও। সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন, আমি তাদের প্রতি জবাইসহ প্রেরিত হয়েছি। একথা শুনার পর ভিড় করা লোক কেটে পড়ে।

ইবনে হিশাম, ইবনে জারীর তাবারী ও বায়হাকী ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে এ ঘটনা এভাবে উদ্ধৃত করেছেন যে, ওরওয়া বিন যুবাইর হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আসকে জিজ্ঞেস করেন, কুরাইশ নবী (স) এর প্রতি যে শত্রুতা প্রকাশ করতো, তার মধ্যে সবচেয়ে নির্মম ঘটনা আপনি কি দেখেছেন? তিনি বলেন, আমি একবার কুরাইশের বৈঠকে গিয়েছিলাম এবং তাদের সর্দারগণ হিজরে সমবেত হয়েছিল। তারা রসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে বলে, এ ব্যক্তির ব্যাপারে আমরা যতোটা সবর করেছি এমনটি করতে আর কাউকে দেখেনি। এ আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে নির্বুদ্ধিতা বলে গণ্য করে। আমাদের বাপদাদার নিন্দা করে, আমাদের দ্বীনেরও দোষত্রুটি ধরে এবং আমাদের দলে ভাঙন সৃষ্টি করেছে। আসলে আমরা অনেক ধৈর্য ধারণ করেছি। এরপরও সে এ সব কথা বলে। এমন সময় নবী (স) কে দেখা গেল। তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে হিজরে আসওয়াদে চুমো দিলেন। তারপর কাবায় তাওয়াফ করতে গিয়ে তাদের নিকট দিয়ে গেলেন। তারা তখন তাঁর প্রতি এক বিদ্রুপবান নিক্ষেপ করলো। আমি তাঁর মুখমন্ডলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। দ্বিতীয়

---

১. সঠিক এটাই মনে হয় যে, আসল বর্ণনা হযরত আমর বিন আসের (রা) এবং আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) সম্ভবতঃ তাঁর পিতার নিকট থেকে শোনা ঘটনা বর্ণনা করেন। কারণ হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) ৬৫ হিজরীতে এন্তেকাল করেন এবং তখন তাঁর বয়স ছিল বায়াত্তর বছর। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে তিনি এ ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী ছিলেননা। কারণ তাঁর জন্ম হিজরতের সাত বছর পূর্বে অর্থাৎ নবুওতের ষষ্ঠ বর্ষে হয়- (গ্রন্থকার)।

বার যখন তিনি তাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন পুনরায় তারা তাঁকে উপহাস করলো। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়াও তাঁর মধ্যে দেখলাম।। তৃতীয়বার যখন তারা একই আচরণ করলো তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বল্লেন, হে কুরাইশের লোকেরা শুনে রাখ, কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে, আমি তোমাদের নিকটে জবাইসহ্ এসেছি।

আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা) বলেন, নবীর (স) এ কথায় তারা সকলে হতভম্ব হয়ে পড়লো। এমন মনে হচ্ছিল যে, তাদের মাথার উপরে যেন পাখী বসে আছে অর্থাৎ তারা যেন বজ্রাহত। তারপর তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী বাড়িয়ে কথা বলছিল, সে নবীকে (স) শান্ত করার জন্য ভদ্রভাবে কথা বলে। সে বলে, হে আবুল কাসেম। ভালোভাবে চল। খোদার কসম, তুমিতো কখনো নির্বোধ ছিলেনা। হুযুর (স) সেখান থেকে ফিরে গেলেন।

পরদিন তারা আবার হিজরে সমবেত হয় এবং আমিও তাদের সাথে ছিলাম। তারা নিজেদের মধ্যে বল্লো, তোমাদের স্মরণ আছে কি যে, এ লোকটি তোমাদের ব্যাপারে কতটা বাড়াবাড়ি করছে? এমন কি সে কথাও গতকাল পরিষ্কার বলে দিয়েছে। এরপরও তোমরা তাকে ছেড়ে দিয়েছ। এমন সময়ে হুযুরকে (স) সম্মুখ দিক থেকে আসতে দেখা গেল। তাঁর আসার সাথে সাথে সকলে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে ঘিরে ধরে বলতে থাকে, তুমিই তো এই এই কথা বলে থাক? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি সে ব্যক্তি যে এই এই কথা বলে। এমন সময় দেখলাম তাদের মধ্যে একজন হুযুরের (স) চাদর গলার কাছ থেকে ধরে ফেলে এবং মুষ্টির মধ্যে চেপে ধরে। তারপর আবু বকর (রা) তাঁর সাহায্যের জন্য উঠে পড়েন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে শুধু এ অপরাধে মেরে ফেলতে চাও যিনি বলেন- আমার রব আল্লাহ?

তারপর লোকেরা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। এ হচ্ছে বড্ডো কঠিন ও নির্মম আচরণ যা আমি রসূলুলাহর (স) সাথে কুরাইশকে করতে দেখেছি (মুসনাদে আহমদেও এ কাহিনী এভাবে বর্ণিত আছে)।

হযরত হামযার (রা) ইসলাম গ্রহণ

সে সময়েই একদিন এমন এক ঘটনা ঘটে যা হযরত হামযাকে (রা) ইসলামের গন্ডির মধ্যে টেনে আনে। তাঁর ইসলাম গ্রহণের তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ইবনে হাজার ইসাবাতে নবুওতের দ্বিতীয় বৎসর লিখেছেন। ইবনে আবদুল বারর প্রথমে উক্ত দ্বিতীয় বর্ষ লেখার পর পুনরায় লেখেন যে, তিনি নবুওতের ষষ্ঠ বর্ষে হুযুরের (স) দারুল আরকামে প্রবেশ করার পর মুসলমান হন। কিন্তু ইবনে সা'দ, ইবনুল জুযী এবং আল্‌উতাবী নিশ্চয়তার সাথে নবুওতের ষষ্ঠ বছর বলেছেন, ইবনুল কাইয়েমও যাদুল মায়াদে হাবশার দ্বিতীয় হিজরতের পর উল্লেখ করেছেন, আর এ কথাই ইবনে কাসীরের তারিখুল কামেলে আছে। উপরন্তু যে ঘটনা হযরত হামযার (রা) ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিল তা স্বয়ং এ কথা প্রকাশ করে যে, তা নবুওতের দ্বিতীয় বছর হতে পারেনা। বরঞ্চ কুরাইশ এবং নবীর (স) মধ্যে সংঘাত চরমে পৌছার পরই তা সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল, দ্বিতীয় বর্ষে আবু জাহলের কি সাধ্য ছিল যে নবীকে গালি দেয়াতো দূরের কথা, তাঁর চোখে চোখ রেখে কথা বলে।

ঘটনা এই যে, একদিন নবী (স) (ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে) সাফা পাহাড়ের নিকট দিয়ে মতান্তরে হাজুনের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এমন সময় আবু জাহল তাঁকে খুব গালি গালাজ করে। তাঁর এবং তাঁর প্রচারিত দ্বীন সম্পর্কেও কটু কথা প্রয়োগ

করে। কিন্তু তিনি তার কোন কথারই জবাব দেননা। আর খবরটি ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে আবদুল্লাহ্ বিন্ জুদআমের (বনী তাইয়েমর একজন প্রধান) আযাদ করা দাসী, অন্যান্যের মতে হযরত হামযার (রা) ভগ্নি হযরত সাফিয়া (রা) এবং ইবনে আবি হাতেমের বর্ণনা মতে দুজন মহিলা হযরত হামযাকে (রা) পৌছিয়ে দেন। তিনি কুরাইশের একজন শক্তিশালী, সাহসী ও আত্মমর্যাদাশীল বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন হুযুরের (স) চাচা এবং দুধ ভাই। তাঁর মা বিবি আমেনার চাচাতো ভগ্নি ছিলেন। বয়সে হুযুরের দু'চার বছর বড়ো ছিলেন। হুযুরকে (স) তিনি খুবই ভালোবাসতেন। শিকারের বড়ো সখ ছিল। তীর ধনুক নিয়ে ফিরছিলেন এমন সময় এ ঘটনা শুনতে পেলেন। ক্রোধে অধীর হয়ে হেরেমে পৌছেন যেখানে আবু জাহল বসেছিল। পৌছার সাথে সাথে এমন জোরে ধনুক দিয়ে মাথায় আঘাত করেন যে, মাথা ফেটে যায়। বলেন, তুমি তাঁকে গালি দাও? আমিও তাঁর দ্বীনে রয়েছি এবং তাই বলি যা তিনি বলেন। তোমার সাহস থাকে তো একবার আমাকে গালি দিয়ে দেখ।

এতে বনী মাখযুমের কিছু লোক আবু জাহলের সমর্থনে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু আবু জাহল বল্লো, আবু উমারাকে যেতে দাও। আমি সত্যিই তার ভাতিজাকে খারাপ গালি দিয়েছিলাম। তাবারানী ও এবনে হাতেম বলেন, হযরত হামযা (রা) বলেন, আমার দ্বীনও মুহাম্মদের (স) দ্বীন, তোমরা পারতো আমাকে তার থেকে নিবৃত্ত রাখো।

মাগাযী গ্রন্থ প্রণেতা ইউনুস বিন বুকাইর ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে অতিরিক্ত বিশদ বিবরণ এ দিয়েছেন যে, হযরত হামযা (রা) আত্মমর্যাদার আবেগে অভিভূত হয়ে এ কাজটি করলেন বটে। কিন্তু বাড়ি যাওয়ার পর তাঁর মন তাকে এরূপ ভর্ৎসনা করলোঃ তুমি কুরাইশের সর্দার, দ্বীন পরিত্যাগকারী এ ব্যক্তির অনুসারী হয়ে গেলে এবং বাপদাদার দ্বীন পরিত্যাগ করলে? যা করেছ তারপর তার থেকে মৃত্যুই তোমার জন্য শ্রেয়ঃ।

তারপর তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, হে খোদা! এ যদি সঠিক পথ হয় তাহলে এর সত্যতা আমার মনে প্রবিষ্ট করে দাও। নতুবা তার থেকে বেরুবার কোন পথ আমার জন্য করে দাও। শয়তানী অস্অসায় সমস্ত রাত্রি তাঁর চরম উদ্বিগ্নতা ও অশান্তিতে কাটলো। সকাল বেলা হুযুরের (স) কাছে গিয়ে বল্লেন, ভাইপো! আমি এমন এক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি যার থেকে বেরিয়ে আসার কোন উপায় দেখছিনা। আমার মতো লোকের এমন এক বিষয়ের উপর কায়েম থাকা যা সঠিক অথবা বেঠিক হওয়া সম্পর্কে আমার জানা নেই, এ অত্যন্ত মারাত্মক।

হুযুর (স) তাঁর কথা শুনার পর তাকে উপদেশ দেন, খোদার ভয় দেখান এবং ঈমান আনার জন্য সুসংবাদ দেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁর দিলে ঈমান পয়দা করে দেন এবং হযরত হামযা (রা) বল্লেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সত্যবাদী। এ ঘটনা বায়হাকী ও ইউনুস বিন বুকাইরের বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেছেন।

হযরত ওমরের (রা) ইসলাম গ্রহণ

তারপর কুরাইশের প্রতি দ্বিতীয় এবং বিরাট মারাত্মক আঘাত এ ছিল যে, তারা একদিন জানতে পারে যে, ওমর বিন খাত্তাবও নবীর (স) প্রতি ঈমান এনেছেন। কুরাইশের ইসলাম বিরোধিতার স্তম্ভগুলোর মধ্যে তিনি একটি স্তম্ভ ছিলেন। ঈমান আনয়ন কারীদের উপর জুলুম নির্যাতনে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। কুরাইশের নিকটে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা ছিল। আরবের কুলপুঞ্জী বিদ্যার প্রখ্যাত পন্ডিত তিনি ছিলেন। কুরাইশের পক্ষ থেকে

দূতরূপেও তাঁকে পাঠানো হতো। উপজাতিদের মধ্যে ঝগড়া বিসংবাদে তাঁকে সালিসী মানা হতো এবং তাঁর ফয়সালা মেনে নেয়া হতো। তিনি ছিলেন শক্তিশালী ও সাহসী বীর। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাকপটু ও সুবক্তা এবং শ্রোতাদেরকে করতে পারতেন মন্ত্রমুগ্ধ। কুরাইশ এ ধারণাই করতে পারেনি যে, তাঁর মতো লোক একদিন ইসলামের পতাকাবাহী রূপে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। কিন্তু ক্রমশঃ অগ্রগমনশীল এক কর্মধারা তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল যা অবশেষে তাঁকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে।(৩)

তাঁর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া

তাঁর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া মুসনাদে আহমদে ও তারাবানীতে তাঁর বর্ণনা থেকেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি বলেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন রসূলুল্লাহকে (স) বিব্রত করার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরুলাম। কিন্তু আমার পূর্বেই তিনি হেরেমে প্রবেশ করেছিলেন। আমি যখন পৌঁছি তখন তিনি নামাযে সূরা আল্ হাক্কা পড়ছিলেন। আমি তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং শুনতে লাগলাম। কুরআনের বাকমর্যাদায় আমি বিস্ময়বোধ করছিলাম এবং আমার মধ্যে হঠাৎ এ ধারণা হলো যে এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই একজন যাদুকর যেমন কুরাইশ বলে থাকে। তৎক্ষণাৎ হুযুরের (স) মুখ থেকে একথাগুলো বেরুলো-

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ

- এ এক সম্মানিত রসূলের কথা, কোন কবির কথা নয়। তোমরা অতি অল্প ঈমানই আন (আয়াতঃ ৪০-৪১)

আমি মনে মনে বল্লাম, এ ব্যক্তি কবি না হলে, গণকতো বটে। তক্ষুণি তাঁর মুখ থেকে এ কথা বেরুলো-

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

- আর না এ কোন গণকের কথা। তোমরা কম চিন্তাভাবনা কর।

تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- এ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

এ শুনার পর আমার মনের গভীরে ইসলাম প্রবেশ করলো।(৪)

তাঁর মনে হিজরতে হাবশার প্রতিক্রিয়া

তাঁর দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে ইবনে হিশাম সীরাতে, তাবারী তাঁর ইতিহাসে, ইবনে আসীর উস্‌দুল গাবায়- হযরত লায়লা বিন্তে আবি হাস্‌মার বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ইনি ছিলেন হযরত ওমরের (রা) নিকট আত্মীয়া এবং তাঁর স্বামী হযরত আমের বিন রাবিয়াতুল আনযীর সাথে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তিনি বলেন, আমি হিজরতের জন্য মালপত্র বাঁধছিলাম এবং আমার স্বামী কোন কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। এমন সময়ে ওমর (রা) এলেন এবং তখনো তিনি শির্কের মধ্যে লিপ্ত ছিলেন। আমরা তাঁর হাতে অনেক নির্যাতন ভোগ করেছি। কিন্তু সে সময়ে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার কর্মব্যস্ততা দেখছিলেন। তারপর বল্লেন, আবদুল্লাহর মা, তাহলে কি চলেই যাচ্ছ?

বল্লাম, হ্যাঁ, তোমরা যখন আমাদের বড়ো জ্বালাতন করলে, আমাদের উপর জুলুম করলে, তখন আমরা খোদার যমীনে কোথাও বেরিয়ে পড়বো যেখানে খোদা আমাদেরকে এ বিপদ থেকে বাঁচার কোন পথ বের করে দেবেন। এতে ওমর (রা) বল্লেন, আল্লাহ

তোমাদের সাথে থাকুন। তাঁকে সে সময়ে এমন অশ্রু গদগদ দেখেছিলাম যা পূর্বে কখনো দেখিনি। আমাদের দেশ ত্যাগ করা দেখে তিনি অতি ক্ষুণ্ন মনে চলে যান।

তারপর আমের যখন আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে এলেন তখন আমি বল্লাম, আবদুল্লাহর আব্বা! হায়রে তুমি যদি এ সময়ে ওমরকে এবং আমাদের অবস্থার জন্য তার বেদনা কাতর চেহারা দেখতে। এই একটু পূর্বেই সে এখান থেকে চলে গেল। আমের বল্লেন, তুমি কি তার মুসলমান হওয়ার আশা কর? বল্লাম- হ্যাঁ। তিনি বল্লেন, যাকে তুমি এখন দেখেছ, সে ততোক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হবেনা যতোক্ষণ না খাত্তাবের গাধা মুসলমান হয়েছে।

তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী

এ মানসিক দ্বন্দ্ব অবশেষে একদিন রসূলুল্লাহকে (স) হত্যা করার জন্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে যাতে এ দ্বন্দের সমাপ্তি ঘটে যার মধ্যে তিনি নিমজ্জিত আছেন। ইবনে ইসহাক বলেন, তিনি এ উদ্দেশ্যে মুক্ত তরবারী হাতে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু পথের মধ্যে নুয়াইম বিন আবদুল্লাহ আল্লাখ্যামের সাথে দেখা হয়ে গেল। তিনি হযরত ওমরের (রা) গোত্রেরই অন্যতম সম্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন যিনি গোপনে মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কোথায় যাচ্ছ? বলেন, আমি এ সাবীকে (ধর্ম ত্যাগীকে) হত্যা করতে চাই যিনি কুরাইশের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করেছেন। আমাদের সবাইকে আহমক গণ্য করেন, আমাদের দ্বীনের ক্রটি বের করেছেন এবং আমাদের মা'বুদদের গালমন্দ করেন। নুয়াইম বলেন, খোদার কসম! হে ওমর, তোমার মন তোমাকে প্রতারণার জালে আবদ্ধ করেছে। তুমি কি মনে কর যে, মুহাম্মদের (স) হত্যার পর বনী আবদে মনাফ তোমাদেরকে জীবিত রাখবে? তুমি প্রথমে তোমার আপন ঘরের লোকদের খবর তো নিয়ে দেখ। হযরত ওমর (রা) বলেন, আমার কোন আপন ঘরের লোকদের কথা বলছ? নুয়াইম বলেন, তোমার ভগ্নিপতি ও চাচাতো ভাই সাঈদ বিন যায়দ এবং তোমার ভগ্নি ফাতেমা। তারা উভয়ে মুসলমান হয়েছে। তারা মুহাম্মদের (স) আনুগত্য গ্রহণ করেছে। হযরত ওমর (রা) উল্টা দিকে ফিরে সোজা তাঁর ভগ্নির বাড়ি পৌঁছেন। সেখানে খাব্বাব বিন আল্ আরাত উপস্থিত ছিলেন এবং তার হাতে একটি সাহীফা ছিল যাতে সূরা 'তা-হা' লেখা ছিল। তিনি হযরত ফাতেমাকে তা শিক্ষা দিতেন। ওমরের (রা) আগমন টের পেয়ে খাব্বার ঘরের এক কোণে লুকিয়ে থাকেন। হযরত ফাতেমা সে সহীফা উরুর তলায় দাবিয়ে রাখেন। কিন্তু হযরত ওমর দরজা থেকেই হযরত খাব্বাবের ক্বেরাত শুনতে পান। তিনি ভেতরে প্রবেশ করে বলেন, এ গুন গুন করে তোমারা কি বলছিলে যা আমি শুনতে পেলাম। সাঈদ বলেন, তুমি কিছুই শুননি। তিনি বলেন, না, আমি শুনেছি। খোদার কসম, আমি জানতে পেরেছি তোমরা উভয়ে মুহাম্মদের (স) দ্বীনের আনুগত্য কবুল করেছ। তারপর তিনি ভগ্নিপতিকে মারতে থাকেন। হযরত ফাতেমা স্বামীকে বাঁচাবার জন্য অগ্রসর হলে তাঁকেও এমনভাবে মারা হয় যে, মাথা ফেটে যায়। তখন মিয়া-বিবি উভয়ে বলেন, হ্যাঁ, আমরা মুসলমান হয়েছি এবং আল্লাহর রসূলের উপর ঈমান এনেছি। তুমি এখন যা খুশী কর। হযরত ওমর (রা) যখন ভগ্নির রক্ত ঝরতে দেখেন তখন তাঁর এ আচরণের জন্য লজ্জিত হন এবং আপন অজ্ঞতা থেকে ফিরে আসেন। তিনি ভগ্নিকে বলেন, সে সহীফা আমাকে দেখাও যা একটু আগে তোমরা পড়ছিলে। দেখি সে জিনিস কি যা মুহাম্মদ (স) এনেছে। হযরত ওমর (রা) শিক্ষিত লোক ছিলেন । এ জন্য তিনি তা পড়তে চাইছিলেন। তাঁর ভগ্নি বলে, আমার ভয় হচ্ছে, কি জানি তুমি তা নষ্ট করে

না ফেল। তিনি বলেন, সে ভয় করোনা। তিনি তাঁর মা'বুদের কসম করে বলেন যে, তা পড়ে ফেরৎ দেবেন। এখন তাঁর ভগ্নির মনে কিছুটা আশার সঞ্চার হলো যে, তিনি মুসলমান হয়ে যাবেন। তিনি বল্লেন, ভাই, তুমি শির্কের কারণে নাপাক আর এ সহীফাকে শুধুমাত্র পাক লোকই স্পর্শ করতে পারে। এতে হযরত ওমর (রা) উঠে গোসল করে এলেন। তখন ফাতেমা সহীফা তাঁর হাতে দিলেন। তিনি সূরা 'তা-হা'র প্রাথমিক অংশ পড়ে বল্লেন, কত সুন্দর ও উচ্চমানের কালাম! হযরত খাব্বাব (রা) তাঁর এ কথা শুনা মাত্র বের হয়ে এলেন এবং বল্লেন, হে ওমর! আশা করি আল্লাহ্ তোমাকে নবীর দোয়ার উপযোগী বানাবার জন্য বেছে নিয়েছেন। আমি গতকালই নবীকে (স) এ দোয়া করতে শুনেছি, হে খোদা! আবুল হাকাম বিন হিশাম (আবু জাহল) অথবা ওমর বিন খাত্তাবের দ্বারা ইসলামের সাহায্য কর। অতএব হে ওমর! আল্লাহ্র দিকে এসো, আল্লাহ্র দিকে এসো।

হযরত ওমর (রা) বলেন, আমাকে মুহাম্মদের (স) নিকটে নিয়ে চল। যাতে আমি মুসলমান হয়ে যাই। হযরত খাব্বাব (রা) বল্লেন, তিনি সাফার নিকটে একটি বাড়িতে (দারে আরকাম) তাঁর সংগীসাথীসহ্ রয়েছেন। হযরত ওমর (রা) তরবারী কোমরে বেঁধে হুযুর (স) এবং তাঁর সাহাবীদের বাসস্থানে পৌছেন এবং দরজায় আঘাত করেন। হুযুরের একজন সাথী দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলেন যে ওমর (রা) তরবারীসহ্ দাঁড়িয়ে। তিনি ভয়ে ফিরে গিয়ে হুযুরকে (স) এ সংবাদ দেন। হযরত হামযা (রা) বলেন, তাকে আসতে দাও। যদি নেক নিয়তে এসে থাকে তো আমরাও নেক আচরণ করব। নতুবা তার তরবারী দিয়েই তাকে খতম করব। হুযুর (স) বলেন, তাকে আসতে দাও। নির্দেশ অনুযায়ী হযরত ওমরকে (রা) ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হলো। তিনি আসা মাত্র হুযুর (স) সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁর চাদর মুষ্টির মধ্যে চেপে ধরে সজোরে টানলেন এবং বল্লেন, ইবনে খাত্তাব! কি মনে করে এখানে এলে? খোদার কসম, আমি মনে করি তুমি ফিরে আসবেনা যতোক্ষণ না আল্লাহ্ তোমার উপর কঠিন বিপদ নাযিল না করেন। হযরত ওমর (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর এবং রসূলের আনীত শিক্ষার উপর ঈমান আনার জন্য হাযির হয়েছি। এ কথায় হুযুর (স) উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবর' বলেন যার ফলে বাড়ি শুদ্ধ লোক জেনে ফেলেন যে, ওমর মুসলমান হয়েছেন। এতে মুসলমানদের বিরাট সাহস বেড়ে যায় যে, হযরত হামযার (রা) পরে হযরত ওমরও (রা) মুসলমান হয়েছেন। এখন এ দুজন মুসলমানদের জন্য শক্তি স্তম্ভ হয়ে পড়েন। ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত ওমরের (রা) ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে এ মদীনাবাসী রাবীগণের বর্ণনা। হাফেজ আবু ইয়া'লা তা হযরত আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণনা করেন এবং বায্যার স্বয়ং ওমর (র) থেকে।

হযরত ওমরের (রা) বর্ণনা

বায্যার, তাবারানী, বায়হাকী, ইবনে আসাকের, আবু নুয়াইম, দারকুত্নী প্রমুখ সীরাত লেখকগণ হযরত ইবনে আব্বাস (রা), আনাস বিন মালেক (রা), আসলাম প্রমুখ থেকে এবং স্বয়ং ওমরের (রা) নিজস্ব বর্ণনাও এ সম্পর্কে উদ্ধৃত করেছেন, যা বিশদ বিবরণে কিছু মতপার্থক্যসহ্ ইবনে ইসহাকের উপরোক্ত বর্ণনার সাথে অনেকটা মিলে যায়। অবশ্যি আবু নুয়াইম ও ইবনে আসাকের হযরত ওমরের (রা) বিবৃতির যে বর্ণনা হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তাতে অতিরিক্ত বলা হয়েছে যে, হযরত ওমর (রা) বলেন, আমি আরজ করলাম- হে আল্লাহ্র রসূল! আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই, মরি

আর বাঁচি? নবী (স) বলেন, খোদার কসম, মর আর বাঁচ তোমরা হকের উপর রয়েছ। বল্লাম, তাহলে গোপন করার কি প্রয়োজন? আমরা যখন হকের উপর এবং তারা বাতিলের উপর, তাহলে আমরা নিজেদের দ্বীন লুকিয়ে রাখব কেন?

হুযুর (স) বল্লেন, হে ওমর! আমরা সংখ্যায় খুব কম। আর তুমি দেখছ যে, আমরা কোন্ অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছি।

"আমি বল্লাম, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে হকের সাথে নবী করে পাঠিয়েছেন, আমি এমন মজলিস ছাড়বনা যেখানে পূর্বে কুফরের সাথে বসতাম এবং এমন ইসলামের সাথে বসবনা।"

"তারপর আমরা দুই ভাগ হয়ে বেরুলাম। একটিতে আমি এবং দ্বিতীয়টিতে হামযা (রা)। অবশেষে আমরা মসজিদে হারামে প্রবেশ করলাম, কুরাইশ যখন আমাদেরকে দেখলো তখন তারা এমন মর্মাহত হলো যে, পূর্বে তা কখনো হয়নি। এ ঘটনা ইবনে মাজা, হাকেম ও ইবনে সাদ বিভিন্নভাবে উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে হিশাম হযরত ওমরের (র) এ বিবৃতি উদ্ধৃত করেছেন যাতে ওমর (রা) বলেন, যেদিন আমি ইসলাম গ্রহণ করি সে রাতেই আমার মনে পড়লো যে, যে ব্যক্তি নবীর (স) সবচেয়ে বড়ো দুশমন তাকে আমার ইসলাম গ্রহণের খবর দেয়া উচিত। সুতরাং আমি সোজা আবু জাহলের বাড়ি গিয়ে দরজায় আঘাত করলাম। সে বের হয়ে আমাকে দেখে বল্লো, খোশ আমদেদ! আমার ভাইপো, কি মনে করে এলে?

বল্লাম- এ খবর দিতে এলাম যে আমি মুসলমান হয়েছি। সে বল্লো- তোমার ও তোমার এ খবরের পরিণাম খারাপ হোক। তারপর সে দরজা বন্ধ করে দেয়।

ইবনে ওমরের (রা) বর্ণনা

ইবনে ইসহাক নাফে'র বরাত দিয়ে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমরের (রা) বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর হযরত ওমর (র) জিজ্ঞেস করেন, কুরাইশের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশী সংবাদ ছড়াতে পারে? বলা হলো- জামিল বিন মা'মার বিন হাবিব আল্ জুমাহী। হযরত ওমর (রা) তার সন্ধানে বেরুলেন এবং আমিও তাঁর পেছনে চল্লাম। সে সময়ে আমার বয়স এমন ছিল যে, যা কিছু দেখতাম তা বুঝতে পারতাম।[১] হযরত ওমর (রা) গিয়ে তাকে বল্লেন, আমি মুসলমান হয়েছি এবং দ্বীনে মুহাম্মদ গ্রহণ করেছি। সে কোন কথা বল্লোনা। সে তার চাদর মাটিতে ছেঁচড়িয়ে বেরিয়ে পড়লো। হযরত ওমর তাঁর পেছনে এবং তাঁর পেছনে আমি চল্লাম। মসজিদে হারামের দরজায় পৌঁছে সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, কুরাইশের লোকেরা! কুরাইশ সর্দারগণ তখন কাবার ধারে বৈঠকে ছিল। তারা তার আওয়াজ শুনে সেদিকে মনোযোগ দিল। সে বল্লো, শুনো, ওমর দ্বীন থেকে ফিরে গেছে। হযরত ওমর (রা) পেছন থেকে উচ্চস্বরে বলেন, মিথ্যা কথা বলছে। আমি মুসলমান হয়েছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (স) তাঁর বান্দা ও রসূল।

তারপর লোক তাঁকে মারতে শুরু করে এবং তিনিও তাদেরকে মারতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত বেলা দুপুর হয়ে যায়। হযরত ওমর (রা) ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েন। লোক চার ধারে

---

১. ইবনে সা'দ হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমরের (রা) বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন- তাতে তিনি বলেন, আমি তখন ছ'বছরের ছিলাম। হাফেজ ইবনে হাজার ফতহুল বারীতে বলেছেন- তাঁর বয়স তখন ছিল পাঁচ বছর (গ্রন্থকার)।

দাঁড়িয়ে ছিল এবং তিনি বলছিলেন, তোমাদের যা ইচ্ছা কর। এমন সময় কুরাইশের জনৈক মুরুব্বী ব্যক্তি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সমবেত লোকাদের জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার কি?

তারা বল্লো, ওমর দ্বীন থেকে ফিরে গেছে। তিনি বল্লেন, তাতে কি হয়েছে? একজন যা কিছু চাচ্ছিল তাই করেছে। এখন তোমরা কি চাও? তোমরা কি চাও যে বনী আদী এভাবে তার লোককে তোমাদের হাতে ছেড়ে দেবে? সরে যাও তার কাছ থেকে। তখন তারা সরে পড়লো। পরে আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করি, তিনি কে ছিলেন?

তিনি বল্লেন, পুত্র, তিনি ছিলেন আস বিন ওয়ায়েল সাহমী- অর্থাৎ আমর বিন আল আস্-এর পিতা। তাবারানী ও বায্যার ইবনে ওমরের (রা) এ বর্ণনা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করেছেন।

বোখারীতে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমরের (রা) এরূপ বর্ণনা আছে যে, যখন হযরত ওমর (রা) আপন গৃহে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় বসে ছিলেন তখন আস বিন ওয়ায়েল (জাহেলিয়াতের যুগে আমাদের মিত্র পক্ষীয় ছিলেন) তাঁর কাছে এলেন এবং বল্লেন, এমন বিষণ্ন বদনে বসে আছ কেন? তিনি বলেন, তোমার কওম আমাকে হত্যা করতে চায়। কারণ আমি মুসলমান হয়েছি। তিনি বলেন, কেউ তোমার গায়ে হাত দিতে পারবেনা, আমার পক্ষ থেকে যখন তোমাকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। তারপর আস্ যখন বাইরে বেরুলেন তখন দেখলেন উপত্যকায় মানুষের ভিড়ে জমজমাট। তিনি বল্লেন, তোমরা কি চাও? জবাবে তারা বল্লো, আমরা ইবনে খাত্তাবের খবর নিতে চাই যে, দ্বীন থেকে বিমুখ হয়েছে। তিনি বল্লেন, ওমরের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবেনা। তখন তারা সব ফিরে চলে গেল।

ওমরের (রা) ইসলাম গ্রহণের তারিখ

হযরত ওমরের (রা) ইসলাম গ্রহণের ঘটনা নবুওতের ষষ্ঠ বর্ষে সংঘটিত হয়। যেমন ইমাম নাওয়াদী 'তাহ্যীবুল আস্মা ওয়াল্লোগাতে' এবং মোল্লা আলী কারী 'আরবাইনে নাওয়াদীর' ব্যাখ্যায় লিখেছেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি হযরত হামযার (রা) মুসলমান হওয়ার তিন দিন পর ঈমান আনেন। কেউ কেউ বলেন, তিন মাস পর। কিন্তু আবু নুয়াইম ইসফাহানী হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রা) এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি স্বয়ং হযরত ওমরকে (রা) তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেন, আমি হযরত হামযার (রা) মুসলমান হওয়ার তিন দিন পর বেরিয়েছিলাম। ইবনে সা'দ হযরত ওমরের (রা) ভৃত্য আসলামের বরাত দিয়ে বলেন যে, এ ছিল নবুওতের ষষ্ঠ বর্ষের যিল্হজ্ব মাসের ঘটনা। কিন্তু সম্ভবতঃ এ তার বেশ আগের ঘটনা। মসহায়লী বলেন, সে সময়ে রসূলুল্লাহর (স) সাথে চল্লিশের কিছু বেশী লোক ছিলেন। ওয়াহেদী এর উপর অতিরিক্ত দশজন নারীর কথা বলেছেন। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার 'মুনাকেবে ওমরে' ইবনে আবি খায়সামার বরাত দিয়ে হযরত ওমরের (রা) এ উক্তি উদ্ধৃত করেন যে, রসূলুল্লাহর সাথে ৩৯ জন লোক ছিলেন, আমাকে দিয়ে ৪০ জন হয়। সম্ভবতঃ সে সময়ে হযরত ওমর (রা) এতো সংখ্যক লোকের কথাই জানতেন। কারণ বহু মুসলমান তাঁদের ঈমান গোপন রেখেছিলেন।

'শিয়াবে আবি তালেবে' অবরুদ্ধ অবস্থায়

এ সময়ে ইসলাম ও নবীর (স) উপর কুরাইশের ক্রোধ দিন দিন বেড়েই চলছিল।

তারা দেখছিল যে তাদের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও মক্কা শহরেও ভেতরে ভেতরে ইসলাম প্রসার লাভ করছিল। বাইরের গোত্রের লোকও একের পর এক মুসলমান হচ্ছিল। তারপর এ ব্যাপারটি শুধু আরব দেশেই সীমিত ছিলনা। বরঞ্চ আবিসিনিয়া পর্যন্ত তার মূল বিস্তার লাভ করে। নাজ্জাশী প্রকাশ্যে মুসলমানদের সমর্থক হয়ে পড়েন। সেখান থেকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য নবীর (স) নিকটে প্রতিনিধি দল আসতে থাকে। উপরন্তু তাদের ক্রোধাগ্নিতে এ জিনিস ঘৃত নিক্ষেপ করছিল যে, হযরত হামযা (রা) ও হযরত ওমরের (রা) মতো বীর ও প্রভাবশালী সর্দারগণের মুসলমানদের দলে শামিল হওয়ার ফলে ওসব মুসলমানের হিম্মৎ সাহস বেড়ে যায়- যাঁরা হিজরতে হাবশার পর মক্কায় রয়ে গিয়েছিলেন। ইবনে আবি শায়বা ও তাবারানী হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদের (রা) এ উক্তি উদ্ধৃত করেন- খোদার কসম, আমরা বায়তুল্লাহর পার্শ্বে নামায পড়তে পারতাম না যতোক্ষণ না হযরত ওমর (রা) মুসলমান হয়েছেন। বোখারীতে সেই ইবনে মাসউদের (রা) এ উক্তি উদ্ধৃত আছে-

مازلنا اعزّة منذ اسلم عمرؓ

-ওমরের (রা) মুসলমান হওয়ার পর থেকে আমরা বরাবর শক্তিশালীই ছিলাম।

এ কারণসমূহ একত্রে মিলে অবশেষে কুরাইশের জাহেলিয়াতকে এতোটা উত্তেজিত করে দেয় যে, তারা সর্বসম্মতিক্রমে একটি দলিল রচনা করে যাতে আল্লাহর কসম করে এ শপথ গ্রহণ করে যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত বনী হাশেম ও বনী মুত্তালেব মুহাম্মদ (স) কে তাদের হাতে সমর্পণ না করেছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে মেলামেশা, বিয়ে-শাদী, কথাবার্তা, বেচাকেনা প্রভৃতির কোন সম্পর্ক থাকবেনা। কুরাইশের সকল পরিবারের কর্মকর্তা এ দলিলের সত্যায়ন করে এবং তা কাবা ঘরে লটকিয়ে দেয়। ইবনে সা'দ ও ইবনে আবদুল বারর বলেন এ নবুওতের সপ্তম বছর পয়লা মহররমের ঘটনা।

মূসা বিন ওকবা ইমাম যুহরীর বরাত দিয়ে তাঁর মাগাযীতে[১] লেখেন যে, আবু তালেব যখন জানতে পারলেন যে, কুরাইশের লোকেরা নবী মুহাম্মদের (স) জীবন নাশের জন্যে বদ্ধপরিকর তখন বনী হাশেম ও বনী মুত্তালেবকে ডেকে পাঠালেন এবং বল্লেন, মুহাম্মদকে (স) সাথে নিয়ে সকলে শিয়াবে আবি তালেবে[২] সমবেত হোক এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর হেফাজত করুক। এ প্রস্তাব উভয় পরিবার মেনে নেয় এবং তাদের কাফের ও মুসলমান সকলে শিয়াবে আবি তালেবে একত্র হয়। এরপর কুরাইশের অন্যান্য পরিবার পরস্পরে উপরে বর্ণিত চুক্তি করে।[৩]

পক্ষান্তরে ইবনে সা'দ ওয়াকেদী থেকে এবং ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, প্রথমে কুরাইশের লোকেরা বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার শপথনামা রচনা করে এবং তারপর এ দুই পরিবার আবু তালেবের কথায় শিয়াবে আবি তালেবে অবরুদ্ধ হয়ে বসে পড়ে। একথা ইবনে আবদুল বাররও

---

১. ইবনে আবদুল বারর সীরাতে এ বর্ণনা মূসা বিন ওকবা ছাড়াও মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান আবুল আসওয়াদ এবং ইয়াকুব বিন হামিদ বিন কাসেবের বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেন (গ্রন্থকার)।

২. শিয়াব অর্থ ঘাঁটি। শিয়াবে আবিতালেব আবু কুরাইশ পাহাড়ের ঘাটিগুলোয় অন্যতম যেখানে আবু তালেব বাস করতেন। এখন তার নাম শিয়াবে আলী। তাকে সুকুল লায়লও বলা হয়- গ্রন্থকার।

৩. ইবনে আবদুল বারর মূসা বিন ওকবার বরাত দিয়ে ইমাম যুহরীর এ আজীব বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন- যে শিয়াবে আবি তালেবে অবরোধের পর হুযুর (স) মক্কায় মজলুম মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। একথ সর্বসাধারণের পরিজ্ঞাত বর্ণনার পরিপন্থী- গ্রন্থকার।

সীরাতে উল্লেখ করেছেন। আবু লাহাব এ সময় তার পরিবার থেকে পৃথক থাকে এবং অবরোধকারীদের দলে যোগদান করে। বনী আবদে মনাফ-এর অবশিষ্ট দুটি পরিবার- বনী আবদে শাম্‌স ও বনী নওফলও দাদীর দিক দিয়ে আত্মীয়দের পরিত্যাগ করে অবরোধকারী দুশমনদের সাথে যোগদান করে।

ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে অবরোধ দু'তিন বছর স্থায়ী ছিল বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু ইবনে সা'দ ও মূসা বিন ওক্‌বা নিশ্চয়তার সাথে এর মুদ্দৎকাল তিন বছর বলেছেন। এ সমগ্র কালব্যাপী কুরাইশের অবরোধ অত্যন্ত কঠোরতার সাথে বিদ্যমান থাকে। তাঁদেরকে এমনভাবে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল যে, পানাহারের দ্রব্যাদি তাঁদের নিকটে পৌঁছার সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। মূসা বিন ওক্‌বা বলেন, বাইরের কোন ব্যবসায়ী মক্কায় আগমন করলে কুরাইশের লোকেরা তাড়াতাড়ি তাদের সমুদয় পণ্যদ্রব্য খরিদ করে নিত যাতে অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণ কিছু খরিদ করতে না পারেন। আবু লাহাব সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছে যে, অবরুদ্ধ লোকদেরকে কিছু খরিদ করতে দেখলে উচ্চস্বরে ব্যবসায়ীদেরকে বলতো, তাদের নিকটে এমন চড়া মূল্য চাও যেন তারা কিনতে না পারে, তারপর আমি সেসব তোমাদের নিকট থেকে খরিদ করে নেব এবং তোমাদের কোন লোকসান হতে দেবনা। ইবনে সা'দ এবং বায়হাকী বলেন, অবরুদ্ধদের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শিশুদের কান্না শিয়াবে আবি তালেবের বাইরে শুনা যেত। এরা শুধু হজ্বের সময় বের হতেন এবং দ্বিতীয় হজ্ব পর্যন্ত নিজেদের মহল্লায় আবদ্ধ থাকতেন।

এ সময়ে শুধু হযরত খাদিজার (রা) ভাইপো হাকিম বিন জুযাম এবং নাদলা বিন হাশেম বিন আবদে মানাফের ভাইপো হিশাম বিন আমর আল্ আমেরী গোপনে আত্মীয়তার হক আদায় করতে থাকেন। ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে ইবনে হিশাম বলেন, একবার আবু জাহল হাকিম বিন জুযামকে তাঁর ফুফুর নিকটে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যাবার সময় ধরে ফেলে এবং বলে বনী হাশেমের জন্যে খাদ্য নিয়ে যাচ্ছ? আচ্ছা ঠিক আছে। আমি তোমাকে ছাড়বনা যতোক্ষণ না সারা মক্কায় তোমাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করে দিয়েছি। এমন সময় আবুল বাখতারী বিন হিশাম (বনী আসাদ বিন আবদুল ওয্যা বিন কুসাই এর লোক এবং হযরত খাদিজার (রা) নিকট আত্মীয়) সেখানে পৌঁছলেন এবং জিজ্ঞেস করেন, ব্যাপার কি? আবু জাহল বলে, এ বনী হাশিমের জন্যে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যাচ্ছে। তিনি বল্লেন, ছেড়ে দাও একে। এ তার ফুফুর খাদ্যদ্রব্য তার কাছে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি কি তার নিজের জিনিস তার কাছে যেতে দেবেনা? একথা আবু জাহল মেনে নেয়না। ফলে উভয়ের মধ্যে ঝগড়া ও মারামারি শুরু হয়। এক পর্যায়ে আবুল বাখ্‌তারী উটের চোয়ালের হাড় দিয়ে আবু জাহলের মাথায় আঘাত করলে মাথা ফেটে যায়। হযরত হামযা (রা) এ ঘটনা লক্ষ্য করছিলেন। এতে উভয় মুশরিক কাফের লজ্জিত হয়ে পারস্পরিক বিবাদ বন্ধ করে দেয়- যাতে বনী হিশাম আনন্দিত না হয়। হিশাম বিন আমর আল আমেরী সম্পর্কে ইবনে ইসহাকের বর্ণনা ইবনে হিশাম উদ্ধৃত করে বলেন যে, তিনিও চুপে চুপে বনী হাশিম ও বনী আল্ মুত্তালিবের সাথে আত্মীয় সুলভ সদাচরণ করতে থাকেন। তা করার পন্থা এ ছিল যে, উটের পিঠে রাতের বেলায় পণ্যদ্রব্য বোঝাই করে শিয়াবে আবি তালেবের ভেতরে হাঁকিয়ে দেয়া হতো। অবরুদ্ধ লোকজন উটকে ধরে পণ্যদ্রব্য নামিয়ে নিয়ে তাকে বাইরে বের করে দিত। কুরাইশের লোকজন তাঁকেও ধমক দিত। কিন্তু আবু সুফিয়ান বলেন, তাকে ছেড়ে দাও। সেতো আত্মীয়ের প্রতি দয়া প্রদর্শনের কাজ করছে।

চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার ঘটনা

এ অবরোধ কঠোরতার সাথে চলছিল। কিন্তু 'সাধারণ দাওয়াত' অধ্যায়ে যেমন আমরা বলেছি, (এ খন্ডের শুরুতে), এতদসত্ত্বেও রসূলুল্লাহ (স) একদিনও তবলিগের কাজ থেকে বিরত থাকেননি এবং কারো এ সাধ্যও ছিলনা যে, তাঁকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করে। অবরোধ মাত্র দু'বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার বিরাট ঘটনা সংঘটিত হয়। মক্কায় কাফেরগণ তা স্বচক্ষে দেখতে পায়। মুহাদ্দেস ও তাফসীরকারগণ একমত যে, এ হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা। এ ঘটনা মিনায় ঘটে। কুরআনে তার উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে-

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ - (القمر: ١- ٢)

কিয়ামতের সময় আসন্ন এবং চাঁদ ফেটে গেছে। (কিন্তু তাদের অবস্থা এই যে) তারা কোন নিদর্শনই দেখুক না কেন, মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে এতো প্রচলিত যাদু। (কামার ঃ ১-২)

কতিপয় যুক্তিবাদী চাঁদের ন্যায় গ্রহের খন্ডিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করেন এবং اِنْشَقَّ الْقَمَرُ এর অর্থ এরূপ করেন যে, 'চাঁদ দ্বিখন্ডিত হবে'। যদি অনুবাদ 'ফেটে গেছে' এর পরিবর্তে 'ফেটে যাবে' করা হয় তাহলে দুটি আয়াতের মর্ম অযৌক্তিক হয়ে যায়। প্রথম আয়াতে 'চাঁদের দ্বিখন্ডিত' হওয়াকে কিয়ামতের সময় আসন্ন হওয়ার লক্ষণ বলা হয়েছে। যদি তাকে ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে বলে ধরা হয়, তাহলে চাঁদের ফেটে যাওয়াকে কিয়ামত আসন্ন হওয়ার লক্ষণ কিভাবে গণ্য করা যায়? আর এ অর্থ গ্রহণ করলে পরবর্তী আয়াত তো একেবারে অর্থহীন হয়ে পড়ে যাতে এ কথা বলা হয়েছে যে, এ সব এমন হঠকারী যে, কোন নিদর্শনই তারা দেখুক না কেন, তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাকে যাদুর অদ্ভুত প্রকাশ বলে গণ্য করে। এর পূর্বাপর বক্তব্য اِنْشَقَّ الْقَمَرُ এর এ অর্থ নিশ্চিত করে বলে দেয় যে, সে সময়ে চাঁদ প্রকৃতপক্ষে দ্বিখন্ডিত হয়েছিল। হাদীসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহ এ অর্থেরই সত্যতা স্বীকার করে।(৫)

চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করেছেন- বোখারী, তিরমিযি, আহমদ, আবু আওয়ামা, আবু দাউদ, তিয়ালিসী, আবদুর রাজ্জাক, ইবনে জারীর বায়হাকী, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া এবং আবু নুয়াইম। তাঁরা অধিক সনদসহ হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা), হযরত হুযায়ফা বিন আল ইয়ামান (রা), হযরত আনাস বিন মালেক (রা) এবং হযরত জুবাইর বিন মুত্য়েম (রা) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন বুযুর্গ- হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা), হযরত হুযায়ফা (রা) এবং জুবাইর বিন মুত্য়েম (রা) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, তাঁরা ছিলেন উক্ত ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী।

সকল বর্ণনা একত্র করলে যে বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় তা এই যে, এ ছিল হিজরতের প্রায় পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা। এ ছিল চান্দ্র মাসের ১৪ই রাত। চাঁদ সবে মাত্র উদিত হয়েছে- এমন সময় হঠাৎ তা দ্বিখন্ডিত হয়ে একখন্ড সম্মুখের পাহাড়ের একদিকে এবং অপরখন্ড অপরদিকে দেখা গেল। এ অবস্থা এক মুহূর্তই ছিল এবং তারপর দুটি খন্ড একত্র হয়ে যায়। নবী (স) তখন মিনায় অবস্থান করছিলেন। তিনি লোকদের বল্লেন, দেখ এবং সাক্ষী থাকো। কাফেরগণ বল্লো, মুহাম্মদ (স) তো আমাদের উপর যাদু করতে পারেন

কিন্তু সকলের উপর করতে পারেননা। বাইরের লোকদের আসতে দাও। তাদের জিজ্ঞেস করা হবে যে, তারাও এ ঘটনা লক্ষ্য করেছে কিনা। বাইর থেকে যখন কিছু সংখ্যক লোক এলো তখন তারা সাক্ষ্য দিল যে, তারাও এ দৃশ্য দেখেছে।

হযরত আনাস (রা) থেকে কিছু রেওয়ায়েত এমন পাওয়া যায় যার থেকে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়ার ঘটনা একবার নয়, দু'বার হয়েছে। প্রথম কথা এই যে, সাহাবাগণের মধ্যে কেউ একথা বলেননি। দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং হযরত আনাসের (রা) কোন কোন বর্ণনায় مَرَّتَيْن (দু'বার) শব্দগুলো এবং "দুখন্ড" শব্দগুলো পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ কুরআন শুধু একবার দ্বিখন্ডিত হওয়ার কথা বলেছে। এর ভিত্তিতে সঠিক কথা এই যে, এ ঘটনা শুধুমাত্র একবারই সংঘটিত হয়েছে। তারপর যে কাহিনীটি প্রচলিত আছে যে, নবীর (স) অঙ্গুলির ইশারায় চাঁদ দু'টুকরা হয়ে যায় এবং এক টুকরা তাঁর জামার ভেতর ঢুকে এক আস্তিন দিয়ে বেরিয়ে যায়, তা একেবারে ভিত্তিহীন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এ ঘটনার প্রকৃত স্বরূপ কি। এটা কি কোন মোজেযা ছিল যা মক্কায় কাফেরদের মুকাবেলায় রসূলুল্লাহ (স) তাঁর রেসালাতের প্রমাণ স্বরূপ দেখিয়েছিলেন? অথবা এ একটি দুর্ঘটনা ছিল যা আল্লাহর কুদরতে চাঁদের মধ্যে সংঘটিত হয় এবং তিনি লোকের দৃষ্টি এ উদ্দেশ্যে এদিকে আকৃষ্ট করেন যে, এ কিয়ামতের সম্ভাব্যতা এবং তার নিকটবর্তী হওয়ার একটি লক্ষণ? ওলামায়ে কেরামের একটি বড়ো দল একে হুযুরের (স) মোজেযার মধ্যে শামিল করেন। তাঁদের ধারণা এই যে, কাফেরদের দাবী পূরণের জন্যে এ মোজেযা দেখানো হয়। কিন্তু এ ধারণার উদ্ভব হয়, এমন কতিপয় বর্ণনা থেকে যা হযরত আনাস (রা) থেকে উদ্ধৃত। তিনি ব্যতীত অন্য কোন সাহাবী এ কথা বলেননি। ফতহুল বারীতে ইবনে হাজার বলেন, এ কাহিনী যতোভাবে উদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্যে হযরত আনাসের (রা) হাদীস ব্যতীত এ বিষয় আমার চোখে পড়েনি যে, চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়ার ঘটনা মুশরিকদের দাবীর ভিত্তিতে ঘটেছিল। আবু নুয়াইম ইস্‌ফাহানী 'দালায়েলুন নবুওতে' হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ বিষয়ে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তার সনদ দুর্বল। নির্ভরযোগ্য সনদে হাদীসগ্রন্থে যতো রেওয়ায়েত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, তার কোনটিতেই এ কথার উল্লেখ নেই। উপরন্তু হযরত আনাস (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) উভয়ে এ ঘটনার সমসাময়িক ছিলেননা। পক্ষান্তরে যে সকল সাহাবী সে সময়ে বিদ্যমান ছিলেন- যেমন হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা), হযরত হুযায়ফা (রা), হযরত জুবাইর বিন মুত্‌য়েম (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা)- তাঁদের মধ্যে কেউ এ কথা বলেননি যে, মক্কায় মুশরিকগণ হুযুরের (স) সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ কোন নিদর্শন দাবী করেছিল এবং তার ফলে চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়ার এ মোজেযা তাদেরকে দেখানো হয়েছিল। সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, কুরআন পাকও স্বয়ং এ ঘটনাকে রেসালাতে মুহাম্মদীর নয়, বরঞ্চ কিয়ামত আসন্ন হওয়ার লক্ষণ হিসাবে পেশ করেছে। অবশ্যি এ এদিক দিয়ে হুযুরের (স) সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ অবশ্যই ছিল যে তিনি কিয়ামত আগমণের যে খবর লোকদের দিয়েছিলেন, এ ঘটনা তারই সত্যতা প্রমাণ করে।

বিরুদ্ধবাদীগণ এ ব্যাপারে দু'ধরনের আপত্তি উত্থাপন করেন। প্রথমত তাঁদের দৃষ্টিতে

এরূপ হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয় যে, চাঁদের মতো একটি বিশাল গ্রহ দ্বিখন্ডিত হয়ে একটি খন্ড আর একটি থেকে পৃথক হয়ে পড়বে এবং একটি খন্ড অপরটি থেকে শত শত মাইল দূরে যাওয়ার পর পুনরায় একত্রে যুক্ত হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, তাঁরা বলেন যে, যদি এমনটি হতো, তাহলে এ ঘটনা সারা দুনিয়ায় প্রসিদ্ধ হয়ে পড়তো, ইতিহাসে তার উল্লেখ থাকতো এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রে তার উল্লেখ থাকতো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয় প্রতিবাদই গুরুত্বহীন। এটা মোটেও সম্ভব কিনা এ বিতর্ক হয়তো অতীতকালে চলতে পারতো। কিন্তু আধুনিক যুগে গ্রহাদির গঠন সম্পর্কে মানুষ যে জ্ঞানলাভ করেছে তার ভিত্তিতে এটা একেবারে সম্ভব যে, একটি গ্রহ তার অভ্যন্তরে অগ্নুদ্গমের কারণে ফেটে যেতে পারে এবং এ ভয়ানক অগ্নুদ্গমে তার দুটি খন্ড বহু দূরে চলে গিয়ে স্বীয় কেন্দ্রের চুম্বুক শক্তির কারণে একটি অপরটির সাথে পুনঃ যুক্ত হতে পারে। এখন রইলো দ্বিতীয় অভিযোগ। তা এ জন্যে গুরুত্বহীন যে, এ ঘটনা মুহূর্তের জন্যে সংঘটিত ছিলনা। সে নির্দিষ্ট মুহূর্তে সারা দুনিয়ার দৃষ্টি তার প্রতি নিবদ্ধ হওয়া জরুরী ছিলনা। কোন বিস্ফোরণ ধ্বনিও হয়নি যে মানুষের মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হবে। পূর্ব থেকে কোন সংবাদও পরিবেশন করা হয়নি যে মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে। আর গোটা বিশ্বে তা দেখাও সম্ভব ছিলনা। বরঞ্চ শুধু আরব এবং তার পূর্বদিকের দেশগুলোতেই তখন চাঁদ উদিত হয়েছিল। সেকালে ইতিহাস রচনার প্রতি মানুষের ততোটা অনুরাগ ও ইতিহাস শিল্প এতোটা উন্নতও হয়নি যে, প্রাচ্যের দেশগুলোতে যারা এ দেখেছে তারা তা লিখে রাখতো এবং কোন ঐতিহাসিকের নিকটে এ সাক্ষ্যসমূহ একত্র করে তা কোন ইতিহাস গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হতো। তথাপি মালাবারের ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ আছে যে, সে রাত্রে সেখানকার এক রাজা এ দৃশ্য অবলোকন করেন। এখন রইলো জ্যোতিঃশাস্ত্র ও পুঞ্জিকা গ্রন্থ। চাঁদের গতি, কক্ষ পথে তার আবর্তন এবং তার উদয় অস্তকালের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণীত হলে শুধুমাত্র তখনই তা জ্যাতিঃশাস্ত্রে বা পুঞ্জিকায় উল্লেখ থাকার কথা। এ ধরনের অনিয়ম দেখা দেয়নি, সেজন্যে প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিদগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়নি। এ সময়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্রেরও এতোটা উন্নতি হয়নি যে উর্ধ্বাকাশে কোন ঘটনা ঘটলে সংগে সংগেই তা রেকর্ড করে সংরক্ষিত করা হতো।(৬)

কিভাবে অবরোধের অবসান হলো

মক্কার কাফেরদের ধর্মান্ধ ও হঠকারী সর্দারগণ যদিও সাময়িক রাগের বশবর্তী হয়ে শহরের অন্যান্য পরিবারগুলো থেকে দুটি বৃহৎ পরিবারকে অবরুদ্ধ করে রাখে, কিন্তু মক্কায় এমন কোন পরিবার ছিলনা যাদের আত্মীয়তা বনী হাশেম এবং বনী আল মুত্তলিবের সাথে ছিলনা। এ জন্যে প্রথম থেকেই অনেকের কাছে আপন ভাই বেরাদরের অবরোধ অসহনীয় ছিল। এ অবরোধ যতোই দীর্ঘায়িত হতে থাকে, ততোই এর বিরুদ্ধে তাদের মন তিক্ততর হতে থাকে। কারণ বনী হাশেম ও বনী আল মুত্তালিব অনাহারের শিকার হয়ে পড়ে। তাদের শিশুদের কান্না ও বিলাপের আওয়াজ পার্শ্ববর্তী মহল্লাগুলোতে শুনা যেতো। অন্যান্য পরিবারে তাদের আত্মীয়-স্বজন যারা পাশেই অবস্থান করতো, এ সব আর্তনাদ হাহাকার শুনে অস্থির হয়ে পড়তো। মূসা বিন ওকবা বলেন, তৃতীয় বছরের শেষে বনী আবদে মানাফ, বনী কুসাই এবং যাদের বিয়ে-শাদী বনী হাশেমে হয়েছিল একে অপরকে তিরস্কার করতে থাকে এবং পরিষ্কার বলতে থাকে এ আত্মীয়তা বন্ধ করার অপরাধ যা আমরা করেছি। এ আচরণ দ্বারা আমরা পারিবারিক অধিকার ক্ষুণ্ন করেছি।

তাবারী ও ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাকের এবং বালাযুরী ওয়াকেদীর বরাত দিয়ে বলেন, অবশেষে হিশাম বিন আমর আল আমেরী এ কাজের দায়িত্ব নিয়ে বলেন যে, এ অবরোধের অবসান করেই তিনি ছাড়বেন। সর্বপ্রথম তিনি বনী মখযুমের প্রধান যুবাইর বিন আবি উমাইয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন যিনি ছিলেন হযরত উম্মে সালমার (রা) ভাই এবং হুযুরের (স) ফুফু আতেকা বিন্তে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। তিনি বলেন, হে যুবাইর! তুমি কি এতে আনন্দ উপভোগ কর যে, তুমি নিশ্চিন্তে খাওয়া দাওয়া করবে, বিয়ে-শাদী করবে আর তোমার নানার দিকের লোকেরা অনাহারে মারা যাবে? তাদের সাথে লেনদেন ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে? খোদার কসম করে বলছি, এ অবস্থা যদি আবু জাহলের হতো এবং তুমি যদি তার নানার পক্ষের লোকদের সাথে সে ব্যবহার করতে বলতে যা সে তোমার নানার পক্ষের লোকাদের সাথে করতে তোমাকে বলেছে, তাহলে সে তা কখনোই করতনা। যুবাইর বলেন, হিশাম! আমি একা কি করতে পারি? আরও কেউ যদি আমাদের সহযোগিতা করতো তাহলে অবরোধের দলিল ছিন্ন না করে ছাড়তাম না। হিশাম বলেন, একজন তো আমি রয়েছি। যুবাইর বলেন, আর একজন তালাশ কর।

তারপর হিশাম বনী নওফল বিন আবদে মানাফের সর্দার মুত্‌য়েম বিন আদীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। বল্লেন, হে মুত্‌য়েম! তুমি কি এতে খুশী যে, বনী আবদে মানাফের দুটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে আর তুমি তামাশা দেখতে থাকবে? তাদের ব্যাপারে তুমি যদি কুরাইশের সহযোগিতা কর এবং তাদেরকে শেষ করার জন্যে এভাবে কুরাইশকে ছেড়ে দাও, তাহলে শীঘ্রই এমন একদিন আসবে যেদিন এ অবস্থা তোমারও হবে। তিনি বল্লেন, আমি একা কি করতে পারি? আর কাউকে সাথে নাও। হিশাম বলেন, একজন তো আমি, দ্বিতীয় জন যুবাইর বিন আবি উমাইয়া। মুতয়েম বল্লেন, আর একজন তালাশ কর।

তারপর হিশাম বনী আসাদ বিন আবদুল ওয্যার সর্দার আবুল বাখতারী আস বিন হাশিমের সাথে সাক্ষাৎ করেন তাঁর কাছেও সে কথাই বলেন যা মুত্‌য়েম বলেছিলেন। তিনি বলেন, আর কি কেউ আছে, যে আমাদের সাথে থাকবে? হিশাম বলেন, আমি, যুবাইর বিন আবি উমাইয়া এবং মুতয়েম বিন আদী। তিনি বল্লেন, ব্যস, আর একজন দেখ। অতএব হিশাম যাম্‌য়া বিন আল আস্‌ওয়াদ বিন মুত্তালিবের সাথে আলাপ করেন। তিনি বনী আসাদ বিন আবদুল ওয্যার সর্দারদের অন্যতম ছিলেন, তাঁকেও এ কাজে সম্মত করা হলো।

অতঃপর এ পাঁচজন (হিশাম, যুবাইর, মুতয়েম, আবুল বাখতারী, যাম্‌য়া) মক্কার উচ্চভূমি হাজুনে একত্রে মিলিত হন এবং স্থির করেন কিভাবে অবরোধের দলিল নষ্ট করার চেষ্টা করা যায়। যুবাইর বলেন, আমি কথা শুরু করব এবং আপনারা আমাকে সমর্থন করবেন। দ্বিতীয় দিন সকালে তাঁরা কুরাইশের বৈঠকের দিকে যান এবং যুবাইর কাবায় সাতবার তাওয়াফ করে মক্কার লোকদের সম্বোধন করে বলেন, হে মক্কাবাসী! আমরা খেয়েপরে থাকব বনী হাশিম ধ্বংস হয়ে যাবে? না তাদের থেকে কিনা যায় আর না তাদের কাছে কিছু বিক্রি করা যায়। খোদার কসম, আমি কিছুতেই বসবনা, যতোক্ষণ না অবরোধের দলিল ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

আবু জাহল উঠে বলে, তুমি মিথ্যা বলেছ, তা কখনো ছিঁড়ে ফেলা হবেনা। যাময়া বলেন, খোদার কসম, তুমি সবচেয়ে বড়ো মিথ্যাবাদী। যখন এ দলিল লেখা হয় তখনো আমরা রাজী ছিলামনা। আবুল বাখতারী তাঁর কথায় সমর্থন দিয়ে বলেন, যাম্‌য়া ঠিক বলছে। ঐ দলিলে যা কিছু লেখা হয়েছে তাতে আমরা কিছুতেই রাজী ছিলামনা। আর আমরা স্বীকারও করিনা। মুতয়েম বিন আদী বলেন, তোমরা উভয়ে সত্য কথা বলেছ। আর

মিথ্যা সে, যে অন্য কথা বলছে। আমরা আল্লাহর সামনে এ দলিল এবং তার মধ্যে যা লেখা আছে তার দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত ঘোষণা করছি। হিশাম বিন আমরও তা সমর্থন করেন। আবু জাহল বলে, এ এক ষড়যন্ত্র যা রাতে কোন স্থানে বসে করা হয়েছে।

আল্লাহর কুদরতের এক বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ

ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম ও বালাযুরী বলেন, রসূলুল্লাহকে (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে জানানো হলো যে, সম্পর্ক ছিন্নের দলিলে অত্যাচার নিপীড়নের, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের, যে সব কথা লেখা হয়েছিল তা সব উইপোকা খেয়ে ফেলেছে এবং শুধুমাত্র আল্লাহর নাম বাকী রয়ে গেছে।

ইবনে ইসহাক, মূসা বিন ওক্‌বা এবং ওরওয়ার বর্ণনা তার বিপরীত এই যে, আল্লাহর নাম যে স্থানে ছিল তা উইপোকা খেয়ে ফেলেছে এবং জুলুম নিপীড়ণ প্রভৃতি কথাগুলো ঠিকই আছে। কিন্তু এ কথা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। সত্য কথা তাই যা ইবনে সা'দ, বালাযুরী ও ইবনে হিশাম বলেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর উল্লেখ, তাঁর চাচা আবু তালেবের নিকটে করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমার রব কি তোমাকে এর সংবাদ দিয়েছেন? হুযুর (স) বলেন, জী হাঁ। আবু তালেব তাঁর ভাইদের নিকটে এর উল্লেখ করেন, তাঁরা বলেন, আপনার ধারণা কি? আবু তালেব বলেন, আল্লাহর কসম। মুহাম্মদ (স) আমার কাছে কখনো মিথ্যা কথা বলেনি।

অতঃপর আবু তালৈব বলেন, এখন কি করা উচিত? নবী (স) বলেন, আমার অভিমত এই যে, আপনারা অতি সুন্দর পোষাক পরিধান করে কুরাইশের দিকে যান এবং এ কথা তাদেরকে বলেন। অতএব সকলে বেরিয়ে পড়েন এবং হিজ্‌রে যান যেখানে কুরাইশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ একত্রে মিলিত হন। এদেরকে যেতে দেখে সকলের নজর এদের দিকে পড়ে এবং তারা ভাবতে থাকেন যে, শেষ পর্যন্ত এরা কি বলতে চান।

যদিও ইতিহাসবেত্তাগণ এর কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেননি, কিন্তু পূর্বের বর্ণনা এবং এ বর্ণনা একত্রে মিলিয়ে দেখলে পরিষ্কার মনে হয় যে, আবু তালেব এবং তার সাথীগণ ঠিক সে সময়ে হারামে পৌঁছেন যখন যুবাইর ও তার সাথীদের আবু জাহলের সাথে বাকবিতন্ডা চলছিল এবং কুরাইশ সর্দারগণ এ বিতর্ক নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন। আবু তালেব সেখানে পৌঁছার পরই সকলকে সম্বোধন করে বলেন, আমরা একটি বিষয় নিয়ে এসেছি- এর সে জবাবই দিবে যা তোমাদের নিকটে সঠিক।

কুরাইশ সর্দারগণ বলেন, খোশ আমদেদ, আহ্‌লান ও সাহ্‌লান। আমাদের নিকটে সে জিনিস আছে যা আপনাদেরকে সন্তুষ্ট করবে। তো বলুন, আপনি কি চান? আবু তালেব বলেন, আমার ভাইপো আমাকে এ খবর দিয়েছে, আর খোদার কসম সে কোনদিন মিথ্যা বলেনি- এখন তোমরা সে চুক্তিপত্র চেয়ে পাঠাও এবং দেখ, আমার ভাইপোর কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বিরত থাক এবং তাতে যা লেখা আছে তা মিটিয়ে ফেল। আর যদি তার কথা মিথ্যা হয়, তাহলে আমি তাকে তোমাদের হাতে তুলে দেব। তারপর তোমাদের এখ্‌তিয়ার তাকে মেরেও ফেলতে পার, অথবা জীবিতও রাখতে পার। তারা বলেন, আপনিতো সুবিচারের কথাই বলেছেন।

তারপর সে চুক্তিপত্র এনে তা খুলে দেখা গেল যে, সে কথাই সত্য হলো- যা আল্লাহ তাঁর রসূলকে বলেছিলেন। এর ফলে কুরাইশ কাফেরদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো এবং তাদের মাথা হেঁট হয়ে গেল। আবু তালেব বল্লেন, এখন তোমাদের কাছে এ কথা সুস্পষ্ট

হয়ে গেল যে, এ জুলুম নিপীড়ন ও সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যে তোমরাই দায়ী। এখন কোন্ অপরাধে আমরা অবরুদ্ধ হয়ে থাকবো? তারপর আবু তালেব তাঁর সংগী-সাথীদের নিয়ে কাবা ঘরের পর্দার পেছনে গিয়ে বায়তুল্লাহর দেওয়ালের সাথে দেহ্ জড়িত করে এ দোয়া করলেনঃ হে খোদা! যারা আমাদের উপর জুলুম করেছে, আমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং নিজেদের জন্যে সে সব হালাল করে নিয়েছে যা আমাদের ব্যাপারে তুমি তাদের জন্যে হারাম করেছ- তাদের মুকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য কর। এ কথা বলে তিনি তাঁর সংগী-সাথীদের নিয়ে আপন শিয়াবের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁরা চলে যেতেই কুরাইশের অনেকই ওসব জুলুম-নিপীড়নের জন্যে ভর্ৎসনা করেন যা বনী হাশেমের প্রতি করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে মুতয়েম বিন আদী, আদী বিন কায়েস্, যাম্‌য়া বিন আসওয়াদ, আবুল বাখতারী বিন হাশেম এবং যুবাইর বিন আবি উমাইয়া উল্লেখযোগ্য ছিলেন। অতঃপর এসব লোক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শিয়াবে আবি তালেবে যান এবং বনী হাশেম ও বনী আল মুত্তালিবকে বলেন, এখন আপনারা নিজ নিজ বাড়িতে গিয়ে বসবাস করুন।

ইবনে সা'দ, বালাযুরী, ইবনে আবদুল বারর প্রমুখ বলেন যে, এ অবরোধের অবসান ঘটে নবুওতের ১০ম বর্ষে।

হযরত খাদিজা (রা) ও জনাব আবু তালেবের ইন্তেকাল

অবরোধ অবসানের পর হুযুর (স) যে আনন্দ ও শান্তি লাভ করেছিলেন, পর পর সংঘটিত দুটি শোকাবহ ঘটনায় তা বিষাদে পরিণত হয়। তাঁর প্রধান সমর্থক ও সাহায্যকারী চাচা আবু তালেব এবং তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও বিপদে সান্ত্বনা দায়িনী বিবি হযরত খাদিজার (রা) এন্তেকালে তিনি অত্যন্ত শোকাহত হয়ে পড়েন। এ দুটি শোকাবহ ঘটনা নবুওতের দশম বর্ষে সংঘটিত হয়, যে বছর অবরোধেরও অবসান হয়।

কোন কোন ইতিহাস লেখক বলেছেন যে, হযরত খাদিজা (রা) আবু তালেবের পূর্বে ইন্তেকাল করেন। ওয়াকেদী বলেন, ৩৫ দিন পূর্বে। কিন্তু বহুল প্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য কথা এই যে, আবু তালেবের মৃত্যু আগে হয় এবং তার অল্পদিন পর হযরত খাদিজা (রা) ইন্তেকাল করেন। বায়হাকী এবং ইবনে হিশাম মুহাম্মদ বিন ইসহাকের এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন যে, এ উভয়ের মৃত্যু হিজরতের তিন বছর পূর্বে একই বছরে হয়।

ইবনে আবদুল বার বলেন, আবু তালেবের ওফাত শিয়াব থেকে বেরুবার ছয় মাস পরে হয়। তার তিনদিন পর হযরত খাদিজার (রা) ইন্তেকাল হয়। ইবনে সা'দ বলেন, নবুওতের দশম বছর শওয়ালে আবু তালেবের ওফাত হয়। সে সময়ে তাঁর বয়স ছিল ৮০ বছর। তার এক মাস পাঁচ দিন পর হযরত খাদিজার (রা) ওফাত হয়। এ সময়ে তাঁর বয়স ছিল ৬৫ বছর। ইবনে আসীর নুয়তের দশম বছর- সওয়াল অথবা যিলকাদ মাস আবু তালেবের ওফাতের সময় বলেছেন, বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে এ বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে যে, আবু তালেব এবং হযরত খাদিজার (রা) এন্তেকালের ব্যবধান মাত্র ৩৫ দিনের। হাফেজ আবু ফারাজ ইবনুল জুযী উভয়ের মৃত্যুর ব্যবধান ৫ দিন এবং কুতায়বা ৩ দিন বলেছেন। মুয়াহেবুল্লাদুন্নিয়াতে কাস্তাল্লানী বলেন, সত্য কথা এই যে, হযরত খাদিজার ইন্তেকাল রমযানে হয় (নবুওতের ১০শ বছর)। বালাযুরী হাকীম বিন হিযামের বরাত দিয়ে ওফাতের তারিখ- ১০ই রমযান (নবুওতের ১০শ বর্ষ) বলে উল্লেখ করেছেন।

মুসলমানদের প্রতি কাফেরদের নির্যাতন

এ বছরটিকে নবী (স) দুঃখের বছর বলে আখ্যায়িত করতেন। এ দুটো দুর্ঘটনার পর হুযুরের (স) উপর শোক ও দুঃখের পাহাড় ভেঙে পড়ে। অপরদিকে হঠাৎ হুযুরের (স) কোন অভিভাবক না থাকার কারণে হঠাৎ কুরাইশের লোকেরা খুবই সাহসী হয়ে পড়ে। আবু তালেবের জীবদ্দশায় তারা নবীর উপরে যে সব নির্যাতন নিষ্পেষণ করতে পারতোনা তা এখন শুরু করে। বায়হাকী ওরওয়া বিন যুবাইরের বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, নবী (স) বলেছেন, আবু তালেবের মৃত্যু পর্যন্ত কুরাইশ কাপুরুষ ছিল। হাকেম ওরওয়া বিন যুবাইরের এ বর্ণনাই হযরত আয়েশার (রা) বরাত দিয়ে এ ভাষায়ই উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি নবীকে (স) এ কথা বলতে শুনেছেন।

ইবনে ইসহাক কুরাইশের ক্রমবর্ধমান সাহসিকতার একটি দৃষ্টান্ত ওরওয়া বিন যুবাইরের বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেছেন যে, একদিন কুরাইশের এক ব্যক্তি বাজারের মধ্যে হুযুরের (স) মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করে, তিনি সে অবস্থায় বাড়ি যান। তাঁর এক কন্যা মাথা ধুয়ে দিচ্ছিলেন এবং কাঁদছিলেন। হুযুর (স) তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলছিলেন, মা, কেঁদোনা, আল্লাহ্ তোমার পিতার সহায়ক।

ইমাম বোখারী কিতাবুত্তাহারাত, কিতাবুস্ সালাত, কিতাবুল জিয্‌য়া, কিতাবুল জিহাদ ও কিতাবুল মাগাযীতে বিভিন্ন স্থানে এ বর্ণনা হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, হুযুর (স) একদিন কাবার নিকটে নামায পড়ছিলেন। কুরাইশের লোকেরা আপন আপন বৈঠকে বসে ছিল। এদের মধ্যে একজন (মুসলিমের বর্ণনায় এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, সে ছিল আবু জাহ্‌ল) বল্লো, তোমাদের কে এমন আছে যে গিয়ে অমুকের বাড়ি থেকে জবাই করা উটের নাড়ি-ভূঁড়ি-রক্তের-ঝুড়ি উঠিয়ে এনে সিজদারত অবস্থায় তার পিঠে রেখে দেবে? এ কথায় তাদের সবচেয়ে দুর্বৃত্ত ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তি ওকবা বিন আবি মুয়াইত উঠে পড়ে এবং ওসব ময়লা আবর্জনা এনে সিজদার অবস্থায় হুযুরের (স) পিঠে অথবা দু' কাঁধের মাঝখানে রেখে দেয়। তার ভারে হুযুর (স) সিজদায় পড়ে রইলেন। মাথা উঠাতে পারলেননা। কুরাইশের লোকেরা এ দৃশ্য দেখে হেসে গড়াগড়ি করতে থাকে এবং একে অপরের উপর পড়তে থাকে। ইতোমধ্যে কেউ গিয়ে হুযুরের (স) বাড়িতে এ খবর পৌঁছিয়ে দেয়, হযরত ফাতেমা (রা) তা শুনে দৌড়ে এলেন এবং এসব ময়লা আবর্জনা টেনে টেনে ফেলে দিলেন। তারপর কুরাইশের লোকদের সম্বোধন করে খুব ভর্ৎসনা করেন এবং যারা এ কাজ করেছে তাদের প্রতি বদদোয়া দেন (হাফেজ বায্‌যার অতিরিক্ত এ কথা বলেন যে, কুরাইশ কাফেরদের কেউই হযরত ফাতেমাকে (রা) কোন কথাই বল্লোনা)। নামায শেষ করে হুযুর (স) বলেন, হে খোদা! কুরাইশের ব্যাপারে তুমি ফায়সালা কর। কেউ বলেন, এ কথা তিনি দু'বার বলেন, কেউ বলেন, তিন বার। বোখারীর বর্ণনায় আছে যে, হুযুরের (স) এ বদদোয়া কুরাইশ অত্যন্ত অপ্রীতিকর মনে করে। মুসলিমে বলা হয়েছে যে, হুযুরের (স) কথায় তাদের হাসি বন্ধ হয়ে যায় এবং বদদোয়ায় ভীত শংকিত হয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ বলেন, তারপর হুযুর (স) নাম নিয়ে নিয়ে আবু জাহ্‌ল, ওতবা বিন রাবিয়া, শায়বা বিন রাবিয়া, অলীদ বিন ওত্‌বা বিন রাবিয়া, উমাইয়া নি খালাফ, ওকবা নি আবি মুয়াইত এবং উমারা বিন অলীদকে বদদোয়া দেন। এ হাদীসটি বোখারী ও মুসলিম ছাড়াও ইমাম আহমদ, নাসায়ী, বায্‌যার, তাবারানী, আবু দাউদ তায়ালেসী প্রমুখও উদ্ধৃত করেছেন। তায়ালেসীয় বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ্ বিন

মাসউদের (রা) এ উক্তিও উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, ঐদিন ব্যতীত হুযুরকে (স) তাদের বদদোয়া দিতে আর শুনা যায়নি।

যদিও এ হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দেসগণ এ কথা বলেননি যে, এ ঘটনাটি কোন্ সময়ের কিন্তু এতে এমন তথ্য পাওয়া যায়- যা সে সময়ের কথা প্রায় নির্দিষ্ট করে বলে দেয়। তা এই যে, হুযুরের (স) সিজদারত অবস্থায় যখন তাঁর উপর উটনীর নাড়ি-ভূড়ি চাপিয়ে দেয়া হয় এবং এ খবর যখন হযরত ফাতেমাকে (রা) পৌছানো হয় তখন তিনি দৌড়ে এসে পিতার মাথার উপর থেকে নাড়ি-ভুঁড়ি টেনে টেনে সরিয়ে ফেলেন। তাঁর সম্পর্কে ইবনে আবদুল বারর ইস্তিয়াবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি যখন পয়দা হন তখন হুযুরের (স) বয়স ছিল এক চল্লিশ বছর। যুরকানী শরহে মুয়াহেবে এটাকে সঠিক বলেছেন। এখন একথা ঠিক যে, এ ঘটনার সময় হযরত ফাতেমার (রা) বয়স নয় বছরতো হওয়াই উচিত। কারণ তার কম বয়সের মেয়ের জন্যে এটা বড়ো কঠিন কাজ ছিল যে, উটনীর নাড়ি-ভুঁড়ি টেনে নামাতে পারতেন। এজন্যে আমাদের ধারণা কাফেরগণ এ বেহুদা কাজ সে সময়ে করে যখন হযরত খাদিজা (রা) এবং আবু তালেব এন্তেকাল করেছিলেন।

আবু তালেবের অসিয়ত

আল্লামা কাস্‌তাল্লানী মুয়াহেবু ল্লাদুন্নিয়াতে এবং আল্লামা যুরকানী তার ব্যাখ্যায় হিশাম বিন মুহাম্মদ বিন আস্‌সায়েব কালবীর বরাত দিয়ে বলেন যে, আবু তালেবের অন্তিম সময়ে কুরাইশ সর্দারগণ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তিনি তাদের সামনে কুরাইশের গুণাবলী ও মহত্ব বর্ণনা করার পর তাঁদেরকে বলেন, "দেখ এই খানায়ে কাবার সম্মান অক্ষুণ্ন রাখবে। এতেই রবের সন্তুষ্টি। আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করবে। একে অপরের উপর বাড়াবাড়ি ও হক নষ্ট করবেনা। দাওয়াত দানকারীর দাওয়াত কবুল করবে। সাহায্য প্রার্থীর অভাব পূরণ করবে। সততা ও আমানতদারী অবলম্বন করবে। এ প্রসংগে তিনি বলেন, মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে অসিয়ত করছি যে, তার সাথে সদাচরণ করবে। কারণ সে কুরাইশের মধ্যে আমীন (নির্ভরযোগ্য) এবং সমগ্র আরবে অতি সত্যবাদী। সে ঐ সব গুণাবলীর অধিকারী যা আমি তোমাদের কাছে বল্লাম। সে এমন জিনিস এনেছে যা মন চায়, লোকে দুশমনীর ভয়ে মুখে তা অস্বীকার করে। কিন্তু খোদার কসম! আমি যেন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি যে আরবের অভাবগ্রস্থ, চারপাশের দুর্বল মানুষ সামনে অগ্রসর হয়ে তার দাওয়াত কবুল করবে, তার কালেমার সত্যতা ঘোষণা করবে। তারা তার কাজ বাড়িয়ে দেবে এবং সে তাদেরকে নিয়ে বিপদ সংকুল ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কুরাইশ সর্দারগণ লেজ গুটিয়ে বসে থাকবে।

ইবনে সা'দ বলেন, মৃত্যুর সময় আবু তালেব সন্তানদেরকে এই বলে অসিয়ত করেন, যতোক্ষণ তোমরা মুহাম্মদের (স) কথা শুনতে থাকবে এবং হুকুম মেনে চলতে থাকবে, তোমরা সর্বদা ভালো থাকবে। অতএব তার আনুগত্য কর এবং তাকে সাহায্য কর, তাহলে সঠিক পথে থাকবে।

নবী (স) বলেন, চাচাজান, আপনি এদেরকে তো নসিহত করলেন কিন্তু নিজেকে তার বাইরে রাখছেন কেন?

জবাবে তিনি বলেন, কিন্তু আমি পছন্দ করিনা যে, মৃত্যুর সময় ঘাবড়ে গিয়ে পথচ্যুত বলে পরিগণিত হই। আর কুরাইশ এ অভিমত ব্যক্ত করুক যে, সুস্থাবস্থায় আবু তালেব যা

প্রত্যাখ্যান করেছিল, মৃত্যুর সময় ঘাবড়ে গিয়ে তা অবলম্বন করলো।

ইবনে সা'দ ইমাম মুহাম্মদ বিন সিরীনের বরাত দিয়ে বলেন, আবু তালেব যখন ইন্তেকাল করেছিলেন তখন তিনি নবীকে (স) ডেকে বলেন, আমি মারা গেলে তুমি তোমার নানার পরিবার বনী নাজ্জারের নিকটে মদীনায় চলে যাবে। কারণ তারা আপন বাড়ির লোকদের হেফাজতের ব্যাপারে বড়ো কঠোর।

এসব অসিয়ত থেকে জানতে পারা যায় যে, আবু তালেব কেমন বিজ্ঞ ও দূরদর্শী লোক ছিলেন যে, মদীনা সম্পর্কে হিজরতের তিন বছর পূর্বে তিনি যে অভিমত পেশ করেন তা অবশেষে সত্যে পরিণত হয়। অথচ সে সময় এ কথা কেউ চিন্তা করতে পারেনি যে, মদীনাই ইসলাম ও নবী মুহাম্মদের (স) জন্যে জীবন বিলিয়ে দেয়া একটি জনপদ হবে। তারপর সেখান থেকে হুযুর (স) এমন এক শক্তি লাভ করবেন যা সমগ্র আরবকে বশীভূত করবে। এভাবে কুরাইশ সর্দারদের নিকটে সে সময়ে তিনি যা কিছু বলেছিলেন তা কয়েক বছর পরই অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়। অন্যান্য লোক হুযুরের (স) সহযোগিতা করে লাভবান হলেন এবং এ কুরাইশ সর্দারগণকে পেছনের সারিতে নিক্ষেপ করা হলো। ইবনে আবদুল বারর ইস্তিয়াবে হযরত ওমরের (রা) শাসন কালের একটি ঘটনা বিবৃত করে বলেন, একদিন কুরাইশ সর্দারগণ (যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সুহাইল বিন আমর ও আবু সুফিয়ান) আমীরুল মুমেনীনের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে অনুমতির প্রতীক্ষায় বাইরে বসেছিলেন। এমন সময় হযরত বেলাল (রা), হযরত সুহাইব (রা) এবং অন্যান্য আহলে বদরকে ভেতরে ডাকা হলো। আবু সুফিয়ান অভিযোগের সুরে তাঁর সাথীদের বল্লেন, সময় কি এসেছে যে, আমাদের লোক বাইরে বসে থাকবে আর গোলামদেরকে ভেতরে ডাকা হবে? এতে সুহাইল বিন আমর বলেন, আপনারা এ অভিযোগ তো নিজেদের কাছেই করুন। যখন ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়, তখন তারা সামনে অগ্রসর হলো আর আপনারা পেছনে পড়ে রইলেন।

আবু লাহাব হুযুরের (স) সমর্থনের জন্য অগ্রসর হয়ে পেছনে ফিরে যায়

ইবনে সা'দ বলেন, মক্কায় হুযুর (স) এর উপর নির্যাতন যখন চরমে পৌঁছে তখন একদিন আবু লাহাব তাঁর নিকটে এসে বলেন, হে মুহাম্মদ! তুমি যা করতে চাও করতে থাক। আবু তালেবের জীবদ্দশায় তুমি যে কাজ করতে তা করতে থাক। লাত ও ওয্যার কসম! আমি বেঁচে থাকতে তোমার গায়ে কেউ হাত দিতে পারবেনা।

তারপর হুযুর (স) বাড়ি থেকে বের হলেন এবং ইবনে আলগায়তালা[১] প্রকাশ্য বাজারে তাঁকে গালিগালাজ করলো। তখন আবু লাহাব বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে ইবনুল গায়তালাকে ভর্ৎসনা করলো। সে চিৎকার করে পালিয়ে যেতে যেতে বলছিল, হে কুরাইশের লোকেরা, শুনে রাখ, আবু ওত্‌বাও পৈত্রিক দ্বীন থেকে সরে পড়েছে। এ হট্টগোল শুনার পর লোক আবু লাহাবের নিকটে এলো এবং ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করলো। সে বল্লো, আমি আবদুল মুত্তালেবের দ্বীন পরিত্যাগ করিনি। কিন্তু এখন আমি আমার ভাইপোর সহযোগিতা করব। কারণ এখন তার আর কোন পৃষ্ঠপোষক নেই, কুরাইশ সর্দারগণ বলেন,

---

১. এ ব্যক্তির আসল নাম ছিল হারেস বিন কায়েস বিন আদীউস্‌ সাহ্‌মী। কায়েস বিন আদীর বিবি বনী মুররার গায়তালা নামে এক গণিকা ছিল। তার সকল সন্তানকে গায়াতেলা বলা হতো- গ্রন্থকার।

তুমি আত্মীয়তার হক আদায় করতে প্রস্তুত হয়ে ভালো কাজ করেছ। তারপর কিছুদিন যাবত নবী (স) নিরাপদে রইলেন এবং লোক- আবু লাহাবের দিকে তাকিয়ে নবীকে (স) উত্যক্ত করা ছেড়ে দিল। অবশেষে একদিন আবু জাহল ও ওত্‌বা বিন আবি মুয়াইত পরস্পর পরামর্শ করে আবু লাহাবের নিকটে এসে বল্লো, আপন ভাইপোকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখ- তার দাদা এবং তোমার বাপ আবদুল মুত্তালিব কোথায় যাবে। আবু লাহাব নবীকে (স) একথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যেখানে তাঁর কওম যাবে, তিনিও সেখানে যাবেন। আবু লাহাব তাঁর বন্ধুদেরকে হুযুরের (স) এ জবাব শুনিয়ে দেয়। তারা বলে, আরে মিয়া, কিছু বুঝতে পারলে? এর অর্থ তোমার পিতাও জাহান্নামে যাবে।

আবু লাহাব এসে নবীকে (স) জিজ্ঞেস করে, হে মুহাম্মদ! আবদুল মুত্তালিব কি জাহান্নামে যাবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। এবং যে ব্যক্তিই সে দ্বীনের উপরে মৃত্যুবরণ করবে, যার উপর আবদুল মুত্তালিব করেছে, সে জাহান্নামে যাবে। একথা শুনামাত্র আবু লাহাব রেগে গেল এবং তড়াক করে বল্লো, খোদার কসম। আমি সব সময়ে তোমার দুশমন থাকবো। তুমি মনে কর- আবদুল মুত্তালিব জাহান্নামী?

এভাবে কিছুদিনের জন্যে যে খোদার দুশমন হকের সমর্থক হয়েছিল, সে তার মৌল অবস্থানের দিকে ফিরে গেল।

হযরত সাওদার (রা) সাথে বিবাহ

হযরত খাদিজার (রা) ওফাতের পর হুযুরের (স) এক বিব্রতকর সমস্যা এ দেখা দিল যে, বাড়িতে শুধু অল্প বয়স্কা কন্যা- হযরত উম্মে কুলসুম (রা) ও হযরত ফাতেমা (রা) রয়ে যান। তাঁদের দেখাশুনা করার কেউ ছিলনা। এখন সেই বিপজ্জনক সময়ে রেসালাতের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে বাড়ির বাইরে চলে গেলে তাঁর কন্যাদ্বয় অসহায় অবস্থায় রয়ে যান। এ জন্যে তিনি হযরত খাদিজার (রা) ওফাতের কয়েকদিন পর হযরত সাওদা বিন্তে যাম্‌য়াকে বিয়ে করেন।[১] তিনি ছিলেন একজন বেশী বয়সের মহিলা এবং মেয়েদের দেখা শুনার জন্যে ছিলেন খুবই উপযুক্ত। তিনি বনী আমের বিন লুয়াই গোত্রের ছিলেন। তাঁর পূর্ব স্বামী- সাকরান বিন আমর তাঁর চাচাতো ভাই এবং সুহাইল বিন আমরের ভাই ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ছিলেন- প্রথম দিকের মুসলমান এবং আবিসিনিয়ার দ্বিতীয় হিজরতে শামিল হন। মূসা বিন ওকবা এবং আবু মা'শার বলেন, আবিসিনিয়াতেই হযরত সাকরান (রা) ইন্তেকাল করেন। কিন্তু মুহাম্মদ বিন ইসহাক ও ওয়াকেদী বলেন, তিনি আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসেন এবং এখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[২] ইবনে সা'দ

---

১. ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর বরাত দিয়ে বলেন, এ বিবাহ হয়েছিল নবুওতের ১০ম বর্ষে রমযান মাসে। কাস্‌তাল্লানী- মুয়াহেবু ল্লাদুন্নিয়াতে বলেন, হযরত খাদিজার (রা) ওফাত রমযান মাসে হয় এবং হযরত সাওদার (রা) সাথে বিয়ে হয় সাওয়াল মাসে। -গ্রন্থকার

২. তাবারী ও ইবনে কাসীর তাঁদের ইতিহাসে লিখেছেন যে, তিনি মক্কা থেকে আবার আবিসিনিয়া চলে যান এবং খৃষ্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু বালাযুরী ইবনে ইসহাক ও ওয়াকেদীর বক্তব্যকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন। স্বয়ং ইবনে আসীর তাঁর রচিত 'উস্‌দুল গাবা'তে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, তিনি মৃত্যুর সময় পর্যন্ত মুসলমান ছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজর 'আলইসাবা'তে তাঁর নামের সাথে 'রাদিআল্লাহ্ আনহু' লিখেছেন। -গ্রন্থকার

ওয়াকেদীর যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন- তাতে উল্লেখ আছে যে- হুযুর (স) যখন তাঁকে বিয়ের পয়গাম দেন তখন তিনি জবাবে বলেন, আমার ব্যাপারে যে কোন ফায়সালা করার এখতিয়ার আপনার আছে। হুযুর (স) এ খবর পাঠান, নিজের পক্ষ থেকে কাউকে নিযুক্ত করে দাও, যে আমার সাথে তোমার বিয়ে করিয়ে দেবে। তিনি সুহাইল বিন আমরের ভাই এবং প্রথম দিকের মুসলমান হযরত হাতেব বিন আমরকে এ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করেন এবং তিনি হুযুরের (স) সাথে তার বিয়ে করিয়ে দেন।

অধিকাংশ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত খাদিজার (রা) পর প্রথম মহিলা ইনিই ছিলেন, যিনি নবীর স্বামীত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর এ বিয়ে হয়েছিল- হযরত আয়েশার (রা) সাথে বিয়ের পূর্বে। ইবনে আবদুল বারর কাতাদা; আবু ওবায়দাও ইমাম যুহরীর বরাত দিয়ে একথাই বলেছেন। ইবনে সা'দও এরই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইবনে ইসহাক হযরত আলী বিন হুসাইন (রা) এর বরাত দিয়ে বলেন, প্রথম মহিলা হযরত খাদিজার (রা) পর যার সাথে হুযুরের বিয়ে হয়, তিনি ছিলেন সাওদা বিন্তে যাম্‌য়া (রা)।

হযরত আয়েশার (রা) সাথে বিবাহ

কিন্তু এর বিপরীত এক বিস্তারিত বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন- ইমাম আহমদ, তাবারানী, ইবনে জারীর তাবারী ও বায়হাকী। তাতে এ কথার উল্লেখ আছে যে, যখন হযরত খাদিজার (রা) ইন্তেকাল হয়, তখন ওসমান বিন মায্‌উনের বিবি খাওলা বিন্তে হাকীম আস্‌সুলামিয়্যাহ্‌ হুযুরের খেদমতে হাযির হন এবং আরজ করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! আপনি কি বিয়ে করবেন? তিনি বল্লেন, কাকে বিয়ে করব? খাওলা বলেন, আপনি কুমারী চাইলে তাও পাবেন এবং বিধবা চাইলে তাও পাবেন। হুযুর (স) জিজ্ঞেস করেন, কুমারী কে? তিনি বলে, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে যে ব্যক্তি আপনার প্রিয়তম- তার কন্যা, অর্থাৎ আয়েশা বিন্তে আবি বকর (রা)। তারপর হুযুর (স) বলেন, বিধবা কে? তিনি বলেন, সাওদা বিন্তে যাম্‌য়া যিনি আপনার উপর ঈমান এনেছেন এবং আনুগত্যও করেছেন। হুযুর (স) বল্লেন, উভয় স্থানে গিয়ে কথা বল।

প্রথমে তিনি হযরত আবু বকরের (রা) কাছে গেলেন এবং তাঁর বিবি উম্মে রুমানকে বল্লেন, কত কল্যাণ ও বরকত আল্লাহ্‌ তোমাদের দান করেছেন।

তিনি বল্লেন- তা কি?

খাওলা বল্লেন- রসূলুল্লাহ (স) আমাকে আয়েশার (রা) জন্যে পয়গাম দিয়ে পাঠিয়েছেন। উম্মে রুমান বল্লেন, আবু বকরকে আসতে দাও। হযরত আবু বকর (রা) এলে উম্মে রুমান তাঁকে বল্লেন, আল্লাহ্‌ কেমন কল্যাণ ও বরকত আপনাকে দান করেছেন। তিনি বল্লেন- তা কি? উম্মে রুমান বল্লেন, রসূলুল্লাহ্‌ (স) আমার নিকটে আয়েশার (রা) পয়গাম পাঠিয়েছেন। তিনি বল্লেন, ও কি তাঁর জন্যে জায়েয হবে? সেতো তাঁর ভাতিজি?

খাওলা হুযুরের (স) কাছে গিয়ে একথা তাঁকে বল্লেন। তিনি বল্লেন, তুমি তাকে বল- সেতো আমার দ্বীনী ভাই। তার কন্যা আমার জন্য জায়েয। খাওলা এ জবাব হযরত আবু বকরকে (রা) শুনিয়ে দেন। তিনি বল্লেন, একটু অপেক্ষা কর। এই বলে তিনি চলে গেলেন।

উম্মে রুমান খাওলাকে বল্লেন, মুত্‌য়েম বিন আদী তার পুত্রের জন্যে আয়েশাকে চেয়েছিল। খোদার কসম, আবু বকর কারো কাছে কোন ওয়াদা করে তা কোনদিন ভংগ করেনি। এদিকে আবু বকর (রা) মুত্‌য়েমের নিকটে গেলেন। তাঁর কাছে তাঁর বিবি

বসেছিলেন যাঁর ছেলের জন্যে মুতয়েম পয়গাম দিয়েছিলেন। তিনি বল্লেন, আবু বকর, আমাদের আশংকা হচ্ছে যে- আমরা আমাদের ছেলের বিয়ে তোমাদের পরিবারে দিলে তাকে তোমরা তার দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেবে। হযরত আবু বকর (রা) মুতয়েমকে বল্লেন, তোমার বিবি যা কিছু বলছে, তোমার কথাও তো তাই? তিনি বল্লেন, ওতো এ কথাই বলছে। এ জবাব শুনার পর আবু বকর (রা) তাঁর ওখান থেকে বেরিয়ে এলেন এবং আল্লাহ তাঁকে সে সংকট থেকে উদ্ধার করেন মুতয়েমের কাছে ওয়াদা করে যে সংকটে তিনি পড়েছিলেন। তারপর তিনি খাওলাকে বল্লেন, রসূলুল্লাহ্‌কে (স) আমার এখানে ডেকে আন। তিনি হুযুরকে (স) ডেকে আনলে হযরত আবু বকর (রা) তাঁর সাথে হযরত আয়েশার (রা) বিয়ে করিয়ে দেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ছ'বছর।

তারপর খাওলা সেখান থেকে বেরিয়ে হযরত সাওদা বিন্তে যাময়ার ওখানে যান এবং বলেন, আল্লাহ্ তোমাকে কেমন কল্যাণ ও বরকত দান করেছেন। তিনি বল্লেন তা কি? খাওলা বল্লেন, রসূলুল্লাহ (স) বিয়ের পয়গাম দিয়ে আমাকে তোমার নিকটে পাঠিয়েছেন। তিনি বল্লেন, আমার পিতাকে এ কথা বল। তিনি খুব বৃদ্ধ ছিলেন। খাওলা তাঁর কাছে গিয়ে জাহেলিয়াতের পন্থায় সালাম করে প্রথমে নিজের পরিচয় দেন। তারপর বল্লেন, আমাকে মুহাম্মদ (স) সাওদার জন্যে পয়গাম দিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি বল্লেন, জোড়াতো বেশ সুন্দর! কিন্তু তোমার বান্ধবী কি বলে? খাওলা বলেন, সেওতো এ সম্পর্ক পছন্দ করে। তিনি সাওদাকে ডেকে তাঁর ইচ্ছা কি জিজ্ঞেস করেন। তিনি যখন তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন, তখন তিনি হুযুরকে (স) তাঁর বাড়ি ডেকে এনে তাঁর সাথে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। পরে সাওদার (রা) ভাই আবদ বিন যামায়া হজ্ব থেকে এসে যখন শুনলেন যে, তাঁর ভগ্নির বিয়ে হুযুরের (স) সাথে হয়েছে তখন মাথায় মাটি ঢালতে থাকেন। তারপর যখন স্বয়ং এ ব্যক্তি মুসলমান হয়ে যান তখন বলতেন, সে সময়ে আমি কতোটা নির্বোধ ছিলাম যে আপন ভগ্নির বিয়ে হুযুরের (স) সাথে হওয়ার জন্যে মাথায় মাটি ঢালতাম।

হযরত আয়েশার (রা) বিয়ের তারিখ

এ বর্ণনায় শুধু এ কথাই সুস্পষ্ট হয়নি যে, হযরত আয়েশার (রা) বিয়ে হযরত সাওদার (রা) পূর্বে হয়েছিল, বরঞ্চ এ কথাও সুস্পষ্ট হলো যে, নবুওতের দশম বছরে যখন শাওয়াল মাসে হুযুরের (স) সাথে হযরত আয়েশার (রা) বিয়ে হয়, তখন তাঁর বয়স ছিল ছ'বছর। এখানে এ প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, যদি নবুওতের ১০ম বছরের শাওয়াল মাসে তাঁর বয়স ছ'বছর থেকে থাকে তাহলে হিজরতের সময় তাঁর বয়স নয় বছর হওয়া উচিত এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে যখন দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়ালে যখন তাঁর রোখসতি হয় তখন তার বয়স ১১ বছর হওয়া উচিত। এ প্রশ্নের জবাব কতিপয় আলেম এ দিয়েছেন যে, হযরত আয়েশার রোখ্‌সতি হিজরতের সাত মাস পরে হয়। হাফেজ ইবনে হাজার এটাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কিন্তু ইমাম নোয়াদী 'তাহ্‌যিবুল আসমা ওয়াল্লোগাত'-তে এবং হাফেজ ইবনে কাসীর 'আলবেদায়া'তে এবং আল্লামা কাস্‌তাল্লানী 'মুযাহেবুল লাদুন্নিয়া'তে নিশ্চয়তা সহকারে বলেছেন যে, রোখ্‌সতি দ্বিতীয় হিজরীতে হয়, হাফেজ বদরুদ্দীন আইনী ওমদাতুল কারীতে লিখেছেন যে, নবী (স) বদর যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মসে হযরত আয়েশার রোখসতি হয়।

ইমাম নববী এবং আল্লামা আইনী উভয়েই এ বক্তব্যকে অর্থহীন বলেছেন যে এ রোখসতি হিজরতের সাত মাস পর হয়েছিল। এরপর অবশ্য অবশ্যই দ্বিতীয় প্রশ্ন এ সৃষ্টি

হয় যে, যদি রোখসতি দ্বিতীয় হিজরীতে হয়ে থাকে তাহলে বিয়ের তারিখ কি ছিল- যখন বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল ছ'বছর এবং কণে হিসাবে স্বামী গৃহে যাওয়ার সময় বয়স ছিল ন'বছর। এর সামঞ্জস্য কিভাবে হতে পারে। এর জবাব বোখারীর সে বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় যা ওরওয়া বিন যুবাইর থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এতে হযরত ওরওয়া (রা) বলেন যে, হিজরতের তিন বছর পূর্বে হযরত খাদিজার (রা) ওফাত হয়। দু'বছর অথবা তার কিছু সময় পর নবী (স) হযরত আয়েশাকে (রা) বিয়ে করেন, যখন তাঁর বয়স ছ'বছর ছিল। তারপর ন'বছর বয়সে তার রোখসতি (স্বামীগৃহে গমন) হয়। এতে হিসাব ঠিকমত হয় যে, হযরত আয়েশার (রা) বিয়ে ছ'বছর বয়সে হিজরতের প্রায় এক বছর পূর্বে হয় এবং স্বামীগৃহে গমন হয়- দ্বিতীয় হিজরীতে। হযরত ওরওয়ার (রা) এ বর্ণনা যদিও মুরসাল কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার বলেন যে, ওরওয়া (রা) যেহেতু হযরত আয়েশার (রা) নিকট থেকে শুনেই[১] এ কথা বলেছেন সে জন্যে একে মুত্তাসাল পর্যায়েরই মনে করা উচিত।

আয়েশার (রা) বিয়ের বিরূপ সমালোচনা

যেহেতু এখানে হযরত আয়েশার (রা) বিবাহের উল্লেখ করা হয়েছে সে জন্যে সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে এটা সংগত মনে করা হচ্ছে যে, এখানে সেসব সমালোচনার জবাব দেয়া হোক যা তাঁর বিয়ের ব্যাপারে করা হয়ে থাকে। তা এই যে ৫৪/৫৫ বছর বয়সে ন'বছরের একটি মেয়েকে বিয়ে করা এবং আঠারো বছর বয়সে তাকে বিধবা অবস্থায় ছেড়ে যাওয়া এবং কুরআনের দৃষ্টিতে অন্য কোথাও তার দ্বিতীয় বিবাহও হতে পারতো না। এ কি (মায়াযাল্লাহ) জুলুম-অবিচার নয়? আর এমন অধিক বয়স ব্যক্তির এমন অল্প বয়সের মেয়েকে বিয়ে করা কি (মায়াযাল্লাহ) প্রবৃত্তি পূজার সংজ্ঞায় পড়েনা? ন'বছর বয়স কি এমন, যে বয়সের একটি মেয়ের উপর দাম্পত্য জীবনের গুরুভার চাপিয়ে দেয়া যায়?

প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের অভিযোগ শুধু সেই অবস্থায় করা যেতে পারে- যখন নবী (স) এবং হযরত আয়েশার (রা) বিবাহ একজন সাধারণ পুরুষ এবং একজন সাধারণ মেয়ের বিবাহ মনে করা হয়, অথচ হুযুর (স) আল্লাহর রসূল ছিলেন এবং মানব জীবনে এক সার্বিক বিপ্লব সৃষ্টি করা এবং সমাজকে সে বিপ্লবের জন্যে তৈরী করা তাঁর দায়িত্ব ছিল। আর হযরত আয়েশা (রা) একজন অসাধারণ গুণসম্পন্ন মেয়ে ছিলেন- যাঁকে তাঁর বিরাট মানসিক যোগ্যতার ভিত্তিতে সমাজ গঠনে হুযুরের (স) সাথে মিলে এতো বিরাট কাজ করতে হয়েছিল যা সকল নবী পত্নীসহ কোন মহিলাই করেননি। বরঞ্চ কোনরূপ অতিরঞ্জিত না করেই একথা বলা যেতে পারে যে, দুনিয়ার কোন নেতার পত্নীই স্বীয় স্বামীর দায়িত্ব কর্তব্য সম্পন্ন করার ব্যাপারে সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা করেননি, যেমনভাবে হযরত আয়েশা (রা) হুযুরের (স) করেছেন। তাঁর শৈশব কালেই তাঁর এসব যোগ্যতার জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ছিলনা। এ কারণেই আপন রসূলের সাহচর্যের জন্যে আল্লাহ স্বয়ং তাঁকে বেছে নিয়েছিলেন। বোখারীতে "আয়েশার (রা) বিবাহ" অধ্যায়ে এ কথা আছে যে, হুযুর (স) হযরত আয়েশাকে (রা) বলেন, তোমাকে দু'বার আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে- এ তোমার বিবি। তিরমিযি-আবওয়াবুল

---

১. প্রকাশ থাকে যে, হযরত ওরওয়া বিন যুবাইর (রা) হযরত আয়েশার (রা) ভাগ্নে ছিলেন। এ জন্যে আপন খালা সম্পর্কে যে কথা তিনি বলেন, তা তাঁর কাছে শুনেই বলেন- বর্ণনায় তাঁর বরাত তিনি দেন বা না দেন তাতে কিছু যায় আসেনা -গ্রন্থকার।

মানাকেবে আছে- জিব্রিল রসূলুল্লাহর (স) নিকটে হযরত আয়েশার (রা) ছবি রেশমের কাপড়ে জড়িয়ে এনে বলেন, ইনি হচ্ছেন দুনিয়া ও আখেরাতে আপনার বিবি। অতএব এ জীবনসংগিনী নির্বাচন হুযুরের (স) ছিলনা, ছিল আল্লাহ্ তায়ালার। আর আল্লাহ্‌রই একথা জানা ছিল যে, ছ' বছরের এ অল্প বয়স্কা মেয়েটিকে তাঁর রসূলে পাকের শিক্ষাদীক্ষায় ভূষিত করে ইসলামী সমাজ গঠনে কত বিরাট খেদমত আঞ্জাম দেয়ার প্রয়োজন আছে।

যারা এ ব্যাপারে হুযুরের (স) উপরে প্রবৃত্তি পূজার অভিযোগ করে তারা নিজেদের বিবেককে জিজ্ঞেস করে বলুক- এমন ব্যক্তি কখনো কি প্রবৃত্তি পূজারী হতে পারেন যিনি পঁচিশ বছর বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত একই বিবিতে পরিতৃপ্ত থাকেন যিনি বয়সে তাঁর থেকে পনেরো বছরের বড়ো ছিলেন? যিনি প্রথম বিবির ওফাতের পর একজন অতি বয়স্কা বিধবাকে বিয়ে করে তাঁকে নিয়েই চার-পাঁচ বছর পরিতৃপ্ত থাকেন? তিনি যদি প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার জন্যে বিয়ে করতে চাইতেন, তাহলে সমাজে তাঁর এতোটা বিরাট জনপ্রিয়তা ছিল যে, তিনি যতোই এবং যেমনই সুন্দরী কুমারী বালিকা বিয়ে করতে চাইতেন, পিতামাতা নিজেদের জন্যে গৌরব মনে করেই তাদেরকে তাঁর সামনে পেশ করতে প্রস্তুত হতো। এ ছাড়াও একজন কুমারী বালিকা ছাড়া আর যত মহিলাকেই তিনি বিয়ে করেন তাঁরা সকলেই ছিলেন বিগত যৌবনা বিধবা এবং একজন স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা। প্রকৃতপক্ষে শুধু এ ধরনের সমালোচকগণের মনের মধ্যে শুধুমাত্র যৌন লালসা চরিতার্থ করার চিত্রটাই থাকে। তাদের হীন মানসিকতা এতো উর্ধ্বে উঠতে পারেনা যে, সে মহামানবের দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে যিনি একটি অতি মহান কাজের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে কতিপয় মহিলাকে তাঁর জীবনসংগিনী করে নিয়েছিলেন।

এখন রইলো জুলুমের অভিযোগ। এ ব্যাপারেও সমালোচকগণ ব্যস এই একটি সাদাসিদে ঘটনাকে সামনে রাখেন যে, একজন বয়স্ক ব্যক্তি একজন ন'বছর বয়স্কা মেয়েকে বিয়ে করে আঠার বছর বয়সের সময় বিধবা করে রেখে যান যখন তার দ্বিতীয় বিয়ের কোন সম্ভাবনা ছিলনা এবং তার সমগ্র যৌবনকাল বিধবা অবস্থায় কাটাতে হয়। তারা এ সাধারণ উঠে এসব লোক কখনো এ কথা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেনা এবং করতে চাননা যে, যে মহান কাজের মংগলকারিতা মানব জাতির নিকটে কোন সীমিত সময়কালের জন্যে নয়, বরঞ্চ সর্বকালের জন্য এবং কোন অঞ্চলের জন্যে নয় বরঞ্চ গোটা বিশ্বের জন্যে পৌঁছে যেতে পারে, সে কাজে লক্ষ লক্ষ মানুষের জান মাল ব্যয়িত হওয়া কোন লোকসানের বিষয় নয় অথচ একজন মহিলার যৌবন এতে ব্যয়িত হওয়াকে কুরবানীর পরিবর্তে জুলুম নামে অভিহিত করা হচ্ছে। আর সে যৌবন যদি কুরবানী করা হয়ে থাকে তাহলে এ অর্থে যে তাকে দাম্পত্য জীবনের আনন্দ উপভোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। এছাড়া আর কোন ক্ষতি চিহ্নিত করতে তাঁরা পারেননা যা এ উন্নতমানের মহিলাকে ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু অপরদিকে লক্ষ্য করুন যে, পারিবারিক জীবনের সকল ঝামেলা ঝঞ্ঝাট ও কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের অবশিষ্ট গোটা জীবন নারী পুরুষের মধ্যে ইসলাম ও তার হুকুম শাসন ও আইন কানুন, নৈতিকতা ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানের কাজে কাটিয়ে দিয়ে সে মহান সত্তা কত বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। যে ব্যক্তিই হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন তিনি জানেন যে, হযরত আয়েশা (রা) এর মাধ্যমে যতোটা দ্বীনী ইল্‌ম মুসলমানদের নিকটে পৌঁছেছে এবং ইসলামী ফেকাহ্‌র জ্ঞান তারা লাভ করেছে, তার তুলনায়- নবী পাকের (স) যুগের নারীতো দূরের কথা পুরুষও অতি নগণ্য সংখ্যক আছেন যাঁদের এলমী খেদমত পেশ করা যেতে পারে। যদি হুযুরের (স) সাথে হযরত আয়েশার

(রা) বিয়ে না হতো এবং তাঁর থেকে শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ তিনি যদি না পেতেন, তাহলে অনুমান করা যায় যে, ইসলামী জ্ঞানের বিরাট অংশ থেকে মুসলিম উম্মাহ বঞ্চিত থাকতো। হযরত আয়েশা (রা) থেকে ২২১০ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি শুধু হাদীস বর্ণনাকারিণীই ছিলেননা, বরঞ্চ ফেকাহবিদ, মুফাস্সির, মুজতাহিদ ও মুফতী ছিলেন। মুসলমান মহিলাদের মধ্যে তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে সর্বাপেক্ষা অধিক ফেকাহবিদ গণ্য করা হতো। প্রথম সারির সাহাবীগণ তাঁর থেকে মস্‌লা-মাসায়েল জেনে নিতেন। এমনকি হওরত ওমর (রা) এবং হযরত ওসমানও (রা) বিভিন্ন শরয়ী মাস্‌লা সম্পর্কে তাঁর স্মরণাপন্ন হতেন। মদীনা তাইয়েবার ওসব মুষ্টিমেয় আলেমদের মধ্যে শামিল ছিলেন যাঁদের প্রতি জনগণের পরিপূর্ণ আস্থা ছিল। এ অগণিত সামষ্টিক কল্যাণের তুলনায় সে সামান্য ব্যক্তিগত ক্ষতি যা বিধবা হওয়ার পর হযরত আয়েশা (রা) ভোগ করেছিলেন, তা বলতে গেলে কিছুই নয়। আর বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এ সম্পর্কে এ অভিযোগ উত্থাপন করেন- যেসব ঈসায়ী মনীষী যাঁদের দৃষ্টিতে কোন সামষ্টিক কল্যাণ ব্যতীতই নিছক উদ্দেশ্যহীন চির কৌমার্যের জীবন যাপন করা সংসারত্যাগীদের জন্যে শুধু প্রশংসনীয়ই নয় বরঞ্চ ধর্মীয় খেদমতকারীদের জন্যে অপরিহার্যও।

তারপর নয় বছর বয়সে হযরত আয়েশার (রা) স্বামীর সাথে মিলিত হওয়ার সমালোচনা যাঁরা করেন,তাঁরা জানেননা যে, ইসলাম প্রাকৃতিক দ্বীন এবং প্রাকৃতিক দিক দিয়ে একজন বালিকার দৈহিক গঠন ও বর্ধন যদি এতোটা ভালো হয় যে, এ বয়সেই সে সাবালিকা হয়েছে বলে মনে করা হবে, তাহলে তার স্বামীর সাথে মিলিত হওয়া একেবারে জায়েয ও সংগত। শুধু একটি প্রকৃতি বিরুদ্ধ ও নৈতিকতা বিরুদ্ধ- আইনই বিয়ের জন্যে বালক ও বালিকার জন্যে একটি বিশেষ বয়স নির্দিষ্ট করে দিতে পারে। কারণ এ বিধিনিষেধ শুধু জায়েয দাম্পত্য সম্পর্কের উপরই আরোপিত হয়, বিবাহ ব্যতীত নারী পুরুষের যৌন সম্পর্ক স্থাপনের উপর, আরোপিত হয়না। আর ব্যাপার শুধু এতোটুকু নয় যে, বিয়ের বয়সের পূর্বে ব্যভিচার কার্যের উপর এসব আইন প্রণেতাদের কোন আপত্তি নেই, বরঞ্চ কার্যতঃ তাদের সমাজে ন-দশ বছরের বালক-বালিকা যৌন কার্যে লিপ্ত হয় এবং তার ফলে কোন বালিকা যদি কুমারী মাতা হয়ে পড়ে তাহলে তাদের সকল সহানুভূতি তার জন্যেই হয়ে থাকে। সে সময় না কোন আপত্তি সে বালিকার উপর করা হয় যে, বিয়ের পূর্বে মা হয়েছে, আর না সে বালকের উপর করা হয়, যে বিয়ের বয়সের পূর্বে একটি বালিকাকে মা বানিয়েছে। এমন নিকৃষ্ট নৈতিক মূল্যবোধ পোষণকারীগণ কোন্ মুখে ইসলামের এ আইনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, যে আইনে বলা হয়েছে যে, যে বালক-বালিকা সাবালক হবে, তাদের বিয়ে জায়েয- এবং এর জন্যে কোন নির্দিষ্ট বয়সের শর্ত আরোপ করা যাবেনা। বিয়ের জন্যে আইনতঃ একটা বয়স নির্ধারণ করার অর্থইতো এই যে, এ বয়সে পৌঁছার পূর্বে হালাল বিয়ে কিছুতেই হতে পারবেনা, হারাম কাজ অর্থাৎ ব্যভিচার যতোই হোকনা কেন।

তায়েফ সফর

এ প্রাসংগিক ও ঘটনা ক্রমে জরুরী আলোচনার পর আমরা ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতার দিকে ফিরে যাচ্ছি। আপন পারিবারিক ব্যাপারসমূহ থেকে মুক্ত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (স) ইবনে সা'দ ও বালাযুরীর বর্ণনা মতে নবুওতের দশম বছরের শেষে শওয়াল মাসে তায়েফমুখী হন যা মক্কার পঞ্চাশ মাইল পূর্বে অবস্থিত। এ সফরের উদ্দেশ্য

এ ছিল যে, তিনি কুরাইশের জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন। তাদের তীব্র বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করার পর এ আশা ছিলনা যে, এ লোকেরা দাওয়াতে হক কবুল করা তো দূরের কথা তা চলতে দেয়ার কোন অবকাশও তাঁকে দেবেন । এ জন্যে তিনি চাচ্ছিলেন যে, তিনি তায়েফবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেবেন এবং সেখানকার শক্তিশালী গোত্র বনী সাকীফকে অন্ততঃ এ ব্যাপারে রাজী করাবেন যে, তারা সেখানে তাঁকে আশ্রয় দেবে এবং ইসলামী দাওয়াতের কাজে সাহায্য সহযোগিতা করবে। ইবনে সা'দ জুবাইর বিন মুতয়েম বিন আদীর বরাত দিয়ে বলেন, এ সফরে হুযুরের (স) সাথে গিয়েছিলেন হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা)। এ কথাই বলেছেন ইবনে কুতায়বা ও বালাযুরী। কিন্তু মূসা বিন ওকবা ও ইবনে ইসহাক বলেন যে, তিনি একাই গিয়েছিলেন। এ সফর তিনি পায়ে হেঁটে করেছিলেন। কোন পরিবহন সংগ্রহ করতে পারেননি। ইবনে সা'দ বলেন যে, সেখানে তিনি দশ দিন অবস্থান করেন। কিন্তু হাফেজ সাখাবী বলেন যে, বিশ দিন পর্যন্ত তিনি তায়েফবাসীদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে থাকেন। আবদে ইয়ালীলের সাথে সাক্ষাতের পর দশ দিন অবস্থান করেন।

হুযুরের (স) উপর তায়েফবাসীদের বিরাট জুলুম

ইবনে ইসহাক, ওয়াকেদী প্রমুখ বলেন যে, সে সময়ে তায়েফের সর্দারী ছিল আমর বিন ওমাইর বিন আওফের তিনপুত্র- আবদে ইয়ালীল, মাসউদ ও হাবিবের হাতে যাদের মধ্যে একজনের বাড়িতে কুরাইশের একজন স্ত্রীলোক- সুফিয়া বিন্তে মা'মার জুমাহী ছিল। রসূলুল্লাহ (স) তার সাথে দেখা করেন। তাকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন এবং তাকে বলেন, আমি আপনাদের কাছে এ জন্যে এসেছি যে, আপনারা ইসলামের কাজে আমাকে সাহায্য করুন এবং আমার কওমের যারা বিরোধিতা করছে তাদের মুকাবিলায় আপনারা আমাকে সমর্থন করুন। এতে তাদের মধ্যে একজন বল্লো, আল্লাহ যদি তোমাকে রসূল বানিয়ে থাকেন তাহলে আমি কাবার পর্দা ছিঁড়ে ফেলব। দ্বিতীয় জন বলে, তোমাকে ছাড়া রসূল বানাবার জন্যে আল্লাহ আর কাউকে পেলেননা? তৃতীয় জন বলে, আমি কিছুতেই তোমার সাথে কথা বলবনা। কারণ যদি তুমি সত্যিই আল্লাহর রসূল হও, তাহলে আমি তোমার জবাব দেব, তার থেকে তুমি অনেক মহান। আর যদি তুমি আল্লাহর নাম নিয়ে মিথ্যা বলছ, তাহলে তুমি এমন যোগ্য নও যে, তোমার সাথে কথা বলা যায়। এ কথা শুনার পর হুযুর (স) উঠে পড়লেন। তাদের থেকে মংগলের আর কোন আশা রইলোনা। বিদায়ের পূর্বে তিনি তাদেরকে বল্লেন, তোমরা আমার সাথে যে আচরণ করেছ তো করেছই। কিন্তু অন্ততঃপক্ষে তোমরা এটা কর যে, আমার কথা গোপন রাখ।

এ কথা তিনি এ জন্যে বল্লেন যে, তিনি আশংকা করেছিলেন যদি এ সংবাদ কুরাইশের নিকট পৌঁছে যায় তো তারা আরও সাহস পেয়ে যাবে। কিন্তু তারা তা করলনা এবং তাদের লুচ্চা-গুন্ডা ও গোলামদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দিল। তারা তাঁকে গালি-গালাজ ও ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে লাগলো। অবশেষে লোক সমবেত হলো এবং তাঁকে একটি বাগান পর্যন্ত নিয়ে ছেড়ে দিল, যে বাগানের মালিক ছিল ওত্‌বা বিন রাবিয়া ও শায়বা বিন রাবিয়া।

ওয়াকেদী থেকে ইবনে সা'দের বর্ণনায় এ কথা আছে যে, হুযুর (স) সাকীফের দলপতি ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের কাছে যান। কিন্তু কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনা। বরঞ্চ তাদের এ আশংকা হয়েছিল যে, তিনি যুবকদের না বিগড়ায়ে দেন। এ জন্যে তারা বল্লো, হে মুহাম্মদ (স) তুমি আমাদের শহর থেকে বেরিয়ে যাও। আর পৃথিবীতে

তোমার কোন বন্ধু থাকলে তার সাথে গিয়ে মিলিত হও। অতঃপর তারা তাদের ভবঘুরে ও গোলামদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে উসকিয়ে দেয়। তারা তাঁকে গালি দিতে থাকে এবং চিৎকার করে লোকদের একত্র করে। মূসা বিন ওকবা বলেন, তারা তাক করে টাকনু এবং পায়ের গোড়ালিতে পাথর মারতে থাকে। পথের দু'পাশে তারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় এবং হুযুর (স) যখন পা তুলে চলতে থাকেন, তারা প্রস্তর বর্ষণ করতে থাকে।

অবশেষে তাঁর জুতা রক্তে পরিপূর্ণ হয়। সুলায়মান আত্তায়মী বলেন, আঘাতের কষ্টে যখন তিনি বসে পড়তেন, তারা তাঁকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিত যাতে তাঁর উপর পুনরায় পাথর মারা যায়। তিনি বাধ্য হয়ে যখন চলা শুরু করতেন, তারা পাথর মারতো এবং ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে থাকতো। ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন- এ অবস্থায় হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা) তাঁকে প্রস্তরাঘাত থেকে রক্ষা করার জন্যে স্বয়ং প্রস্তর বর্ষণ নিজের উপর গ্রহণ করতেন। অবশেষে তার মাথা ফেটে যায়।

নবীর (স) মর্মস্পর্শী দোয়া

অবশেষে হুযুর (স) যখন তায়েফ থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং যে সব দুষ্ট লোক তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছিল তারা ফিরে চলে গেল, তখন তিনি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ওত্‌বা ও শায়বার বাগানের প্রাচীর সংলগ্ন একটি আঙুর লতার ছায়ায় বসে পড়েন। এ ঘটনায় তিনি মর্মাহত হয়ে পড়েন এবং স্বীয় রবের দিকে মুখ ফিরিয়ে দোয়া করেন যার মর্মস্পর্শী কথাগুলো তাবারানী কিতাবুদ্দোয়া ও ম'জামে কবীরে, ইবনে হিশাম মুহাম্মদ বিন ইসহাকের বরাত দিয়ে সীরাতে, তাবারী তাঁর ইতিহাসে, ইবনুল কাইয়েম যাদুল মায়াদে এবং হাফেজ ইবনে কাসীর আল বেদায়াতে উদ্ধৃত করেছেন। তা নিম্নরূপ ঃ

> "হে খোদা! আমি তোমারই দরবারে নিজের অসহায়ত্বের এবং লোকের দৃষ্টিতে আমার মর্যাদাহীনতার অভিযোগ করছি, কার উপর তুমি আমাকে সপর্দ করছো? এমন কোন অপরিচিতের উপর যে আমার সাথে কঠোর আচরণ করবে? অথবা কোন দুশমনের উপরে যাকে তুমি আমার উপর জয়লাভ করার শক্তি দিয়েছ? যদি তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে না থাক তো আমি কোন বিপদের পরোয়া করিনা। কিন্তু তোমার পক্ষ থেকে যদি নিরাপত্তা লাভ আমি করি তাহলে তা আমার জন্যে হবে অধিক আনন্দদায়ক। আমি আশ্রয় চাই তোমার সত্তার সে নূর থেকে যা অন্ধকারে আলো দান করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়গুলো সুবিন্যস্ত করে। তোমার গজব আমার উপর নাযিল হোক এবং তোমার শাস্তিযোগ্য হয়ে পড়ি এর থেকে তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমি যেন তোমার মর্জির উপর রাজী হই এবং তুমি আমার উপর রাজী হয়ে যাও। তুমি ছাড়া আর কোন শক্তি নেই।"

নবীর (স) 'রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন' হওয়ার বর্ণনা

বোখারী 'বাদউল খালক', 'যিক্‌রুল মালায়েকা'তে, মুসলিম মাগাযীতে এবং নাসায়ী 'বউস'-এ হযরত আয়েশার (রা) হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন যে, তিনি হুযুরকে (স) জিজ্ঞেস করেন, ওহোদের যুদ্ধের চেয়েও কি কোন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন আপনি হয়েছিলেন? জবাবে তিনি তায়েফের ঘটনার উল্লেখ করেন এবং বলেন, আমি মর্মাহত অবস্থায় যেদিকেই তাকাতাম সেদিকেই ধাবিত হতাম (অর্থাৎ পেরেশান ছিলাম যে কোন্ দিকে যাই)। এ

অবস্থা থেকে আমি এখনো রেহাই পাইনি এমন সময় হঠাৎ দেখি যে, আমি 'কারনোস্ সায়ালেব'[১] নামক স্থানে রয়েছি। উপরে তাকিয়ে দেখি একটি মেঘ আমার উপর ছায়া দান করে আছে। দেখি তার মধ্যে হযরত জিব্রিল (আ) রয়েছেন। তিনি আমাকে ডেকে বল্লেন, আপনার কওম আপনাকে যা কিছু বলেছে এবং আপনার দাওয়াতের যে জবাব দিয়েছে আল্লাহ্ তা শুনেছেন। তিনি পাহাড়সমূহের এ ফেরেশতা পাঠিয়েছেন। আপনি যা ইচ্ছা সে হুকুম তাকে করুন। অতঃপর পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে সালাম করে বলেন, হে মুহাম্মদ (স)! আপনার কওমের বক্তব্য এবং আপনার দাওয়াতের জবাব আল্লাহ্ শুনেছেন। আমি পাহাড়ের ফেরেশতা। আপনার রব আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন- যাতে আপনি আমাকে হুকুম করেন। এ শব্দগুলো মুসলিমের বর্ণনায় আছে।

তাবারানীতে আছে, যে হুকুম আপনি চান করুন। বোখারীর শব্দগুলো হচ্ছেঃ তারপর তিনি বল্লেন, হে মুহাম্মদ (স)! আপনি যা কিছু চান তা বলার এখতিয়ার আছে। যদি আপনি চান তাহলে আমি তাদের উপর (কুরাইশের উপর) মক্কার দু'দিকের পাহাড়গুলো (আবু কুবাইস্ ও কুয়ায় কেয়াম) একত্র করে তাদের উপর চাপিয়ে দেব।[২] নবী (স) তার জবাবে বলেন, না, না। আমি আশা করি যে, আল্লাহ্ তাদের বংশ থেকে এমন লোক পয়দা করবেন যারা আল্লাহ্ এক ও লাশরীকের দাসত্ব আনুগত্য করবে।

আদ্দাস্ নাসরানীর ইসলাম গ্রহণ

ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাকের বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, নবী (স) যখন ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওত্বা বিন রাবিয়া এবং শায়বা বিন রাবিয়ার বাগানের প্রাচীর সংলগ্ন আঙুর লতার ছায়ায় বসেছিলেন, তখন কুরাইশের এ দুই সর্দার তাঁকে এ অবস্থায় দেখতে পেল এবং তাদের শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হলো। এ কথারও উল্লেখ আছে যে, বনী জুমাহের যে স্ত্রীলোকটি তায়েফের জনৈক সর্দারের বাড়িতে ছিল, সেও হুযুরের (স) সাথে দেখা করলো। তিনি তাকে বল্লেন, তোমার শ্বশুর পরিবারের লোকেরা আমার সাথে এ কিরূপ আচরণ করলো? ওত্বা ও শায়বা তাদের এক ঈসায়ী গোলামকে ডেকে পাঠালো এবং বল্লো, বড়ো একটা পাত্রে এক গোছা আঙুর রাখ এবং তাকে দিয়ে খেতে বল। সে যখন পাত্রটি তাঁর কাছে রাখলো তখন তিনি বিস্মিল্লাহ বলে (এক বর্ণনা মতে বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে) তাতে হাত রাখলেন। আদ্দাস বল্লো, খোদার কসম, এ দেশে তো এ কালেমা বলার কেউ নেই। হুযুর (স) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোথাকার অধিবাসী এবং তোমার দ্বীন কি? সে বল্লো, আমি ঈসায়ী এবং নিনাওয়ার অধিবাসী। তিনি বল্লেন, মর্দে সালেহ্ ইউনুস বিন

---

১. এ স্থানটিকে 'কারনোল মানায়েল'ও বলে। এ হচ্ছে নজদ বাসীর মীকাত যেখান থেকে কাবার যিয়ারতের জন্যে তাদেরকে ইহরাম বাঁধতে হয়। মক্কা থেকে উটের পিঠে একদিন এক রাতের পথ- গ্রন্থকার।

২. কুরাইশদেরকে পাহাড় দিয়ে ঢেকে দেয়ার জন্য ফেরেশতা এ জন্যে হুযুরের (স) অনুমতি চাইলেন যে, হুযুর (স) যে মুসিবতের সম্মুখীন হলেন, তা তাদেরই জুলুম ও আক্রোশের কারণেই হয়েছেন। তারা যদি তাঁর উপর সীমাতিরিক্ত নির্যাতন না করতো তাহলে তাঁর তায়েফ যাওয়ার প্রয়োজনইবা কেন হতো? -গ্রন্থকার

মাত্তার বস্তির লোক নাকি? সে বল্লো, আপনি তাঁকে কিভাবে জানেন?[১] হুযুর (স) বল্লেন, তিনি আমার ভাই। তিনিও নবী ছিলেন এবং আমিও নবী।

একথা শুনার পরই আদ্দাস তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়লো এবং তাঁর মাথা ও হাত-পায়ে চুমো দিতে লাগলেন।

সুলায়মান আত্তায়মী তাঁর সীরাত গ্রন্থে এ কথা বলেন যে, আদ্দাস বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রসূল।

রাবিয়ার পুত্রদ্বয় যখন এ দৃশ্য দেখলো তখন একজন অপরজনকে বল্লো, দেখ তোমাদের গোলামকেও এ লোক বিগড়ে দিয়েছে। আদ্দাস ফিরে এলে তারা তাকে বল্লো, তোমার কি হলো যে, তার মাথা ও হাত-পায়ে চুমো দিতে লাগলে? সে বল্লো, প্রভু আমার! পৃথিবীতে তাঁর চেয়ে ভালো লোক আর কেউ নেই। তিনি আমাকে এমন এক বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন যা নবী ব্যতীত আর কেউ জানেনা। তারা বল্লো, আদ্দাস! তোমার দ্বীন থেকে ফিরে যেয়োনা। তার দ্বীন থেকে তোমার দ্বীন উত্তম।(৭)

জ্বিনদের কুরআন শ্রবণ

তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নবী (স) নাখলা নামক স্থানে কিছুদিন অবস্থান করেন। মক্কায় কি করে ফিরে যাবেন এ দুশ্চিন্তায় তিনি পেরেশান ছিলেন। তায়েফে যা কিছু ঘটেছে তা তারা জানতে পেরেছে। তারপর তো পূর্ব থেকে কাফেরদের সাহস আরও বেড়ে যাবে। এ সময়ে একদিন তিনি যখন নামাযে কুরআন তেলাওত করছিলেন, জ্বিনদের একটি দল সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। তারা কুরআন শ্রবণ করে এবং ঈমান আনে। তারা ফিরে গিয়ে নিজেদের কওমের মধ্যে ইসলামের তবলিগ শুরু করে। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীকে এ সুসংবাদ দেন যে, মানুষ যদিও তাঁর দাওয়াত থেকে পলায়ন করছে কিন্তু জ্বিন সে দাওয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং স্বজাতির মধ্যে তা ছড়াচ্ছে।[২](৮)

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা), হযরত যুবাইর (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা), হযরত হাসান বাসরী, সাঈদ বিন জুবাইর, যির বিন হুবাইশ, মুজাহিদ, একরামা এবং অন্যান্য মনীষীগণ জ্বিনদের আগমনের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁরা সকলে একমত যে, জ্বিনদের উপস্থিতির এ ঘটনা নাখলার অভ্যন্তরে ঘটেছিল। ইবনে ইসহাক, আবু নুয়াইম ইস্পাহানী এবং ওয়াকেদী বলেন, এ সে সময়ের ঘটনা যখন নবী (স) তায়েফ থেকে নিরাশ হয়ে মক্কার দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন। পথে তিনি নাখলায় অবস্থান করেন। সেখানে এশা অথবা ফজর অথবা তাহাজ্জুদে তিনি কুরআন তেলাওত করছিলেন। এমন সময় জ্বিনদের একটি দল সেদিক দিয়ে অতিক্রম করছিল। তারা তাঁর কেরাত শুনার জন্যে থেমে গেল। এর সাথে সকল বর্ণনার এ বিষয়ে ঐক্যমত্য হয় যে, এ সময়ে জ্বিনগণ

---

১. সুহায়লী আত্তায়মীর বরাত দিয়ে বলেছেন যে, হুযুরের (স) মুবারক মুখ থেকে হযরত ইউনুসের (আ) উল্লেখ শুনার পর আদ্দাম বলে, খোদার কসম, আমি যখন নিনাওয়া ছেড়ে আসি, তখন লোকেরাও জানতোনা যে মাত্তা কি! তাহলে তিনি তাঁকে কি করে জানলেন- যেহেতু তিনি উম্মী ছিলেন এবং উম্মী কওমে পয়দা হন। -গ্রন্থকার।

২. এ ছিল সূরা আহকাফের ২৯ থেকে ৩২ আয়াত যাতে আল্লাহ্ তায়ালা নবীকে (স) এ সংবাদ দেন যে জ্বিনগণ তাঁর মুখে কুরআন শুনে তার কি প্রভাব গ্রহণ করেছে- গ্রন্থকার।

হুযুরের (স) সামনে আসেনি। আর না তিনি তাদের আগমন অনুভব করেন। বরঞ্চ পরে আল্লাহ্ তায়ালা অহীর মাধ্যমে তাঁকে তাদের আগমন ও কুরআন শ্রবণ সম্পর্কে অবহিত করেন।

যেখানে এ ঘটনা ঘটে সে স্থানটি ছিল 'আয্‌যাইমা' অথবা 'আস্ সাইলুল কবীর'। কারণ এ দুটি স্থান নাখলা উপত্যকায় অবস্থিত। উভয় স্থানেই পানি ও সবুজ শ্যামল তৃণলতা ছিল। তায়েফ থেকে আগমনকারীদের যদি এ উপত্যকার কোথাও শিবির স্থাপন করতে হতো তাহলে এ দুয়ের যে কোন একটি স্থানে তারা অবস্থান করতে পারতো।(৯)

এ সময়ে জ্বিনগণ হুযুরের (স) মুখ থেকে কুরআনের যে সূরা শ্রবণ করে তা ছিল সূরা রহ্‌মান। আল্ বায্‌যার, ইবনে জারীর, ইবনুল মুন্‌যের, দার কুত্‌নী (আফরাদে), ইবনে মারদুইয়া, খতীব (তাঁর ইতিহাসে), হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রা) এ বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, একবার নবী (স) স্বয়ং সূরা রহ্‌মান তেলাওয়াত করেন অথবা তাঁর সামনে এ সূরা পড়া হলো, তারপর তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, কি কারণ যে, আমি তোমাদের নিকট থেকে তেমন সুন্দর জবাব পাচ্ছি না যেমনটি জ্বিনগণ তাদের রবকে দিয়েছিল? লেকেরা বল্লো, সে জবাব কি ছিল? তিনি বলেন, আমি যখন আল্লাহ্ তায়ালার ইরশাদ فَبِاَىِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ পড়লাম, তখন জ্বিনগণ তার জবাবে বল্লো-

لَا بِشَيْئٍ مِّنْ نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ

(আমরা আমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করি না)। একই রূপ বর্ণনা তিরমিযি, হাকেম এবং হাফেজ আবু বকর বায্‌যার হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে উদ্ধৃত করেন। তাঁদের বর্ণনায় এ কথা আছে যে, যখন লোক সূরা রহ্‌মান শুনে নীরব থাকে তখন হুযুর (স) বলেন, আমি এ সূরা সে রাতে জ্বিনদেরকে শুনিয়ে ছিলাম- যে রাতে তারা কুরআন শুনার জন্যে একত্র হয়েছিল। তারা এর জবাব তোমাদের থেকে সুন্দর করে দিচ্ছিল। যখন আমি এ ইরশাদ পর্যন্ত পৌছলাম, "হে জ্বিন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে?" - তখন তারা তার জবাবে বলতো-

لَا بِشَيْئٍ مِّنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ

- হে আমাদের পরওয়ারদেগার। আমরা তোমার কোন নিয়ামতই অস্বীকার করছিনা। অতএব প্রশংসা তোমারই জন্যে।

যদিও অন্যান্য বর্ণনায় এ কথা বলা হয়েছে যে, সে সময় নবী (স) জানতেননা যে জ্বিন তাঁর মুখে কুরআন শুনছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা (সূরা আহকাফ- আয়াত ২৯-৩২) তাঁকে এ খবর দেন যে, তারা তাঁর কেরাত শুনছিল। কিন্তু এ কথা অনুমান করা অসংগত হবেনা যে, যেভাবে আল্লাহ্ তায়ালা হুযুরকে (স) জ্বিনের কুরআন শ্রবণ সম্পর্কে অবহিত করেন, তেমনি আল্লাহ্ তায়ালাই তাঁকে এ বিষয়ও জানিয়ে দেন যে, সূরা রহ্‌মান শুনার সময় তারা কি জবাব দিচ্ছিল।

প্রত্যাবর্তনের পর মক্কায় হুযুরের (স) প্রবেশ কিভাবে হয়

ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন যে, নাখলা থেকে যখন তিনি মক্কা যাওয়ার ইচ্ছা করেন তখন হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা) বলেন, আপনি সেখানে কিভাবে প্রবেশ করবেন যেহেতু আপনাকে বের করে দিয়েছে? হুযুর (স) বল্লেন, হে যায়দ!

যে অবস্থা তুমি দেখছো তার থেকে বাঁচার কোন পথ আল্লাহ্ বের করে দিবেন। তিনি তাঁর দ্বীনের সমর্থক ও সাহায্যকারী এবং তাঁর নবীকে তিনি বিজয়দানকারী। পরবর্তী কথাগুলো ওয়াকেদী সংক্ষিপ্ত করেন। কিন্তু ইবনে ইসহাক তা বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হেরা পৌঁছার পর তিনি আবদুল্লাহ্ বিন আল উরায়কেতকে[১] আখনাস্ বিন শুরায়েকের নিকটে পাঠান যেন সে তাঁকে তার আশ্রয়ে গ্রহণ করে। সে বলে, আমি তো বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ।[২] চুক্তি সূত্রে আবদ্ধ ব্যক্তিতো কুরাইশের আসল গোত্রসমূহের মুকাবিলায় আশ্রয় দিতে পারেনা। অতঃপর হুযুর (স) ইবনে উরায়কেতকে সুহাইল বিন আমরের নিকট পাঠান, সে বলে, বনী আমের বিন লুসাই বনী কাবের মুকাবিলায় আশ্রয় দিতে পারেনা। তারপর হুযুর (স) তাকে মুতয়েম বিন আদী-এর নিকটে পাঠান যে, বনী আবদে মনাফের শাখা বনী নাওফলের গোত্রভুক্ত ছিল। উরায়কেত গিয়ে তাকে বল্লো, মুহাম্মদ (স) বলেন যে, তুমি কি তাঁকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছ, যাতে তিনি তাঁর রবের পয়গাম পৌঁছাতে পারেন? সে জবাবে বলে, ঠিক আছে তাঁকে মক্কায় আসতে বল। অতএব হুযুর (স) শহরে গিয়ে রাত বাড়িতেই কাটালেন। সকালে মুতয়েম ও তার ছ'সাত পুত্র অস্ত্রসজ্জিত হয়ে হুযুরকে (স) সংগে করে হারামে নিয়ে যায় এবং বলে, আপনি তাওয়াফ করুন। তাওয়াফের সময় তারা সকলে তাঁর নিরাপত্তার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে। আবু সুফিয়ান (তাবারানীর মতে আবু জাহল) জিজ্ঞেস করে, তোমরা কি আশ্রয় দাতা, না তার আনুগত্যকারী? মুতয়েম বলে, না, শুধু আশ্রয়দানকারী। সে বলে, তোমাদের আশ্রয় ভংগ করা যায়না। তোমরা যাকে আশ্রয় দিয়েছ আমরাও তাকে আশ্রয় দিয়েছি।(১০)

মুতয়েম বিন আদীর এ অনুকম্পা ছিল যার ভিত্তিতে বদর যুদ্ধের কয়েদীদের সম্পর্কে নবী (স) বলেন,

لو كان المطعم بن عدى حيا ثم كلمنى فى هؤلاء النتنى
لتركتهم له (بخارى، ابوداود، مسند احمد)

অর্থাৎ যদি মুতয়েম বিন আদী জীবিত থাকতো এবং আমার সাথে এসব ঘৃণ্য লোক সম্পর্কে কথা বলতো, তাহলে তার খাতিরে আমি এদেরকে ছেড়ে দিতাম।(১১)

---

১. এ ব্যক্তি যদিও মুশরিক ছিল, কিন্তু নবী (স) এবং আবু বকর (রা) তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। এ জন্যে মদীনায় হিজরতের চরম আশংকাজনক অবস্থায় পথ দেখাবার জন্যে হুযুর (স) তাকে সাথে নেন। সে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে এ খেদমত আঞ্জাম দেয়। অথচ সে কুরাইশকে এ খবর দিয়ে মোটা পুরস্কার লাভ করতে পারতো– গ্রন্থকার।

২. এ ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে বনী সাকিক্ গোত্রের ছিল। কিন্তু মক্কায় বনী যোহরার (হুযুরের (স) নানার দিকের আত্মীয়) সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তার যোগ্যতার কারণে বনী যোহরার মধ্যে সে সর্দার হওয়ার মর্যাদা লাভ করে- গ্রন্থকার।

নির্দেশিকা

১. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন।
২. তাফহীম, ৪র্থ খন্ড- সূরা মুমেনের ভূমিকা।
৩. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন।
৪. তাফহীম, ৬ষ্ঠ খন্ড- সূরা আল হাক্কার ভূমিকা।
৫. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন।
৬. তাফহীম, ৫ম খন্ড- আল কামার- টীকা ১।
৭. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন।
৮. তাফহীম, ৪র্থ খন্ড- আল আহকাফ- ভূমিকা।
৯. তাফহীম, ৪র্থ খন্ড- আল আহকাফ- টীকা ৩৩।
১০. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন।
১১. তাফহীম- ৫ম খন্ড- সূরা মুহাম্মদ- ভূমিকা।

একাদশ অধ্যায়

ইস্‌রা ও মে'রাজের মর্মকথা

নবী মুস্তফা (স) এর মক্কী যিন্দেগীর শেষ তিন বছরের ইতিহাস বর্ণনা করার আগে সে সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা যুক্তিসংগত মনে করছি। তা নবী পাকের জীবন চরিত্রের উপর এক উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণরূপে শোভা বর্ধন করতে দেখা যাচ্ছিল। এ এমন এক তাজ বা শিরস্ত্রাণ যা আম্বিয়া সমেত মানব ইতিহাসের অন্য কোন ব্যক্তির জীবন চরিত আলোকোজ্জ্বল করতে পারেনি। আর তা হচ্ছে ইস্‌রা ও মে'রাজের ঘটনা। ইস্‌রার অর্থ রাতের বেলায় নবীকে মসজিদে হারাম থেকে মস্‌জিদে আকসা (বায়তুল মাক্‌দেস্‌) পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া। এ কথা কুরআনে সুরায়ে বনী ইসরাইলের শুরুতে বলা হয়েছে। মে'রাজের অর্থ নবী পাকের (সঃ) বায়তুল মাক্‌দেস্‌ থেকে সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত পৌঁছা। এর পূর্ণ বিবরণ হাদীসগুলোতে পাওয়া যায়। কদাচিৎ একথাও বলা হয়েছে যে, ইস্‌রা ও মে'রাজের ঘটনা পৃথক পৃথক সময়ে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু ওলামায়ে উম্মত এবং ফকীহ্‌, মুহাদ্দিস ও মুতাকাল্লিমীনের বিরাট সংখ্যক মনীষী এ ব্যাপারে একমত যে, এ উভয় ঘটনা একই সময়ে সংঘটিত হয়। একই রাতে নবী মুস্তাফাকে সশরীরে অর্থাৎ দেহ ও আত্মাসহ জাগ্রত অবস্থায় মসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মাকদেস পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ঐ রাতেই তিনি উর্ধ জগতের উচ্চতম স্তর অতিক্রম করে গিয়ে রাব্বুল ইয্যাতের দরবারে পৌঁছে যান। আবার ভোর হবার আগেই তিনি মক্কায় তশরিফ আনেন।

মে'রাজের তারিখ

এ ঘটনা কখন ঘটেছিল তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। ইবনে সাদ ওয়াকেদীর বর্ণনা নকল করে বলেন যে, নবুওতের বার বছর পর ১৭ই রমজানে অর্থাৎ হিজরতের আঠারো মাস আগে এ ঘটনা ঘটে।* অন্য এক সনদে ইবনে সা'দই নবুওতের তের বছর পর ১৭ই রবিউল আওয়াল অর্থাৎ হিজরতের এক বছর পূর্বের এ ঘটনা বলে উল্লেখ করেন। বায়হাকী

---

* এখানে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা প্রয়োজন বোধ করছি যে, আমরা মদীনায় হিজরতের পূর্বে নবুওত উত্তর কালের যে ইতিহাস নির্ণয় করি তা ঐ হাদীসের ভিত্তিতে যা বোখারী এবং মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এতে তিনি বলেন, নবী (স) এর উপর যখন ওহী নাযিল হয়, তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তারপর তিনি মক্কায় তের বছর, মদীনায় দশ বছর অতিবাহিত করেন। এ বর্ণনার ভিত্তিতে আমরা মনে করি নবুওতের তের বছর পূর্ণ হওয়ার পর হিজরত হয়- গ্রন্থকার।

মুসা বিন ওকবার বরাত দিয়ে এবং তিনি ইমাম যুহ্‌রীর বরাত দিয়ে মে'রাজের এ তারিখই উল্লেখ করেছেন। ওরওয়া বিন যুবাইরের বর্ণনাও তাই। ইবনে লাহিয়া আবুল আস্‌ওয়াদের বরাত দিয়ে তা উদ্ধৃত করেছেন। এর ভিত্তিতে ইমাম নাওয়াদী এটাকেই মে'রাজের সঠিক তারিখ বলেছেন। ইবনে হাযম এর উপর ইজমার দাবী করেছেন যদিও তা সঠিক নয়। ইসমাইল আস্‌-সুদ্দী থেকে দুটি বক্তব্য বর্ণিত আছে। তাবারী ও বায়হাকী তাঁর যে বর্ণনা নকল করেছেন তাতে মে'রাজকে হিজরতের এক বছর পাঁচ মাস পুর্বে নবুওতের দ্বাদশ বর্ষের শাওয়াল মাসের ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন। হাশেমের বর্ণনা মতে এ এক বছর চার মাস পূর্বের ঘটনা এবং সে দৃষ্টিতে এ যিল্‌কাদ মাসের ঘটনা বলে নির্নিত হয়। ইবনে আব্দুল বার এবং কুতায়বার বর্ণনা এই যে, এ হিজরতের এক বছর আট মাস পূর্বে (দ্বাদশ নবুওত বর্ষের রজব মাসে) এ ঘটনা ঘটে। ইবনে ফারেস একে হিজরতের এক বছর তিন মাস, ইবনে আল্ জাওযী আট মাস, আবুর রাবী বিন মালেক ছ'মাস পূর্বের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। এগার মাস পূর্বের একটা উক্তিও আছে। ইবনুল মুনীর সীরাতে ইবনে আবদুল বার এর ব্যাখ্যায় এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইবরাহীম বিন ইসহাক আল হারবী নিশ্চয়তার সাথে বলেছেন যে এটাই হলো মে'রাজের সঠিক তারিখ। কিন্তু ২৭শে রজব যে মে'রাজ হয় একথা প্রসিদ্ধি লাভ করে। আল্লামা যুরকানী বলেন, কোন উক্তিকে অন্য কোন উক্তির উপর প্রধান্য দেয়ার যথেষ্ট দলিল প্রমাণ পাওয়া না গেলে প্রসিদ্ধ উক্তি গ্রহণ করাই উত্তম।[১]

ঐতিহাসিক পটভূমিঃ

এ ঘটনাটি ইসলামী আন্দোলনের এমন এক স্তরে সংঘটিত হয়; যখন নবী (স) এর তাওহীদের আওয়াজ বলুন্দ করার পর প্রায় বার বছর কেটে গেছে। বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর পথ রুদ্ধ করার জন্যে সকল প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু তাদের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নবীর আওয়াজ আরবের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। আরবের এমন কোন গোত্র ছিলনা যার দু'চার জন লোক তাঁর দাওয়াত দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। স্বয়ং মক্কায় মুষ্টিমেয় নিষ্ঠাবান লোকের এমন একটি দল তৈরী হয়েছিল, যাঁরা এ দাওয়াতে হকের সাফল্যের জন্যে জীবনের যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন। মদীনায় আওস ও খায্‌রাজের শক্তিশালী গোত্রদ্বয়ের বিরাট সংখ্যক লোক নবীর সাহায্য সহযোগিতাকারী হয়ে পড়েছিলেন। এখন সে সময় নিকটবর্তী হয়ে পড়েছিল যখন নবী পাকের মক্কা থেকে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে ছাড়িয়ে পড়া মুসলমানদেরকে একস্থানে একত্র করে ইসলামের আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ এসে গিয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে মে'রাজ সংঘটিত হয় এবং মে'রাজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নবী (স) মানুষকে সে পয়গাম শুনিয়ে দেন যা সুরায়ে বনী ইসরাইলে সন্নিবেশিত আছে।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সূরায়ে বনী ইসরাইলের প্রথম আয়াতে শুধু মসজিদে হারাম (বায়তুল্লাহ্) থেকে মসজিদে আক্‌সা (বায়তুল মাক্‌দেস) পর্যন্ত হুযুরকে (স) নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য বলা হয়েছে যে আল্লাহতায়ালা তাঁর বান্দাহকে তাঁর কিছু নিদর্শন দেখাতে চেয়েছিলেন। এর চেয়ে বিস্তারিত কিছু কুরআনে বলা হয়নি। কিন্তু হাদীস ও সীরাতের

গ্রন্থগুলোতে এ ঘটনার বিশদ বিবরণ বহু সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যাঁদের সংখ্যা পঁচিশ পর্যন্ত, বরঞ্চ গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হয়েছে হযরত আনাস বিন মালেক (রা), হযরত আবু হুরায়রা (রা), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা), হযরত মালেক বিন সা'সায়া (রা), হযরত আবুযর গিফারী (রা), হযরত শাদ্দাদ বিন আওস (রা), হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা), হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) এবং হযরত উম্মেহানী (রা) থেকে।

হাদীসে যে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় তার সংক্ষিপ্ত সার এই যে, রাতে জিব্রিল (আ) নবীকে (স) জাগ্রত করে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত বোরাকে আরোহণ করিয়ে নিয়ে যান। সেখানে (বায়তুল মাকদেসে) নবী (স) আম্বিয়া আলায়হিমুস্ সালামের সাথে নামায আদায় করেন। তারপর জিব্রিল (আ) তাঁকে উর্ধ জগতে নিয়ে চলেন। বিভিন্ন আসমানে বিভিন্ন নবীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। শেষে এক অতি চরম উচ্চতায় পৌঁছার পর তিনি তাঁর রবের দরবারে হাযির হন। এ হাযিরি কালে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত ছাড়াও পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হিসাবে তাঁর উপর আরোপ করা হয়। তারপর তিনি বায়তুল মাক্দেসে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখান থেকে তিনি মসজিদে হারামে ফিরে আসেন। এ সম্পর্কে বহু হাদীস থেকে জানা যায় যে, তাঁকে জান্নাত এবং জাহান্নামও দেখানো হয়। উপরন্তু নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, পরদিন যখন তিনি লোকের সামনে এ ঘটনার উল্লেখ করেন, তখন মক্কার কাফেরগণ তাই নিয়ে খুব ঠাট্টা বিদ্রুপ করে এবং মুসলমানদের মধ্যে কারো কারো ঈমান নড়বড়ে হয়ে পড়ে।

হাদীসের এ অতিরিক্ত বিবরণ কুরআনের পরিপন্থী নয় বরঞ্চ কুরআনের বর্ণনার পর আরও কিছু বলা হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট যে অতিরিক্ত বর্ণনাকে কুরআনের পরিপন্থী বলে প্রত্যাখ্যান করা যায়না।

মে'রাজ দৈহিক ছিল না আত্মিক?

মে'রাজের এ ভ্রমণ কাহিনী কেমন ছিল? একি স্বপ্নে হয়েছিল, না জাগ্রত অবস্থায়? হুযুর (স) কি স্বয়ং তশরিফ নিয়ে গিয়েছিলেন, না তিনি আপন স্থানে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁকে আত্মিকভাবে ওসব দেখানো হয়েছিল? এ সব প্রশ্নের জবাব স্বয়ং কুরআনের শব্দগুলো থেকেই পাওয়া যায়।

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى থেকে বর্ণনার সূচনা এ কথাই বলে যে, এ কোন বিরাট অস্বাভাবিক অলৌকিক ঘটনা ছিল যা আল্লাহতায়ালার অসীম শক্তি ও কুদরতে সংঘটিত হয়। একথা ঠিক যে, স্বপ্নে কোন ব্যক্তির এমন কিছু দেখা, অথবা কাশ্ফের দ্বারা এমন দেখার এ গুরুত্ব হয় না যে তা বয়ান করার জন্যে এ ভূমিকার প্রয়োজন হয়। যেমন সকল ত্রুটি বিচ্যুতির ও অক্ষমতার উর্ধে যে সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন অথবা কাশফের মাধ্যমে এ সব কিছু দেখিয়ে দিয়েছেন। তারপর এ শব্দগুলো-"একরাত্রিতে তিনি তাঁর বান্দাহকে নিয়ে গেলেন" দৈহিক ভ্রমণকেই বুঝায়। স্বপ্নে কোন সফরকে, অথবা কাশফের মাধ্যমে কোন সফরের জন্যে 'নিয়ে যাওয়া' শব্দগুলো কিছুতেই উপযোগী হতে পারেনা। সুতরাং আমাদের এ কথা মেনে নেয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকেনা যে এ নিছক একটি আত্বিক পর্যবেক্ষণ ছিলনা বরঞ্চ একটি দৈহিক সফর এবং চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ ছিল যা আল্লাহ নবী (স) কে দেখিয়েছিলেন।

এখন যদি এক রাতে উড়োজাহাজ ব্যতিরেকে মক্কা থেকে বায়তুল মাক্দেস্ যাওয়া এবং আসা আল্লাহর কুদরতে সম্ভব ছিল, তাহ্লে পরবর্তী অন্যান্য বিবরণ অসম্ভব বলে কেন প্রত্যাখ্যান করা হবে যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে? সম্ভব ও অসম্ভবের বিতর্ক তখনই হতে পারে যখন কোন সৃষ্ট জীবের নিজের এখতিয়ারে কোন কাজ করার প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু যখন বলা হয় যে খোদা অমুক কাজ করেছেন তখন সম্ভাবনার প্রশ্ন সেই ব্যক্তি উত্থাপন করতে পারে খোদার শক্তিশালী হওয়ার বিশ্বাস যার নেই। আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা মূহুর্তের মধ্যে এমন স্থানে নিয়ে যেতে পারেন যেখানে জড় জগতের সব চেয়ে দ্রুতগামী বস্তু আলোর পৌঁছতে কোটি কোটি আলোক বর্ষের প্রয়োজন হয়। কাল ও স্থানের বাধা বন্ধন সৃষ্টির জন্যে, বিশ্ব জগতের স্রষ্টার জন্যে নয়।

হাদীস অস্বীকারকারীদের আপত্তি-অভিযোগ

মে'রাজ ভ্রমণের যে বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে বর্নিত রয়েছে, সে সম্পর্কে হাদীস অস্বীকারকারীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আপত্তি অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু সে সবের মধ্যে শুধু দুটি এমন যার কিছু গুরুত্ব দেয়া যায়।

এক- এই যে, এর থেকে আল্লাহ্ তায়ালার কোন বিশেষ স্থানে অবস্থান অনিবার্য হয়ে পড়ে। নতুবা তাঁর সামনে বান্দার উপস্থিতির জন্যে তাকে সফর করিয়ে এক নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল?

দ্বিতীয়- এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দোযখ ও বেহেশ্ত দেখানো এবং কিছু লোকের আযাবে লিপ্ত থাকার দৃশ্য কিভাবে দেখানো হলো, যখন বান্দাদের বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করাই হয়নি। এ কোন্ কথা যে শাস্তি অথবা পুরস্কারের ফয়সালা তো হবার কথা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর, কিন্তু কিছু লোককে পূর্বাহ্নেই শাস্তি দেয়া হয়েছে?

প্রকৃতপক্ষে এ দুটি অভিযোগ ত্রুটিপূর্ণ চিন্তারই পরিণাম ফল। প্রথম অভিযোগটি এ জন্যে ভ্রান্ত যে, স্রষ্টা তাঁর আপন সত্তায় নিঃসন্দেহে অসীম শক্তির মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্ত সৃষ্টির সাথে আচরণের ব্যাপারে তিনি তাঁর নিজের দুর্বলতার জন্যে নয় বরঞ্চ সৃষ্টির দুর্বলতার কারণে সীমিত মাধ্যম অবলম্বন করেন। যেমন যখন তিনি সৃষ্টির সাথে কথা বলেন, তখন কথা বলার সেই সীমিত পন্থা অবলম্বন করেন যা একজন মানুষ শুনতে ও বুঝতে পারে। বস্তুতঃ আল্লাহর কথার নিজস্ব একটা সার্বভৌম মর্যাদা রয়েছে। এমনিভাবে যখন তিনি তাঁর বান্দাহ্কে তাঁর সাম্রাজ্যের বিরাট ও মহান নিদর্শনাবলী দেখাতে চান, তখন তিনি তাকে নিয়ে যান এবং যেখানে যে বস্তু দেখবার সেখানেই তা দেখিয়ে দেন। কারণ বান্দাহ সমগ্র সৃষ্টরাজ্য একই সময়ে সেভাবে দেখতে পারেনা যেভাবে খোদা দেখে থাকেন। কোন কিছু পর্যবেক্ষণ করার জন্যে খোদাকে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু বান্দার প্রয়োজন হয়। স্রষ্টার সমীপে হাযির হওয়ার ব্যাপারটাও তাই। স্রষ্টা স্বয়ং কোন স্থানে অবস্থানরত নন। কিন্তু বান্দাহ্ তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্যে একটা স্থানের মুখাপেক্ষী যেখানে তার জন্যে আল্লাহ্ তায়ালার তাজাল্লী কেন্দ্রীভূত করা হয়। অন্যথায় তাঁর সার্বভৌম মর্যাদায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ সীমিত শক্তিসম্পন্ন বান্দাহর জন্যে সম্ভব নয়।

এখন রইলো দ্বিতীয় অভিযোগটি। তা এ জন্যে ভুল যে, মে'রাজের সময় নবীকে বহু

কিছুর পর্যবেক্ষণ করানো হয়। তার মধ্যে কিছু বাস্তবতাকে রূপকের আকারে দেখানো হয়। যেমন কোন ফেৎনা সৃষ্টিকারী বিষয়ের এ দৃষ্টান্ত যে, একটি সামান্য ফাটল বা ছিদ্র থেকে একটা মোটাসোটা বলদ বেরিয়ে আসা এবং তারপর আর তার মধ্যে ফিরে যেতে না পারা। জেনাকারীদের এ দৃষ্টান্ত যে, তার কাছে তাজা সুন্দর গোশ্‌ত থাকা সত্ত্বেও তা ছেড়ে পঁচা গোশ্‌ত খাচ্ছে। এভাবে অসৎ কাজের যে শাস্তি তাঁকে দেখানো হলো, তা ছিল রূপক আকারে আখেরাতের শাস্তির অগ্রিম পর্যবেক্ষণ।

প্রকৃত বিষয় যা মে'রাজ সম্পর্কে উপলব্ধি করা উচিত তাহলো এই যে, আম্বিয়া আলায়হিমুস্‌ সালামের প্রত্যেককে আল্লাহ্‌ তায়ালা তাঁর পদমর্যাদা অনুযায়ী আসমান যমীনের শাসন ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ করিয়েছেন। বস্তগত যবনিকা মাঝখান থেকে উত্তোলন করে সচক্ষে সেসব বাস্তব সত্য দেখানো হয়েছে যা না দেখেই বিশ্বাস করার দাওয়াত দেয়ার জন্যে তাঁদেরকে আদিষ্ট করা হয়েছিল, যাতে করে তাঁদের মর্যাদা একজন দার্শনিকের মর্যাদা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায়। দার্শনিক যা কিছু বলে তা আন্দাজ অনুমান করে বলে। সে যদি স্বয়ং তার নিজের সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হয়, তাহলে কখনো তার কোন অভিমতের সত্যতার সাক্ষ্য দেবেনা। কিন্তু নবীগণ যা কিছুই বলেন, তা তাঁর প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই বলেন। তাঁরা সৃষ্টির সামনে এ সাক্ষ্য দিতে পারেন, "আমরা এ সব জানি এবং এ সব আমাদের চোখে দেখা বাস্তবতা।"[২]

মে'রাজকে স্বপ্ন বলে আখ্যায়িতকারীদের যুক্তি পর্যালোচনা

এ ঘটনাটিকে স্বপ্ন বলে আখ্যায়িত করার জন্যে দুটি যুক্তি পেশ করা হয়ে থাকে। একটি এই যে, সুরা বনী ইসরাইলের ৬০ নং আয়াতে তার জন্যে রুয়া رؤيا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ হযরত আয়েশার (রা) এ উক্তি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে-

مَا فُقِدَ جَسَدُهُ الشَّرِيفُ وَلٰكِنْ أُسْرِىَ بِرُوحِهِ

হুযুরের (স) দেহমুবারক (আপনস্থান থেকে) সরে যায়নি, বরঞ্চ তাঁর রূহকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

এ দুটির মধ্যে প্রথমটিকে তো স্বয়ং কুরআনই নাকচ করে দিচ্ছে। সেই পূর্ণ বাক্যটি একটু দেখুন যাতে মে'রাজকে লক্ষ্য করে رؤيا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ-

আর যে রুয়া আমরা তোমাকে দেখিয়েছি তাকে আমরা মানুষের জন্যে ফেৎনা বানিয়ে রেখে দিয়েছি।

এ বাক্যে যদি رؤيا শব্দকে স্বপ্নের অর্থে নেয়া হয় তাহলে মানুষের জন্যে তা ফেৎনা হওয়ার কি কারণ হতে পারে? স্বপ্নে মানুষ হরেক রকমের বস্তু দেখতে পারে। যদি রসূলুল্লাহ (স) লোকের সামনে একথা বলতেন, 'আজ রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, মক্কা থেকে বায়তুল মাকদেস গিয়েছি' -তাহলে তার জন্যে কোন মুসলমান ফেৎনায় পড়ে মুরতাদ হয়ে যেতোনা এবং কোন কাফেরও এ নিয়ে বিদ্রুপ করতোনা। আর কেউ একথাও জিজ্ঞেস করতোনা-তোমার ভ্রমণ যে সত্য তার প্রমাণ দাও। এটা ফেৎনা তখনই হতে পারতো যখন নবী (স) এ ঘটনা জাগ্রত অবস্থায় ঘটেছে বলে লোকের কাছে বলতেন এবং একথাও বলতেন যে, আমার এ সফর রূহানী নয়, বরঞ্চ দৈহিক।

উপরন্ত একথা দাবী করাও ঠিক নয় যে, আরবী ভাষায় رؤيا শব্দ শুধু স্বপ্নের

জন্যেই ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে আরবী অভিধানে رؤيا এবং رؤيت উভয়ই একই অর্থবোধক এবং একটি অপরটির স্থানে ব্যবহৃত হয়। যেমন قربى ও قربت হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) যিনি আরবী ভাষায় দিকপাল হিসাবে গন্য হতেন, কুরআনের এ আয়াতের এ তফসীর করতে গিয়ে বলেন,

هى رؤيا عين اريها النبىّ صلى الله عليه و سلّم ليلة
اسرى به الى بيت المقدس- (بخارى، ترمذى، نسائى)

-এ ছিল চাক্ষুষ স্বপ্ন যা সে রাতে নবীকে (স) দেখানো হয়েছিল যখন তাঁকে বায়তুল মাকদেস্ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সাঈদ বিন মনসুর ইবনে আব্বাসের (রা) এ উক্তির যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তার মধ্যে এ কথাটি অতিরিক্ত আছে- و ليس رؤيا منام এ স্বপ্নের মতো رؤيا (রুয়া) ছিলনা।

অন্য একটি সনদে ইবনে মনসুর ইবনে আব্বাসের (রা) এ উক্তি নকল করেছেন -

هو ما ارى فى طريقه الى بيت المقدس

এর দ্বারা সে পর্যবেক্ষণ বুঝানো হয়েছে যা বায়তুল মাকদেসের পথে নবীকে করানো হয়েছিল।

এখন রইলো হযরত আয়েশার (রা) উক্তি। তো এ সনদের দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল। মুহাম্মদ বিন ইসহাক তা এ ভাষায় নকল করেছেন- আবু বকর বংশের কতিপয় লোক (কোন ব্যক্তিকে) বলেছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) এ কথা বলতেন। এরূপ অজ্ঞাত সনদ দ্বারা এ কি করে প্রমাণিত হতে পারে যে, যে কথা হযরত আয়েশার (রা) বলে উল্লেখ করা হচ্ছে, তা প্রকৃত পক্ষে তাঁর উক্তি? তারপর এ দুর্বল বর্ণনার মুকাবিলায় বহু সহীহ্ সনদের মাধ্যমে হাদীসের নির্ভর যোগ্য গ্রন্থগুলোতে স্বয়ং নবী (স) এর বর্ণিত ইসরা ও মে'রাজের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। আর এ সব উদ্ধৃত করা হয়েছে হযরত আনেস (রা), হযরত মালেক বিন সা'সায়া (রা), হযরত আবু হুরায়রা (রা), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা), হযরত আবুযর গিফারী (রা), হযরত শাদ্দাদ বিন আওস (রা) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে। এ সব কি করে নাকচ করা যায়? আর হযরত আয়েশার (রা) এ বর্ণনার কি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যা বায়হাকী পুরো মুত্তাসিল সনদসহ নকল করেছেন যে, ইসরার রাত শেষে ভোরবেলায় নবী (স) লোকের কাছে রাতের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন এবং ঈমান আনার পর নবীর নবুওতের যারা স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই মুরতাদ হয়ে পড়েন। তারপর তাঁরা এ খবর নিয়ে হযরত আবু বকরের (রা) কাছে গিয়ে বলতে থাকেন, আপনার বন্ধুর একটু খবর নিয়ে দেখুন। তিনি বলছেন যে, গত রাতে তাঁকে বায়তুল মাকদেস নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

আবু বকর বলেন, তিনি কি এরূপ বলেছেন নাকি? তাঁরা বল্লেন, হাঁ। আবু বকর (রা) বলেন, যদি তিনি এমন বলে থাকেন তাহলে অবশ্যই তা সত্য কথা বলেছেন। তাঁরা বল্লেন, আপনি কি এটা সত্য মনে করেন যে, তিনি একই রাতে বায়তুল মাকদেস গেলেন এবং ভোরের আগে ফিরেও এলেন? আবু বকর (রা) বলেন, আমি তো সকাল সন্ধ্যা তাঁর থেকে আসমানের খবর শুনে তার সত্যতা স্বীকার করে নেই।

কোন ব্যক্তি কি এ কথা মেনে নিতে পারে যে, যে বক্তব্যটি অজ্ঞাত সনদের মাধ্যমে হযরত আয়েশার (রা) বলে বলা হচ্ছে যে, হুযুরের দেহ আপন স্থানেই ছিল এবং শুধু রূহকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে বক্তব্য ছিল হযরত আয়েশার (রা)?[৩]

মে'রাজের প্রকৃত মর্মকথা

মে'রাজের এ ঘটনা মানব ইতিহাসের এক অন্যতম বিরাট ঘটনা যা কালের গতি পরিবর্তন করে এবং ইতিহাসের উপর স্থায়ী রেখাপাত করে। মে'রাজের প্রকৃত গুরুত্ব এটা নয় যে তা কিভাবে হলো, বরঞ্চ তার উদ্দেশ্য ও ফলাফলই প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ।

আসল কথা এই যে, যে ভূমন্ডলে আমরা বাস করি, তা হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার বিরাট বিশাল সাম্রাজ্যের একটি অতি ক্ষুদ্র প্রদেশ বিশেষ। এ প্রদেশে খোদার পক্ষ থেকে যে নবীই পাঠানো হয়েছে তাঁর মর্যাদা কিছুটা এমন ছিল যেমন দুনিয়ার সরকারগুলো তাদের অধীন দেশগুলোতে গভর্নর অথবা ভাইসরয় প্রেরণ করে থাকে। একদিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। দুনিয়ার সরকার বা রাষ্ট্র পরিচালকদের গভর্ণর ও ভাইসরয় শুধুমাত্র দেশের ব্যবস্থাপনার জন্যে নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। অপর দিকে বিশ্বজগতের সম্রাটের গভর্ণর ও ভাইসরয় এজন্যে নিযুক্ত হন যে তাঁরা মানুষকে সঠিক সভ্যতা, পুত চরিত্র এবং সত্য জ্ঞান ও কর্মের এমন মূলনীতি শিক্ষা দেন যা আলোক স্তম্ভের ন্যায় মানব জীবনের রাজপথে অবস্থান করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সোজা পথ দেখাতে থাকে। এতদ্ সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া পাওয়া যায়। দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলো গভর্নরের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পন করে যারা হয় নির্ভরযোগ্য। যখন তারা তাদেরকে এ দায়িত্বে নিয়োজিত করে তখন তাদেরকে বলা হয় রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনা কিভাবে এবং কোন পলিসির উপর চলছে। তাদের কাছে সে সব গোপন তথ্যও প্রকাশ করে দেয়া হয় যা সাধারণ প্রজাবৃন্দের জন্যে করা হয়না। খোদার সাম্রাজ্যের অবস্থাও অনুরূপ। সেখানেও পয়গম্বরী বা নবুওতের দায়িত্ব তাঁদের ওপরই আরোপ করা হয়েছে যাঁরা সবচেয়ে বেশী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। তারপর যখন তাঁদেরকে এ পদে নিয়োগ করা হয়, তখন আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং তাঁদেরকে তাঁর সকল সাম্যাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করান। তাদের কাছে সৃষ্টিজগতে সে সব গোপন রহস্য ও তথ্য প্রকাশ করে দেন যা সাধারণ মানুষের জন্যে প্রকাশ করা হয়না। যেমন, হযরত ইবরাহীমকে (আ) আসমান ও যমীনের আভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করিয়ে দেন (সূরা আনয়াম আয়াত ৭৫)। খোদা কিভাবে মৃত্যুকে জীবন দান করেন, তাও তাঁকে দেখিয়ে দেয়া হয় (সূরা বাকারা আয়াত ২৬০)। হযরত মূসাকে (আ) তূর পর্বতে আল্লাহর তাজাল্লী দেখানো হয় (সূরা আ'রাফঃ ১৪৩)। তাঁকে এক বিশিষ্ট বান্দার সাথে কিছুকাল ভ্রমণ করান যাতে করে তিনি দেখতে পান এবং উপলব্ধি করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছায় দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা কিভাবে চলে (সূরা কাহাফঃ ৬০-৮২)। এমন কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা নবী মুহাম্মদ (স) লাভ করেন। কখনো তিনি খোদার নৈকট্য লাভকারী ফেরেশ্তাকে উর্ধলোকে প্রকাশ্যে দেখতে পান (তাকবীরঃ ২৩)। কখনো সে ফেরেশতা তাঁর এতোটা নিকটবর্তী হয়ে যান যে, উভয়ের মধ্যে দুই ধনুক পরিমাণ, বরঞ্চ তার চেয়েও কম দূরত্ব রয়ে যায় (সূরা নজমঃ ৬-৯)। কখনো আবার সেই ফেরেশতাকে তিনি সিদরাতুল মুন্তাহা অর্থাৎ জড় জগতের সর্বশেষ সীমান্তে দেখতে পান এবং সেখানে তিনি খোদার বিরাট ও মহান নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করেন (নজমঃ ১৩-১৮)।

কিন্তু মে'রাজ নিছক পরীক্ষা পর্যবেক্ষন পর্যন্তই সীমিত ছিলনা, বরঞ্চ তার চেয়ে উচ্চতর মর্যাদার এক বস্তু ছিল। তার দৃষ্টান্ত কিছুটা এ ধরনের মনে করুন যে, সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক তাঁর নিয়োগকৃত নিম্নপদস্থ শাসককে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সরাসরি রাজধানীতে

ডেকে নিয়ে কোন বিশেষ কাজের দায়িত্ব অর্পন করছেন। এবং তার জন্যে প্রয়োজনীয় নীতি সম্পর্কীয় নির্দেশাবলীও দিচ্ছেন। ঠিক তেমনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকেও আল্লাহ্‌র দরবারে তলব করা হয়েছিল। কারণ ইসলামী আন্দোলনের মোড় পরিবর্তন ছিল অতি আসন্ন। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁকে বিশেষ পথ নির্দেশনা দানই ইঙ্গিত ছিল।[৪]

মে'রাজের ভ্রমন বৃত্তান্ত

এখন আমরা প্রথমে ঐ সব হাদীসগুলোর সার সংক্ষেপ পেশ করব যাতে মে'রাজের অত্যাশ্চর্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত বয়ান করা হয়েছে। তারপর বলব, মে'রাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করে রসূলুল্লাহ (স) দুনিয়াবাসীকে কোন্ পয়গাম দিয়েছিলেন।

রসূলুল্লাহ্‌র (স) নবুওত প্রাপ্তির পর প্রায় বারো বছর অতিবাহিত হয়েছে। বয়স তাঁর বায়ান্ন বছর। হেরমে কাবায় তিনি শুয়ে ছিলেন। হঠাৎ জিব্রিল ফেরেশ্‌তা এসে তাঁকে জাগিয়ে দেন। আধা-ঘুমন্ত ও আধা-জাগ্রত অবস্থায় তাঁকে তুলে যমযমের নিকটে নিয়ে যান। তাঁর বক্ষ বিদীর্ন করেন। তা যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলেন। তারপর সহনশীলতা প্রজ্ঞা এবং ঈমান ও একীন দিয়ে সে বক্ষ পরিপূর্ণ করে দেন।[১]

তারপর আরোহনের জন্যে জিব্রিল (আ) একটি পশু পেশ করেন। তার রং ছিল সাদা, আকৃতি ছিল গাধা থেকে কিছুটা বড়ো এবং খচ্চর থেকে ছোটো। বিদ্যুৎ বেগে চলছিল। তার এক একটি পদক্ষেপ হচ্ছিল দৃষ্টির শেষ সীমায়। আর এ কারণেই তার নাম ছিল বুরাক।[২] পূর্বে নবীগণও এরূপ ভ্রমণে এধরনের বাহনই ব্যবহার করতেন।[৩] **যখন নবী পাক (স) তার উপর সওয়ার হতে যাচ্ছিলেন তখন সে নড়ে উঠলো। হযরত জিব্রিল (আ) তার গায়ে মৃদু আঘাত করে বলেন, এ দেখ কি করছিস্। আজ পর্যন্ত মুহাম্মদ (স) থেকে কোন মহান ব্যক্তিত্ব তোর উপর সওয়ার হয়নি। এ কথায় লজ্জায় তার গা দিয়ে ঘাম ছুটলো।**[৪]

---

১ বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, ইবনে জারীর, বায়হাকী, হাফেয ইবনে আবি হাতেম, তাবারানী ও বাযযার প্রভৃতিতে হযরত আবু হুরায়রা (রা) ও হযরত মালেক বিন সা'সায়ার বর্ণনা সমূহ। কিছু অন্যান্য বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ইসরার সূচনা হয় হুযুরের চাচাতো ভগ্নি উম্মেহানী (রা) বিন্তে আবি তালিবের বাড়ি থেকে। সেখানে তিনি এশার নামায পড়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। ইবনে জারীর আবু ইয়ালা এবং তাবারানী এ ঘটনা স্বয়ং উম্মেহানী (রা) থেকে এবং বায়হাকী হযরত আলী (রা) বিন আবি তালিব, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাবাকাতে ইবনে সায়াদে ওয়াকেদীর এ বর্ণনা আছে যে, ইসরার সূচনা হয় শিয়াবে আবি তালিব থেকে। বুখারী ও মুসলিমে আবুযর (রা) থেকে এবং মুসনাদে আহমদে হযরত উবাই বিন কায়াব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, বাড়ির ছাদ ফেঁড়ে জিব্রিল (আ) ঘরে প্রবেশ করেন এবং নবীকে নিয়ে যান। প্রকৃত পক্ষে এ সব বর্ণনায় কোন গরমিল নেই। উম্মেহানীর ঘর ছিল শিয়াবে আবি তালিবে। সে ঘরের ছাদ ফেঁড়ে জিব্রিল ঘরে নামেন এবং নিদ্রাবস্থায় নবীকে মসজিদে হারামে নিয়ে যান। তারপর আধা-নিদ্রা ও আধা-জাগ্রত অবস্থায় যা ঘটলো তা উপরে বলা হয়েছে।-গ্রন্থকার

২. বুরাকের এ গুণাবলী সম্পর্কে হাদীসের সকল বর্ণনা সর্বসম্মত -গ্রন্থকার।

৩. ইবনে জরীর বায়হাকী তাঁর দালায়েলে, ইবনে আবি হাতেম; ইবনে ইসহাক, ইবনে মারদুইয়া, নাসায়ী, মাগাযী ইবনে আয়েয এবং সুহায়লী রাওযুল উনুকে লিখেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ) বুরাকে চড়ে হযরত হাজেরা ও দুগ্ধপোষ্য সন্তান হযরত ইসমাইলকে (আ) নিয়ে মক্কায় গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা এ বর্ণনার উৎস বলেননি -গ্রন্থকার।

৪. মুসনাদে আহমদ, তিরমিযি, ইবনে হিব্বান, ইবনে জারীর, ইবনে ইসহাক, ইবনে সা'দ, -(গ্রন্থকার)।

তারপর নবীপাক তার উপর আরোহন করেন এবং জিব্রিল তাঁর সাথে চলেন।[৫] প্রথম মনযিল ছিল মদীনা, যেখানে নেমে নবী (স) নামায পড়েন। জিব্রিল (আ) বলেন, এখানে আপনি হিজরত করে আসবেন। দ্বিতীয় মনযিল ছিল সিনাই পাহাড় যেখানে আল্লাহ্ হযরত মূসার (আ) সাথে কথা বলেন। তৃতীয় মনযিল বায়তুল্লাহাম যেখানে হযরত ঈসা (আ) ভূমিষ্ট হন। চতুর্থ মনযিল ছিল বায়তুল মাকদেস্, যেখানে বুরাকের সফর শেষ হয়।[৬]

বিভিন্ন পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্ঠকারী শক্তি

এ সফরের এক স্থানে একজন চিৎকার করে বলে, এদিকে এসো। নবী (স) সে দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করলেননা। জিব্রিল (আ) বল্লেন, এ ইহুদীবাদের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে। অপর দিক থেকে আওয়াজ এলো-এদিকে এসো। নবী (স) সে দিকেও তাকালেননা। জিব্রিল (আ) বলেন, এ খৃষ্টবাদের আহবায়ক। তারপর অত্যন্ত সাজ সজ্জা ও জাঁক জমক সহ্ একজন রমনী দেখা গেল। সেও হুযুরকে তার দিকে আহ্বান জানালো। তিনি সে দিক থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেন। জিব্রিল (আ) বলেন, এ হচ্ছে দুনিয়া। তারপর এক বৃদ্ধা সামনে পড়লো। জিব্রিল (আ) বলেন, দুনিয়ার অবশিষ্ট বয়স এ বৃদ্ধার অবশিষ্ট বয়স থেকে অনুমান করুন। তারপর আর এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলো, যে নবীকে তার দিকে আকৃষ্ট করতে চাইলো। কিন্তু তাকেও ছেড়ে তিনি সামনে অগ্রসর হলেন। জিব্রিল (আ) বলেন, এ শয়তান ছিল যে, আপনাকে পথ থেকে সরাতে চেয়েছিল।[৭]

বায়তুল মাকদেসে নামাজ

বায়তুল মাকদেসে পৌঁছার পর হুযুর (স) বুরাক থেকে নেমে পড়লেন। সেখানেই বুরাককে বেঁধে রাখা হলো যেখানে অন্যান্য নবীগণ তাকে বাঁধতেন।[৮] যখন তিনি হায়কালে

---

৫. ইবনে জারীর, বায়হাকী, নাসায়ী, ইবনে হাশেম, ইবনে আবি হাতেম, তাবারানী, বায্যার ও ইবনে সা'দের উদ্ধৃত বর্ণনাবলীতে আছে যে জিব্রিল (আ) সব সময়ে এ সফরে নবীর সাথে ছিলেন। তাবারানীতে আবদুর রহমান বিন আবি লায়লার বর্ণনায় আছে যে, জিব্রিল (আ) হুযুরকে বুরাকের উপরে তাঁর সামনে বসিয়ে নিয়েছেন। আবু ইয়ালা এবং ইবনে হিব্বানে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদের (রা) এ বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, জিব্রিল (আ) সামনে বসেন এবং হুযুরকে (স) পেছনে বসিয়ে নেন। তিরমিযি, নাসায়ী এবং মুসনাদে আহ্মদে হযরত হুযায়ফার (রা) এরূপ বর্ণনা আছে যে, হুযুর (স)এবং জিব্রিল (আ) উভয়ে বুরাকের উপরে আরোহন করেন, কিন্তু এ কথা বলা হয়নি যে, কে আগে এবং কে পেছনে ছিলেন- গ্রন্থকার।

৬. নাসায়ীতে আনাস বিন মালেকের (রা) বর্ণনা এবং বায়হাকীতে শাদ্দাদ বিন আওসের (রা) বর্ণনা কিছু ভিন্ন ধরনের। এতে সিনাই পাহাড়ের পরিবর্তে মাদইয়ানের সেই গাছের নিকটে নামায পড়ার উল্লেখ আছে যেখানে হযরত মুসা (আ) দুজন মহিলার পশুকে পানি পান করাবার পর বসে পড়েছিলেন- গ্রন্থকার।

৭. এ ঘটনা গুলোর বিভিন্ন অংশ হাদীস ও সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থাবলীতে সন্নিবেশিত আছে। বায়হাকী (দালায়েল), তাবারানী (আওসাত), ইবনে জাবীর, ইবনে হাতেম, ইবনে ইসহাক, ইবনে মারদুইয়া- (গ্রন্থকার)।

৮. মু'সনাদে আহ্মদ, মুসলিম, ইবনে জারীর, বায়হাকী, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে ইসহাক, ইবনে সা'দ, ইবনে মারদুইয়া। কিছু অন্যান্য বর্ণনায়ও আছে যে, জিব্রিল (আ)একটি পাথর আঙুলের আঘাতে ছিদ্র করেন। সেই ছিদ্রের সাথে বুরাককে বাঁধেন (তিরমিযি, হাতেম, ইবনে আবি হাতেম)।

সুলায়মানীতে (সে সময়ে তা ধ্বংস হলেও তার স্থান বিদ্যমান ছিল এবং কায়সার জাষ্টিনাইন যেখানে একটা গীর্জা বানিয়ে রেখেছিলেন) প্রবেশ করলেন, তখন সে সকল নবীকে তিনি দেখতে পেলেন যাঁরা মানব জন্মের সূচনা কাল থেকে তখন পর্যন্ত দুনিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পৌছার সাথে সাথেই নামাজের কাতার দাঁড়িয়ে যায় এবং সকলে প্রতীক্ষা করতে থাকেন যে, কে ইমামতি করবেন। জিব্রিল (আ) তাঁর হাত ধরে সামনে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর পেছনে সকলে নামাজ আদায় করেন।[৯]

তারপর তাঁর সামনে তিনটি পানপাত্র রাখা হয়। একটিতে পানি, দ্বিতীয়টি দুধ এবং তৃতীয়টিতে শারাব ছিল। তিনি দুধের পাত্র হাতে নিয়ে তা পান করলেন। জিব্রিল (আ) তাঁকে মুবারকবাদ দিয়ে বলেন আপনি প্রকৃতির পথ অবলম্বন করেছেন।[১০]

অতঃপর একটি সিঁড়ি তাঁর সামনে পেশ করা হলো। তাঁর সাহায্যে জিব্রিল (আ) তাঁকে আসমানের দিকে নিয়ে চল্লেন। আরবী ভাষায় সিঁড়িকে মে'রাজ বলে। তদনুযায়ী এ সমগ্র ঘটনাকে মে'রাজ নামে অভিহিত করা হয়।[১১]

প্রথম আসমানে

যখন তাঁরা প্রথম আসমানে উঠেন, তখন আসমানের দরজা বন্ধ ছিল।
দ্বার রক্ষক ফেরেশতা জিজ্ঞেস করেন, কে এসেছে?
হযরত জিব্রিল (আ) আপন নাম বলেন।
ফেরেশতা বলেন, আপনার সাথে কে?
জিব্রিল-মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।
ফেরেশতা-তাঁকে কি ডাকা হয়েছে?
জিব্রিল-জি হাঁ।

---

৯. ইবনে জারীর, বায়হাকী, তাবারানী, নাসায়ী, ইবনে আবি হাতেম, মুসনাদে আহমদ, ইবনে সা'দ।

১০. হযরত সুহাইব (রা) থেকে তাবারানীর, হযরত আনাস (রা) এবং আবু হুরায়রা (রা) থেকে ইবনে জারীর, এবং বিভিন্ন মনীষীদের পক্ষ থেকে ইবনে ইসহাকের বর্ণনা তাই যা আমরা উপরে উদ্দৃত করেছি। কিন্তু এ ব্যাপারে বর্ণনা সমূহের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। ইবনে জারীর, বায়হাকী এবং ইবনে আবি হাতেম হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তাতে দুটি পেয়ালার উল্লেখ আছে। একটিতে পানি এবং দ্বিতীয়টিতে শারাব ছিল। মুসনাদে আহমদ এবং মুসলিমে হযরত আনাসের (রা) বর্ণনা, বোখারীতে হযরত আবু হুরায়রার বর্ণনা এবং বায়হাকীতে হযরত সাঈদ বিন আল-মুসাইয়েবের (রা) বর্ণনায় দুটি পাত্রের উল্লেখ আছে। একটিতে দুধ এবং অপরটিতে শারাব ছিল। বায়হাকী, ইবনে হাতেম, বাযযার এবং তাবারানীতে হযরত শাদ্দাদ বিন আওসের বর্ণনায়ও দুটি পাত্রের কথা আছে। কিন্তু একটিতে দুধ এবং অপরটিতে মধু ছিল। পক্ষান্তরে মুসনাদে আহমদ, বোখারী এবং মুসলিমে হযরত মালেক বিন সা'সায়ার (রা) বর্ণনা হচ্ছে এই যে, সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে অথবা বায়তুল মামুরের নিকটে হুযুর (স) এর সামনে তিনটি পাত্র পেশ করা হয়, যার একটিতে শারাব, দ্বিতীয়টিতে দুধ এবং তৃতীয়টিতে মধু ছিল। কিন্তু সকল বর্ণনা এ ব্যাপারে একমত যে হুযুর (স) দুধের পাত্রই বেছে নেন -গ্রন্থকার।

১১. ইবনে জারীর, বায়হাকী, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে ইসহাক, ইবনে মারদুইয়া আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে নকল করেছেন। কিন্তু ইবনে হাতেম হযরত আনাস (রা) থেকে এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন যে জিব্রিল (আ) হুযুর (স) এর হাত ধরে আসমানের দিকে উঠে যান -(গ্রন্থকার)।

তারপর দরজা খুলে যায় এবং হুযুরকে (স) সাদরে অভ্যর্থনা করা হয়।[১২] এখানে নবী পাকের (স) পরিচয় ফেরেশ্‌তা এবং মানবীয় আত্মার ঐসব বিরাট ব্যক্তিত্বের সাথে হয়, যাঁরা এ স্তরে অবস্থান করছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব এমন এক বুযুর্গের ছিল যা ছিল মানব আকৃতির পূর্ণাংগ নমুনা। মুখমন্ডল ও দেহের গঠনে কোন প্রকার ত্রুটি বা অপূর্ণতা ছিলনা। জিব্রিল (আ) বলেন, ইনি আদম (আ), আপনার আদি পিতা।

এ বুযর্গের ডানে বামে বহু লোক ছিল। তিনি ডান দিকে তাকালে আনন্দিত হতেন, বাম দিকে তাকালে কাঁদতেন। জিজ্ঞেস করা হলো -ব্যাপার কি?

বলা হলো- এ সব আদমের বংশধর। আদম তাঁর নেক বংশধরদের দেখে খুশী হতেন এবং অসৎ লোকদের দেখে কাঁদতেন।[১৩]

তারপর হুযুরকে (স) বিস্তারিত পর্যবেক্ষণের সুযোগ দেয়া হয়। একস্থানে তিনি দেখলেন কিছু লোক ফসল কাটছে। যতোই কাটছে ততোই বেড়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করা হলো- এরা কারা? বলা হলো- এরা খোদার পথে জিহাদকারী।

তারপর দেখা গেল কিছু লোকের মস্তক পাথর মেরে চূর্ণ বিচূর্ন করা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করা হলো-এরা কারা? বলা হলো এরা ঐসব লোক যাদের অনীহা অসন্তোষ নামাযের জন্যে উঠতে দিতনা।

তিনি এমন কিছু লোক দেখলেন যাদের কাপড়ের আগে-পেছনে তালি দেয়া আছে এবং তারা পশুর মতো ঘাস খাচ্ছে। জিজ্ঞেস করা হলো-এরা কারা? বলা হলো-এরা তাদের মাল থেকে যাকাত খয়রাত কিছু দিতনা।

তারপর একজন লোক দেখা গেল, যে কাঠ জমা করে তার বোঝা উঠাবার চেষ্টা করছে। যখন তা উঠাতে পারছিলনা তখন তার সাথে আরও কিছু কাঠ যোগ করছিল। জিজ্ঞেস করা হলো-এ কে? বলা হলো-এ এমন ব্যক্তি যার উপর দায়িত্বের এতো বোঝা ছিল যে, তা বহন করতে পারতোনা। কিন্তু তা কম করার পরিবর্তে আরও দায়িত্বের বোঝা নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিত।

তারপর দেখা গেল কিছু লোকের জিহ্‌বা ও ওষ্ঠ কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করা হলো- এরা কারা? বলা হলো- এরা এমন সব লোক যারা ছিল দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তা এবং মুখে যা আসতো তাই বলতো এবং সমাজে ফেৎনা সৃষ্টি করতো।

তারপর একস্থানে একটা পাথর দেখা গেল, যার মধ্যে সামান্য ফাটল ছিল। তার মধ্য থেকে একটা মোটা সোটা বলদ বেরিয়ে এলো। তারপর সে পুনরায় তার মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিল কিন্তু পারছিলনা। জিজ্ঞেস করা হলো- ব্যাপার কি? বলা হলো- এ হচ্ছে এমন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে দায়িত্বহীনের মতো ফেৎনা সৃষ্টিকারী উক্তি করে। তারপর.

---

১২. মে'রাজ সম্পর্কে এ কথা সর্ব সম্মত যে, প্রত্যেক আসমানে প্রবেশ করার সময়ে জিব্রিলকে (আ) এভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো। আগমনকারী জিব্রিল (আ) এটা নিশ্চিত জানার পর এবং তাঁর সাথে মুহাম্মদ (স) এবং তাকে ডাকা হয়েছে এটা জানার পর দরজা খুলে দেয়া হয়েছে ও হুযুরকে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে- গ্রন্থকার।

১৩. বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ মালেক বিন সা'সায়ার বর্ণনা, বুখারী ও মুসলিম আবুযর (রা) এর বর্ণনা, ইবনে জারির, বায়হাকী, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে ইসহাক আবু সাঈদ খুদরীর (রা) বর্ণনা, ইবনে জারির, বায়হাকী, হাফেয, ইবনে আবি হাতেম, তাবারানী, বাযযার আবু হুরায়রার (রা) বর্ণনা এবং আব্দুল্লাহ্‌ বিন আহমদ হাম্বল যাওয়ায়েদে মুসনাদে উবাই বিন কায়াবের (রা) বর্ণনা নকল করেছেন-গ্রন্থকার।

লজ্জিত হয়ে প্রতিকার করতে চায় কিন্তু পারেনা।

এক স্থানে দেখা গেল কিছু লোক তাদের নিজেদের গোশ্‌ত কেটে কেটে খাচ্ছে। জিজ্ঞেস করা হলো- এরা কারা? বলা হলো- এরা পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ ও কটুক্তি করতো।

তাদের নিকটেই এমন কিছু লোক ছিল যাদের হাতের নখ ছিল তামার তৈরী। তাই দিয়ে তারা তাদের মুখমন্ডল ও বুক আঁচড়াচ্ছিল। এরা কারা জিজ্ঞেস করা হলে বলা হলো- এরা মানুষের অসাক্ষাতে তাদের কুকর্ম প্রচার করে বেড়াতো এবং তাদের সম্মানে আঘাত করতো।

কিছু লোক এমন দেখা গেল, যাদের ওষ্ঠদ্বয় ছিল উটের ওষ্ঠের মতো এবং তারা আগুন ভক্ষণ করছিল। জিজ্ঞেস করা হলো- এসব কারা। বলা হলো- এরা এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করছিল।

কিছু লোক এমন দেখা গেল, যাদের পেট ছিল অসম্ভব রকমের বড়ো এবং তা ছিল বিষাক্ত সাপে পরিপূর্ণ। লোক তাদেরকে দলিত মথিত করে তাদের উপর দিয়ে যাতায়াত করতো কিন্তু তারা আপন স্থান থেকে নড়তে পারতোনা। এরা কারা জিজ্ঞেস করা হলে বলা হলো- এরা ছিল সুদখোর।

তারপর এমন কিছু লোক দেখা গেল, যাদের সামনে একদিকে রাখা ছিল তাজা সুন্দর গোশ্‌ত, অন্যদিকে পঁচা গোশ্‌ত যার থেকে দুর্গন্ধ ঠিকরে বেরুচ্ছিল। তারা ভালো গোশ্‌ত ছেড়ে পঁচা গোশ্‌ত খাচ্ছিল। বলা হলো, এরা ছিল এমন লোক যারা তাদের হালাল স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অবৈধভাবে নিজেদের যৌন বাসনা চরিতার্থ করতো।

তারপর কিছু স্ত্রীলোক এমন দেখা গেল, যারা তাদের স্তনের সাহায্যে লটকে ছিল। জিজ্ঞেস করা হলে বলা হলো- এরা এমন স্ত্রীলোক ছিল, যারা তাদের এমন সব সন্তানকে স্বামীর ঔরসজাত বলতো যারা তাদের ঔরসজাত ছিলনা।[১৪]

এ সব পর্যবেক্ষণকালে নবী (স) এর সাক্ষাৎ এমন এক ফেরেশতার সাথে হয়- যিনি অত্যন্ত কাটখোট্টা মেযাজে মিলিত হন। নবী (স) জিব্রিলকে (আ) জিজ্ঞেস করেন, এতক্ষণ যতো ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হলো সকলে উৎফুল্ল হয়ে ও হাসিমুখে মিলিত হলেন। কিন্তু ইনি এমন শুষ্ক মেযাজের কেন? জিব্রিল (স) বলেন, এর হাসিখুসির কোন কারবার নেই। এ যে দোযখের দারোগা। এ কথা শুনে নবী (স) দোযখ দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে পর্দা উঠিয়ে দেয়া হলো এবং দোযখ তার ভয়ংকর রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলো।[১৫]

---

১৪. এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, এসব পর্যবেক্ষণ বায়তুল মাকদেস যাবার পথে হয়েছিল, না প্রথম আসমানে। উপরন্তু এ সকল পর্যবেক্ষণের উল্লেখ সব বর্ণনায় একত্রে করা হয়নি। বরঞ্চ বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের উল্লেখ বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এখানে আমরা সব বরাত এক স্থানে করে দিচ্ছি। মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজা, ইবনে জারীর, বায়হাকী, ইবনে হাশেম, ইবনে আবি হাতেম, তাবারানী, বাযযার- বর্ণনা আবু হুরায়রা (রা) ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে ইসহাক, ইবনে মারদুইয়া, বর্ণনা আবু সাঈদ খুদরীর (র) মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদ- বর্ণনা আনেস বিন মালেকের (র)- গ্রন্থকার।

১৫. সীরাতে ইবনে হিশাম- বরাত ইবনে ইসহাক ও ইবনে আবি হাতেম। বর্ণনা আনাস বিন মালেকের (রা)- গ্রন্থকার।

পরবর্তী আসমানগুলোতে

এসব স্তর অতিক্রম করে নবী পাক (স) দ্বিতীয় আসমানে পৌছেন। এখানকার মনীষীদের মধ্যে দুজন যুবক ছিলেন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। পরিচয়ে জানা গেল, তাঁরা হলেন হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) এবং হযরত ঈসা (আ)।

তৃতীয় আসমানে এক বুযর্গের পরিচয় দেয়া হলো যাঁর সৌন্দর্য সাধারণ মানুষের তুলনায় তারকারাজির মুকাবিলায় যেন পূর্ণিমার চাঁদ। জানা গেল, ইনি হযরত ইউসুফ (আ)।

চতুর্থ আসমানে হযরত ইদরিস (আ), পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন (আ) এবং ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আ) নবী মুহাম্মদ (স) এর সাথে মিলিত হন। সপ্তম আসমানে পৌছার পর তিনি এক বিরাট প্রাসাদ (বায়তুল মা'মুর) দেখতে পান যেখানে সকল ফেরেশতা যাতায়াত করছিলেন। এখানে তাঁর সাথে এমন এক বুযর্গের সাথে সাক্ষাৎ হয় যিনি স্বয়ং দেখতে অনেকটা তাঁর মতোই ছিলেন। পরিচয়ে জানা গেল তিনি হযরত ইব্রাহীম (আ)।[১৬]

সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা

অতঃপর নবী পাকের (স) অতিরিক্ত উর্ধলোকে যাত্রা শুরু হয় এবং তিনি সিদরাতুল মুন্তাহা পৌছে যান। এ হচ্ছে মহান রাব্বুল ইয্যাতের দরবার এবং জড়জগতের মধ্যবর্তী এক বিভক্তকারী সীমান্তের মর্যাদা ধারণ করে। এখানে সকল সৃষ্টির জ্ঞান শেষ হয় যায়। এরপর যা কিছু আছে তা অদৃশ্য যার জ্ঞান না কোন নবীর আছে আর না কোন নিকটবর্তী ফেরেশতার। অবশ্যি আল্লাহ্ তার থেকে কোন কিছুর জ্ঞান কাউকে দিতে চান তো ভিন্ন কথা। নীচে থেকে যা কিছু যায় তা এখানে নিয়ে নেয়া হয় এবং উপর থেকে যা কিছু আসে তা এখানে গ্রহণ করা হয়। এ স্থানের নিকটে নবীকে বেহেশতের পর্যবেক্ষণ করানো হয়। তিনি দেখেন যে, নেক বান্দাহদের জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা এমন সব নিয়ামতের ব্যবস্থা করে রেখেছেন যা না কোন চোখ দেখেছে, না কোন কান শুনেছে, আর না কোন মন তার ধারণা করতে পেরেছে।[১৭]

সিদ্‌রাতুল মুন্তাহায় জিব্রিল (আ) থেকে যান। তারপর নবী (স) একাকী সামনে অগ্রসর হন। অতঃপর এক উচ্চ অনুকূল সমতল স্থানে মহিমাময়ের দরবার সামনে দেখতে

---

১৬. মুসনাদে আহমদ, বুখারী ও মুসলিম- মালেক বিন সা'সায়ার বর্ণনা। মুসনাদে আহমদ, মুসলিম, ইবনে আবি হাতেম আনাস বিন মালেকের (রা) বর্ণনা। ইবনে জারীর, বায়হাকী, ইবনে আবি হাতেম, তাবারানী, বাযযার, হাকেম, ইবনে ইসহাক- আবু হুরায়রার (রা) বর্ণনা। কোন কোন বর্ণনায় নবীগণের স্থান সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করা হয়েছে। নাসায়ী এবং মুসলিমে হযরত আনাসের (রা) বর্ণনায় চতুর্থ আসমানে হযরত হারুন (আ) এবং পঞ্চম আসমানে হযরত ইদরিসের (আ) স্থান বলা হয়েছে। হযরত আবু সাইদ খুদরীর (রা) বর্ণনা উদ্ধৃত করে ইবনে জারীর, বায়হাকী, ইবনে মারদুইয়া হযরত ইউসুফের (রা) স্থান দ্বিতীয় আসমানে এবং হযরত ইহাহ্ইয়া (আ) ও হযরত ঈসার (আ) স্থান তৃতীয় আসমানে বলেছেন- গ্রন্থকার।

১৭. বুখারী ও মুসলিম- আবুযর (রা) এর বর্ণনা। মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযি ও বায়হাকী- আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদের (রা) বর্ণনা। ইবনে জারীর, বায়হাকী, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে মারদুইয়া- বর্ণনা আবু সাইদ খুদরীর (রা)- গ্রন্থকার।

পান। অতঃপর কথোপকথনের মর্যাদা তাঁকে দান করা হয়।[১৮] যা কিছু এরশাদ করা হয় তার মধ্যে ছিলঃ

১. প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়।

২. সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াত শিক্ষা দেয়া হয়।

৩. শির্ক ব্যতীত অন্য সব গোনাহ্ মাফ করার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়।

৪. এরশাদ হয় যে, যে ব্যক্তি নেক কাজ করার ইচ্ছা করে, তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়। তারপর যখন সে তার উপর আমল করে তখন তার জন্যে দশটি নেকী লেখা হয়। কিন্তু যে অসৎ কাজের ইচ্ছা করে, তার বিরুদ্ধে কিছু লেখা হয়না। তারপর যখন সে তার উপর আমল করে তখন একটি গোনাহ্ লেখা হয়।[১৯]

খোদার দরবারে হাযিরের পর প্রত্যাবর্তনের জন্যে নীচে অবতরণ কালে হযরত মূসা (আ) এর সাথে হুযুরের (স) সাক্ষাৎ হয়। তিনি বিবরণ শুনার পর বলেন, বনী ইসরাইল সম্পর্কে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমার ধারণা আপনার উম্মত পঞ্চাশটি নামাযের পাবন্দী করতে পারবেনা, যার কম করার জন্যে আরজ করুন। তিনি ফিরে গেলে আল্লাহ জাল্লা শানুহু (মহিমান্বিত আল্লাহ) দশ নামায কম করে দেন।

হযরত মূসা (আ) পুনরায় সে কথাই বলেন। তারপর নবী মুহাম্মদ (স) বার বার উপরে যান এবং দশ দশটি করে নামায কম হতে থাকে। অবশেষে পাঁচ নামায ফরয করা হয় এবং বলা হয় এ পঞ্চাশ নামাযের সমান।[২০]

প্রত্যাবর্তন

ফেরার পথে হুযুর (স) সেই সিঁড়ি বেয়ে বায়তুল মাকদেস এসে পড়েন। এখানে পুনরায় সকল নবী হাযির ছিলেন। তিনি তাঁদেরকে নামায পড়িয়ে দেন এবং সম্ভবতঃ তা ছিল ফজর নামায। তারপর বুরাকে আরোহণ করে মক্কায় ফিরে আসেন (আল বেদায়া ওয়ান্নেহায়া- তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ১১২-১৩)।

ভোরে সকলের আগে এ ঘটনার বিবরণ তিনি তাঁর চাচাতো ভগ্নি উম্মে হানীকে (রা) শুনিয়ে দেন। তারপর বাইরে বেরুতে চান। কিন্তু তিনি (উম্মে হানী) তাঁর চাদর টেনে ধরে বলেন, আল্লাহর ওয়াস্তে এ ঘটনা কারো কাছে বলবেননা। নতুবা আপনাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ

---

১৮ ইবনে হাতেম, বর্ণনা আনেস বিন মালেকের (রা)। বুখারী- কিতাবুস সালাত- বর্ণনা ইবনে আব্বাস (রা) এবং আবু হাব্বা আনাসারীর। কাস্তাল্লানী তাঁর মাওয়াহেবে বরাত ছাড়াই বলেছেন যে, হুযুর (স) বলেছেন, জিব্রিল যখন তাঁর স্থানে পৌঁছলেন, তখন বললেন, "এখন সামনে আপনার এবং আপনার ররে ব্যাপার। এই আমার স্থান যার আগে আমি আর যেতে পারিনা।"

১৯. প্রথমতঃ পঞ্চাশ নামায ফরয হওয়ার কথা মে'রাজের ব্যাপারে সকল হাদীসের সর্বসম্মত বর্ণনা। অন্যান্য বিষয়গুলো নিম্নের হাদীস গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত আছেঃ
মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযি, বায়হাকী- রেওয়ায়াত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদের (রা) মুসনাদে আহমদ ও মুসলিম- আনেস নি মালেকের (রা) বর্ণনা। ইবনে জারীর বায়হাকী, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে মারদুইয়া- বর্ণনা আবু সাঈদ খুদরীর (রা) -গ্রন্থকার।

২০. এ কথাটি সকল হাদীসে সর্বসম্মত যে, হযরত মূসার (আ) কথায় হুযুর (স) বার বার আল্লাহর দরবারে গিয়ে কম করার আরজ করেন এবং সর্বশেষে পাঁচ নামায ফরয রয়ে যায়। একে আল্লাহ পঞ্চাশের সমান গণ্য করেন। অবশ্যি অধিকাংশ বর্ণনায় প্রত্যেকবার দশ কম করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বর্ণনায় কিছু কম করার এবং কোন কোন বর্ণনায় পাঁচটি করে কম করার উল্লেখ আছে- গ্রন্থকার।

করার আর একটা হেতু তারা পেয়ে যাবে। কিন্তু হুযুর (স) 'আমি অবশ্যই বলবো'- এ কথা বলে বাইরে বেরিয়ে গেলেন (তাবারানী ইবনে ইসহাক, ইবনে সাদ, আবু ইয়ালা উম্মেহানীর (রা) বরাত দিয়ে এ কথা বর্ণনা করেছেন)।

হেরমে কাবায় পৌঁছার পর হুযুর (স) আবু জেহেলকে সামনে দেখতে পান। সে বলে, কোন নতুন খবর আছে কি? হুযুর (স) বলেন, হাঁ আছে বৈকি। আবু জেহেল বলে, বল দেখি তা কি?

হুযুর (স) বলেন, আজ রাতে আমি বায়তুল মাকদেস গিয়েছিলাম। আবু জেহেল বলে, বায়তুল মাকদেস? রাতারাতিই ঘুরে এলে? আর সকাল বেলা এখানে হাযির?

হুযুর (স) বলেন, হাঁ তাই।

আবু জেহেল বলে- তাহলে লোকজন জমা করবো? সকলের সামনে এ কথা বলবে তো?

হুযুর (স) বলেন, অবশ্যই।

আবু জেহেল চিৎকার করে করে সবাইকে জমা করলো এবং হযুর (স) কে বল্লো, এখন তুমি বল।

হুযুর (স) সকলের সামনে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেন। লোকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা শুরু করল। কেউ হাত তালি দিচ্ছিল, কেউ অবাক বিস্ময়ে মাথায় হাত রাখছিল। বলছিল, দু'মাসের সফর এক রাতে? অসম্ভব, একেবারে অবাস্তব। আগেতো আমাদের সন্দেহ ছিল কিন্তু এখন দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে তুমি পাগলই বটে- (মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী, বায়হাকী, বাযযার, তাবারানী ইবনে আব্বাসের (রা) বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন। ইবনে জারীর, বায়হাকী, ইবনে আবি হাতেম- বর্ণনা আবু সাঈদ খুদরীর (রা)।

হযরত সিদ্দীকের (রা) সত্যতা স্বীকার

মুহূর্তের মধ্যে সংবাদটি গোটা মক্কায় ছড়িয়ে পড়ে। কিছু মুসলমান একথা শুনে ইসলাম থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। (মুসনাদে আহমদ, বুখারী, তিরমিযি, বায়হাকী, জাবের বিন আবদুল্লাহর (রা) বর্ণনা। মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী- বর্ণনা ইবনে আব্বাসের (রা)। বায়হাকী- বর্ণনা হযরত আয়েশার (রা)।

তারপর লোক এ আশায় হযরত আবু বকরের (রা) নিকটে গেল যে, তিনি ছিলেন নবী মুহাম্মদ (স) এর দক্ষিণ হস্ত। তিনি যদি নবী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, তাহলে এ আন্দোলনের মৃত্যু ঘটবে। হযরত আবু বকর (রা) এ ঘটনা শুনার পর বলেন, যদি মুহাম্মদ (স) এ কথা বলে থাকেন, তাহলে তা অবশ্যই সত্য হবে। এতে আশ্চর্যের কি আছে? আমি তো প্রতিদিন শুনি যে, তাঁর কাছে আসমান থেকে পয়গাম আসে। তার সত্যতাও আমি

মুষ্টিমেয় পাশ্চত্যমনা বিশেষ করে হাদীস অস্বীকারকারী এ বর্ণনায় আপত্তি উত্থাপন করে বলে যে, পাঁচটি নামাযই যদি খোদার ফরয করার ইচ্ছা ছিল তাহলে পঞ্চাশ থেকে কথা শুরু করে ক্রমশঃ দর কষাকষির কি অর্থ হয়? তার জবা এই যে, আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রতি এ বিষয় সুস্পষ্ট করে দেন যে তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার জন্যে মানুষের এতোটা এবাদতকারী হওয়া উচিত যে, যদি দৈনিক পঞ্চাশ বার নামায আদায় করে তাহলে তা এমন কিছু বেশী নয়। কিন্তু মানবীয় দুর্বলতা ও স্বভাব সামনে রেখে এ সুবিধা দান করা হয়। তারপর হুযুর (স) হযরত মূসার (আ) পরামর্শে বার বার কম করার যে আবেদন করেন এবং আবেদন মঞ্জুর করা হয় তাতে হুযুরের (স) মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। এ ঘটনাটি আখেরাতে হুযুর (স) এবং অন্যান্য নবীগণের পক্ষ থেকে শাফায়াতের একটি প্রমাণ - গ্রন্থকার।

স্বীকার করি (ইবনে জারীর, বায়হাকী- বর্ণনা আবু সালমা বিন আবদুর রহমানের। ইবনে আবি হাতেম- বর্ণনা আনেস বিন মালেকের। বায়হাকী- বর্ণনা হযরত আয়েশার (রা)।

তারপর হযরত আবু বকর (রা) হেরমে কাবায় আসেন যেখানে রসূলুল্লাহ (স) বিদ্যমান ছিলেন এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপকারী জনতাও। তিনি হুযুর (স) কে জিজ্ঞেস করেন, সত্যিই কি আপনি এ সব কথা বলেছেন?

হুযুর (স) বলেন, হাঁ বলেছি।

হযরত আবু বকর (রা) - বায়তুল মাকদেস আমার দেখা আছে। আপনি সেখানকার চিত্র বয়ান করুন।

হুযুর (স) সাথে সাথে তার চিত্র বয়ান করা শুরু করলেন। এক একটি জিনিস এমনভাবে বয়ান করেন যেন বায়তুল মাকদেস তাঁর সামনে রয়েছে এবং তা দেখে দেখে অবস্থা বর্ণনা করছেন। হযরত আবু বকরের (রা) এ ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বনে অস্বীকারকারীদের মনে চরম আঘাত লাগে।[২১]

আরও সাক্ষী

সমাবেশে এমন অনেক ছিল যারা ব্যবসার উদ্দেশ্যে বায়তুল মাকদেস যাতায়াত করতো। তারা মনে মনে বলছিল যে, তিনি সঠিক চিত্রই বয়ান করেছেন। এখন এ বয়ানের সত্যতার জন্যে লোক আরও প্রমাণ দাবী করতে থাকে।

হুযুর (স) বলেন, যাবার সময় আমি অমুক কাফেলা অতিক্রম করে যাই, যাদের সাথে এই এই জিনিসপত্র ছিল। কাফেলা ওয়ালাদের উট বুরাক দেখে ভয়ে ভড়কে গেল। একটি তো অমুক উপত্যকার দিকে দৌড়ে পালিয়ে গেল। কাফেলাওয়ালাকে বলে দিলাম সে কোথায় আছে।

ফিরবার সময় ওমুক গোত্রের অমুক কাফেলার সাথে অমুক প্রান্তরে আমার সাক্ষাৎ হয়। তারা সব ঘুমিয়ে ছিল। আমি তাদের পাত্র থেকে পানি পান করি এবং পানি পান করার চিহ্নও রেখে যাই।

হুযুর (স) এ ধরনের আরও কিছু ঘটনা তুলে ধরেন। পরে আগত কাফেলাওয়ালাদের নিকটে তার সত্যতার স্বীকৃতি লাভ করা হয় (ইবনে আবি হাতেম আনাস বিন মালেকের (রা) বরাত দিয়ে বলেন, বায়হাকী, ইনে আবি হাতেম, বায্যার, তাবারানী শাদ্দাদ বিন আওসের বরাত দিয়ে বলেন এবং ত্বারানী ও আবু ইয়ালা উম্মে হানীর (রা) বর্ণনা নকল করেন)।

এভাবে প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তারা মনে মনে ভাবতে থাকে যে,

---

২১. হাফেজ ইবনে কাসীর আল বেদায়া এবং আন্নেহায়ায় বলেন যে, বায়তুল মাকদেসের বিবরণ আবু বকর (রা) মুশরিকদের সামনে এজন্য দিতে বলেন যে, তিনি যদি সঠিকভাবে তা বর্ণনা করতে পারেন তাহলে মুশরিকদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আবু ইয়ালা উম্মেহানী (রা) থেকে একটি বর্ণনা নকল করেছেন যে, বায়তুল মাকদেসের বিবরণ জিজ্ঞেস করেছিল মুতয়েম বিন আদী। ইবনে জারীর এবং ইবনে আবি হাতেম আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে এ বর্ণনা নকল করেছেন যে, জনতার মধ্যে এ কথা যে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল সে হুযুরকে মিথ্যা মনে করছিল। মুসলিম হযরত আবু হুরায়রার (রা) এ বর্ণনা আছে যে, লোকজন হুযুরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। এ প্রশ্ন করার আসল কারণ এই ছিল যে, তাদের জানা ছিল জীবনে হুযুর (স) কখনো বায়তুল মাকদেস দেখেননি। তার জন্যে এর বিবরণ দেয়া

কিভাবে এটা হতে পারে। আজও অনেক লোকের মনে এ প্রশ্ন যে তা কিভাবে সম্ভব হলো।[৫]

হুযুরকে (স) পাঁচ ওয়াক্ত নামায শিক্ষাদান

যে রাতে মে'রাজ অনুষ্ঠিত হয় তারপর দু'দিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে জিব্রিল (আ) প্রত্যেক নামাযের সময় একথা বলার জন্যে আসতে থাকেন যে, যে পাঁচ নামায ফরয করা হয়েছে তা আদায়ের সময়টা কি। তিনি একটি নামায রসূলুল্লাহ (স) কে প্রথম দিন প্রথম ওয়াক্তে পড়িয়ে দেন এবং দ্বিতীয় দিন শেষ ওয়াক্তে। নামাযে তিনি ইমামতি করেন। অতঃপর বলেন, প্রত্যেক নামাযের সময় এ দু'সময়ের মধ্যে। এ বর্ণনা ইমাম আহমদ নাসায়ী, তিরমিযি, ইনে হিব্বান এবং হাকেম হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে নকল করেন। ইমাম বুখারী একে নামাযের সময়ের ব্যাপারে সবচেয়ে সঠিক বলে গণ্য করেন। ইমাম আহমদ, তিরমিযি, আবু দাউদ ইবনে খুযায়মা, দারকুত্নী, হাকেম ও আবদুর রায্যাক এ বিষয়ে বর্ণনা কিছুটা পার্থক্য সহ্ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) থেকে নকল করেছেন। আর এটাকে ইবনে আবদুল বার, কাযী আবু বকর বিন আল-আরাবী সঠিক বলে গণ্য করেছেন।

ইমাম যুহরী বলেন, হযরত ওমর বিন আবদুল আযীযের (রহ) সামনে যখন ওরওয়া বিন যুবাইর, একথা বলেন যে, রসূলুল্লাহকে (স) হযরত জিব্রিল (আ) তাঁর ইমামতিতে নামায পড়ান, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলেন, ওরওয়া, একবার চিন্তা করে দেখত, তুমি কি বলছ? অর্থাৎ হুযুরের (স) ইমামতি জিব্রিল (আ) করেছিলেন?

ওরওয়া বলেন, আমি একথা বাশির বিন আবি মাসউদ থেকে শুনেছি। তিনি আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে শুনেছেন বলে বলেন। তিনি (মাসউদ আনসারী) বলেছেন, আমি স্বয়ং রসূলুলাহকে (স) একথা বলতে শুনেছি, জিব্রিল নাযিল হলেন এবং তিনি আমার ইমামতি করলেন। আমি তাঁর সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লাম (মুয়াত্তা, বুখারী, মুসলিম, আবদুর রায্যাক, তাবারানী)।[৬]

মে'রাজের পয়গাম

মে'রাজের সফর থেকে প্রত্যার্তনের পর আল্লাহর পক্ষ থেকে যে পয়গাম রসূলুল্লাহ (স) দুনিয়াবাসীকে দেন তা কুরআন মজিদের সপ্তদশ সূরা বনী ইসরাইলের আয়াত ২ থেকে ৩৯ পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষিত আছে। তা যদি দেখা যায় এবং তার ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি যদি দৃষ্টি দেয়া যায় তাহলে জানা যাবে যে, এ হেদায়াত হিজরতের এক বছর পূর্বে দেয়া হয়েছিল। পাঠক পরিষ্কার বুঝতে পারবেন যে, ইসলামের মূলনীতির উপর একটি নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের পূর্বেই সে হেদায়েত দেয়া হয়েছিল যার ভিত্তিতে নবী (স) ও সাহাবায়ে কেরামকে পরবর্তীতে কাজ করতে হয়েছিল।

মুস্কিল ছিল বিশেষ করে তিনি রাতের বেলায় তা দেখেছিলেন। তাই আল্লাহ্ তায়ালা তাদের জিজ্ঞাসাবাদের সময় বায়তুল মাকদেসকে তাঁর দৃষ্টির সামনে তুলে ধরেন এবং তা দেখে দেখে তিনি তাঁদের এক একটি প্রশ্নের জাব দিচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে মানতে হলো যে, সেখানকার যে চিত্র তিনি বর্ণনা করেন তা একেবারে সত্য। বোখারী, মুসলিম মুসনাদে আহমদ ইবনে জারীর, তিরমিযি ও বায়হাকী- বর্ণনা জাবের বিন আবদুল্লাহর (রা)। মুসলিম ও ইবনে সা'দ- বর্ণনা আবু হুরায়রার (রা)। বায়হাকী ইবনে আবি হাতেম, বায্যার, তাবারানী- বর্ণনা ইবনে আব্বাসের (রা) - গ্রন্থকার।

বনী ইসরাইলের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ

এ পয়গামে মে'রাজের উল্লেখ করার পর সকলের আগে বনী ইসরাইলের ইতিহাস থেকে শিক্ষাদান করা হয়। মিসরীয়দের গোলামি থেকে মুক্ত হওয়ার পর বনী ইসরাইল যখন স্বাধীন জীবন যাপন করতে থাকে তখন খোদাওন্দ আলম তাদের পথ নির্দেশনার জন্য কিতাব দান করেন। সেই সাথে এ তাকীদ করে দেয়া হয়- আমি ছাড়া এখন নিজেদের কাজকর্মের ব্যাপারে আর কারো পথ নির্দেশনার উপর যেন ভরসা না কর।

কিন্তু বনী ইসরাইল খোদার এ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে তার প্রতি অস্বীকৃতি জানায় এবং তারা পৃথিবীতে সংস্কার ধর্মী হওয়ার পরিবর্তে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী ও বিদ্রোহী হয়ে রইলো। পরিণাম এই হলো যে, খোদা একবার তাদের বেবিলনীয়দের দ্বারা নির্মূল করেন এবং দ্বিতীয় বার রোমীয়দেরকে তাদের শাসক বানিয়ে দেন। এ শিক্ষনীয় ইতিহাসের উল্লেখ করে আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানদেরকে সাবধান করে দেন যে, একমাত্র কুরআনই এমন এক গ্রন্থ যা তোমাদেরকে সঠিক পথ বাতলিয়ে দেবে। এটা যদি অনুসরণ করে চল তাহলে তোমাদের জন্যে বিরাট পুরস্কারের সুসংবাদ রয়েছে।

প্রত্যেক ব্যক্তি দায়িত্বশীল

দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তাহলো এই যে, প্রত্যেক মানুষ স্বয়ং এক স্থায়ী নৈতিক দায়িত্বের অধিকারী। তার নিজের ক্রিয়াকর্ম তার স্বপক্ষে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী। সোজা পথে চল্লে তার নিজেরই মংগল। ভুল পথে চল্লে নিজেকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। এ ব্যক্তিগত দায়িত্বে কেউ কারো অংশীদার নয়। একের দায়িত্বের বোঝা অপরকে বহন করতে হবেনা। অতএব একটি সৎ সমাজের প্রতিটি মানুষের আপন আপন দায়িত্বের প্রতি বিশেষ নজর রাখা উচিত। অন্য লোক যা কিছুই করুক, তার প্রথমে এ চিন্তাই করা উচিত যে, সে নিজে কি করছে।

বড়ো লোকদের অধঃপতন

তৃতীয় যে বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে তাহলো এই যে, একটি সমাজকে অবশেষে যে জিনিস ধ্বংস করে তা বড়ো লোকদের, প্রভাব প্রতিপত্তিশীলদের অধঃপতন। যখন কোন জাতির ভাগ্য বিপর্যয় অপরিহার্য হয়, তখন তার স্বচ্ছল ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিগণ পাপাচারে লিপ্ত হয়। তারা অন্যায় অত্যাচার, অবিচার, পাপাচার ও দুষ্কর্ম করা শুরু করে। অবশেষে এ ফেৎনা গোটা জাতিকে ধ্বংসের অতল তলে নিমজ্জিত করে। অতএব যে সমাজ নিজেই নিজের দুশমন হতে না চায়, তার এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা থাকা উচিত, যাতে করে সে সমাজে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও আর্থিক ধন সম্পদের চাবিকাঠি যেন চরিত্রহীন লোকের হাতে না যায়।

দুনিয়ার সাথে আখেরাতের গুরুত্ব

তারপর মুসলমানদেরকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, যার পুনরাবৃত্তি বারবার কুরআনে করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমাদের লক্ষ্য যদি দুনিয়া এবং তার সাফল্য ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হয়, তাহলে সে সব কিছু তোমরা এখানে লাভ করতে পার। কিন্তু তার শেষ পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। স্থায়ী ও চিরন্তন সাফল্য যা এ জীবন থেকে শুরু করে পরবর্তী জীবন পর্যন্ত কোথাও ব্যর্থতার গ্লানি বহন করেনা তা তোমরা একমাত্র সে অবস্থায়

লাভ করতে পার যখন তোমরা তোমাদের চেষ্টা চরিত্রে আখেরাত ও তার জবাবদিহির অনুভূতিকে সামনে রাখ। দুনিয়া পুজারীদের স্বাচ্ছল্য প্রকাশ্যতঃ সৃজনশীল বলে মনে হয়। কিন্তু তার এ সৃজনশীলতার মধ্যে অনিষ্ট অনাচারের বীজ লুকায়িত থাকে। সে চরিত্রের সে মহত্ত্ব থেকে বঞ্চিত থাকে যা শুধুমাত্র আখেরাতে জবাবদিহির অনুভূতি থেকে সৃষ্টি হয়। এ পার্থক্য তোমরা দুনিয়াতেই উভয় প্রকারের মানুষের মধ্যে দেখতে পাও। এ পার্থক্য জীবনের পরবর্তী স্তরগুলোতে আরও অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। অবশেষে একজনের জীবন একেবারে ব্যর্থকাম এবং অন্য জনের জীবন পরিপূর্ণ সাফল্যমন্ডিত হবে।

ইসলামী তামাদ্দুনের বুনিয়াদী মূলনীতি

ভূমিকা স্বরূপ এ সব উপদেশ দানের পর সে সব গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে যার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ গঠিত হওয়ার কথা। এ মূলনীতি চৌদ্দটি। আমরা সেগুলো সেই ক্রমানুসারেই পেশ করছি যেভাবে তা মে'রাজের এ পয়গামে বর্ণনা করা হয়েছে।

১. এক ও লা শরীক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন শক্তি ও সত্তার প্রভুত্ব কর্তৃত্ব স্বীকার করা যাবেনা। তিনি তোমাদের মা'বুদ এবং দাসত্ব আনুগত্য একমাত্র তাঁরই কর। আর হুকুম পালন করে চলাই তোমাদের স্বাতন্ত্র স্বকীয়তার পরিচায়ক। তিনি ব্যতীত যদি অন্য কারো প্রভুত্ব কর্তৃত্ব তোমরা মেনে নাও, তা সে অন্য কেউ হোক, বা তোমাদের প্রবৃত্তি, তাহলে অবশেষে তোমরা চরম লাঞ্ছনার শিকার হয়ে পড়বে এবং ঐ সব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে যা খোদার সাহায্যেই শুধু লাভ করা যেতে পারে।[১]

২. মানবীয় অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারযোগ্য অধিকার মাতাপিতার। সন্তানগণকে মাতাপিতার অনুগত, খেদমতগুজার ও শিষ্টাচারী হতে হবে। সমাজের সামাজিক নীতি নৈতিকতা এমন হওয়া উচিত যাতে সন্তান সন্ততি মাতাপিতার মুখাপেক্ষীহীন ও অবাধ্য না হয় বরঞ্চ তাদের প্রতি অত্যন্ত সদাচারী হয়। তারা তাদের সম্মান শ্রদ্ধা করবে এবং তাদের বার্ধক্যে সেবা-শুশ্রুষা করবে ও সকল প্রয়োজন পূরণ করবে যেমন তাদের শৈশকালে মাতাপিতা করেছে।[২]

৩. সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠায় প্রাণশক্তি যেন বলবৎ থাকে। প্রত্যেক আত্মীয় তার আত্মীয়ের যেন সাহায্যকারী হয়। প্রত্যেকে যেন অন্যের সাহায্য লাভের অধিকারী হয়। কোন মুসাফির কোন পল্লী বা জনপদে গিয়ে পৌঁছলে সে যেন নিজেকে অতিথিপরায়ন লোকদের মধ্যে দেখতে পায়। সমাজে অধিকার (হক) সম্পর্কে ধারণা যেন এতো তীব্র ও ব্যাপক হয় যাতে একটি মানুষ যাদের

---

১. এ শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসই ছিলনা বরঞ্চ যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা নবী (স) মদীনা গিয়ে কায়েম করেছিলেন তার বুনিয়াদী মূলনীতি ছিল। তার গোটা প্রাসাদ এ দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্মাণ করা হয় যে খোদাওন্দ আলমই দেশের মালিক ও বাদশাহ এবং তাঁর শরিয়তই দেশের আইন- গ্রন্থকার।

২. এ দফার দৃষ্টিতে এটা স্থিরীকৃত হয় যে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি পরিবারের উপর স্থাপিত হবে এবং পারিবারিক ব্যবস্থার মেরুদন্ড হলো পিতামাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা। পরবর্তীকালে এ দফা অনুযায়ী মাতাপিতার সে শরিয়ত সম্মত অধিকার নির্ধারিত করা হয় যার বিস্তারিত বিবরণ আমরা হাদীস ও ফেকার গ্রন্থাবলীতে দেখতে পাই। উপরন্তু ইসলামী সমাজের মানসিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণে এবং মুসলমানদের সভ্যতার শিষ্টাচারে এমন সব চিন্তাধারণা ও আচরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা খোদা ও

মধ্যে বসবাস করে তাদের অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থাকে। তাদের কোন খেদমত করলে মনে করবে যে, তার হক আদায় করছে, অনুগ্রহ করছেনা। খেদমত করার ব্যক্তি না থাকলে বিনীতভাবে অক্ষমতা প্রকাশ করবে এবং খোদার করুণা ভিখারী হবে যাতে সে অপরের কাজে লাগতে পারে।[৩]

৪. লোকে তাদের ধন সম্পদ যেন ভুল পদ্ধতিতে অপচয় না করে। গর্ব প্রকাশের ও লোক দেখানোর জন্য বিলাসিতা ও পাপ কাজের জন্য ব্যয় করা এবং মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন ও মংগলজনক কাজের পরিবর্তে সম্পদ ভ্রান্ত পথে ব্যয় করার অর্থ খোদার নিয়ামতের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন। যারা এভাবে তাদের সম্পদ ব্যয় করে তারা প্রকৃত পক্ষে শয়তানের ভাই এবং এ ধরনের সম্পদের অপচয়কে নৈতিক প্রশিক্ষণ ও আইনানুগ বিধিনিষেধের মাধ্যমে বন্ধ করে দেয়া একটা সংস্কার ধর্মী সমাজের অপরিহার্য কর্তব্য।

৫. মানুষের মধ্যে এতোখানি ভারসাম্য থাকা উচিত যাতে তারা কার্পণ্য করে সম্পদ পুঞ্জিভূত করে না রাখে এবং বাহুল্য খরচ করে নিজের আর্থিক শক্তি বিনষ্ট না করে। সমাজের লোকদের মধ্যে ভারসাম্যের এমন এক সঠিক অনুভূতি থাকতে হবে যেন তারা একদিকে ন্যায় সংগত ব্যয় করা থেকে বিরত না থাকে এবং অপরদিকে অন্যায় পথে ব্যয় করার পাপে লিপ্ত না হয়।[৪]

৬. খোদা তাঁর রিযিক বন্টনের যে ব্যবস্থাপনা কায়েম করে রেখেছেন, মানুষ যেন কৃত্রিম উপায়ে তাতে হস্তক্ষেপ না করে। তিনি তাঁর সকল বান্দাহকে রিযিকের দিক দিয়ে সমান করে রাখেননি, বরঞ্চ তাদের মধ্যে কম ও বেশীর পার্থক্য রেখেছেন। তার মধ্যে অনেক তাৎপর্য রয়েছে এবং তিনি স্বয়ং তা ভালো জানেন।

রসূলের পরে মা বাপকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। এ সব বিষয় সর্বকালের জন্য এ মূলনীতি নির্ধারিত করে দেয় যে, ইসলামী রাষ্ট্র তার আইন প্রশাসনিক নির্দেশের মাধ্যমে পরিবারকে দুর্বল করার পরিবর্তে সুদৃঢ় ও সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা করবে -গ্রন্থকার।

৩. এ দফার ভিত্তিতে- মদীনার সমাজে ওয়াজেব সদকা এবং নফল সদকার নির্দেশ দেয়া হয়। এতিমদের অসিয়ত এবং ওয়াকফের পদ্ধতি নির্ধারিত করা হয়। এতিমদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। একটি বস্তিতে মুসাফিরের এ অধিকার কায়েম করা হয় যে, কম পক্ষে তিন দিন পর্যন্ত তার মেহমানদারী করতে হবে। তারপর নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে গোটা সমাজে উদারতা সহানুভূতি ও সাহায্য সহযোগিতায় এমন প্রাণশক্তি সৃষ্টি করা হয় যে, লোকের মধ্যে আইনগত অধিকার ছাড়াও নৈতিক অধিকারের এক ব্যাপক ধারণা সৃষ্টি হয়। তার ভিত্তিতে লোক স্বয়ং একে অপরের এ ধরনের অধিকার অবগত হতে লাগলো এবং তা আদায় করা শুরু করলো যা আইনের বলে না চাওয়া যেতে পারে, আর না তা আদায় করিয়ে দেয়া যেতে পারে -গ্রন্থকার।

৪. মদীনার সমাজে এ উভয় দফার ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। একদিকে ব্যয়বহুল ও বিলাসিতার বহু উপায় পদ্ধতি আইনত হারাম করে দেয়া হয়েছে এং অন্যদিকে পরোক্ষভাবে আইনের সাহায্যে সম্পদের অন্যায় অসংগত ব্যয়ের পথ রুদ্ধ করা হয়েছে। আর এক দিক দিয়ে সরকারকে এ এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল যে, ব্যয় বাহুল্যের লক্ষণীয় কর্মকান্ড প্রশাসনিক নির্দেশের দ্বারা বন্ধ করে দেয়া হবে। যারা তাদের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যয় করতে থাকবে তাদের বিষয় সম্পত্তি সাধারণভাবে সরকার নিজের ব্যবস্থাপনায় নিয়ে নেবে। এসব পদক্ষেপ ছাড়াও সমাজের মধ্যে এমন এক জনমত সৃষ্টি করা হয় যে, ব্যয় বাহুল্যের প্রশংসা করার পরিবর্তে নিন্দা করা হয়। তারপর নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মন মানসিকতার সংশোধনও করা হয় যাতে অন্যায় ও ন্যায়সংগত ব্যয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে এবং স্বয়ং এর থেকে বিরত থাকে। এমনিভাবে কৃপণতাও আইনের সাহায্যে যতোটা সম্ভব বন্ধ করা হয়। অন্যায় সংস্কারমূলক কাজ জনমতের চাপে এবং নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

অতএব একটি সঠিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাই যা খোদার নির্ধারিত এ পন্থার নিকটতর হবে। প্রাকৃতিক অসাম্যকে একটি কৃত্রিম সাম্যে পরিবর্তিত করা অথবা অসাম্যকে প্রকৃতির সীমারেখা থেকে বর্ধিত করে বেইনসাফীর সীমা পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়া উভয়ই একই ধরনের ভুল।[১]

৭. সন্তান সন্ততি বেড়ে গেলে জীবন জীবিকার পথ সংকীর্ণ হয়ে যাবে এ আশংকায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ মারাত্মক ভুল। এ আশংকায় যারা ভবিষ্যৎ বংশ ধ্বংস করে তথা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে তারা এ ভুল ধারণায় লিপ্ত যে রিযিকের ব্যস্থাপনা তাদের হাতে। অথচ রিযিক দাতা সেই খোদা যিনি মানুষকে এ পৃথিবীতে বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। পূর্ববর্তীদের রিযিকের ব্যবস্থাপনা তিনিই করেছেন এবং পরবর্তীদের রিযিকের ব্যবস্থাপনাও তিনিই করবেন। জনসংখ্যা যতোই বর্ধিত হয়, খোদা সেই অনুপাতে জীবন জীবিকার উপায় উপকরণও প্রসারিত করে দেন। অতএব খোদা তাঁর সৃষ্টির জন্য যে ব্যবস্থাপনা করে রেখেছেন তাতে কেউ যেন অন্যায় হস্তক্ষেপ না করে এবং কোন অবস্থাতেই যেন তাদের মধ্যে বংশ হত্যার প্রবণতা সৃষ্টি হতে না পারে।[২]

৮. ব্যভিচারের মাধ্যমে নারী-পুরুষের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। এ শুধু বন্ধ হওয়াই যথেষ্ট নয় বরঞ্চ যে সব উপায় উপকরণ মানুষকে ব্যভিচারের নিকটবর্তী করে দেয় সে সবেরও মূলোৎপাটন করা উচিত।[৩]

৯. আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের জীবনকে সম্মান ও মর্যাদার যোগ্য বলে গণ্য করেছেন।

---

১. এ দফার মধ্যে প্রকৃতির বিধানের যে মূলনীতির দিকে পথ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তার কারণে মদীনার সংস্কারমূলক কর্মসূচীতে এ চিন্তাধারণা কোন স্থানই পায়নি যে, জীবিকা এবং জীবিকার উপায় উপকরণে বৈষম্য পার্থক্য এং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকৃতিগতভাবে কোন অবিচার এং সুবিচার কায়েম করার জন্যে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য মিটিয়ে দেয়া এবং একটি শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করার চেষ্টা করা উচিত। ঠিক তার বিপরীত মদীনায় মানবীয় তামাদ্দুনকে সৎ বুনিয়াদের উপর কায়েম করার জন্যে যে কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল তা এই যে, আল্লাহর ফিতরাত মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য সৃষ্টি করে রেখেছে তাকে অবিকল প্রাকৃতিক অবস্থায় রেখে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দফা অনুযায়ী সমাজের স্বভাব চরিত্র, আচার, আচরণ ও আইন কানুন এমন ভাবে সংশোধন করে দিতে হবে যেন জীবন জীকির পার্থক্য অত্যাচার অনাচারের কারণ না হয়ে অসংখ্য নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও তামাদ্দুনিক সুযোগ সুবিধার কারণ হয়ে পড়ে। প্রকৃত পক্ষে এ জন্যই বিশ্বপ্রকৃতির স্রষ্টা তাঁর বান্দাহদের মধ্যে এ পার্থক্য রেখে দিয়েছেন - গ্রন্থকার।

২. এ দফাটি সে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ একেবারে নির্মূল করে দিচ্ছে যাকে ভিত্তি করে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে জন্ম নিয়ন্ত্রণের আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে থাকে। প্রাচীনকালে দারিদ্রের ভয়ে শিশু হত্যা ও ভ্রূণ হত্যার জন্যে মানুষ তৈরী হতো। এখন তৃতীয় একটি পন্থা অর্থাৎ জন্ম নিয়ন্ত্রণের দিকে দুনিয়াকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু মে'রাজের পয়গামের এ দফাটি মানুষকে এ পথ নির্দেশনাই দেয় যে, আহার গ্রহণকারীর সংখ্যা হ্রাস করার ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা পরিহার করে খাদ্যের উপায় উপকরণ বাড়াবার গঠনমূলক চেষ্টা চরিত্রে নিজেদের শক্তি ও যোগ্যতা নিয়োজিত করতে হবে -গ্রন্থকার।

৩ অবশেষে এ দফাটি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এক বিস্তারিত অধ্যায়ের ভিত্তি হয়ে পড়ে। এ দফা অনুযায়ী ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অভিযোগকে ফৌজদারী অপরাধ গণ্য করা হয়েছে। অশ্লীলতার প্রচারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। মদ্যপান গীতবাদ্য, নৃত্য এবং জীবের মূর্তি ও ছবির উপরেও বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তারপর এমন এক দাম্পত্য আইন বানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তার ফলে বিবাহ্ অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়ে পড়েছে এবং ব্যভিচারের জন্য সমাজে প্রচলিত উপায় উপকরণ নির্মূল করা হয়েছে -গ্রন্থকার।

কোন ব্যক্তি না আত্মহত্যা করতে পারে, আর না অপরকে হত্যা করতে পারে। খোদার নির্ধারিত এ নিষেধাজ্ঞা তখনই ভংগ করা যেতে পারে যখন খোদারই নির্ধারিত কোন অধিকার তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রক্তপাত ততোটুকু পরিমাণে হওয়া উচিত যতোটুকু সে অধিকার দাবী করে। হত্যার ব্যাপারে সীমালংঘনের সকল পথ বন্ধ হওয়া উচিত। যেমন, উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে অপরাধীর পরিবর্তে অন্য কাউকে হত্যা করা যার বিরুদ্ধে অধিকার প্রমাণিত হয়নি। অথবা অপরাধীকে যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে মেরে ফেলা অথবা হত্যা করার পর তার মৃতদেহের অসম্মান করা। অথবা এ ধরনের অন্য কোন প্রতিশোধমূলক বাড়াবাড়ি যা দুনিয়ায় প্রচলিত ছিল।[১]

১০. এতিমদের স্বাথের সংরক্ষণ ততোক্ষণ পর্যন্ত করতে হবে যতোক্ষণ না তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। তাদের সম্পদ এমন ভাবে ব্যয় করা যাবেনা যা তাদের জন্য মংগলজনক নয়।[২]

১১. চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি কোন ব্যক্তির অন্য কোন ব্যক্তির সাথে অথবা কোন জাতির জন্য কোন জাতির সাথে যে কোন অবস্থাতেই ঈমানদারীর সাথে পূরণ করতে হবে। চুক্তি ভংগ করলে খোদার নিকটে জবাবদিহি করতে হবে।[৩]

১২. পণ্য দ্রব্যের পরিমাপ যন্ত্র ঠিক রাখতে হবে যাতে লেনদেনে ঠিকমত পরিমাপ করে দেয়া যায়।[৪]

১৩. যে বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয় নিয়ে উঠে পড়ে লেগোনা। শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং মনের নিয়ত, ধারণা ও ইচ্ছা বাসনার পুংখানুপুংখ্য হিসাব দিতে হবে খোদার সামনে।[৫]

---

১. এ দফার ভিত্তিতে ইসলামী আইনে আত্মহত্যা হারাম করা হয়েছে। ইচ্ছাকৃত হত্যাকে অপরাধ গণ্য করা হয়েছে। ভুল বশতঃ হত্যার বিভিন্ন অবস্থার জন্য হত্যার খেসারত ও কাফ্‌ফারার প্রস্তাব করা হয়েছে। ন্যায়সংগত হত্যা পাঁচটি অবস্থার মধ্যে সীমিত করে রাখা হয়েছে।

এক. যদি কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করে।

দুই. কোন দল যদি দ্বীনে হকের পথে এমন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তিন. কোন বিবাহিত পুরুষ অথবা নারী যদি ব্যভিচার করে।

চার. কোন দল যদি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা উচ্ছেদের চেষ্টা করে অথবা ইসলামী সমাজ ব্যস্থা পরিচালনাকারী দলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে।

পাঁচ. মুসলমান হওয়ার পর যদি কেউ মুরতাদ হয়ে যায়। তারপর ন্যায়সংগত হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার শরীয়তের কাজীকে দেয়া হয়েছে। তার জন্যে শালীনতাপূর্ণ নিয়ম নীতিও তৈরী করে দেয়া হয়েছে -গ্রন্থকার।

২. এটাও নিছক একটি নৈতিক হেদায়াত ছিলনা। বরঞ্চ এতিমদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার আইনানুগ ও প্রশাসনিক উভয় ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যার বিস্তারিত বিবরণ আমরা হাদীস ও ফেকাহর গ্রন্থগুলোতে দেখতে পাই। অতঃপর এ দফা থেকেই এ সুদূর প্রসারী মূলনীতি গ্রহণ করা হয়েছে যে, যে সব নাগরিক নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে সক্ষম নয় তাদের স্বার্থের সংরক্ষক স্বয়ং ইসলামী রাষ্ট্র। নবী (স) এর এরশাদ- انا ولىّ من لا ولىّ له (যার কোন অভিভাবক নেই আমি তার অভিভাক) সে ইংগিতই বহন করে -গ্রন্থকার।

৩. এটাও ইসলামী নৈতিকতার নিছক একটি গুরুত্বপূর্ণ দফা ছিলনা। বরঞ্চ পরবর্তী কালে ইসলামী রাষ্ট্র এটাকেই তার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাজনীতির ভিত্তিপ্রস্তর বলে গণ্য করে -গ্রন্থকার।

১৪. অত্যাচারী ও অহংকারীদের ন্যায় যমীনের উপর চলোনা। না তুমি তোমার ঔদ্ধত্য অহংকারে যমীনকে বিদীর্ণ করতে পার। আর না তোমার গর্বের দ্বারা পাহাড় থেকে মাথা উঁচু করতে পার।[৬]

এ ছিল সে সব মূলনীতি যার উপরে নবী (স) মদীনায় হিজরতের পর ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন।[৭]

হুযুরকে (স) হিজরতের দোয়া শিক্ষাদান

এ সুরায়ে বনী ইসরাইলে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীকে এমন এক দোয়া শিক্ষা দেন যা প্রকৃতপক্ষে হিজরতের দোয়া বলা যেতে পারে। তিরমিযি এবং হাকেম হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন যে, নিম্ন আয়াতে নবীকে (স) হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়ঃ

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ
وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا - (بنى اسرائيل : ٨٠)

---

৪. এ দফা অনুযয়ী ইসলামী রাষ্ট্রের পুলিশ বিভাগের উপর অন্যান্য দায়িত্বের সাথে এ দায়িত্বও আরোপিত হয় যে, তারা বাজারে ওজন ও পরিমাপ যন্ত্র দেখাশুনা করবে এবং শক্তি প্রয়োগ করে মাপে ও ওজনে কম দেয়া বন্ধ করে দেবে। অতঃপর এর থেকে এ ব্যাপক মূলনীতি গ্রহণ করা হয় যে ব্যবসা ও লেনদেনে সকল প্রকার বেঈমানী ও অধিকার হরণ তথা ধোকা প্রতারণার মূলোচ্ছেদ করা সরকারের দায়িত্ব -গ্রন্থকার।

৫. এ দফার উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমান তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কুসংস্কার আন্দাজ অনুমান ও ধারণার পরিবর্তে জ্ঞানের অনুসারী হবে নৈতিকতায়, আইনে, দেশের আইন শৃংখলায় এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন ভাবে ব্যাপক হারে এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করা হয়েছে। জ্ঞানের পরিবর্তে আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে জীবনের বিভিন্ন দিকে যে অগণিত অত্যাচার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে সেগুলো থেকে ইসলামী সমাজকে রক্ষা করা হয়। নৈতিকতার দিক দিয়ে নির্দেশ দেয়া হয় যে, কুধারণা পোষন করা থেকে দূরে থাক এবং ভালোভাবে যাচাই না করে কোন ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করোনা। আইনে এ একটি স্থায়ী নীতি হিসাবে নির্ধারিত হয় যে, নিছক সন্দেহ বশতঃ কারো বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়া হবেনা। অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রেও এ রীতি নির্ধারিত করা হয় যে, সন্দেহ্ বশতঃ কাউকে গ্রেফতার করা মারপিট করা, হাজতে বন্ধ করে রাখা একবারে অন্যায় ও অবৈধ কাজ, বিজাতীয়দের সাথে আচরণের বেলায়ও এ নীতি নির্ধারিত করে দেয়া হয় যে, তদন্ত ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবেনা। সন্দেহ বশতঃ গুজব ছড়ানোও যাবেনা। শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও সে সব তথাকথিত জ্ঞান বিদ্যাকে অবাঞ্ছিত মনে করা হয়েছে, যার ভিত্তি নিছক আন্দাজ ও অলীক কল্পনা। এভাবে মুসলমানদের মধ্যে একটা সত্যনিষ্ঠ ও সত্য ভিত্তিক মানসিকতার সৃষ্টি করা হয়েছে -গ্রন্থকার।

৬. এটাও নিছক কোন উপদেশবাণী নয়, বরঞ্চ প্রকৃত পক্ষে মুসলমানদেরকে আগাম সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, ক্ষমতাসীন দল হওয়ার পর যেন তার লোকজন গর্ব অহংকারে লিপ্ত না হয়। এ নির্দেশের বাস্তব প্রতিফলন আমরা এই দেখতে পাই যে, এ ১৪ দফা মেনিফেস্টো বা ঘোষণা অনুযায়ী মদীনা শরীফে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো তার শাসকবৃন্দ গভর্নর ও সিপাহসালারগণ মৌলিক ও লিখিতভাবে এমন কছু বলেননি যার মধ্যে গর্ব অহংকারের লেশমাত্র পাওয়া যায়। এমন কি যুদ্ধকালেও তাঁরা গর্ব অহংকার সূচক কোন কথা বলেননি। তাঁদের কথাবাতায় আচার আচরণে এবং উঠা বসায় বিনয় নম্রতাই ফুটে উঠেছে। বিজয়ীর বেশে যখন তাঁরা কোন শহরে প্রবেশ করেছেন, তখন গর্ব-অহংকার ও দাম্ভিকতার সাথে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের চেষ্টা করেননি -গ্রন্থকার।

এবং (হে নবী) দোয়া করঃ পরওয়ারদেগার! তুমি যেখানেই আমাকে নিয়ে যাও, সত্যতার সাথে নিয়ে যাও এবং যেখান থেকেই আমাকে বের করে নাও সত্যতার সাথে বের করে নাও এবং তোমার পক্ষ থেকে একটা রাষ্ট্রশক্তি আমার সহায়ক বানিয়ে দাও। (বনী ইসরাইলঃ ৮০)

এ দোয়া শিক্ষা থেকে এ কথা পরিষ্কার জানতে পারা যায় যে, হিজরতের সময় সন্নিকট। এ জন্য বলা হচ্ছে, তোমার দোয়া এই হওয়া উচিত যে কোন অবস্থাতেই যেন তুমি সত্যতা থেকে সরে না পড়। যেখান থেকেই বেরিয়ে পড় সত্যতার সাথে বেরিয়ে পড়বে এবং যেখানেই যাও সত্যতার সাথেই যাবে।

"এবং তোমার পক্ষ থেকে একটা রাষ্ট্রশক্তি আমার সহায়ক বানিয়ে দাও।"

অর্থাৎ হয় তুমি স্বয়ং আমাকে রাষ্ট্রশক্তি দান কর অথবা কোন রাষ্ট্রশক্তি বা সরকারকে আমার সহায়ক বানিয়ে দাও যাতে করে তার সাহায্যে আমি দুনিয়ার এ অধঃপতন অনাচারকে দূর করতে পারি, অশ্লীলতা ও পাপাচারের সয়লাব রুখতে পারি এবং তোমার সুবিচারপূর্ণ আইন কার্যকর করতে পারি। এর থেকে জানতে পারা যায় যে, ইসলাম দুনিয়ায় যে সংস্কার সংশোধন চায় তা শুধু ওয়াজ-নসিহত নয়, বরঞ্চ ইসলামের বাস্তব প্রতিফলনের জন্যে রাজনৈতিক শক্তিরও প্রয়োজন আছে। তারপর এ দোয়া যখন আল্লাহ তাঁর নবীকে স্বয়ং শিক্ষা দিয়েছেন এবং হাদীসে একথা পাওয়া যায়-

إِنَّ اللّٰهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা সে সব বিষয়ের পথরুদ্ধ করে দেয়- যা কুরআন করতে পারেনা- তখন এর থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, দ্বীনের প্রতিষ্ঠা (একামতে দ্বীন) এবং শরিয়ত ও আল্লাহর দন্ডনীয় আইনসমূহ (হদূদ) জারী করার জন্যে রাষ্ট্রশক্তি চাওয়া এবং তা লাভ করার জন্য চেষ্টা করা শুধু জায়েযই নয় বরঞ্চ বাঞ্ছনীয়। যারা এটাকে দুনিয়াদারী বা দুনিয়াপুরস্তি বলে অভিহিত করে, তারা ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত আছে। দুনিয়াপুরস্তি তখনই হতে পারে যখন কেউ নিজের স্বার্থের জন্য রাষ্ট্রশক্তি লাভ করতে চায়। আর খোদার দ্বীনের প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রশক্তির অভিলাসী হওয়া দুনিয়াপুরস্তি নয় বরঞ্চ খোদাপুরস্তিরই দাবী।[৮]

সাহায্যের জন্যে মজলুম মুসলমানদের দোয়া শিক্ষাদান

মে'রাজের সময়কালেই সূরায়ে বাকারার শেষ কয়েকটি আয়াত রসূলুল্লাহকে (স) দান করা হয়। ইতিপূর্বে আমরা হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে একথা বলেছি। এ আয়াতগুলোর সমাপ্তি নিম্নোক্ত দোয়ার মধ্য দিয়ে হয় ঃ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا........ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ ۔

হে আমাদের রব! ভুলে আমাদের কোন ক্রটি বিচ্যুতি হয়ে থাকলে তার জন্যে পাকড়াও করোনা। হে খোদা! তুমি সে বোঝা আমাদের উপর চাপিয়ে দিওনা যা তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়েছিলে। পরওয়ারদেগার! যে বোঝা বহনের শক্তি আমাদের নেই, তা আমাদের উপর চাপিওনা। আমাদের প্রতি কোমল হও, আমাদের ক্ষমা কর, আমাদের উপর রহম কর। তুমি আমাদের প্রভু। অতএব কাফেরদের মুকাবিলায় তুমি আমাদের সাহায্য, কর। (বাকারাঃ ২৮৬)

লক্ষ্য রাখতে হবে যে এ দোয়াটি এমন এক অবস্থায় শিক্ষা দেয়া হয়েছিল যখন মক্কায় ইসলাম ও কুফরের সংঘাত সংঘর্ষ চরমে পৌঁছেছিল। মুসলমানদের উপরে বিপদ মুসিবতের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ছিল। বলতে গেলে অবস্থা এই ছিল যে, আরবের মধ্যে এমন কোন স্থান ছিলনা যেখানে কোন খোদার বান্দাহ্ দ্বীনি হকের অনুকরণ করা শুরু করেছে আর যমীনের উপর তার জন্যে শাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। এ অবস্থায় মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয়া হলো যে এ ভাবে আপন প্রভুর কাছে দোয়া কর। বলা বাহুল্য যে দাতা স্বয়ং যদি চাওয়ার ধরন পদ্ধতি বলে দেন, তাহলে আপনা আপনি পাওয়ার নিশ্চয়তাও পয়দা হয়। এজন্যে এ দোয়া সে সময়ে মুসলমানদের জন্যে অসাধারণ মানসিক প্রশান্তি এনে দিয়েছিল উপরন্তু এ দোয়ার মধ্যে প্রসংগক্রমে এ শিক্ষাও দেয়া হয় যে, তারা যেন তাদের ভাবাবেগ কোন অবাঞ্ছিত দিকে প্রবাহিত হতে না দেয়, বরঞ্চ এ দোয়ার ছাঁচেই ঢেলে নেয়। একদিকে সেই হৃদয় বিদারক জুলুম নির্যাতন দেখুন যা শুধু হকপরস্তি বা সত্যনিষ্ঠার জন্যে তাদের উপর করা হচ্ছিল এবং অপর দিকে এ দোয়া দেখুন যার মধ্যে দুশমনের বিরুদ্ধে তিক্ততা সৃষ্টির লেশমাত্র পাওয়া যাবেনা। একদিকে সেই দৈহিক নির্যাতন ও আর্থিক ক্ষতি দেখুন যার শিকার তারা হয়েছিলেন এবং অপর দিকে দোয়া দেখুন যার মধ্যে দুনিয়াবী কোন স্বার্থ হাসিলের সামান্যতম কোন কথাও নেই। এক দিকে সে সব হকপুরস্ত ও সত্যনিষ্ঠদের চরম দুরবস্থা দেখুন এবং অন্য দিকে সে মহান ও পুতপবিত্র ভাবাবেগ দেখুন যার দ্বারা এ দোয়া পূর্ণ। এ তুলনামূলক যাঁচাই পর্যালোচনা থেকেই সঠিক ধারণা হতে পারে যে, সে সময়ে আহলে ঈমান মুসলমানদেরকে কোন্ ধরনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তরবিয়ত দেয়া হচ্ছিল।[৯]

মে'রাজের আর একটা দিক

এ বর্ণনা প্রসংগে মে'রাজের আর একটা দিকও পাঠকদের সামনে তুলে ধরা সংগত হবে যার থেকে এমন সব বহু প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে যা মে'রাজের বিভিন্ন অবস্থা ও বিবরণ অধ্যয়ন করতে গিয়ে মনের মধ্যে উদয় হয়।

জিব্রিল (আ) এর সাথে হুযুর (স) এর দুনিয়ার উপর প্রথম সাক্ষাত

কুরআন পাকে সূরায়ে নজমে প্রথমেই জিব্রিল (আ) এর সাথে হুযুর (স) এর সাক্ষাতের উল্লেখ করা হয়েছে যখন তাকে (জিব্রিল) তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দিগ্বলয়ে দেখা গেল। তারপর তিনি নিকটবর্তী হতে হতে এতোটা নিকটে এসে গেলেন যে হুযুর (স) ও তাঁর মাঝে দুটি ধনুকের সমান অথবা তার চেয়েও কম দুরত্ব রয়ে গেল। সে সময় তিনি আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে অহী পৌঁছিয়ে দেন। একথা উল্লেখ করার পর এরশাদ হচ্ছে-

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى -(النجم: ١١-١٢)

চোখ যা দেখলো, মন তাতে মিথ্যা মিলিয়ে দিলনা। এখন তোমরা কি তার সাথে সে বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছ যা সে চোখ দিয়ে দেখছে? (নাজমঃ ১১-১২)

অর্থাৎ দিনের আলোকে পরিপূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় উন্মুক্ত চোখে নবী মুহাম্মদ (স) যা পর্যবেক্ষণ করলেন, সে সম্পর্কে তাঁর মন এ কথা বল্লোনা যে এ দৃষ্টিভ্রম মাত্র। অথবা এ কোন জ্বিন বা শয়তান যা দেখা যাচ্ছে। অথবা এ কোন কাল্পনিক আকৃতি যা আমার সামনে

আবির্ভূত হয়েছে। অথবা জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখছি। না তা নয়। বরঞ্চ তাঁর মন ঠিক তাই উপলব্ধি করেছে যা তাঁর চোখ দেখছিল। তাঁর এ বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ ছিলনা যে প্রকৃতপক্ষে ইনি জিব্রিল (আ) এবং যে পয়গাম তিনি বয়ে এনেছেন তা খোদার পক্ষ থেকে অহী।

এ ধরনের অসাধারণ পর্যবেক্ষণের পর নবীর মনে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার কারণ

এখানে এ প্রশ্ন মনে জাগে যে এ কেমন কথা যে এমন অভিনব ও অসাধারণ পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে নবী পাকের (স) মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হলোনা এবং তিনি দৃঢ় বিশ্বাস করলেন যে, তাঁর চোখ যা কিছু দেখেছে তা প্রকৃত পক্ষে সত্য, কোন কল্পিত নিরাকার কিছু নয় এবং জ্বিন ও শয়তানও নয়? এর কারণ 'কি'? এ প্রশ্ন নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে এর পাঁচটি কারণ আমরা অনুধাবন করতে পারি।

প্রথম এই যে, যে বাহ্যিক অবস্থায় এ পর্যবেক্ষণ হয়েছিল তা এ সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দান করে। রসূলুল্লাহ (স) এর এ পর্যবেক্ষণ রাতের আঁধারে; অথবা মুরাকাবা অবস্থায়, স্বপ্নে অথবা অর্ধজাগ্রত অবস্থায় হয়নি। বরঞ্চ সকালের উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। নবী (স) পুরোপুরি জাগ্রত ছিলেন। প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট শূন্যে এবং পূর্ণ দিবালোকে স্বচক্ষে তিনি এ দৃশ্য ঠিক সেভাবেই দেখছিলেন, যেভাবে কোন ব্যক্তি দুনিয়ার অন্যান্য দৃশ্য দেখে থাকে। এর মধ্যে যদি সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে, তাহলে এই যে দিনের বেলায় আমরা সমুদ্র, পাহাড়, মানুষজন, ঘরবাড়ি এবং আর যা কিছুই দেখছি, তা সবই সন্দিগ্ধ ও দৃষ্টিভ্রম হতে পারে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, নবী পাকের (স) আভ্যন্তরীণ অবস্থাও এ সত্যতার নিশ্চয়তা দান করছিল। তিনি পরিপূর্ণ সজ্ঞানে ছিলেন। পূর্ব থেকে তাঁর মনে এমন কোন চিন্তাধারণা ছিলনা যে এমন কোন পর্যবেক্ষণ হওয়া উচিত বা হতে যাচ্ছে। এ সব চিন্তাভাবনা ও তত্ত্বতালাশ থেকে তাঁর মন একেবারে শূন্য ছিল। এমন অবস্থায় আকস্মিক ভাবে তাঁর সামনে এ ঘটনা ঘটে। এতে এ ধরনের সন্দেহের কোন অবকাশ ছিলনা যে, চোখ কোন বাস্তব দৃশ্য দেখছেনা, বরঞ্চ কল্পিত কোন আকৃতি তাঁর সামনে ভেসে উঠেছে।

তৃতীয় এই যে, এ অবস্থায় নবীর সামনে যে সত্তা আবির্ভূত হলেন, তিনি এতো মহান, মর্যাদাপূর্ণ, সুন্দর ও জ্যোতির্ময় যে, এমন সত্তার কোন ধারণা কোন দিনই এর আগে তিনি হৃদয়ে পোষণ করেননি। নতুবা তাঁর মনে হতো এ দৃশ্য তাঁর ধারণা ও কল্পনা প্রসূত। জ্বিন বা শয়তানও এমন মর্যাদা সম্পন্ন হতে পারতোনা যে তিনি তাঁকে ফেরেশতা ব্যতীত অন্য মনে করতে পারতেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) এর বর্ণনায় আছে যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি জিব্রিলকে (আ) এমন আকৃতিতে দেখলাম যে, তাঁর দু'শ বাহু ছিল (মুসনাদে আহমাদ)। অন্য এক বর্ণনায় ইবনে মাসউদ (রা) আরও ব্যাখ্যা করে বলেন যে, জিব্রিল (আ) এর এক একটি বাহু এতো বিরাট ও বিশাল ছিল যে তা উর্ধাকাশ ছেয়ে আছে- এমনটি দেখা যাচ্ছিল। (মুসনাদে আহমাদ)

চতুর্থ কারণ এই যে, যে শিক্ষা সে সত্তা দান করছিলেন তাও এ পর্যবেক্ষণের সত্যতার নিশ্চয়তা দানকারী ছিল। এর মাধ্যমে হঠাৎ যে জ্ঞান, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির বাস্তব সত্যতা সম্পর্কিত যে জ্ঞান তিনি লাভ করলেন, তার কোন ধারণা ইতিপুর্বে তাঁর মনে ছিলনা যে

তিনি এ সন্দেহ পোষণ করতে পারতেন যে এ সব তাঁরই ধ্যান ধারণা যা রূপ লাভ করে তাঁর সামনে এসেছে। এমনি ভাবে সে জ্ঞান সম্পর্কে এ সন্দেহ পোষণের কোন অবকাশ ছিলনা যে শয়তান এ আকৃতি ধারণ করে তাঁকে ধোকা দিচ্ছে। কারণ এ কাজ তো শয়তানের হতেই পারেনা এবং কখন সে এ কাজ করেছে যে, মানুষকে শির্ক ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, খাঁটি তাওহীদের শিক্ষা দিচ্ছে? আখেরাতের জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছে? জাহেলিয়াত ও তার রীতি পদ্ধতির প্রতি বিরাগভাজন করে দিচ্ছে? নৈতিক মহত্ব লাভের দাওয়াত দিচ্ছে? আর এক ব্যক্তিকে বলছে যে - শুধু তুমি এটা গ্রহণ করবে তাই নয়, বরঞ্চ তার স্থানে তাওহীদ, সুবিচার এবং তাক্ওয়ার মংগলকারিতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে দাঁড়িয়ে যাও?

পঞ্চম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যে, আল্লাহ তায়ালা যখন কোন ব্যক্তিকে নবুওতের জন্যে বেছে নেন, তখন তাঁর মনকে সকল সন্দেহ সংশয় ও প্ররোচনা থেকে মুক্ত করে সেখানে দৃঢ় প্রত্যয় ও আস্থা সৃষ্টি করে দেন। এ অবস্থায় তাঁর চোখ যা কিছু দেখে এবং কান যা কিছু শুনে তার সত্যতা সম্পর্কে কণামাত্র সন্দেহ তাঁর মনে সৃষ্টি হতে পারেনা। তিনি পূর্ণ আস্থা সহকারে প্রতিটি সত্য গ্রহণ করেন, যা তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে উদঘাটিত হয়। এ কোন পর্যবেক্ষণের আকারেও হতে পারে যা তাঁকে স্বচক্ষে দেখানো যায় অথবা ইসলামী জ্ঞানের আকারেও হতে পারে যা তাঁর হৃদয়ে ঢেলে দেয়া যায়। অথবা অহীর পয়গামের আকারেও হতে পারে যা প্রতিটি শব্দে শব্দে তাঁকে শুনানো যায়। এ সকল অবস্থাতেই পয়গাম্বরের এ বিষয়ের পূর্ণ অনুভূতি হয় যে তিনি সকল প্রকার শয়তানী হস্তক্ষেপ থেকে একেবারে নিরাপদ রয়েছেন এবং যা কিছুই তাঁর কাছে যে কোন আকারেই পৌঁছুচ্ছে তা যথাযথভাবে তাঁর রবের পক্ষ থেকেই আসছে। সকল খোদা প্রদত্ত অনুভূতির ন্যায় পয়গাম্বরের এ অনুভূতিও এমন এক নিশ্চিত বস্তু যার মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির কোন অবকাশ নেই। মাছের সন্তরণকারী মাছ হওয়ার, পাখীর পাখী হওয়ার এবং মানুষের মানুষ হওয়ার অনুভূতি যেমন একেবারে খোদা প্রদত্ত এবং এতে ভুল বুঝাবুঝির যেমন কোন অবকাশ নেই, ঠিক তেমনি পয়গাম্বরের নিজের পয়গাম্বর হওয়ার অনুভূতিও খোদা প্রদত্ত। তাঁর মনের মধ্যে পয়গাম্বর হওয়া সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে এমন খারাপ ধারণা তাঁর মনে এক মুহূর্তের জন্যেও স্থান পেতে পারেনা।

জিব্রিলের (আ) সাথে দ্বিতীয় সাক্ষাত সিদরাতুল মুন্তাহায়

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى - عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ، اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ، لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى - (النجم: ١٣ - ١٨)

এবং আর একবার সে সিদরাতুল মুন্তাহার কাছে তাকে নেমে আসতে দেখে, সেখানে নিকটেই জান্নাতুল মাওয়া রয়েছে। সে সময় সিদরার উপরে ছেয়ে যাচ্ছিল যা কিছু ছেয়ে যাচ্ছিল। দৃষ্টি না ঝলসে যায়, আর না সীমা অতিক্রম করে। এবং সে তার রবের বড়ো নিদর্শন দেখে। (নজমঃ ১৩-১৮)

এখানে জিব্রিল (আ) এর সাথে নবী (স) এর দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে তিনি নবী (স) এর সামনে তাঁর আসল আকৃতিতে আবির্ভূত হন। এ

সাক্ষাতের স্থান সিদরাতুল মুন্তাহা বলা হয়েছে। সেই সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, তার নিকটেই রয়েছে "জান্নাতুল মাওয়া"।

সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা

সিদ্‌রা আরবী ভাষায় কুলগাছকে বলা হয়। আর 'মুন্তাহা' অর্থ শেষ প্রান্ত। 'সিদ্‌রাতুল মুন্তাহার' আভিধানিক অর্থ সে কুলগাছ যা একেবারে শেষ প্রান্তে অবস্থিত। আল্লামা আলুসী তাঁর তফসীর রুহুল মায়ানীতে এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন-

اليها ينتهى عالم وما وراءها لا يعلمه الا الله -

এখানে এসে সকল জ্ঞানীর জ্ঞান শেষ হয়ে যায়। তারপর যা কিছু আছে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা। প্রায় এরূপ ব্যাখ্যাই ইবনে জারীর তাঁর তফসীরে এবং ইবনে আসীর 'আন্নিহায়া ফী গারীবেল হাদীসে ওয়াল আসার"-এ করেছেন। আমাদের পক্ষে এ কথা বলা বড়ো কঠিন যে, এ জড়জগতের শেষ সীমান্তে সে কুলগাছটি কেমন এবং তার প্রকৃত ধরন ও অবস্থাটাই বা কেমন। এ আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টিতত্ত্বের এমন এক রহস্য যা কিছুতেই আমাদের বোধগম্য নয়। যাহোক সে এমন এক বস্তু যার জন্যে মানুষের ভাষায় সিদ্‌রা বা কুলগাছ থেকে অধিকতর উপযোগী কোন শব্দ.আল্লাহ্ তায়ালার নিকট আর কিছু হয়তো ছিলনা।

জান্নাতুল মাওয়া

জান্নাতুল মাওয়ার আভিধানিক অর্থ হলো এমন জান্নাত যা বসবাস যোগ্য। হযরত হাসান বাসরী (রহ) বলেন, এ হচ্ছে সেই জান্নাত যা আখেরাতে ঈমানদার ও মুত্তাকীদের জন্যে নির্দিষ্ট করা আছে এই আয়াত থেকে তিনি এ যুক্তি প্রমাণ পেশ করেন যে, সে জান্নাত আসমানে রয়েছে। কাতাদাহ্ বলেন, এ সেই জান্নাত যেখানে শহীদদের রূহ রাখা হয়। এ জান্নাত বুঝায়না যা আখেরাতে পাওয়া যাবে। ইবনে আব্বাসও তাই বলেন এবং অতিরিক্ত এ কথা বলেন যে, আখেরাতে যে জান্নাত ঈমানদারদের দেয়া হবে তা আসমানে নয়, বরং তার স্থান এ যমীনে।

সিদ্‌রার উপরে আল্লাহর তাজাল্লীর প্রতিভাত

'সে সময় সিদরার উপর ছেয়ে যাচ্ছিল যা কিছু ছেয়ে যাচ্ছিল এর অর্থ এই যে, তার মর্যাদা ও অবস্থা বর্ণনাতীত। সে এমন অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি প্রবাহ ছিল যা ছিল মানুষের ধারণা বহির্ভুত এবং বর্ণনাতীত।

হুযুর (স) এর সংযম ও ধৈর্য

অতঃপর নবী পাকের (স) প্রশংসায় বলা হয়েছে যে, সে তাজাল্লী দেখার পর তাঁর দৃষ্টি ঝলসেও যায়নি এবং সীমা অতিক্রমও করেনি। অর্থাৎ একদিকে তাঁর চরম সহনশীলতা এমন ছিল যে, এমন অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি প্রবাহ্ তাঁর দৃষ্টিশক্তি ঝলসে দেয়নি এবং তিনি অত্যন্ত প্রশান্ত মনে তা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। অপর দিকে তাঁর সংযম ও একাগ্রতা এমন ছিল যে, যে উদ্দেশ্যে তাঁকে ডাকা হয়েছে, তার প্রতিই তিনি তাঁর মন ও দৃষ্টি কেন্দ্রীভুত করে রাখেন। আর যে বিস্ময়কর দৃশ্য সেখানে বিরাজমান ছিল তা দেখার জন্যে তিনি একজন ক্রীড়া দর্শকের ন্যায় চারদিকে দৃষ্টিপাত করা শুরু করেননি।

তার দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন কোন ব্যক্তির কোন বিরাট ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিশীল বাদশার দরবারে হাযির হওয়ার সুযোগ হচ্ছে এবং সে সেখানে এমন সব জাঁকজমক ও আড়ম্বর দেখছে যা সে কোনদিন ধারণা করতে পারেনি। এখন যদি সে নিম্ন শ্রেণীর লোক হয় তাহলে তো সেখানে পৌঁছা মাত্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে। হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। দরবারের শিষ্টাচার সম্পর্কে অনবহিত হলে দরবারের সাজসজ্জা ও দৃশ্য উপভোগ করার জন্যে চারদিকে ঘুরে ফিরে দেখতে থাকবে। কিন্তু একজন সম্ভ্রান্ত মার্জিত শিষ্টাচার ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি সেখানে পৌঁছে না হতবাক হয়ে যায়, আর না দরবারের সাজসজ্জা ও জাঁকজমক দর্শনে মশগুল হয়ে পড়ে বরঞ্চ সে অত্যন্ত মর্যাদাসহকারে সেখানে উপস্থিত হবে এবং যে উদ্দেশ্যে তাকে শাহী দরবারে তলব করা হয়েছে তার প্রতি তার সমস্ত মনোযোগ নিবিষ্ট করবে। নবী পাকের (স) এ গুণ বৈশিষ্ট্যই ছিল যার প্রশংসা এ আয়াতে করা হয়েছে।

নবী (স) কি আল্লাহকে দেখেছিলেন?

শেষের আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর রবের বড়ো বড়ো নিদর্শন দেখেছেন।

এ আয়াত এ ব্যাখ্যা পেশ করে যে, রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহকে নয়, বরঞ্চ তাঁর বড়ো বড়ো নিদর্শনাবলী দেখেছিলেন। আর যেহেতু পূর্বাপর বক্তব্যের দৃষ্টিতে এ দ্বিতীয় সাক্ষাতও সেই সত্তার সাথে হয়েছিল, যাঁর সাথে প্রথম সাক্ষাত হয়েছিল, সে জন্যে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, উর্ধ্বে শূন্যে যাঁকে তিনি প্রথম বার দেখেছিলেন যিনি নিকটে আসতে আসতে এতো নিকটে এলেন যে উভয়ের মধ্যে দুটি ধনুকের অথবা তারও কম দূরত্ব রয়ে গেল, তিনিও আল্লাহ ছিলেননা। দ্বিতীয় বার সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে যাকে তিনি দেখলেন তিনিও আল্লাহ ছিলেননা। যদি তিনি এ দু'টি ঘটনার কোন একটিতেও আল্লাহ তায়ালাকে দেখে থাকতেন, তাহলে এতো বড়ো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হতো যে, তাহলে অবশ্যই তা ব্যাখ্যা করে বলে দেয়া হতো। হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে যে, তিনি আল্লাহকে দেখার আবেদন করেছিলেন। জবাবে স্পষ্ট বলে দেয়া হয় لَنْ تَرَانِىْ তুমি আমাকে দেখতে পারনা- (আ'রাফঃ ১৪৩)। এখন এ মর্যাদা হযরত মূসাকে (আ) দেয়া হলোনা, কিন্তু নবী মুহাম্মদকে (স) যদি দেয়া হতো, তাহলে তার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করে তা সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হতো। কিন্তু আমরা দেখি যে কুরআনের কোথাও এ কথা বলা হয়নি যে, হুযুর (স) তাঁর রবকে দেখেছেন। বরঞ্চ মেরাজের ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে সূরায়ে বনী ইসরাঈলে এরশাদ করা হয়েছে যে, "আমরা আমাদের বান্দাহকে এ জন্যে নিয়ে গিয়েছিলাম যে, তাকে আমাদের নিদর্শনাবলী দেখার- (لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا) এবং এখানে সিদরাতুল মুন্তাহায় উপস্থিতির বেলায়ও বলা হয়েছে, "সে তার রবের বড়ো বড়ো নিদর্শনাবলী দেখেছে-

(لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى)

এ সব কারণে বাহ্যতঃ এ বিতর্কের কোন অবকাশ থাকেনা যে রসূলুল্লাহ (স) এ উভয় অবস্থাতে আল্লাহকে দেখেছিলেন না হযরত জিব্রিলকে (আ)? কিন্তু যে কারণে এ বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তা এই যে, এ বিষয়ে হাদীস গ্রন্থগুলোতে মতানৈক্য পাওয়া যায়। নিম্নে আমরা ক্রামানুসারে ঐ সব হাদীস সন্নিবেশিত করছি যেগুলো এ বিয়ে বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরাম থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

হযরত আয়েশার(রা) বর্ণনা

বুখারী কিতাবুত তফসীরে হযরত মাসরুকের বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, আম্মাজান, মুহাম্মদ (স) কি তাঁর রবকে দেখেছিলেন?

তিনি বলেন, তোমার এ কথায় তো আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে পড়লো। একথা তুমি কি করে ভুলে গেলে যে, তিনটি বিষয় এমন যে, যদি কেউ তার দাবী করে তাহলে সে মিথ্যা দাবী করছে?

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, প্রথমটি এই যে, যদি কেউ তোমাকে এ কথা বলে যে, মুহাম্মদ (স) তাঁর রবকে দেখেছেন, তাহলে সে মিথ্যা কথা বলছে। তারপর হযরত আয়েশা (রা) এ আয়াত পাঠ করেন- لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ কোন চোখ তাঁকে দেখতে পারেনা। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَائِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِىَ بِاِذْنِهٖ مَايَشَاءُ۔

- কোন মানুষের এ মর্যাদা নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন। তবে হ্যাঁ, হয় অহীর মাধ্যমে, অথবা পর্দার আড়াল থেকে, অথবা কোন ফেরেশ্‌তা পাঠিয়ে দেবেন এবং সে তার উপর আল্লাহর অনুমতিক্রমে অহী করবে যা কিছু তিনি চান।

তারপর হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তবে রসূলুল্লাহ (স) জিব্রিলকে (আ) দু'বার তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছেন।

এ হাদীসের একটি অংশ বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, ৪র্থ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। আর بدء الخلق এ মাসরুকের যে বর্ণনা ইমাম বুখারী উদ্ধৃত করেছেন তাতে তিনি বলেছেন, আমি হযরত আয়েশার (রা) একথা শুনে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে আল্লাহ তায়ালার এ এরশাদের অর্থ কি?

ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

জবাবে তিনি বলেন, এর থেকে জিব্রিলকে (আ) বুঝানো হয়েছে। তিনি হামেশা রসূলুল্লাহর (স) সামনে মানুষের আকৃতিতে আসতেন। কিন্তু এ সময়ে তিনি তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে রসূলুল্লাহর (স) কাছে আসেন এবং তিনি সমগ্র শূন্যলোকে ছেয়ে যান।

মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, সিদরাতুল মুন্তাহা অধ্যায়ে, হযরত আয়েশার (রা) সাথে মাসরুকের এ কথোপকথন বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে এই যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি এ দাবী করে যে মুহাম্মদ (স) তাঁর রবকে দেখেছেন, সে আল্লাহর প্রতি ভয়ানক দোষারোপ করে।

মাসরুক বলেন, আমি ঠেস দিয়ে বসেছিলাম। এ কথা শুনার পর উঠে ভালো হয়ে বসলাম এবং আরজ করলাম, উম্মুল মুমেনীন। তাড়াহুড়া করবেননা। আল্লাহ তায়ালা কি এ কথা বলেননি?

لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى এবং وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ

হযরত আয়েশা তার জবাবে বলেন, এ উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম আমিই রসূলুল্লাহকে (স) এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেন-

- তিনি তো জিব্রিল (আ) ছিলেন। যে আকৃতিতে আল্লাহ্ তাঁকে পয়দা করেছেন, সেই আসল আকৃতিতে তাঁকে দু'বার ব্যতীত আর কখনো দেখিনি। এ দু'সময়ে আমি তাঁকে আসমান থেকে নামতে দেখেছি তাঁর বিরাট সত্তা আসমান ও যমীনের মাঝে বিরাট শূন্যলোক জুড়ে ছিল।

ইবনে মারদুইয়া মাসরূকের এ বর্ণনাকে যে ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন তা এইঃ

انما هو جبريل عليه السلام، لم أرَهُ على صورته التى خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطًا مّن السّماء سادًّا عظم خلقه مابين السماء والارض-

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, সবার আগেই আমিই রসূলুল্লাহকে (স) এ কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম- আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন?

হুযুর (স) জবাবে বলেন, না, আমি জিব্রিলকে (আ) আসমান থেকে নামতে দেখেছি।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদের (রা) বর্ণনা

বুখারী কিতাবুত তাফসীর, মুসলিম কিতাবুল ঈমান এবং তিরিমিযি আবওয়াবুত তাফসীর এ যির বিন হুবাইশ এর যে বর্ণনা আছে তাতে বলা হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) - فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او اَدْنٰى এর এরূপ তফসীর বর্ণনা করেছেনঃ

রসূলুল্লাহ্ (স) জিব্রিলকে (আ) এ আকৃতিতে দেখেন যে, তাঁর ছয়শ' বাহু ছিল মুসলিমের দ্বিতীয় একটি বর্ণনায়-

ما كذب الفؤاد ما راٰى لقد راٰى من اٰيٰت ربّه الكبرٰى

এরও একই রূপ তাফসীর যির বিন হুবাইশ হযরত আদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

মুসনাদে আহমদে ইবনে মাসউদের (রা) এ তাফসীর যির বিন হুবাইশ ছাড়াও আবদুর রহমান বিন ইয়াযিদ এবং আবু ওয়াইল-এর মাধ্যমেও উদ্ধৃত হয়েছে। উপরন্তু মুসনাদে আহমদে যির বিন হুবাইশের আরও দুটি বর্ণনা নকল করা হয়েছে যাতে আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা)

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى

এর তফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتُ جبريل عند سدرة المنتهٰى عليه ستمائة جناح-

- অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, আমি জিব্রিলকে সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে দেখেছি। তাঁর ছয়শ' বাহু ছিল।

এ বিষয়ের বর্ণনা ইমাম আহমদ শাকীক বিন সালমা থেকেও নকল করেছেন। এতে তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদের (রা) মুখ থেকে এ কথা শুনেছি। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, আমি জিব্রিল (আ) কে এ আকৃতিতে সিদরাতুল মুন্তাহায় দেখেছি।

হযরত আবু হুরায়রার (রা) বর্ণনা

আতা বিন রাবাহ্ হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে- لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى
- এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে বলেন, رَاٰى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَام
- হুযুর (স) জিব্রিলকে (আ) দেখেছিলেন (মুসলিম-কিতাবুল ঈমান)।

হযরত আবুযর (রা) এর বর্ণনা

ইমাম মুসলিম কিতাবুল ঈমানে হযরত আবুযর গিফারী (রা) থেকে আবদুল্লাহ্ বিন শাকীকের দুটি বর্ণনা নকল করেছেন। এক বর্ণনায় তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে (স) জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার রবকে দেখেছিলেন? হুযুর (স) জবাবে বলেন- نُوْرٌ اَنّٰى اَرَاهُ দ্বিতীয় বর্ণনায় বলেন, আমার প্রশ্নে তিনি এ জবাব দেন- رَاَيْتُ نُوْرًا হুযুরের (স) প্রথম এরশাদের অর্থ ইবনুল কাইয়েম তাঁর যাদুল মায়াদে এভাবে বর্ণনা করেছেন- আমার এবং রবের দর্শনের মধ্যে নূর প্রতিবন্ধক ছিল। দ্বিতীয় এরশাদের অর্থ তিনি এভাবে বর্ণনা করেন- আমি আমার রবকে দেখিনি, বরঞ্চ ব্যস একটা নূর দেখেছি।

নাসায়ী এবং ইবনে আবি হাতেম হযরত আবুযর গিফারীর (রা) বক্তব্য এ ভাষায় নকল করেছেন- রসূলুল্লাহ (স) তাঁর রবকে মন দিয়ে দেখেছেন, চোখ দিয়ে দেখেননি।

হযরত আবু মুসা আশয়ারীর (রা) বর্ণনা

হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) থেকে ইমাম মুসলিম কিতাবুল ঈমানের এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, হুযুর (স) বলেছেন ما انتهى اليه بصر من خلقه আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্ট জীবের মধ্য থেকে কারো দৃষ্টি তিনি পর্যন্ত পৌছেনি।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাসের (রা) বর্ণনা

মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞেস করা হলো- ولقد راه نزلة اخرى এবং ما كذب الفؤاد ما راى -
এ দুটি আয়াতের অর্থ কি?

জবাবে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স) তাঁর রবকে দু'বার মনের চোখ দিয়ে দেখেন। এ বর্ণনা মুসনাদে আহমদেও আছে।

ইবনে মারদুইয়া আতা বিন আবি রাবাহ্র বরাত দিয়ে ইবনে আব্বাসের (রা) এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেন যে, নবী (স) আল্লাহ্ তায়ালাকে চোখ দিয়ে দেখেননি, মন দিয়ে দেখেছেন।

নাসায়ীতে একরেমার বর্ণনা আছে যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন,

اتعجبون ان تكون الخلة لابراهيم والكلام لموسى
والرؤية لمحمد -

তোমরা কি একথায় বিস্ময় বোধ করছ যে ইব্রাহীমকে (আ) আল্লাহ্ তায়ালা খলীল (বন্ধু) বানিয়েছেন, মূসা (আ) এর সাথে কথা বলেছেন এবং মুহাম্মদকে (স) দর্শনের মর্যাদা দিয়েছেন?

হাকেম এ বর্ণনা নকল করেছেন এবং একে সঠিক বলেছেন।

তিরমিযিতে শা'বীর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ইবনে আব্বাস (রা) এক বৈঠকে বলেন, আল্লাহ্ তাঁর দর্শন ও কথনকে মুহাম্মদ (স) এবং মূসার (আ) মধ্যে বন্টন করে দেন। মূসার (আ) সাথে তিনি দু'বার কথা বলেন এবং মুহাম্মদ (স) তাঁকে দু'বার দেখেন।

ইবনে আব্বাসের (রা) এ বক্তব্য শুনার পর মাসরুক হযরত আয়েশার (রা) নিকটে যান এবং জিজ্ঞেস করেন, মুহাম্মদ (স) কি তাঁর রবকে দেখেছেন?

তিনি বলেন, তোমার কথায় আমার শরীর রোমাঞ্চিত হলো।

তারপর হযরত আয়েশা (রা) এবং মাসরুকের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তা আমরা উপরে হযরত আয়েশার (রা) বর্ণনায় উল্লেখ করেছি।

তিরমিযিতেই ইবনে আব্বাসের (রা) দ্বিতীয় যে বর্ণনা নকল করা হয়েছে তাঁতে একস্থানে তিনি বলেন, হুযুর (স) আল্লাহ্কে দেখেছিলেন। দ্বিতীয় স্থানে বলেন, দু'বার দেখেছিলেন। তৃতীয় স্থানে বলেন, তিনি আল্লাহ্কে মন দিয়ে দেখেছিলেন।

মুসনাদে আহমদে ইবনে আব্বাস (রা) এর একটি বর্ণনা এ ধরনের আছে-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي تبارك وتعالى.

আমার মহান রব আল্লাহ্ তায়ালাকে আমি দেখেছি, দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني ربي الليلة في احسن صورة احسبه يعني في النوم -

রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, আজ রাতে আমার রব অতি সুন্দর আকৃতিতে আমার নিকটে আসেন। আমি মনে করি হুযুরের (স) একথা বলার অর্থ এই যে, স্বপ্নে তিনি আল্লাহ্ তায়ালাকে দেখেছিলেন।

তাবারানী এবং ইবনে মারদুইয়া ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ ধরনের একটা বর্ণনাও নকল করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (স) দু'বার তাঁর রবকে দেখেছিলেন। একবার চোখ দিয়ে এবং দ্বিতীয় বার মন দিয়ে।

মুহাম্মদ বিন কাব আল কুরাযীর বর্ণনা

মুহাম্মদ বিন কাব আল কুরাযী বলেন- রসূলুল্লাহ্কে (স) কতিপয় সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন? হুযুর (স) জবাবে বলেন, আমি দু'বার তাঁকে মন দিয়ে দেখেছি (ইবনে হাতেম)। এ বর্ণনাকে ইবনে জারীর এ ভাষায় নকল করেছেন, আমি তাঁকে চোখ নয় মন দিয়ে দু'বার দেখেছি।

হযরত আনাসের (রা) বর্ণনা

হযরত আনাস বিন মালেক এর একটি বর্ণনা যা মে'রাজ প্রসংগে শরীক বিন আবদুল্লাহর বরাত দিয়ে ইমাম বুখারী কিতাবুত্তাওহীদে উদ্ধৃত করেছেন তা এই যে-

حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنى فاوحى الله فيما اوحى اليه خمسين صلوة -

- অর্থাৎ যখন তিনি সিদরাতুল মুন্তাহায় পৌছলেন, তখন আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যৎ তাঁর নিকটে এলেন এবং তাঁর উপর ঝুলে রইলেন। এমনকি তাঁর এবং আল্লাহ্র মাঝে দুটি ধনুকের অথবা তার কম পরিমাণ দূরত্ব রয়ে গেল। তারপর আল্লাহ্ তাঁর উপরে যেসব অহী করলেন তার মধ্যে পঞ্চাশ নামাযের হুকুমও ছিল।

এ বর্ণনার সনদ এবং বিষয়বস্তুর উপরে ইমাম খাত্তাবী, হাফেজ ইবনে হাজার, ইবনে হাযম এবং হাফেজ আবদুল হক যে সব ওজর আপত্তি তুলেছেন সে সবের বড় আপত্তি এই যে, এ কুরআনের সুস্পষ্ট খেলাপ, কারণ কুরআন দুটি পৃথক দর্শনের উল্লেখ করছে। একটি প্রথমে সুউচ্চ দিগ্বলয়ে ঘটে এবং তারপর নিকটে আসতে আসতে এতোটা নিকটে আসে যে, নবী (স) এবং তার মধ্যে দুটি ধনুক অথবা তার কম পরিমাণ দূরত্ব রয়ে যায়। প্রথমে এ ঘটনা ঘটে। দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে। কিন্তু এ বর্ণনা দুটি দর্শনকে একত্রে মিলিয়ে একাকার করে দিয়েছে এ জন্যে কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে এটাকে কিছুতেই মেনে নেয়া যায়না।

এখন রইলো ঐসব বর্ণনা যা উপরে আমরা উদ্ধৃত করেছি। তবে সে সবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা তাই যা হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) এবং হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে কারণ তাঁরা উভয়ে মতৈক্য সহকারে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (স) এর এ এরশাদ বয়ান করেন যে, এ উভয় অবস্থাতেই তিনি আল্লাহকে দেখেননি, বরঞ্চ হযরত জিব্রিলকে (আ) দেখেছেন। আর এ বর্ণনাগুলো কুরআনের ব্যাখ্যা ও ইংগিতের সাথে পুরোপুরি সংগতিশীল। উপরন্তু তার সমর্থন হুযুর (স) এর ঐসব বক্তব্য থেকেও পাওয়া যায় যা হযরত আবুযর গিফারী (রা) এবং হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) তাঁর থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এর বিপরীত হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) থেকে যে সব বর্ণনা হাদীস গ্রন্থগুলোতে উদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্যে ভয়ানক গরমিল পাওয়া যায়। কারো মধ্যে তিনি উভয় দর্শনকে চাক্ষুষ বলছেন, কারো মধ্যে উভয়কে মনের দেখা বলছেন। কোন বর্ণনায় একটি চাক্ষুষ এবং অন্যটি মনের দেখা বলছেন। কোন বর্ণনায় চাক্ষুষ দেখা একেবারে অস্বীকার করছেন। এসবের মধ্যে কোন একটি বর্ণনাও এমন নয় যাতে তিনি রসূলুল্লাহ্র (স) নিজস্ব কোন বক্তব্য উদ্ধৃত করছেন। যেখানে তিনি স্বয়ং হুযুরের (স) কথা উদ্ধৃত করছেন সেখানে প্রথমতঃ কুরআনে বর্ণিত এ দুটি দর্শনের কোন একটিরও উল্লেখ নেই। উপরন্তু তাঁর এক বর্ণনার ব্যাখ্যা অন্য বর্ণনা দ্বারা এতোটুকু জানা যায় যে, হুযুর (স) কোন সময়ে জাগ্রত অবস্থায় নয়, স্বপ্নে আল্লাহ্ তায়ালাকে দেখেছেন। এ কারণে এ আয়াতগুলোর তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) এর বর্ণনার উপর আস্থা স্থাপন করা যায়না। এরূপ মুহাম্মদ বিন কা'ব আল্ কুরাযীর বর্ণনা যদিও রসূলুল্লাহ্র (স) একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করছে, কিন্তু তার মধ্যে এসব সাহাবায়ে কেরামের নামের কোন বিবরণ নেই যারা হুযুর (স) থেকে এ কথা শুনেছেন। উপরন্তু তার মধ্যে একটিতে বলা হয়েছে যে, হুযুর (স) চাক্ষুষ দর্শন একেবারে অস্বীকার করেছেন।

নির্দেশিকা

১. গ্রন্থকার কর্তৃক পরিবর্ধন।
২. তাফহীমুল কুরআন বনী ইসরাইল, ভূমিকা ও টীকা ১।
৩. গ্রন্থকার কর্তৃক পরিবর্ধন।
৪. বেতার ভাষণ ২০ শে আগস্ট ১৯৪১ (সংক্ষেপিত)।
৫. বেতার ভাষণ ৩০ শে জুলাই ১৯৪৪।
৬. গ্রন্থকার কর্তৃক পরিবর্ধন।
৭. বেতার ভাষণ ৫ই জুন ১৯৪৮।
৮. তাফহীমুল কুরআন বনী ইসরাইল টীকা ৯৯-১০০।
৯. তাফহীমুল কুরআন বাকারাহ্ টীকা ৩৪২।
১০. তাফহীমুল কুরআন নাজম, টীকা ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪।

দ্বাদশ অধ্যায়

মক্কী যুগের শেষ তিন বছর

এর আগে আমরা হুযুরের (স) তায়েফ সফরের উল্লেখ করেছি- যা নবুওতের ১০ম বর্ষে সংঘটিত হয়। সে অভিজ্ঞতার আলোকে নবী (স) বুঝতে পেরেছিলেন কুরাইশের পক্ষ থেকে যেমন কোন মংগল আশা করা যায়না, ঠিক তেমনি বনী সাকীফ্ থেকেও এ আশা করা যায় না। তারা তাঁর দাওয়াত কবুল করা তো দূরের কথা তা বরদাশত করতেও প্রস্তুত নয়। বরঞ্চ তায়েফে তাঁর উপর যে জুলুম নির্যাতন করা হয়েছে, দশ বছরের দীর্ঘ সংঘাত-সংঘর্ষে তা মক্কায় একদিনও করা হয়নি। এভাবে মক্কা ও তায়েফবাসীদের থেকে নিরাশ হয়ে তিনি আরবের অন্যান্য গোত্রদের প্রতি দৃষ্টি দেন- যারা ওকাজ, মাজান্না ও যুল-মাজাযের মেলাগুলোতে এবং হজ্বের সময় মিনায় একত্র হতো। যদিও ইতিপূর্বে সাধারণ দাওয়াতের জন্যে তিনি এসব সমাবেশে প্রত্যেক গোত্রের শিবিরে যেতেন। কিন্তু সে সময়ে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শুধু দাওয়াত ইলাল্লাহ্ পেশ করা। কিন্তু এখন তিনি এ দাওয়াত পেশ করার সাথে সাথে এ কথাও বলা শুরু করেনঃ 'তোমরা আমাকে তোমাদের সাহায্য-সহযোগিতায় নিয়ে নাও এবং আমার সহযোগিতা কর, যেন আমি আমার রবের বাণী লোকের কাছে পৌঁছাতে পারি।

এসব স্থানে আবু জাহল, আবু লাহাব এবং কুরাইশের অন্যান্য শয়তানরা হুযুরের (স) পেছনে লেগে থাকত এবং গোত্রগুলোকে হুশিয়ার করে দিত যেন তারা তাঁর কথা না শুনে। নতুবা তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। অনেক সময় এসব দুষ্ট লোক নবীর (স) প্রতি পাথর নিক্ষেপও করতো। কেউ বা মাটি নিক্ষেপ করতো। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও হুযুর (স) তাঁর কাজ করেই যেতেন। তাছাড়া মক্কার বাইর থেকে কোন প্রভাবশালী লোক, ওমরা, জিয়ারত অথবা ব্যবসার উদ্দেশ্যে যখন আসতো, তাঁর সাথেও তিনি সাক্ষাৎ করতেন এবং তার কাছে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করতেন। সেই সাথে এ কথাও বলতেন, তোমরা এ তবলিগে হকের কাজে আমাকে সাহায্য কর এবং তোমাদের এলাকায় আমাকে নিয়ে চল।

সেসব গোত্র যাদের সাথে তিনি মিলিত হন

হুযুর (স) তাঁর দাওয়াত পৌঁছাবার জন্যে অধিকাংশ গোত্রের কাছে যান যাদের তালিকা দৃষ্টে জানা যায় যে, আরবের পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম এবং দক্ষিণ প্রান্ত থেকে উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত কোন প্রভাবশালী ও শক্তিশালী গোত্র এমন ছিল না যার সাথে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেননি। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোত্র নিম্নরূপ ঃ

১. কেন্দাহ্- দক্ষিণ আরবের এক বিরাট গোত্র। হাদারা-মাওত থেকে ইয়ামেন পর্যন্ত তার এলাকা বিস্তৃত ছিল।

২. কাল্‌ব- কোযায়ার একটি শাখা। যাদের এলাকা বিস্তৃত ছিল- উত্তর আরবের 'দুমাতুল জান্দাল' থেকে তবুক পর্যন্ত।

৩. বনী বকর বিন ওয়ায়েল- এ আরবের বড়ো সংগ্রামপ্রবণ গোত্রগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

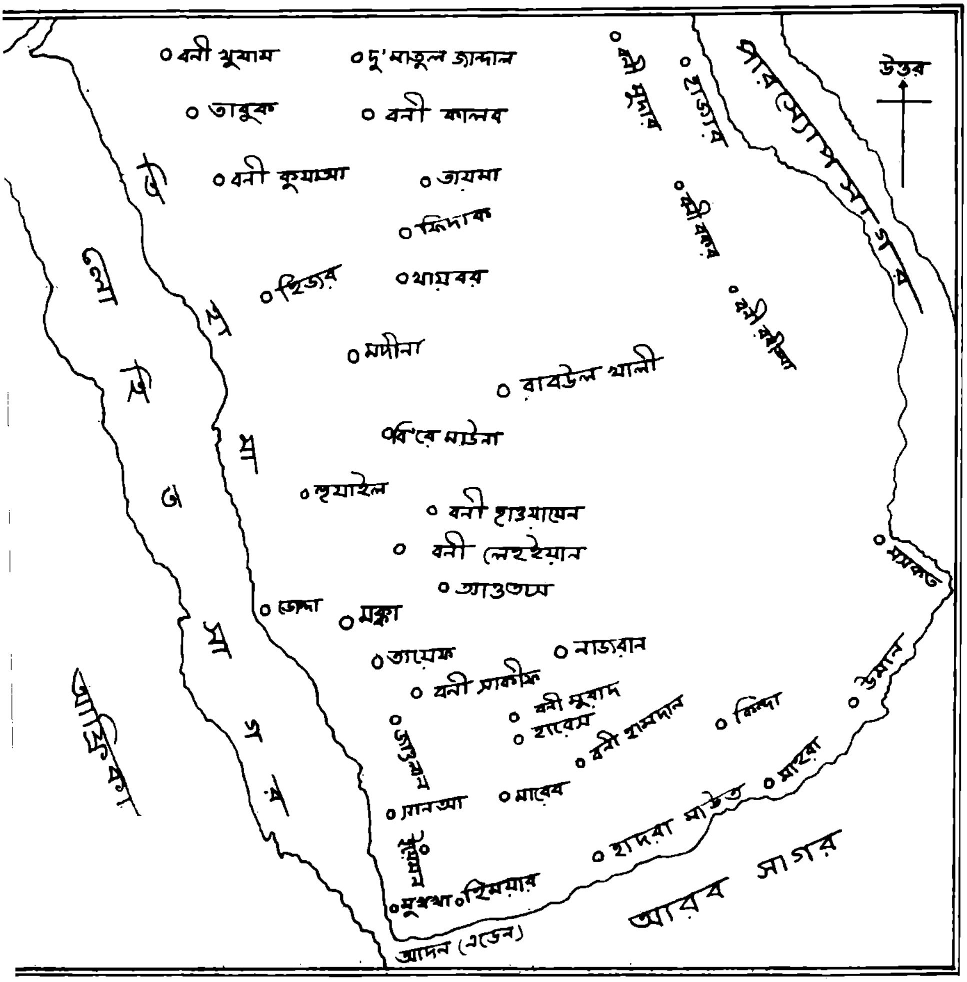

রসূলের যুগে আরব গোত্রসমূহের অঞ্চল

মধ্য আরব থেকে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত তার শাখা ছড়িয়ে ছিল। ৩৩০ খৃষ্টাব্দে এ গোত্রটি সর্বপ্রথম ইরান সাম্রাজ্যের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অতঃপর নবীর যুগে পুনরায় ইরানের সাথে যুদ্ধ বাধে যাতে ইরান পরাজয় বরণ করে। ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'জংগে যি-কার' নামে অভিহিত।

৪. বনী আল্ বাক্কা- বনী আমের বিন সা'সায়ার একটি শাখা। মক্কা ও ইরাক সীমান্ত পথে এদের অবস্থান ছিল।

৫. সা'লাবা বিন ওকাবা- বনী সা'লাবা বিন ওকাবার একটি শাখা।

৬. বনী শায়বান বিন সা'লাবা- বনী সা'লাবা বিন উকাবার একটি শাখা।

৭. বনী আল হারেস বিন কা'ব- বনী তামীমের একটি শাখা।

৮. বনী হানীফা- এ ছিল বনী বকর বিন ওয়ায়েলের একটি শাখা যা ইয়ামামায় বাস করতো। মুসায়লামা কায্যাব এ গোত্রভুক্ত ছিল। হযরত আবু বকরের (রা) সময়ে ইরতিদাদের যে ফেৎনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তাতে এ গোত্রই মুসলমানদের সাথে ভয়ানক যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। আরবের প্রখ্যাত যুদ্ধপ্রবণ গোত্রগুলোর মধ্যে এ একটি ছিল।

৯. বনু সুলায়েম- কায়সে আইলান গোত্রগুলোর মধ্যে এ এক বৃহৎ গোত্র ছিল। তাদের বাসস্থান ছিল খয়বরের নিকটস্থ- নজদের উচ্চতর অঞ্চল। 'ওয়াদিউল কুরা এবং 'তায়মা' পর্যন্ত এরা ছড়িয়ে ছিল।

১০. বনী আমের বিন সা'সায়া-এ 'হাওয়ায়েন'- এর একটি শাখা। হাওয়াযেন কায়সে আইলানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরা নজদে বসবাস করতো। অতঃপর তায়েফের এক অংশেও তারা পৌঁছে যায়। গ্রীষ্মে তায়েফে এবং শীতে নজদে কাটাতো।

১১. বনী আব্বাস- এ আইলানের একটি শাখা বনী গাতফানের এক বিরাট অধস্তন গোত্র ছিল। নজদে বসবাস করতো এবং যুদ্ধপ্রবণ ছিল। জাহেলিয়াতের যুগে অন্যান্য গোত্রের সাথে তাদের যুদ্ধ চলতো দীর্ঘকাল যাবত। সে সবের মধ্যে ওয়াহেস্ ও গাবরার যুদ্ধ ছিল ইতিহাসে বিখ্যাত।

১২. বনী ওয্‌রা- এ বনী আবদুল্লাহ্ বিন গাতফানের একটি শাখা ছিল।

১৩. গাস্‌সান- এ দক্ষিণ আরবের একটি বড়ো কওম যা উত্তর আরবে গিয়ে বসবাস করে। এদের মধ্যে বিভিন্ন গোত্র ছিল- যাদের মধ্যে ঈসায়ী ও মুশরিক ছিল। রোমীয় সাম্রাজ্যের অধীন গাস্‌সানীদের একটি রাষ্ট্রও ছিল।

১৪. ফাযারা- এ গাতফান অধঃস্তন গোত্রগুলোর এক বিরাট গোত্র ছিল। এরা নজদ ও ওয়াদিউল কুরাতে বসবাস করতো।

১৫. বনী আবদুল্লাহ্- এ কালবের অধঃস্তন গোত্রগুলোর একটি ছিল।

১৬. বনী মহারিব বিন খাসামা- এ আদনানী গোত্রগুলোর একটি ছিল।

বহু গোত্রের মধ্যে মাত্র কয়টির উল্লেখ এখানে করা হলো যাদের সাথে হুযুর (স) সাক্ষাৎ করে দাওয়াত পেশ করেন। এ সংক্ষিপ্ত তালিকা এ জন্যে পেশ করা হলো যে, আপন দাওয়াতের এ পর্যায়ে হুযুর (স) বেছে বেছে এমন সব গোত্রের কাছে যান যারা স্বীয় সংখ্যা, স্বীয় মর্যাদা, স্বীয় সাধারণ শক্তি এবং অন্যান্য গোত্রের সাথে নিজেদের সম্পর্কের ভিত্তিতে এমন মর্যাদা-সম্পন্ন ছিল যে, তাদের মধ্যে কোন একটি গোত্র যদি তাঁর কথা মেনে নিত এবং ইসলামী দাওয়াতের জন্যে বদ্ধপরিকর হতো, তাহলে আশা করা যেতো যে, তদ্দরুণ দ্বীন বড়ো শক্তি সঞ্চার করতে পারতো।

গোত্রগুলোর সাথে সাক্ষাতের বিবরণ

আরব গোত্রগুলোর সাথে সাক্ষাতকালে রসূলুল্লাহকে (স) বিভিন্ন ধরনের লোকের সম্মুখীন হতে হয়। মূসা বিন ওকবা মাগাযীতে বলেন, অধিকাংশ গোত্রের জবাব এ ছিলঃ লোকের কওম তাকে বেশী ভালো জানতো। এমন এক ব্যক্তি কি আমাদের জন্যে মংগলদায়ক হতে পারে যে তার আপন কওমের মধ্যে ফাসাদ ও বিরোধ বিসংবাদ সৃষ্টি করেছে এবং তার কওম তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে? আবার কোন কোন গোত্র তাঁর দাওয়াত শুধু প্রত্যাখ্যানই করেনি, তাঁর সাথে অসদাচরণও করেছে। ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে- ইবনে জারীর, ইবনে হিশাম ও ইবনে কাসীর বলেন যে, হুযুর (স) কিন্দার শিবিরে গিয়ে তাদের সহযোগিতা চান। কিন্তু তারা সে কথা মেনে নিতে অস্বীকার করে। বনী আবদুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পিতাকে সুন্দর নাম দিয়েছেন। তোমরা আমার সহযোগি হও। কিন্তু তারাও অস্বীকার করে। বনী হানিফার সাথে সাক্ষাৎ করলে তাদের জবাব অন্যান্য সকল গোত্র থেকে অধিকতর খারাপ ছিল। এছাড়াও কিছু গোত্র এমনও ছিল যাদের সাথে হুযুরের (স) সাক্ষাতের বড়ো চমৎকার অবস্থা হাদীস ও ইতিহাসবেত্তাগণ উদ্ধৃত করেছেন।

বনী হামদানের এক ব্যক্তির দ্বিধা প্রকাশ

ইমাম আহমদ, হাকেম এবং অন্যান্য মুহাদ্দসীন হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, হুযুর (স) এ কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলেন, "কেউ আছে কি যে আমাকে সাথে করে তার কওমের কাছে নিয়ে যাবে?"

এমন সময়ে হামদান গোত্রের একজন তাঁর কাছে এলো এবং তাঁর কথা মেনে নিল। তারপর তার আশংকা হলো কি জানি তার কওম তার এ কথা মানে কিনা। অতএব সে পুনরায় ফিরে এসে বল্লো, আমি গিয়ে আমার কওমের সাথে কথা বলব। তারপর আগামী বছর হজ্বের সময় আপনার সাথে দেখা করব।

বনী বকর বিন ওয়ায়েলের সাথে সাক্ষাৎ

হাফেজ আবু নুয়াইম এবং এহিয়া বিন আল্‌উমাবী কালবীর বরাত দিয়ে বলেন, হুযুর (স) বনী বকর বিন ওয়ায়েলের সাথে মিলিত হন এবং কথা প্রসংগে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমাদের সামরিক শক্তি কেমন?"

তারা বলে, আমরা ইরানের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি রাখিনা এবং তার মুকাবেলায় কারো নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করতে পারিনা।

হুযুর (স) বলেন, এমন এক সময় আসবে যখন তোমরা তাদের জনপদে উপনীত হবে, তাদের নারীদেরকে বিয়ে করবে এবং তাদের ছেলেদেরকে গোলাম বানাবে। একথা বলে তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন এবং আবু লাহাব সেখানে পৌছে। সে তাদেরকে বলে, এ ব্যক্তি আমাদের নিকটে বড়ো মর্যাদা সম্পন্ন ছিল, কিন্তু তার মতিভ্রম হয়েছে।

তারা জবাবে বলে, সে যখন ইরানীদের উল্লেখ করে তখন আমরা এটাই মনে করেছিলাম।

এর থেকে অনুমান করা যায় যে, সে সময়ে কোন আরব এ ধারণাই করতে পারতোনা যে, ইরানের মতো এমন বিরাট সাম্রাজ্যের উপর আরববাসী বিজয়ী হবে। তাদের দৃষ্টিতে এমন

কথা একজন পাগলই বলতে পারতো। কিন্তু কথাবার্তার পর পনেরো-ষোল বছর অতিবাহিত হতে না হতেই তারা স্বচক্ষে সে বস্তুই দেখতে পেলো যার উল্লেখ তারা পাগলামি মনে করতো।

বনী আমের বিন সা'সায়ার সাথে সাক্ষাৎ

ইবনে ইসহাক ইমাম যুহরীর বরাত দিয়ে বলেন যে, হুযুর (স) বনী আমের বিন সা'সায়ার শিবিরে গমন করেন এবং তাদের সামনে তাঁর কথা রাখেন। তাদের মধ্যে একজন বুহায়রা বিন ফেরাস্ বলে, খোদার কসম, কুরাইশের এ যুবককে যদি আমি আমার সাথে নিয়ে নেই তো তার মাধ্যমে গোটা আরব বশীভূত করে ফেলব। তারপর সে হুযুরকে (স) বলে, যদি আমরা আপনার সাথে সহযোগিতা করি এবং আল্লাহ্ আপনাকে বিরোধিদের উপর বিজয়ী করেন, তাহলে আপনার পরে কি শাসন ক্ষমতা আমাদের হাতে আসবে? হুযুর (স) বলেন, এ ব্যাপার তো আল্লাহ্র হাতে। তিনি যাকে চান তাকে শাসন ক্ষমতা দান করেন। তখন সে বলে, তাহলে আমরা কি আপনার খাতিরে আমাদের গলদেশ আরবদের লক্ষ্য বানাবার জন্যে পেশ করব এবং আল্লাহ্ যখন আপনাকে বিজয় দান করবেন তখন শাসন ক্ষমতা আমাদের পরিবর্তে অন্যরা লাভ করবে? যান, আপনার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।

হজ্বের শেষে যখন এসব লোক বাড়ি ফিরে যায়, তখন তারা তাদের হজ্বের অবস্থা এমন এক শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধলোককে জানালো যিনি বার্ধক্যের জন্যে হজ্ব ও অন্যান্য মেলায় যোগদান করতে পারতেননা। তারা তাঁর নিকটে এ কথাও বল্লো, আমাদের নিকটে কুরাইশের মধ্য থেকে বনী আবদুল মুত্তালিবের এক যুবক এসেছিল, যে এ দাবী করতো যে, সে একজন নবী এবং আমাদেরকে বলছিল- "তোমরা আমার সহযোগিতা কর এবং আমাকে তোমাদের এলাকায় নিয়ে চল।" কিন্তু তার সাথে আমাদের এ কথা হয়েছিল এবং শেষে তাকে এ জবাব দিয়ে বিদায় করে দিই। এ কথা শুনার পর সে বৃদ্ধ আপন মস্তক চেপে ধরে বলেন, হে বনী আমের! এর কি কোন প্রতিকার হতে পারে? এ হাত ছাড়া সুযোগ কি আর ফিরে আসতে পারে? সেই খোদার কসম, যার মুষ্টির মধ্যে আমার প্রাণ, কোন ইসমাইলী এমন কথা মিথ্যার আবরণে কখনো বলতে পারেনা। তিনি অবশ্যই নবী। তোমাদের বিবেক তখন কোথায় ছিল?

বনী শায়বান বিন সা'লাবার সাথে সাক্ষাৎ

আবু নুয়াইম, হাকেম ও বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস থেকে হযরত আলীর (রা) এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন যে, তিনি (হযরত আলী রা) বলেন, আমি একবার রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বকরের (রা) সাথে মিনায় গোত্রগুলোর সাথে দেখা-সাক্ষাতের কাজ করছিলাম। ঘোরাফেরা করতে করতে আমরা একটি বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন সমাবেশে পৌছলাম। তার নেতৃবৃন্দ বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। হযরত আবু বকর (র) জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের পরিচয়? তাঁরা জবাবে বলেন, আমরা বনী শায়বান বিন সা'লাবার লোক। হযরত আবু বকর (রা) হুযুরকে (স) বলেন, আমার মা-বাপ আপনার জন্যে কুরবান হোক, এঁদের থেকে সম্মানিত লোক আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এ বৈঠকে মাফরুক বিন আমর, হানী বিন কাবিসা, মুসান্না বিন হারেসা ও নো'মান বিন শারিক উপস্থিত ছিলেন। মাফরুক হযরত আবু বকরের (রা) নিকটেই বসেছিলেন।

তিনি বলেন, সম্ভবতঃ আপনারা কুরাইশের লোক? হযরত আবু বকর (রা) বলেন, সম্ভবতঃ আপনারা শুনেছেন যে, এখানে আল্লাহর রসূল প্রেরিত হয়েছেন। তিনিই এ ব্যক্তি। মাফরুক বলেন, হাঁ, এ কথা আমাদের কাছে পৌঁছেছে। অতঃপর তিনি হুযুরের (স) দিকে মনোনিবেশ করলেন। হুযুর (স) বলেন, আমি আপনাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি যে, আপনারা এ সাক্ষ্য দেন আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং সাক্ষ্য দেন যে আমি আল্লাহর রসূল। আর এই যে, আপনারা আপনাদের ওখানে আমাকে আশ্রয় দিন এবং আমার মদদ করুন যাতে সে দায়িত্ব আমি পালন করতে পারি যা আল্লাহ আমার উপর অর্পণ করেছেন। কারণ কুরাইশ আল্লাহর কাজ রুখবার জন্যে জোটবদ্ধ হয়েছে। আল্লাহর রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং হকের পরিবর্তে বাতিল নিয়ে মগ্ন রয়েছে। অথচ আল্লাহ মানুষের মুখাপেক্ষী নন এবং আপন সত্তায় সপ্রশংসিত।

মাফরুক বলেন, হে কুরাইশ ভাই! আপনি আর কোন্ জিনিসের দাওয়াত দেন? হুযুর (স) সূরা আন্‌য়ামের ১৫১-১৫৩ আয়াত- তেলাওত করেন-

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ۔ (الانعام : ١٥١ ـ ١٥٣)

(১৫১) - হে মুহাম্মদ (স), এ লোকদের বল যে, এসো আমি তোমাদের শুনাবো তোমাদের রব তোমাদের উপর কি কি হারাম করেছেন। তা এই যে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবেনা। পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। নিজেদের সন্তান দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করবেনা। আমি তোমাদেরও রিযিক দিই, তাদেরও দেব। নির্লজ্জতার ধারে-কাছেও যেয়োনা, তা প্রকাশ্যই হোক কি গোপন। কোন মানুষ যাকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন হত্যা করোনা, অবশ্যি ন্যায় সংগত হলে অন্য কথা। এ সব কথা যা পালনের জন্যে তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। সম্ভবতঃ তোমরা বুঝে শুনে কাজ করবে।

(১৫২) আরও এই যে তোমরা এতিমের মালের নিকটেও যাবেনা। অবশ্যি এমন নিয়ম ও পন্থায় যা সবচেয়ে ভালো, যতোদিন পর্যন্ত না সে সাবালক হয়েছে। আর ওজনে পুরোপুরি ইনসাফ কর। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর দায়িত্বের বোঝা ততোখানি দিই যতোখানি বহন করার শক্তি তার আছে। কথা বল্লে ইনসাফের কথা বলবে নিজের আত্মীয়ের ব্যাপার হোক না কেন। খোদার ওয়াদা পূরণ কর। এসব বিষয়ের হেদায়েত আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন হয়তো তোমরা নসিহত কবুল করবে।

মাফরুক বলেন, হে কুরাইশ ভাই, আপনি আর কোন্ জিনিসের দাওয়াত দেন? খোদার কসম, এ দুনিয়াবাসীর কালাম নয়। তাদের কালাম হলে আমরা চিনতে পারতাম। তখন হুযুর (স) সূরা নহলের ৯০ আয়াত তেলাওত করেন-

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَائِ ذِى الْقُرْبٰى ... (النحل ٩٠)

আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন- ইনসাফ, অনুগ্রহ করার ও আত্মীয়-স্বজনকে দেয়ার জন্যে। আর নিষেধ করছেন- নির্লজ্জতা, পাপাচার ও জুলুম-নিপীড়ন করতে। তিনি তোমাদের নসিহত করছেন- যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।

মাফরুক বলেন, খোদার কসম, হে কুরাইশ ভাই, আপনি সর্বোৎকৃষ্ট নৈতিক গুণাবলী ও ভালো কাজে দাওয়াত দিয়েছেন। বড়ো বিবেকহীন সে কওম যে আপনাকে অস্বীকার করেছে এবং আপনার বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছে। তারপর হানী বিন কাবিসার দিকে ইংগিত করে মাফরুক বলেন, ইনি আমাদের মুরব্বী ও ধর্মীয় নেতা।

হানী বলেন, হে কুরাইশী ভাই, আপনার কথা আমি শুনেছি। তা সত্য বলে স্বীকার করছি। কিন্তু আমাদের একই বৈঠকে নিজেদের দ্বীন পরিত্যাগ করে আপনার আনুগত্য করা বড়ো তাড়াহুড়া করা হবে। পেছনে আমাদের এক কওম আছে। তাদের পরামর্শ ও অভিমত ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত করে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া ঠিক হবেনা। আমরা ফিরে যাচ্ছি এবং আপনিও যান। আমরা এর পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করব এবং আপনিও দেখুন ব্যাপার কতদূর পর্যন্ত গড়াচ্ছে।

একথা বলে হানী মুসান্না বিন হারেসের সাথে হুযুরের (স) পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, ইনি আমাদের শায়খ ও জংগী সর্দার (সেনাপতি)।

মুসান্না বলেন, হে কুরাইশী ভাই, আমি আপনার কথা শুনেছি ও তা পছন্দ করেছি। কিন্তু আমার জবাব তাই যা হানী দিয়েছেন। একই বৈঠকে আমাদের দ্বীন পরিত্যাগ করে আপনার আনুগত্য স্বীকার করা ঠিক হবেনা। আমরা এমন স্থানে থাকি যেখানে আমাদের দুটি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়, একটি ইয়ামামা এবং দ্বিতীয়টি সামাওয়া[১]।

রসূলুল্লাহ (স) বলেন, এ দুটি কি?

মুসান্না- এক তো পাহাড় ও আরব ভূখন্ড, দ্বিতীয়- ইরানের এলাকা এবং কিস্‌রার নদ-নদী। কিস্‌রা আমাদের কাছ থেকে শপথ নিয়েছে যে- না আমরা স্বয়ং প্রচলিত নিয়ম বিরোধী কোন নতুন কাজ করব আর না এমন কাজ যে করতে চায় তাকে আমাদের এখানে কোন স্থান দেব। আপনি যে জিনিসের দিকে আমাদের আহ্বান জানাচ্ছেন– তা সম্ভবতঃ বাদশাহগণ সহ্য করবেননা। আরব ভূখন্ডের ব্যাপারে কথা এই যে, এতে আমাদের দোষক্রটি ক্ষমার যোগ্য হতে পারে। যদি আপনি চান যে আরবের মুকাবেলায় আমরা আপনার সহযোগিতা করি, তো তা আমরা করতে পারি। কিন্তু পারস্যের মুকাবেলা করা আমাদের সাধ্যের অতীত।

রসূলুল্লাহ (স) বলেন, আপনারা সত্য কথা বলে থাকলে মন্দ কিছু করেননি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহর দ্বীনকে নিয়ে যে দাঁড়িয়ে যায় সে কোন ব্যতিক্রম কিছু করেনা, সকল দিক দিয়ে তার সহযোগিতা করে। আপনারা একটু সবর করুন, তাহলে আল্লাহ পারস্যবাসীদের দেশ ও ধনসম্পদ আপনাদেরকে দান করবেন এবং তাদের কন্যাদেরকে আপনাদের অধীন করে দেবেন। আপনারা কি আল্লাহর তস্‌বিহ ও তাকদীস্‌ করবেন?

নো'মান বিন শারীক বলেন, হে কুরায়শী ভাই, আপনার এ কথা আমরা মেনে নিলাম। তারপর হুযুর (স)-

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا

পড়তে পড়তে উঠে পড়েন এবং হযরত আবু বকরের (রা) হাত ধরে বিদায় হন।

বনী আব্বাসের সাথে সাক্ষাৎ

ওয়াকেদী আবদুল্লাহ বিন ওয়াবেসাতুল আব্‌সী থেকে তাঁর দাদার এ বয়ান উদ্ধৃত করেন, আমাদের গোত্র বনী আব্‌স মসজিদে খায়েফের নিকটে জামরাতুল উলার সন্নিকটে অবস্থান করছিল। রসূলুল্লাহ (স) আমাদের থাকার জায়গায় তশরিফ আনেন। যায়েদ বিন হারেসা (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন এবং

১. ইরাকের সে অংশ যা আরব উপদ্বীপের সাথে সংলগ্ন -গ্রন্থকার।

আমরা তা কবুল করি। ইতিপূর্বেও প্রত্যেক হজ্বের সময় তিনি আমাদের শিবিরে আসতেন এবং তাঁর দাওয়াত আমরা কখনো কবুল করিনি। এবার যখন তিনি আমাদের নিকট এলেন তখন মায়সারা বিন মাসরুক আল্ আবসী আমাদের সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, খোদার কসম! যদি আমরা তাঁর সত্যতা স্বীকার করি এবং তাঁকে নিয়ে গিয়ে আমাদের এলাকার কেন্দ্রীয় স্থানে রাখি তাহলে এ হবে একটা ন্যায়সংগত অভিমত। কারণ খোদার কসম, তিনি অবশ্যই বিজয়ী হবেন এবং পুরোপুরি বিজয়ী হবেন। কিন্তু কওমের লোকেরা বল্লো, রাখ ভাই, আমাদেরকে এমন কাজে ঠেলে দিওনা যার বোঝা বহন করার সাধ্য আমাদের নেই।

মায়সারা সম্পর্কে হুযুর (স) কিছু আশা পোষণ করে তাঁকে ডেকে নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, আপনার কালাম কত সুন্দর ও সুস্পষ্ট। কিন্তু আমার কওম আমার বিরোধিতা করছে। যদি তারাই সমর্থন না করে তো অন্যান্যরা তো দূরে পালাবে।

দীর্ঘকাল পর বিদায় হজ্বের সময় মায়সারা হুযুরের (স) সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি তাঁকে চিনতে পারেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! যখন প্রথম বার আপনি আমাদের শিবিরে আসেন তখন থেকে হরহামেশা আপনার আনুগত্যের অভিলাষী ছিলাম। কিন্তু যা হবার তা হয়েছে। এখন আমি এতো বিলম্বে মুসলমান হচ্ছি।

এভাবে আরবের সকল গোত্র সে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়, যা পায়ে হেঁটে তাদের কাছে আসে। আর মদীনাবাসী সে সৌভাগ্যবান লোক ছিলেন যারা স্বয়ং পায়ে হেঁটে তার কাছে যান এবং তা লাভ করেন। আমরা কিছুটা পেছনে ফিরে গিয়ে বলব যে, এ ভাগ্যবান বস্তির লোক কি কারণে মুহাম্মদ আরবীর (স) দাওয়াত কবুল করার জন্যে মানসিক দিক দিয়ে তৈরী ছিলেন।

আউস ও খায্‌রাজের প্রাথমিক ইতিহাস

৪৫০ অথবা ৪৫১ খৃষ্টাব্দে মারেব বাঁধ বা প্রাচীর ভেঙে যাওয়ার ফলে ইয়ামেনে বিরাট বন্যা হয়। এ কারণে সাবা কওমের এক ব্যক্তি আমর বিন আমের তার পরিবারের লোকজনসহ উত্তর দিকে স্থানান্তরিত হয়। তার এক পুত্র জুফ্‌নার সন্তানগণ শাম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। অঞ্চলটি গাস্‌সান নামে অভিহিত হয়। দ্বিতীয় পুত্র হারেসা হেজাযের পাহাড়পুঞ্জ এবং লোহিত সাগরের তটভূমির মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায় বসবাস করতে থাকে যে স্থানটিকে তাহামা বলা হয়। তার বংশধর খুযায়া নামে খ্যাত। তৃতীয় পুত্র সা'লাবার সন্তানদের মধ্যে একজন ছিল হারেসা যার দু'পুত্র একই মা- কায়লার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। এ দু'পুত্রের নাম ছিল আউস ও খায্‌রাজ। তাদের সন্তানগণ ইয়াস্‌রেব (মদীনা) গিয়ে বসতি স্থাপন করে,যেখানে ইহুদী পূর্ব থেকেই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিল। দীর্ঘকাল যাবত ইহুদীরা আউস ও খাযরাজের সন্তানদেরকে মূল শহর এবং তার সবুজ-শ্যামল ভূখন্ডে প্রবেশ করতে দেয়নি। ফলে তারা চারপাশের অনুর্বর ভূমিতে বড়ো কষ্টে জীবন যাপন করতে থাকে। অবশেষে তারা তাদের সমবংশীয় গাস্‌সানীদের সাহায্য প্রার্থনা করে। তারা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এসে ইহুদীদেরকে শহর থেকে বহিষ্কার করে দিয়ে আউস ও খাযরাজকে স্থান করে দেয়। ইহুদীদের দুটি গোত্র- বনী কুরায়জা ও বনী নাদীর শহরের উপকণ্ঠে বাস করতে বাধ্য হয় এবং একটি গোত্র বনী কায়নোকা খাযরাজ গোত্রের আশ্রয় নিয়ে শহরের এক মহল্লায় বসবাস করতে থাকে। বনী কুরায়জা ও বনী নাদীর যখন দেখলো যে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র বনী কায়নোকা খাযরাজের বন্ধু হয়ে গেছে, তখন তারা

আউস গোত্রের সাথে চুক্তি করে তাদেরকে বন্ধু বানিয়ে নেয়। তারপর আউস ও খাযরাজ পৌনে দু'শত বছর যাবত ইহুদীদের সাথে একই শহরে ও তার উপকণ্ঠে বসবাস করতে থাকে। এ সময়কালে এ দুটি আরব গোত্র একই বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও এবং পারস্পরিক বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও জাহেলিয়াতের ভিত্তিতে স্বয়ং একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। ইহুদী গোত্রগুলোও আপন আপন বন্ধু গোত্রগুলোকে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইন্ধনও যোগাতে থাকে। কারণ তাদের (আউস ও খাযরাজ) পারস্পরিক যুদ্ধে ইহুদীরা তাদের মংগল মনে করতো ও তাদের ঐক্য তাদের মৃত্যুর পরওয়ানা স্বরূপ ছিল। এভাবে পৌনে দু'শতকের মধ্যে ছোটো-খাটো বহু যুদ্ধ ছাড়াও এগারটি রক্তাক্ত সংঘর্ষ হয় যার মধ্যে সর্বশেষ যুদ্ধ- বুয়াসের যুদ্ধ- হিজরতের মাত্র পাঁচ বছর পূর্বে (নবুওতের ৮ম বর্ষে, ৬১৮ খৃঃ) সংঘটিত হয়- যাতে উভয় গোত্রের বড়ো বড়ো সর্দারগণ নিহত হন।[১] কিন্তু এসব যুদ্ধবিগ্রহ সত্ত্বেও মদীনাবাসীদের উপর ইহুদীদের ধর্মীয় প্রভাব এমন অধিক পরিমাণে ছিল যে, যে নারীর সন্তান হয়ে হয়ে মারা যেতো, সে মানত করতো। এরপর যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তাকে ইহুদী বানাবে। এ অবস্থার উল্লেখ ইবনে জারীর তাঁর তফসীরে আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাসের (রা) বরাত দিয়ে করেছেন। আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে আবি হাতিম এবং ইবনে হিব্বানও এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন- যা ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহেদ, সাঈদ বিন জুবাইর, শা'বী, হাসান বাসরী প্রমূখ থেকে বর্ণিত আছে।

এ ঐতিহাসিক পটভূমির প্রভাব

এ সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক অবস্থা যা বয়ান করা হলো, তার কারণে আউস এবং খাযরাজের উপর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে। তারা অন্যান্য সকল আরব গোত্রের বিপরীত তাদের ইসলাম কবুলের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে রেখেছিল এবং তার সুযোগ সামনে আসার সাথে সাথেই ওসব কারণে এরা এ দ্বীন এবং তার আহবায়ক সাইয়েদুনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দিকে ঝুঁকে পড়লো যেমন তৃষ্ণার্ত পানির দিকে ঝুঁকে পড়ে।

এ সবের মধ্যে প্রথম প্রভাব এ ছিল যে, দীর্ঘদিন যাবত ইহুদীদের সাথে মিলামিশা ও যোগাযোগ রক্ষা করে চলার ফলে তাদের কাছে অহী, কিতাব, শরিয়ত প্রভৃতি শব্দাবলী ও তার অর্থ পরিচিত হয়ে পড়েছিল। এ কারণে তাদের জন্যে এ বস্তুগুলো তেমন অপরিচিত ছিলনা যেমন ছিল অন্যান্য আরববাসীর কাছে।

দ্বিতীয় প্রভাব, ইবনে ইসহাকের বরাতসহ ইবনে হিশাম ও তাবারীর বর্ণনা অনুযায়ী এ ছিল যে, প্রতিবেশী ইহুদীদের সাথে আলাপচারীতে প্রায় এ কথা তারা জানতে পারতো যে,

---

১. ইবনে সা'দের বর্ণনা অনুযায়ী বুয়াস যুদ্ধ হিজরতের ছ'বছর পূর্বে সংঘটিত হয়। বুয়াস একটি স্থান, অথবা ছোট দুর্গ অথবা শস্যক্ষেত্রের নাম যা বনী কুরাইযার সন্নিকটে মদীনা থেকে দু'মাইল দূরে অবস্থিত। যুদ্ধে এক পক্ষে আউস গোত্র ছিল, যার সর্দার ছিলেন হযরত উসাইদ বিন মুহ্দাইরের পিতা হুদাইর। বনী কুরায়যা ও বনী নাদীর- তাদের সাথে যুদ্ধে শরীক ছিল। অপর পক্ষে ছিল খাযরাজ গোত্র যার সর্দার ছিলেন আমর বিন নু'মান বায়াযী। ইহুদীদের বনী কায়নুকা তাদের সাথে ছিল। আউস যুদ্ধে বিজয়ী হয়। কিন্তু উভয় পক্ষ এতোটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে, তাদের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ অনুভব করেন যে, যদি তারা এভাবে একে অপরের দুশমন হয়ে থাকে তাহলে যুদ্ধ করতে করতে সব খতম হয়ে যাবে।- গ্রন্থকার।

এসব লোক (ইহুদী) অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে একজন নবীর আগমন প্রতীক্ষায় ছিল- যার ভবিষ্যদ্বাণী তাদের আসমানী কিতাবগুলোতে করা হয়েছে। তারা এ দোয়া করতো- শীগ্‌গির তিনি যদি আসেন, তাহলে অইহুদী কওমগুলোর প্রাধান্য শেষ হয়ে যাবে এবং তাদের নিজেদের উন্নতির যুগ শুরু হবে। বিশেষ করে যখন আউস ও খাযরাজের সাথে ঝগড়া বিবাদ হতো তখন তারা বলতো, অতিসত্বর এক নবীর আগমন হবে। তিনি যখন আসবেন তখন আমরা তাঁর আনুগত্য করব এবং তাঁর সাথে থেকে তোমাদেরকে এমন মার দেব যেমন আদ ও ইরাম মার খেয়েছিল। কুরআনেও তাদের এসব কথার দিকে ইংগিত করা হয়েছে ঃ

وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا-(البقرة : ٨٩)

- এবং ইতিপূর্বে তারা স্বয়ং কাফেরদের মুকাবেলায় বিজয়ী হওয়ার দোয়া করতো। (বাকারাঃ ৮৯)

ইহুদীদের এ সব কথায় আউস ও খাযরাজের লোকের মধ্যে এ প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে নবী যদি আসেন তাহলে সকলের আগে তারা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাঁর আনুগত্য অবলম্বন করবে যাতে ইহুদীরা তাদের অগ্রগামী হতে না পারে।

তৃতীয় প্রভাব এ ছিল যে, গৃহযুদ্ধে তারা মনমরা হয়ে পড়েছিল এবং এমন এক নেতৃত্বের অভিলাষী ছিল যে তাদের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করতে পারে। তাদের এ অবস্থার প্রতিও ইংগিত করা হয়েছে ঃ

وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا -(ال عمران: ١٠٣)

- তোমরা অগ্নি গহ্বরের তীরে অবস্থান করছিলে, আল্লাহ্ তার থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। (আলে ইমরানঃ ১০৩)

নিজেদের এ বিপদের অবসান ঘটাবার জন্যে মদীনাবাসী এতোদূর পর্যন্ত প্রস্তুত হয়েছিল যে, খাযরাজের সর্দার আবদুল্লাহ্ বিন ওবাইকে তারা তাদের বাদশাহ্ বানিয়ে নেবে যাতে তাদের মতানৈক্য মিটে যায় এবং এক ব্যক্তির শাসনাধীন সব একত্র হয়ে যায়। এ অবস্থায় অবশেষে সে নিয়ামত তাদের সামনে এসে গেল প্রকৃতপক্ষে যার অভিলাষী তারা ছিল। (ইবনে হিশাম- ২য় খন্ড- পৃঃ ২৩৪)

মদীনার প্রথম ব্যক্তির হুযুরের (স) সাথে সাক্ষাৎ

ইবনে হিশাম ও তাবারী ইবনে ইসহাক থেকে আসেম বিন ওমর বিন কাতাদার এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, মদীনার সর্ব প্রথম ব্যক্তি যিনি রসূলুল্লাহর (স) সাথে মিলিত হন- তিনি ছিলেন সুয়া'এদ বিন সামেত। তিনি তাঁর যোগ্যতা, বীরত্ব, কবিত্ব ও বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে তাঁর কওমের নিকটে 'কামেল' বলে খ্যাত ছিলেন। ইবনে সা'দ ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি তার কওমের মধ্যে সম্মানিত ও বিবেকবান, সঠিক অভিমত ব্যক্ত করতে সক্ষম, শিক্ষিত, তীর নিক্ষেপ ও সাঁতারে পটু, এমন ব্যক্তিকে জাহেলিয়াতের যুগে 'কামেল' বলা হতো। (তবকাত- ৩য় খন্ড- পৃঃ ৬০৩)

রসূলুল্লাহর (স) সাথে এ ব্যক্তির আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল, তাঁর মা লায়লা বিন্তে আমর হুযুরের (স) দাদার মা সাল্‌মা বিন্তে আমরের সহোদরা ভগ্নি ছিলেন, হজ্ব অথবা ওমরার উদ্দেশ্যে তিনি মক্কায় এলে হুযুর (স) নিয়ম অনুযায়ী তাঁর সাথে মিলিত হন। তাঁর সামনে দাওয়াত পেশ করেন। তিনি বলে, সম্ভবতঃ আপনার নিকটেও সেই জিনিস আছে যা আমার কাছে আছে। হুযুর (স) বলেন, তা কি? তিনি বলেন- মুজাল্লায়ে লুকমান– অর্থাৎ

লোকমানের পান্ডিত্য ও বিচক্ষণতা। হুযুর (স) বলেন, তা আমাকে শুনান। তিনি তা পড়ে শুনান। হুযুর (স) বলেন, এ সুন্দর কালাম। তবে আমার নিকটে যা আছে তা এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর। তা হলো কুরআন- যা আল্লাহ্ আমার উপর নাযিল করেছেন। তা হেদায়েত ও নূর। অতঃপর হুযুর (স) তাঁকে কুরআন শুনিয়ে দেন এবং ইসলামের দাওয়াত দেন। তিনি এর থেকে দূরে সরে না গিয়ে বলেন, সত্যি এ বড়ো সুন্দর কালাম। তারপর তিনি মদীনা ফিরে যান। কিছুদিন পর খাযরাজ তাঁকে হত্যা করে। এ বুয়াস যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা।[১]

মদীনার আর একটি প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাৎ

ইবনে হিশাম ও তাবারী মুহাম্মদ বিন ইসহাকের এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে- বুয়াস যুদ্ধের পূর্বে যখন আউস এবং খাযরাজের মধ্যে শত্রুতার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ার উপক্রম হয়, তখন আউসের একটি শাখা- বনী আবদুল আশহাল-এর একটি প্রতিনিধি দল আবুল হায়সের অথবা হায়সার-এর নেতৃত্বে মক্কা আগমন করে যাতে খাযরাজের মুকাবেলায় কুরাইশকে নিজেদের বন্ধু বানাতে পারে। তাদের আগমনের সংবাদ নবী (স) জানতে পেরে তাদের সাথে মিলিত হন। তিনি তাদেরকে বলেন, তোমরা যে জিনিসের জন্যে এখানে এসেছ তার থেকে উৎকৃষ্টতর জিনিস কবুল করা পছন্দ কর কি?

তাঁরা বলেন, তা কি? হুযুর (স) বলেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাহদের জন্যে প্রেরিত রসূল। তাদেরকে এ দাওয়াত দিতে এসেছি যে, তিনি ছাড়া আর কারো বন্দেগী করবেনা, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবেনা। আমার উপর একটি কেতাব নাযিল করা হয়েছে।

তারপর তিনি তাদেরকে ইসলামের কিছু শিক্ষা দেন এবং কুরআন শুনিয়ে দেন। প্রতিনিধি দলের মধ্যে এক যুবক- ইয়াস্ বিন মুয়াযও ছিলেন। তিনি হুযুরের (স) কথা শুনে বলেন, হে লোকেরা, এ জিনিস তার থেকে উৎকৃষ্টতর যার জন্যে তোমরা এখানে এসেছ। কিন্তু আবু হায়সের বাত্হার কিছু মাটি তুলে নিয়ে তার মুখের উপর নিক্ষেপ করে বলেন, এসব কথা থেকে আমাদের মাফ কর। আমরা অন্য এক কাজে এসেছি।

ইয়াস্ নীরব রইলেন এবং হুযুর (স) উঠে চলে গেলেন। এসব লোক মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর বুয়াস যুদ্ধ শুরু হয়। তারপর বেশী দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই ইয়াস মারা যান। তাঁর মৃত্যুর সময় যারা উপস্থিত ছিল তারা বলে যে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা তাঁর মুখ থেকে আল্লাহর তাসবিহ ও তাহলিল শুনতে পেয়েছে। এজন্যে তাদের এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিলনা যে, ইয়াস্ সেই বৈঠক থেকে ইসলাম কবুল করেই এসেছিলেন এবং তিনি ইসলামের উপরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর বরাত দিয়ে এ ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, তার কিছু কথা ইবনে ইসহাকের বর্ণনা থেকে অতিরিক্ত। এর থেকে জানা যায় যে, বনী আবদুল আশহাল-এর প্রতিনিধি দল মক্কায় ওত্বা বিন রাবিয়ার বাড়ি অবস্থান করছিল। সে তাদের খুব সম্মানের সাথে আতিথেয়তা করেছিল। তারা যখন তার কাছে বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তির প্রস্তাব দেয় তখন সে এই বলে প্রত্যাখ্যান করে যে তার এলাকা তাদের এলাকা থেকে বহু দূরে। তাদের কাছ থেকে সাহায্যের আবেদন এখানে পৌছতে পৌছতে দুশমন তার কাজ সেরে

---

১. বালাযুরী আন্‌সাবুল আশরাফে বলেন, সুয়াএদের হত্যার কারণেই বুয়াসের যুদ্ধ হয়- গ্রন্থকার।

ফেলবে। সে বলে, আমাদের ব্যাপারেও তাই হবে।

ওয়াকেদী এ কথাও বলেন যে ইয়াস্ যখন ইসলাম গ্রহণ করার প্রস্তাব দেন, তখন আবুল হায়সের তাঁর উপর মাটি নিক্ষেপ করতে করতে বলে, আমরা এসেছিলাম- আমাদের দুশমনের মুকাবেলায় কুরাইশকে বন্ধু হিসাবে পেতে, আর তুমি চাচ্ছ- আমরা কুরাইশকে শত্রু বানিয়ে ফিরে যাই।

ওয়াকেদীর বর্ণনায় অতিরিক্ত এ কথাও আছে যে, যারা ইয়াস্কে মরবার সময় তাস্বিহ্ তাহ্লিল পড়তে শুনেছে- তারা হচ্ছেন মুহাম্মদ বিন মাস্লামা (রা), সালামা বিন সালামা বিন ওয়াক্শ (রা) এবং আবুল হাশিম বিন আত্তায়হান।

আনসারের প্রথম দলের ইসলাম গ্রহণ ও আকাবার প্রথম বয়আত

নবুওতের একাদশ বছরে (৬২০ খৃঃ) হজ্বের সময়ে হুযুর (স) তাঁর নিয়ম অনুযায়ী আরব গোত্রগুলোর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মিনার দিকে রওয়ানা হন। ঘোরাফেরা করতে করতে আকাবার[১] নিকটে খাযরাজ গোত্রের একটি দলের কাছে পৌছেন। ইবনে হিশাম ও তাবারী মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে বলেন, হুযুর (স) তাদেরকে বলেন, আপনাদের পরিচয়? তাঁরা বলেন, খাযরাজের কিছু লোক। নবী (স) বলেন, আপনারা কি একটু বসবেন- যাতে আমি আপনাদের কাছে কথা বলতে পারি? তাঁরা বলেন, অবশ্যই। অতএব তাঁরা হুযুরের (স) নিকটে বসে পড়লেন। তিনি তাঁদেরকে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেন, তাঁদের সামনে ইসলাম পেশ করেন। তাঁদেরকে কুরআন শুনান। তাঁরা পরস্পরে বলাবলি করলেন, ভাইসব! জেনে রাখ যে, ইনিই সেই নবী যাঁর আগমনের ভয় ইহুদীরা তোমাদের দেখাতো। এমন যেন না হয় যে তারা আমাদের থেকে আগে চলে যায়। অতঃপর একেবারে সন্তুষ্টচিত্তে তাঁরা তাঁর দাওয়াত কবুল করেন, তাঁর সত্যতা স্বীকার করেন এবং তাঁর পেশকৃত ইসলামের উপর ঈমান আনেন। তারপর তাঁরা আরজ করেন, আমরা আমাদের কওমকে এ অবস্থায় ছেড়ে এসেছি যে, কোন কওম এমন হবেনা যাদের মধ্যে আমাদের চেয়ে অধিক পারস্পরিক শত্রুতা পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ আল্লাহ্ আপনার মাধ্যমে তাদেরকে একত্র করবেন। আমরা তাদের কাছে ফিরে যাচ্ছি, আপনার পক্ষ থেকে তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি এবং যে দ্বীন আমরা গ্রহণ করলাম তা তাদের কাছে পেশ করছি। যদি আল্লাহ্ তাদেরকে আপনার জন্যে একত্র করে দেন তাহলে কেউ আপনার চেয়ে শক্তিশালী হবেনা।

কোন কোন বর্ণনায় এ কথাকে এভাবে বলা হয়েছে, বায়আতের পর হুযুর (স) তাঁদেরকে বলেন, আপনারা কি আমার পৃষ্ঠেপোষকতা করবেন যাতে আমি রবের পয়গাম পৌছাতে পারি? তাঁরা আরজ করেন, হে আল্লাহ্র রসূল! এখন আমাদের ওখানে বুয়াসের যুদ্ধ হয়ে গেল। এ অবস্থায় আপনি সেখানে গেলে লোকেরা একত্রে মিলিত হওয়া মুশকিল হবে। আপাততঃ আপনি আমাদেরকে আপন লোকদের কাছে ফিরে যেতে দিন। হয়তো আল্লাহ্ আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো করে দিবেন। আর আমরা লোকদের কাছে সেই দাওয়াত দিই যার দিকে আপনি আমাদের দাওয়াত দিয়েছেন। হতে পারে যে- আল্লাহ্

---

১. আকাবা ঘাঁটিকে বলে। এখানে যে ঘাঁটির উল্লেখ আছে- তা মিনার এলাকায় মক্কার পথে অবস্থিত- গ্রন্থকার।

আপনার জন্যে তাদেরকে একত্রে মিলিত করে দিবেন। তারপর আপনার চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ হবেনা। এখন আমরা সামনে বছর হজ্বে আপনার সাথে মিলিত হবো।

ইবনে ইসহাক, শা'বী এবং যুহরী বলেন যে, এরা ছয় জন ছিলেন। ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর বক্তব্যই উদ্ধৃত করেছেন যে তাঁদের সংখ্যা ছিল ছয়। তাঁদের তালিকা নিম্নরূপঃ

বনী মালেক বিন আন্নাজ্জার থেকে-	১. আবু উসামা আসয়াদ বিন যুরারা (জাহেলিয়াতের যুগেও ইনি তাওহীদ পন্থী ছিলেন এবং প্রতিমা পূজার বিরোধী ছিলেন।)
	২. আওফ বিন আল হারেস বিন রিফায়া- মায়ের নাম আফ্‌রা।
বনী যুরাইস থেকে-	৩. রাফে বিন মালেক (জাহেলিয়াতে 'কামেল' বলা হতো)।
	৪. কুত্‌বা বিন আমের বিন হাদীদা।
বনী হারাম বিন কাব থেকে-	৫. ওকবা বিন আমের বিন নাবী।
বনী ওবায়েদ বিন আদী থেকে-	৬. জাবের বিন আবদুল্লাহ্ বিন রেয়াব।

ইবনে আবদুল বার বলেন, সীরাতের জ্ঞান সম্পন্ন কেউ কেউ জাবের বিন রেয়াবের স্থলে হযরত উবাদাহ বিন সামেতের নাম লিখেছেন। মূসা বিন ওকবা এ প্রথম বায়আতে আকাবায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা আট বলেছেন, যার মধ্যে আসাদ বিন যুরারা এবং রাফে বিন মালেকের সাথে তাঁরা মুয়ায বিন আফরা, ইয়াযিদ বিন সা'লাবা, আবুল হায়সাম বিন আত্তাইয়েহান এবং উয়ায়েম বিন সায়েদার নাম শামিল করেছেন। অতঃপর একটি দুর্বল বর্ণনা হিসাবে বলেন, বলা হয়ে থাকে যে, এদের মধ্যে উবাদা বিন সামেত এবং যাকরান বিন আবদে কায়সও ছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞজনের অধিকাংশ মুহাম্মদ বিন ইসহাকের বর্ণনাকেই গ্রহণ করেছেন এবং ফত্‌হুলবারীতে হাফেজ ইবনে হাজার এ বর্ণনাকেই অন্যান্য বর্ণনার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর উপরে বর্ণিত বক্তব্য ছাড়াও মদীনাবাসীর ইসলাম কবুল সম্পর্কে আরও তিনটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন ঃ

১. সর্ব প্রথম আসয়াদ বিন যুবারা এবং যাকরান বিন আবদ কায়েস জাহেলিয়াতের রীতি অনুযায়ী গর্ব অহংকারের মুকাবেলা করার জন্যে মক্কায় ওত্‌বা বিন রাবিয়ার নিকটে যান। কিন্তু ওতবার সাথে মিলিত হবার আগেই রসূলুল্লাহর (স) কথা শুনে তাঁর সাথে মিলিত হন ও মুসলমান হয়ে যান। অতঃপর হযরত আস্‌য়াদ মদীনা গিয়ে আবুল হায়সাম বিন আত্তাইয়েহান -এর কাছে ইসলামের উল্লেখ করেন এবং তাঁরাও ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর তিনি সে ছয়জনের সাথে শামিল হন যাঁরা আকাবার স্থানে হুযুরের (স) সাথে মিলিত হন।

২. সর্ব প্রথম রাফে বিন মালেক আয্‌যুরাকী এবং মুয়ায বিন আফরা ওমরা করতে মক্কায় যান। সেখানে তাঁরা হুযুরের (স) নাম শুনতে পান। তারপর তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে মুসলমান হন।

৩. মিনায় হুযুরের (স) সাথে মদীনার ছয়জন নয় আটজনের সাক্ষাৎ হয়। এ আটজন তাঁরা যাঁদের নাম আমরা মূসা বিন ওকবার বরাত দিয়ে উপরে উল্লেখ করেছি।

মদীনা থেকে দ্বিতীয় প্রতিনিধি দলের উপস্থিতি ও আকাবায় দ্বিতীয় বয়আত

ইবনে সা'দ ও ইবনে ইসহাক বলেন, আকাবার স্থানে ইসলাম গ্রহণকারী এ প্রথম দলটি যখন মদীনা ফিরে যান তখন তাঁরা সেখানে ইসলাম সম্পর্কে আলাপ আলোচনা শুরু করেন। ফলে আনসারদের মহল্লার মধ্যে এমন কোন মহল্লা বাকী থাকলোনা যেখানে রসূলুল্লাহর (স) উল্লেখ করা হলোনা। অতঃপর পরের বছর (নবুওতের দ্বাদশ বর্ষে) হজ্বের সময় মদীনার বার জন হুযুরের (স) সাথে ঐ আকাবার স্থানে মিলিত হন যেখানে খাযরাজের লোকের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। এদের মধ্যে পাঁচজনই তাঁরা ছিলেন যাঁরা গত বছর মুসলমান হন (জাবের বিন আবদুল্লাহ্ বিন রেয়াব এবার আসেননি)। অবশিষ্ট সাত জনের মধ্যে ৫ জন খাযরাজের এবং দু'জন আউসের ছিলেন। তাদের নাম নিম্নরূপঃ

খাযরাজের বনী আন্নাজ্জার থেকে-	১. মুয়ায আল হারেস বিন রেফায়া।
খাযরাজের বনী যুরাইন থেকে-	২. যাকরান বিন আবদ কায়েম। ইবনে সাদ ও ইবনে হিশাম বলেন, এ দু'জন মদীনা থেকে মক্কা এসে হুযুরের (স) সাথে থাকেন এবং তাঁর সাথে হিজরত করেন।
খাযরাজের বনী আওফ বিন আল খাযরাজ থেকে-	৩. ওবাদা বিন সামেত।
	৪. ইয়াযিদ বিন সা'লাবা।
খাযরাজের বনী সালেম বিন আওফ বিন খাযরাযের-	৫. আব্বাস বিন ওবদা বিন নাদলা (ইবনে ইসহাক বলেন, ইনিও হুযুরের (স) সাথে থেকে তাঁর সাথে হিজরত করেন।
আউসের বনী আবদুল আশহাল থেকে-	৬. আবুল হায়সাম বিন আত্তাইয়েহান (ইনি জাহেলিয়াতের যুগেও তাওহীদ পন্থী ছিলেন এবং প্রতিমা পূজার বিরোধিতা করতেন ।
আউসের বনী আমর বিন আওফের-	৭. ওয়াইম বিন সায়েদা।

এ সময়ে হুযুর (স) এসব লোকের থেকে যে বয়আত গ্রহণ করেন তা 'বয়আতে নেসা' নামে অভিহিত। কারণ এ সে বয়আতের শব্দাবলীর অনেকটা অনুরূপ- যা এ ঘটনার কয়েক বছর পর সূরায়ে মুমতাহেনার- ১২ নং আয়াতে মুসলিম নারীদের নিকট থেকে বায়আত গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। ইবনে ইসহাক হযরত উবাদা বিন সামেতের (রা) বর্ণনা উদ্ধৃত করেন যে, হুযুর (স) এ সব বিষয়ে বয়আত গ্রহণ করেন ঃ

ان لا نُشرِكَ باللّه شيئًا ، ولا نَسرِقَ ولا نزني ولا نقتلَ اولادنا ولا نأتي ببهتانٍ نَفتريه بين أيدينا وارجلنا ولا نعصيه فى معروفٍ ونعطيه السمع والطاعة فى العسر والمنشط والمكره واثرةٍ علينا وان لا ننازع الامر اهله (زاد احمد فى المسند ، وان رأيت ان لك فى الامر حقًّا ، وزاد البخارى الا ان تروا كفرًا بواحًا) وان نقول بالحق حيث كنّا . لا نخاف لومة لائمٍ ثم قال صلى اللّه عليه وسلّم فان وفيتم فلكم الجنة ومن غشى من ذالك كان امره الى اللّه ان

شاء عذبه وان شاء عفا عنه (وفى رواية، وان غشيتم من ذالك شيئا فاخذتم بجدة فى الدنيا فهو كفارة له وان سترتم عليه الى يوم القيامة فامركم الى الله عز وجل، ان شاء عذب وان شاء غفر)

আমরা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবনা, চুরি করবনা, ব্যভিচার করবনা, আপন সন্তানদের হত্যা করবনা, আপন হাত পায়ের আগে কেউ বুহ্‌তান বানোয়াট অভিযোগ পেশ করবেনা এবং কোন মা'রূফ কাজে রসূলুল্লাহ্ (স) নাফরমানী করবনা, তাঁর হুকুম শুনবো ও মানবো, আমরা সুখে থাকি বা দুঃখে থাকি, সে হুকুম আমাদের সহনীয় হোক বা অসহনীয়, তা আমাদের উপর কাউকে অগ্রাধিক দেয়া হেক না কেন এবং আমরা হুকুম শাসনের ব্যাপারে শাসকের সাথে ঝগড়া বিবাদ করবোনা। (মুসনাদে আহ্‌মদে অতিরিক্ত বলা হয়েছে যে, যদিও তোমরা মনে কর যে শাসন ব্যবস্থায় তোমাদের হক আছে। বোখারীতে অতিরিক্ত এ কথা আছে, অথবা তোমরা যদি প্রকাশ্য কুফর দেখ) এবং আমরা যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন, সত্য কথা বলব, কোন ভৎর্সনাকারীর ভর্ৎসনার ভয় করবনা। অতএব তোমরা যদি এ শপথ পূরণ কর তাহলে তোমাদের জন্যে জান্নাত। আর যদি কেউ হারাম কাজের কোন একটি করে তার বিষয়টি আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি চাইলে মাফ করবেন এবং চাইলে শাস্তি দেবেন (একটি বর্ণনায় এ কথা আছে, যদি তোমরা হারাম কাজের কোন একটা কর, তারপর ধরা পড় এবং দুনিয়াতে তোমাদের শাস্তি দেয়া হয়- তাহলে তা সে অপরাধের কাফ্‌ফারা হবে, আর কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের সে অপরাধ যদি পর্দাবৃত থাকে, তাহলে তোমাদের বিষয়টি আল্লাহ্ তায়ালা ইচ্ছা করলে শাস্তি দিতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে মাফও করতে পারেন)।

এ হাদীসের বিভিন্ন অংশ বোখারী কিতাবুল ঈমান, আবওয়াবে মুনাকেবেল আনসার, কিতাবুল হুদূদ, কিতাবুল ফিতন, কিতাবুল আহ্‌কাম, মুসলিমের- কিতাবুল হুদূদ ও কিতাবুল ইমারাত এবং মুসনাদে আহ্‌মদে- মরবিয়াতে উমারা বিন সামেত-এ পাওয়া যায়।

মুস্‌আব বিন উমাইরকে মদীনা প্রেরণ

ইবনে জারীর ও ইবনে হিশাম মুহাম্মদ বিন ইসহাকের এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, যখন এসব লোক মদীনায় ফিরে যাচ্ছিলেন- তখন রসূলুল্লাহ্ (স) তাঁদের সাথে হযরত মুস্‌আব বিন উমাইরকেও পাঠালেন যাতে তিনি তাঁদেরকে কুরআন শিক্ষা দেন, ইসলাম শিক্ষা দান করেন এবং তাঁদের মধ্যে দ্বীনের উপলব্ধি সৃষ্টি করেন। অতএব মুস্‌আব (রা) মদীনায় গিয়ে আসয়াদ বিন মুরারার (রা) বাড়িতে অবস্থান করতে থাকেন।

এর বিপরীত মূসা বিন ওকবার বর্ণনায় একথা আছে যে, তাঁরা মদীনায় যাওয়ার পর মুয়ায বিন আফরা (রা) এবং রাফে বিন মালিককে (রা) এ উদ্দেশ্যে হুযুরের (স) নিকটে পাঠান হয়- যেন এমন ব্যক্তিকে মদীনা পাঠানো হয় যিনি তাঁদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেবেন। এ আবেদনের পর তিনি হযরত মুসয়াবকে (রা) পাঠিয়ে দেন। এর চেয়ে একটু ভিন্ন রেওয়ায়েত বায়হাকী ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেছেন। তা এই যে, তাঁরা হুযুরের (স) নিকটে লিখলেন, "আমাদের দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্যে কাউকে পাঠিয়ে দিন।" তার ফলে হযরত মুস্‌য়াবকে পাঠানো হয়। ওয়াকেদী থেকে ইবনে সাদ'ও তাই বর্ণনা করেছেন।

আকাবায় এ দ্বিতীয় বয়আতের পর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে আনসারের লোকজন হযরত মুসআব বিন উমাইরের নেতৃত্বে দ্রুতবেগে ইসলামের প্রচার শুরু করেন। ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর বরাত দিয়ে বলেন, বনী আবদুল আশহালের আববাদ বিন বিশর বিন ওয়াক্‌শ এবং তাদের চুক্তিবদ্ধ বন্ধুদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন মাস্‌লামা (রা) হযরত মুসয়াবের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর বনী আবদুল আশহালের সর্দার সা'দ বিন মুয়ায ও উসাইদ বিন হুযাইর একই দিনে তাঁর হাতে মুসলমান হন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে তাঁর গোটা গোত্র মুসলমান হয়ে যায়। এমনকি বনী আবদুল আশহালের মহল্লায় একজনও অমুসলিম রইলোনা। ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাক থেকে এবং তাবারী হযরত সা'দ থেকে হযরত উসাইদের ইসলাম গ্রহণের এক মজার কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

একদিন আস্‌য়াদ বিন যুরারা হযরত মুসয়াবকে সাথে নিয়ে আউস গোত্রের একটি শাখা বনী যফরের বাগানগুলোর একটি বাগানে যান। যাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন তাদের অনেকেই সেখানে সমবেত হন। যখন সা'দ বিন মুয়ায এবং উসাইদ বিন হুযাইর এ কথা জানতে পারলেন তখন সা'দ উসাইদকে বলেন, তুমি এ দু'জন লোকের (আস্‌য়াদ ও মুসয়াব) কাছে যাও যারা আমাদের বস্তিতে এসে দুর্বল লোকদেরকে বোকা বানাচ্ছে। তাদের ধমক দিয়ে আমাদের এলাকায় আসতে নিষেধ করে দাও। যদি আস্‌য়াদ বিন যুরারা না হতো তাহলে আমি স্বয়ং সেখানে যেতাম। কিন্তু জান তো সে আমার খালাতো ভাই। এ জন্যে তার সামনে আমি যেতে চাইনা। এ কথায় উসাইদ তার হাতিয়ার নিয়ে সেখানে যান। তাঁকে আসতে দেখে আসয়াদ মুসয়াবকে বলেন, এ তার কওমের সর্দার। তার ব্যাপারে ঠিক ঠিক আল্লাহর কথা পৌছাবার হক আদায় করবে। হযরত মুসআব বলেন, ইনি বসে পড়লে কথা বলব। উসাইদ তাঁর সামনে এসে রুঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে বল্লেন, তোমরা দু'জন এখানে কেন এসেছ? তোমরা আমাদের দুর্বল লোকদের বোকা বানাচ্ছ। যদি ভালো চাও তো এদিকে কোনদিন মুখ করবেনা।

মুসয়াব বল্লেন, আপনি কি বসে আমাদের কথা শুনবেন? কথা পছন্দ হলে কবুল করবেন, তা না হলে যে কাজ আপনি পছন্দ করেননা তা করা হবেনা। উসাইদ বল্লেন- এতো তুমি ইনসাফের কথা বলেছ। তারপর তাঁর হাতিয়ার মাটিতে গুঁজে তাঁর কাছে বসে পড়লেন। হযরত মুসয়াব তাঁকে ইসলামের শিক্ষা বল্লেন এবং কুরআন পড়ে শুনালেন। হযরত আস্‌য়াদ (রা) এবং হযরত মুসয়াব (রা) উভয়ে বলেন, খোদার কসম, উসাইদের মুখের প্রফুল্লতা এবং কথাবার্তায় নম্রতা দেখে আমরা বুঝলাম যে, ইসলাম তার হৃদয়ে প্রবেশ করেছে। সব কথা শুনার পর তিনি বল্লেন, কত ভালো ও সুন্দর কালাম। এ দ্বীনের মধ্যে যখন তোমরা প্রবেশ কর কি কর? উভয় বল্লেন, গোসল করে শরীর পাক করে নিন এবং নিজের কাপড়ও পাক করুন। তারপর হকের সাক্ষ্য দিন। তারপর নামায পড়ুন। তিনি তক্ষুণি উঠে পড়লেন, পাক সাফ হয়ে এলেন, কালেমা শাহাদত পাঠ করলেন এবং দু'রাকাআত নামায পড়লেন। তারপর বলতে লাগলেন, আমার পেছনে আর একজন আছে। সে যদি তোমাদের আনুগত্য মেনে নেয় তাহলে তার কওমের কেউ তার বিরুদ্ধে যাবেনা। আমি গিয়ে তাকে তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি। এ কথা বলে উসাইদ (রা) তাঁর হাতিয়ার নিয়ে সা'দ বিন মুয়াযের দিকে চল্লেন, যাঁর কাছে তাঁর কওমের লোক একত্রে বসেছিল। তাঁকে আসতে দেখে সা'দ বল্লেন, খোদার কসম করে বলছি এ সে চেহারা নয় যা নিয়ে সে গিয়েছিল।

উসাইদ যখন এসে তাদের বৈঠকের সামনে দাঁড়ালেন তখন সা'দ জিজ্ঞেস করলেন, কি করে এলে? তিনি বল্লেন, আমি দু'জনের সাথে কথা বলেছি। তাদের মধ্যে তো খারাপ কিছু দেখলামনা। আমি তাদেরকে নিষেধ করাতে তারা বল্লো, আপনি যা চান তাই আমরা করব। তারপর উসাইদ বলেন, আমি শুনেছিলাম যে, বনী হারেসা আসয়াদ বিন যুরারাকে হত্যা করার জন্যে বের হয়েছে। কারণ তারা জানে যে, আসয়াদ তেমার খালাতে ভাই এবং তারা তোমাকে হেয় করতে চায়।

এ কথা শুনা মাত্র সা'দ ভয়ানক রাগান্বিত হন এবং অস্ত্র হাতে নিয়ে দ্রুত বেগে চলতে থাকেন যাতে বনী হারেসার আক্রমণের পূর্বে তিনি তাঁর ভাইয়ের কাছে (খালাতো ভাই) পৌঁছে যেতে পারেন। চলতে চলতে তিনি উসাইদকে বলেন, খোদার কসম, আমি মনে করি তোমাকে পাঠিয়ে কোন ফল হয়নি।

হযরত আসয়াদ বিন যুরারা (রা) দূর থেকে তাঁকে যেতে দেখে হযরত মুসয়াবকে (রা) বলেন, এ এমন এক সর্দার যে তার পেছনে তার গোটা কওম রয়েছে। সে মুসলমান হলে দু'জনও এমন থাকবেনা যে তার মধ্যে ইসলাম কবুল না করে পারবে।

সেখানে পৌঁছার পর সাদ যখন দেখলেন যে আসয়াদ এবং মুসয়াব নিশ্চিন্তে বসে আছেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, উসাইদের আসল উদ্দেশ্য ছিল, তাকে তাঁদের কথা শুনানো। তিনি ক্রোধ ভরে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং আসয়াদ বিন যুরারাকে বল্লেন, আবু উসামা, আমার এবং তোমার মধ্যে যদি আত্মীয়তা না থাকতো, তাহলে এ ব্যক্তি (মুসআব) আমার হাত থেকে রক্ষা পেতোনা। তুমি কি আমাদের বাড়িতে আমাদের উপর সে জিনিস চাপিয়ে দিতে চাও যা আমরা পছন্দ করিনা?

হযরত মুসয়াব বলেন, আপনি কি বসে আমাদের কথা শুনবেননা? পছন্দ হলে কবুল করবেন, না হলে সে জিনিসকে আপনার থেকে দূরে রাখব যা আপনি পছন্দ করেননা।

সা'দ বলেন, এটা তুমি ইনসাফের কথা বলেছ? তারপর তাঁর অস্ত্র মাটিতে গেড়ে দিয়ে বসে পড়েন। হযরত মুসয়াব তাঁর সামনে ইসলাম পেশ করেন এবং কুরআন পড়ে শুনান। হযরত আসয়াদ এবং হযরত মুসয়াব বলেন, তাঁর কথা বলার পূর্বেই তাঁর চেহারায় প্রফুল্লতা ও নম্রতা দেখে বুঝে ফেল্লাম যে, ইসলাম তাঁকে প্রভাবিত করেছে। সাদ সকল কথা শুনার পর বলেন, এ দ্বীনে প্রবেশ করতে হলে তোমরা কি কর? তাঁরা তাঁকে সে কথাই বল্লেন যা উসাইদকে বলেছিলেন। তারপর তিনি পাক সাফ হয়ে এলেন এবং কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করলেন। দু'রাকাআত নামায পড়লেন এবং অস্ত্র উঠিয়ে নিয়ে স্বীয় গোত্রের মজলিস বা সম্মেলনের দিকে রওয়ানা হলেন।

হযরত সা'দ (রা) যখন তাঁর লোকদের কাছে পৌঁছলেন তারা বলে উঠলো, এতো সে চেহারা নয়, যা নিয়ে সাদ এখান থেকে গিয়েছিল। তিনি তাদের নিকটে পৌঁছে বল্লেন, হে বনী আবদুল আশহালের লোকেরা! তোমরা তোমাদের মধ্যে আমার ব্যাপারে কি জান? সবাই বলে, আপনি আমাদের সর্দার। আমাদের মধ্যে আপনি সবচেয়ে বেশী আত্মীয়দের উপর দয়া অনুগ্রহ করে থাকেন। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সঠিক মতামত দানকারী। আমাদের জন্যে সবচেয়ে বিবেক সম্পন্ন ও অভিজ্ঞ। এসব কথা শুনে সা'দ বলেন, যতোক্ষণ না তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান এনেছ, তোমাদের নারী পুরুষের সাথে আমার কথা বলা হারাম। তারপর সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই বনী আবদুল আশহালের সকল নারী ও পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। শুধু এক ব্যক্তি আমর বিন সাবেত অমুসলিম রয়ে যান। তিনি ওহোদ যুদ্ধের সময় ঈমান আনেন এবং সিজদার সুযোগ আসার পূর্বেই শহীদ

হন। হুযুর (স) বলেন, তিনি জান্নাতবাসী। উল্লেখ্য যে, বনী আবদুল আশহালের মধ্যে একজনও মুনাফেক ছিলনা। ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর বরাত দিয়ে বলেন, মুসলমান হওয়ার পর হযরত সা'দ বিন মুয়ায (রা) এবং উসাইদ বিন হুযাইর (রা) বনী আবদুল আশহালের প্রতিমা ভেঙে বেড়াতেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত মুসয়াব মদীনায় ক্রমাগত তবলিগ করতে থাকেন। অবশেষে আনসারের এমন কোন মহল্লা ছিলনা যেখানে মুসলমান নারী-পুরুষ পাওয়া যেতোনা। শুধু তিন-চারটি পরিবার এমন ছিল যারা খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি।

মদীনায় জুমা কায়েম

হযরত কাব বিন মালেক (রা) এবং ইবনে সিরীন (রহ) বলেন, জুমার নামাযের হুকুম আসার পূর্বেই মদীনার আনসার পরস্পরে এ সিদ্ধান্ত করেন যে, তাঁরা হপ্তায় একদিন সামষ্টিক নামায পড়বেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা ইহুদীদের সাবত (শনিবার) এবং ঈসায়ীদের রোববার বাদ দিয়ে জুমার দিন ধার্য করেন- (জাহেলিয়াতের যুগে তাকে 'ইয়াওমে আরোবা' বলা হতো)। সর্ব প্রথম জুমা হযরত আসয়াদ বিন যুরারা (রা) বায়াযা এলাকায় পড়ান যেখানে চল্লিশ জন শরীক হন (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, আবদ বিন হামীদ, আবদুর রাজ্জাক, বায়হাকী, ইবনে হিশাম)।

দার কুত্‌নী হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রা) বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, মক্কায় যখন নামাযে জুমার হুকুম এলো, তখন রসূলুল্লাহ (স) হযরত মুসআব বিন উমাইরকে (রা) মদীনায় লিখিত নির্দেশ দেন যে, বেলা গড়ে যাওয়ার পর যেন দু'রাকাআত নামায পড়িয়ে দেন। মদীনায় জুমা কায়েমের হুকুম দেয়ার কারণ এই ছিল যে, সে সময়ে মক্কায় জুমার নামায পড়া সম্ভব ছিলনা।

আকাবায় শেষ বায়আত

নবুওতের ত্রয়োদশ বর্ষে (৬২২ খৃঃ জুন-জুলাই) যিলহজ্ব মাসে হজ্বের সময় আসা পর্যন্ত মদীনায় ইসলাম যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল। ইমাম আহমদ ও তাবারানী হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ আনসারীর (রা) এ বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, "রসূলুল্লাহ (স) দশ বছর যাবত ওকায ও মাজান্নার মেলাগুলোতে এবং হজ্বের সময় বিভিন্ন গোত্রের শিবিরে শিবিরে ঘোরাফেরা করতে থাকেন। এ সব স্থানে তিনি বলতেন, কে আমাকে তার ওখানে আশ্রয় দেবে এবং কে আমার মদদ করতে পারে যাতে আমি আমার রবের পয়গাম পৌঁছাতে পারি এবং তার বিনিময়ে সে জান্নাত লাভ করবে? কিন্তু কেউ তাঁর সহযোগিতার জন্যে প্রস্তুত হয়নি। বরঞ্চ যদি ইয়ামেন অথবা মুদারের কোন লোক মক্কা যাওয়ার জন্যে বেরুতো, তাহলে তার কওমের লোক অথবা আত্মীয় তাকে বলতো, কুরাইশের সেই যুবক থেকে একটু দূরে থাকবে, সে যেন তোমাকে ফেৎনায় ফেলে না দেয়।

"হুযুর (স) তাদের শিবিরের পাশ দিয়ে যখন যেতেন, তখন তাঁকে আঙুল দিয়ে ইশারা করা হতো। অবশেষে আল্লাহ আমাদেরকে ইয়াসরেব থেকে রসূলুল্লাহর (স) নিকটে পাঠিয়ে দেন, আমরা তাঁকে সত্য বলে স্বীকার করে নেই। তারপর অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, একজন বাড়ি থেকে বের হয়, ঈমান আনে, কুরআন পড়ে এবং যখন বাড়ি ফিরে যায়-

তখন তার বাড়ির লোকজনও মুসলমান হয়ে যায়। এভাবে আনসারের মহল্লাগুলোতে[১] এমন কোন মহল্লা ছিলনা যেখানে মুসলমানের একটি দল পাওয়া যেতোনা এবং তারা প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা করতোনা। একদিন আমরা সব একত্রে সমবেত হলাম এবং পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলাম যে, আর কতদিন পর্যন্ত রসূলুল্লাহকে (স) এ অবস্থায় ফেলে রাখবো যে, তিনি মক্কার পাহাড়গুলোর স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়াবেন এবং সব স্থানে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং কোথাও তাঁর শান্তি ও নিরাপত্তা নেই? তারপর আমরা সত্তর জন হজ্বে গেলাম এবং স্থির হলো যে, আকাবায় তাঁর সাথে আমরা মিলিত হবো (এ হাদীসের বাকী অংশ আমরা সামনে সন্নিবেশিত করব)।

ইমাম আহমদ, তাবারানী, ইবনে জারীর তাবারী ও ইবনে হিশাম মুহাম্মদ বিন ইসহাকের বরাত দিয়ে হযরত কাব বিন মালেকের (রা) বর্ণনা নকল করেন যে, আমরা আমাদের কওমের মুশরিকদের[২] সাথে হজ্বের জন্যে রওয়ানা হই। আমাদের সাথে আমাদের সর্দার ও বুযুর্গ বারা বিন মা'রুরও ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি বলেন, আমার একটা অভিমত আছে। জানিনা তোমরা তার সাথে একমত, না দ্বিমত পোষণ কর। আমরা বল্লাম, তা কি? বল্লেন, আমার মত এই যে, আমি কাবার দিকে পিঠ না করে বরঞ্চ মুখ করে নামায পড়ব। আমরা বল্লাম, আমরা তো রসূলুল্লাহর (স) নিকট থেকে এ কথা জানতে পেরেছি যে, তিনি শামের দিকে (বায়তুল মাকদেসের দিকে) মুখ করে নামায পড়েন। আমরা আপনার তরিকা অনুযায়ী নামায পড়বনা। কিন্তু তিনি কাবার দিকে মুখ করেই নামায পড়তে থাকেন। তাকে আমরা তিরস্কার করতে থাকি। মক্কা পৌছার পর তিনি আমাকে বল্লেন, ভাতিজা, চল রসূলুল্লাহর (স) সাথে সাক্ষাৎ করি। তারপর তাঁকে আমার এ কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করব যা আমি করি। কারণ তোমাদের বিরোধিতার কারণে আমার মনে খট্‌কা পয়দা হয়েছে। আমরা কখনো হুযুরকে (স) দেখিনি। তাঁকে চিনতামওনা। এ জন্যে মক্কার একজন লোকের কাছে তাঁর ঠিকানা জানতে চাইলাম। সে বল্লো, তাঁর চাচা আব্বাসকে চেন? আমরা বল্লাম- হ্যাঁ। কারণ তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে আমাদের ওখানে যাতায়াত করতেন। সে বল্লো, হেরমে যাও- তাঁকে আব্বাসের সাথে বসে থাকতে দেখবে।

আমরা সেখানে পৌছে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আব্বাসকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ দু'জনকে চেনেন? তিনি বল্লেন, হ্যাঁ, এ বারা বিন মা'রুর এবং এ কাব বিন মালেক। আমি হুযুরের (স) একথা কখনো ভুলবোনা যে, তিনি আমার নাম শুনার পর বল্লেন, কবি? আব্বাস (রা) বল্লেন, হ্যাঁ। তারপর বারা তার মস্‌লা জিজ্ঞেস করলেন। তারপর হুযুরের (স) নির্দেশ অনুযায়ী তিনি সেই কেবলার দিকেই নামায পড়তে শুরু করলেন, যেদিকে হুযুর (স) পড়তেন। তারপর হুযুর (স) আমাদেরকে 'আইয়ামে

---

১. আসলে دُور শব্দ ব্যবহৃত করা যা دار শব্দের বহু বচন। মদীনাবাসীর বস্তি এ ধরনের ছিল যে প্রত্যেক গোত্রের পৃথক বাড়ি ছিল যার মধ্যে থাকার ঘর, ক্ষেত, আঙুরের বাগান- সব একত্রে হতো। এরূপ নয়টি বাড়ি সে সময়ে মদীনায় পাওয়া যেত। প্রত্যেক বাড়ি স্থায়ী ছিল এবং অন্যান্য গোত্রের বাড়ি সংলগ্ন ছিল। এর ভিত্তিতে আমরা এ বাড়ির জন্যে মহল্লা ব্যবহার করেছি- গ্রন্থকার।

২. **হাকেম ও ইবনে সা'দ বলেন, সে বছর আউস ও খাযরাজের ৫০০ (পাঁচশ) লোক হজ্জের জন্যে বেরিয়ে পড়ে- – গ্রন্থকার**

তাশরিকের'[১] মাসের দিনে আকাবায় তাঁর সাথে রাতে মিলিত হওয়ার জন্যে বল্লেন। সেই রাতে আমরা আমাদের শিবিরে শুয়ে পড়লাম। রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা চুপে চুপে তাঁর সাথে দেখা করার জন্যে চল্লাম। কারণ আমরা আমাদের কওমের মুশরিকদের কাছে এ ব্যাপারটি গোপন রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের সাথে আমাদের সর্দার ও সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে আবু জাবের আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারাম ছিলেন। তিনি বাপদাদার দ্বীনের উপরেই কায়েম ছিলেন। তাঁকে আমরা সাথে নিয়ে বল্লাম, আপনি আমাদের সর্দার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। আমরা চাইনা যে আপনি জাহান্নামের ইন্ধন হন। তারপর আমরা তাঁর কাছে ইসলাম পেশ করলাম এবং বল্লাম, এখন আমরা আকাবায় হুযুরের (স) সাথে সাক্ষাতের জন্যে যাচ্ছি। তিনি তখনই ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং আমাদের সাথে আকাবায় বায়আতে শরীক হলেন। তখন আমরা মোট ৭৩ জন পুরুষ ছিলাম এবং আমাদের সাথে দু'জন মহিলাও ছিল। একজন বনী নাজ্জারের নাসিবা অথবা নুসায়বা বিন্তে কাব উম্মে উমারা[২] আর অন্য জন বনী সালেমার আসমা বিন্তে আমর উম্মে সানী।

এ বায়আতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা হযরত জাবের (রা) সত্তর বলেছেন, মহিলার উল্লেখ করেননি। এ বক্তব্যই আহমদ ও বায়হাকী- আমের শা'বী থেকে উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু হযরত কাব বিন মালেক (রা) ৭২ জন পুরুষ এবং দু'জন মহিলার উল্লেখ করেছেন। তাঁদের নামও সুস্পষ্ট করে বলেছেন। ইবনে ইসহাক অতিরিক্ত এ বিশদ বিবরণ দিয়েছেন যে, ৭৩ জন পুরুষের ১১ জন আউসের এবং ৬২ জন খাযরাজের ছিলেন। তাঁদের সাথে দু'জন মহিলা ছিলেন। একজন নুসায়বা বিন্তে কাব তাঁর স্বামী যায়েদ বিন আসেম (রা) এবং দু' পুত্র হাবিব (রা) ও ওবায়দুল্লাহ্ (রা) সহ ছিলেন। দ্বিতীয়া মহিলা- আসমা বিন্তে আমর ছিলেন। বর্ণনায় এ মতপার্থক্য থাকার কারণ সম্ভবতঃ এই যে- আরবগণ অধিকাংশ সময়ে ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে সংখ্যা বর্ণনা করেন। দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ যদি পুরুষ হয়, তাহলে তাদের উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করেন। দু' একজন মহিলা থাকলে তা উপেক্ষা করেন।

ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর বরাত দিয়ে উয়াইম বিন সায়েদার বর্ণনা উদ্ধৃত করেন যে, যখন আমরা মক্কা পৌঁছলাম, তখন সা'দ বিন খায়সামা (রা) মায়ান বিন আদী (রা) এবং আবদুল্লাহ্ বিন জুবাইর (রা) আমাকে বলেন, চল আমরা রসূলুল্লাহর (স) সাথে দেখা করে সালাম দিই। কারণ আমরা তাঁর উপর ঈমানতো এনেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁকে দেখিনি। অতএব আমরা বেরুলাম। আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তিনি আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালেবের বাড়িতে অবস্থান করছেন। আমরা সেখানে পৌঁছলাম। তাঁকে সালাম

---

১. 'আইয়ামে তাশরিক' সে সব দিনকে বলে যে সময়ে লোক হজ্বের পর মিনায় অবস্থান করে- গ্রন্থকর।

২. এ মহিলা মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে স্বীয় পুত্র হযরত আবদুল্লাহর সাথে ছিলেন। যুদ্ধে স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেন। শরীরের বারো স্থানে আঘাত পান এবং এক হাত কেটে যায়। এর পূর্বে তাঁর পুত্র হাবিবকে মুসায়লামা খন্ড বিখন্ড করে হত্যা করে। সে বলতো, তুমি কি মুহাম্মদের (স) রসূল হওয়ার সাক্ষ্য দাও? হাবিব (রা) বলতেন, হাঁ। যখন সে বলতো, তুমি আমার রসূল হওয়ার সাক্ষ্য দাও? তিনি বলতেন, আমি কিছু শুনতে চাইনা। এতে সে তাঁর একটি অংগ কেটে ফেলতো। এভাবে প্রত্যেক প্রশ্নের জবাবের পর একটি অংগ কেটে ফেলতো। এভাবে জালেম তাঁকে খন্ড বিখন্ড করে কেটে হত্যা করে। কিন্তু তিনি এ মিথ্যা নবীকে শেষ পর্যন্ত সত্য বলে স্বীকার করেননি। (ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পঃ ১০৮-১০৯) -গ্রন্থকার।

করে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের অর্থাৎ মদীনা থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সাথে আপনার সাক্ষাৎ কোথায় হবে? হযরত আব্বাস বল্লো, তোমাদের সাথে তোমাদের কওমের সেসব লোকও আছে যারা তোমাদের বিরোধী। অতএব নিজেদের ব্যাপার গোপন রাখ, হাজীগণ চলে যাওয়া পর্যন্ত। রসূলুল্লাহ (স) সাক্ষাতের জন্যে সে রাতের প্রস্তাব দিয়েছেন- যার সকালকে বলা হয় 'ইয়াওমুন্ নাফারেল আখের' يوم النفر الآخر অর্থাৎ সেই শেষ দিন যখন হাজী মিনা থেকে বিদায় হয়ে যায়। আকাবার উচ্চ অংশ তিনি নির্ধারিত করেন।[১] হুকুম দেয়া হয়, কোন নিদ্রিতকে জাগাবেনা, আর যে আসেনি তার অপেক্ষা করবেনা।

বায়আতে আকাবা সম্পর্কে সব বর্ণনাগুলো এ ব্যাপারে একমত পোষণ করে যে, যখন এ সব লোক রাতের বেলায় দু'জন চারজন করে গোপনে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছেন, তখন তাঁরা রসুলুল্লাহকে (স) আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের সাথে দেখতে পেলেন। হুযুর (স) তাঁর নিজের ব্যাপারে তাঁর উপর আস্থা রাখতেন- যদিও তখনো তিনি প্রকাশ্যতঃ অমুসলিম ছিলেন।[২] তিনি এ জন্যে এ নাজুক পরিস্থিতিতে এখানে এসেছিলেন যে, হুযুরের (স) মদীনা যাওয়ার পূর্বে সব দিক দিয়ে কথা যেন পাকা পোক্ত করে নেয়া যায়।

ইমাম আহমদ, বায়হাকী এবং আমের শা'বীর বর্ণনায় আছে যে, যখন সব লোক একত্র হয়ে যান, তখন হুযুর (স) বলেন, যে বলতে চায় সংক্ষেপে বলুক- কথা দীর্ঘায়িত যেন না করে। কারণ মুশরিকদের গুপ্তচর তোমাদের সন্ধানে আছে।

হযরত কাব বিন মালেক, যাঁর বর্ণনার একাংশ আমরা ইমাম আহমদ, ইবনে জারীর, তাবারী ও ইবনে হিশামের বরাত দিয়ে উপরে উদ্ধৃত করেছি, সে বর্ণনা প্রসংগে পরের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, সকলের প্রথমে হযরত আব্বাস (রা) কথা শুরু করেন। তিনি বলেন, হে খাযরাজের[৩] লোকেরা! মুহাম্মদের (স) এখানে যে মর্যাদা তা তোমরা জান। যারা তাঁর সম্পর্কে আমাদের সমমনা (অর্থাৎ যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি) তাদের মুকাবেলায় আমরা (বনী হাশেম ও বনী মুত্তালেব) তাঁকে সমর্থন করেছি ও নিরাপত্তা দিয়েছি। এ জন্যে তিনি আপন কওমের মধ্যে সুদৃঢ় পজিশনে ও শহরে সুরক্ষিত স্থানে আছেন। কিন্তু তিনি তোমাদের ওখানে যাওয়া ব্যতীত আর কিছুতে রাজী নন। এখন যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরা সে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে যে শর্তে তোমরা তাঁকে ডাকছো এবং তাঁর বিরোধিদের মুকাবেলায় তাঁর হেফাজত করবে। তাহলে যে দায়িত্ব

---

১. ইবনে সা'দ বলেন, এ সেই স্থানে যেখানে এখন মসজিদ রয়েছে।(তাবাকাতে ইবনে সা'দ বয়রুতে মুদ্রিত- ১৯৫৭ খৃঃ ১ম খন্ড- পৃঃ ২২১)। এবনে সা'দ ১৬৮ হিজ্রীতে পয়দা হন- ২৩০ হিজ্রীতে ইন্তেকাল করেন। এর অর্থ এই যে, দ্বিতীয় হিজ্রী শতকে এ মসজিদ বিদ্যমান ছিল। এ মসজিদ সে সময়েও ছিল যখন ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল হেজাজ ভ্রমণ করেন। এ কথা তিনি তাঁর 'ফী মানযিলিল্ অহী' গ্রন্থের ১১১ পৃঃ মসজিদে আকাবায় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে কোথাও তার নাম-নিশানা পাওয়া যায়না- গ্রন্থকার।

২. ইবনে সা'দ রসূলুল্লাহর (স) গোলাম আবু রাফে (রা) এর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন- আমি হযরত আব্বাসের (রা) যখন গোলাম ছিলাম- তখন ইসলাম আমাদের বাড়ি প্রবেশ করে। হযরত আব্বাস (রা) তাঁর বিবি উম্মুল ফযল ও আমি মুসলমান হয়েছিলাম। কিন্তু হযরত আব্বাস (রা) তাঁর ইসলাম গ্রহণ গোপন রেখেছিলেন। বদর যুদ্ধের পর যখন কাফেরদের বাড়িতে বাড়িতে মাতম চলছিল, তখন আমাদের বাড়িতে আনন্দ করা হতো- গ্রন্থকার।

৩. সে সময়ে আউস ও খায্রাজের সমাবেশকে খাযরাজ বলা হতো- গ্রন্থকার।

তোমরা গ্রহণ করছ- তা কর। কিন্তু যদি এখান থেকে তাঁর বের হয়ে তোমাদের সাথে মিলিত হওয়ার পর তোমরা কোন পর্যায়েও এ আশংকা পোষণ কর যে, তাঁর সংশ্রব পরিত্যাগ করতে এবং তাঁকে দুশমনের হাতে তুলে দিতে তোমরা বাধ্য হবে, তাহলে এটাই শ্রেয়ঃ হবে যে, এখন থেকেই তাঁকে ছেড়ে দাও। কারণ তিনি তাঁর কওমের মধ্যে সুদৃঢ় মর্যাদার অধিকারী এবং শহরেও সুরক্ষিত স্থানে বাস করেন।

"আমরা বল্লাম- আপনার কথা তো আমরা শুনলাম। এখন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এরশাদ করুন এবং যে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি আমাদের কাছ থেকে নিতে চান তা নিন।"

তারপর হুযুর (স) তাঁর ভাষণে কুরআন তেলাওত করেন, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন, ইসলামের প্রেরণা দান করেন এবং তারপর বলেন, আমি তোমাদের থেকে এ কথার উপর বায়আত নিচ্ছি যে, তোমরা ঠিক সেভাবে আমার সহযোগিতা ও হেফাজত করবে- যেমন তোমাদের জানের ও সন্তানদের হেফাজত করে থাক।

বারা বিন মা'রুর (রা) হুযুরের হাত আপন হাতের মধ্যে নিয়ে আরজ করেন, জি হ্যাঁ, সেই খোদার কসম, যিনি আপনাকে হকসহ পাঠিয়েছেন, আমরা সে সব বিষয় থেকে আপনাকে হেফাজত করব যেসব থেকে আমরা স্বয়ং আমাদের জান ও আওলাদকে হেফাজত করি। অতএব হে আল্লাহর রসূল! আমাদের থেকে বায়আত গ্রহণ করুন। আমরা যুদ্ধের পরীক্ষিত লোক। আমরা বাপদাদার নিকট থেকে এসব উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।

আবুল হায়সাম বিন আত্তাইয়েহান[১] মাঝখান থেকে বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের এবং অন্যান্য (ইহুদী) লোকদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে যা আপনি ছিন্নকারী। তারপর এমন যেন না হয় যে, যখন আল্লাহ্ আপনাকে বিজয় দান করবেন, তখন আপনি আমাদের ছেড়ে আপন কওমের মধ্যে চলে যাবেন। হুযুর (স) মুচ্কি হেসে বল্লেন, না, না। বরঞ্চ এখন খুনের সাথে খুন এবং কবরের সাথে কবর। অর্থাৎ আমার মরণ ও জীবন তোমাদের সাথে। আমি তোমাদের এবং তোমরা আমার। যাদের সাথে তোমাদের লড়াই তাদের সাথে আমারও লড়াই। আর যার সাথে তোমাদের সন্ধি, তার সাথে আমারও সন্ধি।

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ আনসারীর (রা) যে বর্ণনা আমরা ইতিপূর্বে মুসনাদে আহমদ ও তাবারানী থেকে উদ্ধৃত করেছি, তাতে সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি বলেন, আকাবায় যখন আমরা সবাই একত্র হলাম, তখন আমরা আরজ করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কোন্ বিষয়ের উপর আপনার থেকে বায়আত করব? হুযুর (স) বলেন, এর উপর যে তোমরা ভালো-মন্দ সকল অবস্থায় হুকুম মেনে চলবে, আনুগত্য করবে। অবস্থা স্বচ্ছল হোক বা অস্বচ্ছল- সকল অবস্থায় সম্পদ ব্যয় করবে, সৎ কাজের হুকুম করবে, অসৎ কাজ করতে নিষেধ করবে। আর আল্লাহর ব্যাপারে সত্য কথা বলবে। কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার ভয় করবেনা। আর বায়আত করবে এ কথার উপর যে, আমি যখন তোমাদের ওখানে আসব তো তোমরা প্রত্যেকে সে জিনিস থেকে আমার হেফাজত করবে যার থেকে তোমরা তোমাদের জান ও আওলাদের হেফাজত কর। তার বিনিময়ে তোমাদের জন্যে জান্নাত রয়েছে। এ কথায় আমরা উঠে তাঁর দিকে অগ্রসর হলাম এবং তাঁর হাত দলের সবচেয়ে অল্প বয়স্ক যুবক (বায়হাকীর বর্ণনায় শব্দগুলি- আমি ছাড়া সকলের ছোট) আসয়াদ

---

১. কেউ কেউ এর উচ্চারণ- 'আত্তাইয়াহান' আর কেউ 'আত্তিহান' লিখেছেন- গ্রন্থকার।

বিন যুরারা (রা) তাঁর হাতের মধ্যে নিয়ে বল্লেন, হে ইয়াস্‌রেববাসী, থাম। আমরা উট দৌড়ায়ে তাঁর কাছে এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসিনি যে, আমরা জানি তিনি আল্লাহ্‌র রসূল। আজ তাঁকে এখান থেকে বের করে নিজেদের সাথে নিয়ে যাওয়ার অর্থ সমগ্র আরবের দুশমনি খরিদ করা। এর পরিণামে তোমাদের নতুন প্রজন্মকে কতল করা হবে, তরবারী হবে তোমাদের খুন রঞ্জিত। অতএব যদি এসব বরদাশ্‌ত করার শক্তি তোমাদের থাকে, তাহলে তাঁর হাত চেপে ধর। তোমাদের প্রতিদান আল্লাহ্‌র হাতে। কিন্তু তোমরা যদি জানের ভয় কর তাহলে এখন থেকেই সে চিন্তা ত্যাগ কর। আর পরিষ্কার ওজর পেশ কর। কারণ এ সময়ে ওজর-আপত্তি করে দেয়া আল্লাহ্‌র নিকটে বেশী গ্রহণযোগ্য হবে। এতে সবাই বলে ওঠে, আসয়াদ, আমাদের রাস্তা থেকে সরে যাও। খোদার কসম, আমরা এ বায়আত কখনো ত্যাগ করবনা, আর না এর থেকে হাত সরে নেব। তারপর সকলে বায়আত করেন। হাকেম, বায্যার ও বায়হাকীও এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

ইবনে জারীর তাবারী ও ইবনে হিশাম আসেম বিন ওমর বিন কাতাদার বরাত দিয়ে মুহাম্মদ বিন ইসহাকের বর্ণনা উদ্ধৃত করেন যে, বায়আতের সময় আব্বাস বিন উবাদা বিন নাদলা আনসারী বলেন, খাযরাজের লোকেরা, কিছু জান, এ ব্যক্তি থেকে তোমরা কোন্‌ জিনিসের বায়আত নিচ্ছ? উচ্চস্বরে জবাব এলো- হ্যাঁ জানি। আব্বাস তাঁর কথায় জোর দিয়ে বলেন, তোমরা সাদা ও কালো সকলের সাথে লড়াইয়ের বায়আত করছ। অর্থাৎ এ বায়আত করে সারা দুনিয়ার সাথে লড়াই আহ্‌বান করছ। এখন যদি তোমরা ধারণা কর যে, যখন তোমাদের ধনসম্পদ ধ্বংসের এবং তোমাদের সম্ভ্রান্ত লোকদের ধ্বংসের আশংকা করবে, তখন এ ব্যক্তিকে দুশমনের হাতে তুলে দেবে, তাহলে এটাই শ্রেয়ঃ যে আজই তাঁকে পরিত্যাগ কর। কারণ খোদার কসম, এ হবে দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্ছনার কারণ। আর যদি তোমরা মনে কর যে, যে প্রতিশ্রুতিসহ তোমরা এ ব্যক্তিকে তোমাদের ওখানে আহ্‌বান জানাচ্ছ, তাঁকে আপন ধনসম্পদের ও আপন বুযুর্গানের ধ্বংসের আশংকা সত্ত্বেও সব শামলে নেবে, তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁর হস্ত ধারণ কর। খোদার কসম, এটাই হবে দুনিয়া ও আখেরাতের জন্যে মংগল। সমবেত সকলে একমত হয়ে বল্লো, আমরা তাঁকে নিয়ে আমাদের ধনসম্পদ ও বুযুর্গানকে বিপদে নিক্ষেপ করতে প্রস্তুত আছি। তারপর লোকেরা আরজ করলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা যদি আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করি- তাহলে আমাদের পুরস্কার কি?

তিনি বল্লেন- জান্নাত।

ইবনে সা'দ হযরত মুয়ায বিন রিফায়া বিন রাফে-এর বর্ণনা ওয়াকেদীর বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেন যে, আকাবার স্থানে সকলে একত্র হলেন, তখন হুযুরের (স) চাচা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালেব- কথা এভাবে শুরু করেন, হে খায্‌রাজ দল! তোমরা মুহাম্মদকে (স) তোমাদের ওখানে যাওয়ার জন্যে দাওয়াত দিয়েছ। আর অবস্থা এই যে, মুহাম্মদ (স) তার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে সবচেয়ে সুদৃঢ় মর্যাদা সম্পন্ন। আমাদের মধ্যে যারা তাঁর দ্বীন গ্রহণ করেছে এবং যারা করেনি, তারা সকলে বংশ মর্যাদার ভিত্তিতে তাঁর হেফাজত করছে। কিন্তু মুহাম্মদ (স) সকলকে ছেড়ে তোমাদের কাছেই যেতে চান। এখন বুঝেপড়ে দেখ যে, তোমরা এতোটা শক্তি ও সামরিক দূরদর্শিতা রাখ কি না, যে সমগ্র আরবের শত্রুতার মুকাবেলায় নির্ভীক ভূমিকা পালন করবে। কারণ আরব ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অতএব চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত কর। পরস্পর পরামর্শ কর এবং সকলে একমত হয়ে কোন সিদ্ধান্ত কর। কারণ সবচেয়ে ভালো কথা হলো সত্য কথা।

তারপর হযরত আব্বাস জিজ্ঞেস করেন- আমাকে একটু বল তো তোমরা দুমশনের সাথে কিভাবে লড়াই কর? সকলে নীরব রইলেন। আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম- যিনি বায়আতে আকাবার পূর্বক্ষণে ইসলাম গ্রহণ করেন, এ প্রশ্নের জবাব দেন। তিনি বলেন, খোদার কসম, আমরা সমরবিদ লোক। যুদ্ধ আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। এতে আমরা অভ্যস্থ। বাপদাদা থেকে এ আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি। আমরা প্রথমে তীরন্দাজের কাজ করি। তীর শেষ হওয়ার পর নেজাবল্লম দিয়ে লড়াই করি। তা শেষ হওয়ার পর তরবারীর যুদ্ধ শুরু করি। এ তরবারী দিয়ে শত্রুর মুকাবেলা করি। এরপর যার মৃত্যু আগে আসে সে মৃত্যু বরণ করে।

হযরত আব্বাস বলেন, সত্যিই তোমরা যোদ্ধার জাতি। তারপর বারা বিন মা'রুর বলেন, আমরা আপনার কথা শুনলাম। খোদার কসম! আমাদের মনে অন্য কিছু থাকলে পরিষ্কার তা বলে দিতাম। আমরা তো রসূলুলাহর (স) সাথে সত্যিকার অর্থে প্রতিশ্রুতি পালন করতে এবং তাঁর জন্যে জীবন দিতে চাই।

ওয়াকেদী অন্য একটি বর্ণনায়- হযরত বারা বিন মা'রুরের এ ভাষণের এ কথাগুলো উদ্ধৃত করা হয়েছে। "আমরা প্রচুর যুদ্ধ সরঞ্জাম ও লড়াইয়ের শক্তি রাখি। আমরা যখন পাথরের মূর্তি পূজা করতাম, তখনই যখন এ অবস্থা ছিল, আর এখন তো আমাদের অবস্থা কেমন হতে পারে- যখন আল্লাহ আমাদেরকে সে সত্য দেখিয়ে দিয়েছেন- যে বিষয়ে অন্যান্য লোক অন্ধকারে আছে এবং মুহাম্মদের (স) মাধ্যমে আমাদের সাহায্য করেছেন।(১)

আকাবার বায়আতের গুরুত্ব

ইসলামের ইতিহাসে এ এক বৈপ্লবিক ঘটনা যা খোদা তাঁর মেহেরবানীতে সংঘটিত করেন এবং নবী মুহাম্মদ (স) এর সুযোগ গ্রহণ করেন। ইয়াস্রেববাসী নবীকে (স) নিছক একজন আশ্রয় প্রার্থী হিসাবে নয়, বরঞ্চ খোদার প্রতিনিধি এবং নিজেদের নেতা ও শাসক হিসাবে তাঁদের শহরে ডাকছিলেন এবং ইসলামের অনুসারীদের নিকটে তাঁদের এ আহবান এ জন্যে ছিলনা যে তিনি এক অপরিচিত স্থানে নিছক একজন মুহাজির হিসাবে স্থান লাভ করবেন, বরঞ্চ উদ্দেশ্য ছিল এই যে আরবের বিভিন্ন গোত্রে ও অংশে যে সব মুসলমান ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে ছিল তারা সব ইয়াসরেবে এসে একত্র হবে এবং ইয়াসরেবী মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে একটি সুশৃংখল ইসলামী সমাজ গঠন করবে। এভাবে ইয়াসরেব প্রকৃতপক্ষে নিজেকে 'মদীনাতুল ইসলাম' (ইসলামের শহর) হিসাবে পেশ করলো এবং নবী (স) তা গ্রহণ করে আরবে প্রথম দারুল ইসলাম কায়েম করলেন। এ উদ্যোগের অর্থ যা কিছু ছিল, তার থেকে মদীনাবাসী অনবহিত ছিলন। এর পরিষ্কার অর্থ এই ছিল যে, একটা ক্ষুদ্র শহর নিজেকে সমগ্র দেশের সামরিক, অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক বয়কটের মুকাবেলা পেশ করছিল। বস্তুতঃ বায়আতে আকাবার রাতের সে বৈঠকে ইসলামের এ প্রাথমিক সাহায্যকারীগণ (আনসার) এ পরিণাম খুব ভালো করে জেনে বুঝে নবীর (স) হাতে তাঁদের হাত রেখেছিলেন। তাঁদের ভাষণে এ সব কিছুই প্রকাশ হয়ে পড়েছিল।(২)

আনসারদের জীবন বিলিয়ে দেয়ার প্রেরণা

বিপদের আশংকা ভালো করে জানা সত্ত্বেও মদীনার আনসার রসূলুল্লাহর (স) হাতে যে বায়আত করেছিলেন, তার জন্যে কোন প্রকার বিচলিত হওয়া তো দূরের কথা, তার জন্যে

তাঁরা গর্ববোধ করেন এবং তাঁদের মধ্যে এ পথে সকলের আগে চলার প্রেরণা এতো বিরাট ছিল যে, তাঁদের মধ্যে এ আলোচনা হতে থাকে যে, বায়আতের সময় সবার আগে নবীর (স) হাতে কার হাত রাখার সৌভাগ্য হয়েছিল। ইবনে ইসহাক বলেন, বনী নাজ্জার দাবী করতো যে, সর্ব প্রথম বায়আত করেন আসয়াদ বিন যুরারা (রা)। বনী আবদুল আশহাল দাবী করতো যে, এ সৌভাগ্য হয়েছিল- আবুল হায়সাম বিন আত্তাইয়েহানের। ইবনে আসীর উস্‌দুল গাবাতে লিখেছেন যে, বনী সালমা বলেন, সকলের আগে বায়আতকারী ছিলেন কা'ব বিন মালেক (রা)। ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর বরাত দিয়ে বলেন, আউস এবং খাযরাজের মধ্যে পরস্পর গর্ব অহংকার করা শুরু হলো যে, সকলের আগে বায়আতকারী আউসের ছিল না খায্‌রাজের। অবশেষে লোকেরা বল্লো, এ বিষয়টি হযরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব থেকে ভালো আর কেউ জানেনা। কারণ তিনি সে সময় হুযুরের (স) সাথে ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হুযুরের (স) হাতে হাত সর্বপ্রথম দেন আসয়াদ বিন যুরারা, তারপর বারা বিন মা'রুর এবং তারপর উসাইদ বিন হুযাইর।

নকীব নিয়োগ

হযরত কা'ব বিন মালেকের (রা) যে বর্ণনা আমরা ইতোপূর্বে উদ্ধৃত করেছি, তার শেষে তিনি বয়ান করেন যে, বায়আতের পর রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে বার জন নকীব নির্বাচন করে আমাকে দাও যারা নিজ নিজ গোত্রের দায়িত্বশীল হবে। তাবাকাতে ইবনে সা'দে ইবনে ইসহাকের এরূপ বর্ণনা আছে যে, নবী (স) বলেন, তারা নিজ নিজ কওমের জামিনদার হবে যেমন হযরত ঈসা (আ) বিন মরিয়মের হাওয়ারীগণ জামিনদার ছিলেন। তাবাকাতে ইবনে সা'দে ওয়াকেদী থেকে এমন আর এক বর্ণনা আছে যে, হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাইল থেকে বার জন নকীব নিয়েছিলেন। হুযুরের (স) এ এরশাদ অনুযায়ী সকলে ১২ জনের প্রস্তাব করেন- ৯ জন খায্‌রাজ থেকে, ৩ জন আউস থেকে। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে তাঁদের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

খাযরাজ থেকে-

১. আসয়াদ বিন যুরারা (রা)। হুযুর (স) তাঁকে নকীবগণের নেতা বানিয়ে দেন (নকীবুন্ নুকাবা)।
২. সা'দ বিন আর-রাবী (রা)। জাহেলিয়াতের যুগে মদীনায় শিক্ষিত লোকদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন।
৩. আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা)। তাঁকে 'কামেল' বলা হতো।
৪. রাফে বিন মালেক (রা)। জাহেলিয়াতের যুগে- 'কামেল' বলা হতো।
৫. বারা বিন মা'রুর (রা)। হিজরতের কিছু পূর্বে তাঁর ইন্তেকাল হয়। হুযুর (স) তাঁর কবরে জানাযা পড়েন।
৬. আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম (রা)। বায়আতে আকাবার রাতে তিনি ঈমান আনেন।
৭. উবাদা বিন সামেত (রা)।
৮. সা'দ বিন উবাদা (রা)। তাঁকে 'কামেল' বলা হতো।
৯. মুনযের বিন আমর (রা)। ইনিও লেখাপড়া জানতেন।

আউসের মধ্যে-

১. উসায়েদ বিন হুযাইর (রা)। তাঁকে 'কামেল' বলা হতো।

২. সা'দ বিন খায়সামা (রা)।
৩. রিফায়া বিন আবদুল মুনযের (রা)। (ইবনে ইসহাক বলেন, জ্ঞানীগণ তাঁর স্থলে আবুল হায়সাম বিন আত্তাইয়েহান বলেছেন)।

তারপর হুযুর (স) বলেন, তোমরা আপন আপন থাকার জায়গায় চলে যাও।

বায়আতের সংবাদে কুরাইশের প্রথম প্রতিক্রিয়া

ইমাম আহমদ, ইবনে জারীর তাবারী ও ইবনে হিশাম-মুহাম্মদ বিন ইসহাকের বরাত দিয়ে হযরত কাব বিন মালেকের (রা) বর্ণনা উদ্ধৃত করেন এবং অনুরূপ বর্ণনা ওয়াকেদী বিভিন্ন সনদসহ উদ্ধৃত করেন, যা ইবনে সা'দ তাবাকাতে সন্নিবেশিত করেন। তা এই যে, যে রাতে আকাবায় বায়আত অনুষ্ঠিত হয়, সে রাতেই কুরাইশের কানে এ খবর পৌঁছে এবং সকাল বেলা তাদের নেতৃবৃন্দ মিনায় মদীনাবাসীদের শিবিরে পৌঁছে। তারা বলে, হে খাযরাজের লোকেরা, আমাদের নিকটে এ খবর পৌঁছেছে যে, তোমরা আমাদের এ লোকের - (মুহাম্মদ (স)) সাথে মিলিত হয়েছো। তোমরা চাও তাকে আমাদের নিকট থেকে বের করে নিয়ে যেতে এবং তার কাছে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বায়আত করেছ। খোদার কসম! আরবের মধ্যে এমন কোন কওম নেই- যাদের সাথে লড়াই করা আমাদের জন্যে তোমাদের চেয়ে বেশী অপছন্দনীয়।

এর জবাবে মদীনাবাসীদের মধ্যে যারা মুশরিক ছিল তারা উঠে হলপ করে বলে, এমন কিছু হয়নি, আমাদের এ সম্পর্কে কিছু জানা নেই।

এটা তাদের সত্য কথাই ছিল। কারণ সত্য সত্যই এ সম্পর্কে তাদের কিছু জানা ছিলনা। কিন্তু মুসলমান একে অপরের দিকে চাওয়া চাওই করছিলেন। তারপর কুরাইশের সর্দার আবদুল্লাহ বিন ওবাই-এর নিকট গেল এবং তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো। সে বলে, এ এতো বড়ো কাজ যে, আমার কওম আমাকে ছাড়া এ কাজ করতে পারেনা। আমি জানিনা যে এমন হয়েছে।

এসব জবাবে কুরাইশ সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তারা গোপনে অনুসন্ধান করতে থাকে। তারপর তারা নিশ্চিত হয় যে, এরূপ ঘটনা ঘটেছে। বায়আতকারীগণ মদীনায় ফিরে যাবার সময় কুরাইশ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। মক্কার বাইরে নিকটেই 'আযাখের' নামক স্থানে তারা হযরত সা'দ বিন ওবাদা (রা) এবং মুনযের বিন আমরকে (রা) ধরে ফেলে। মুনযের তো তাদের থেকে পালিয়ে বেরিয়ে যান। কিন্তু সা'দ বিন ওবাদা (রা) কে আটক করে তার হাত গলার সাথে বেঁধে মারতে মারতে মক্কায় নিয়ে আসে।

হযরত সা'দ (রা) বলেন, যখন মক্কায় আমার সাথে এরূপ আচরণ করা হচ্ছিল তখন একজন গৌর বর্ণের হাট্টাগোট্টা যুবক আমার সামনে এলো (এ ছিল সুহাইল বিন আমর)। মনে করলাম- এদের কারো মধ্যে যদি মংগল থাকে তো এর মধ্যে আছে। কিন্তু আমার নিকটে এসে সে খুব জোরে আমাকে একটা ঘুষি মারলো। মনে মনে ভাবলাম এর মধ্যে কোন মংগল নেই। যখন তারা আমাকে ছিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন একজন আমাকে বল্লো (এ ছিল আবুল বাখতারী বিন হিশাম), খোদার বান্দাহ! তোমার এবং কুরাইশের কারো সাথে কোন প্রতিশ্রুতি ও আশ্রয়ের কোন সম্পর্ক নেই তো? আমি বল্লাম, আমি আমার এলাকায় জুবাই'র বিন মুতয়েম ও হারেস বিন হারাব বিন উমাইয়া বিন আবদে শামশের বাণিজ্য কাফেলাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি। (ইবনে সা'দ জুবাইরের স্থলে তার পিতা মুতয়েম বিন আদীর নাম বলেছেন)। সে বলে, তাহলে তার দোহাই দাও এবং বল তার সাথে

তোমার কি সম্পর্ক। অতএব আমি তাই বল্লাম। তখন সে (আবুল বাখতারী) দু'ব্যক্তির তালাশে বেরিয়ে গেল। তারপর হেরমে কাবায় তাদেরকে পেয়ে গেল। তাদেরকে বল্লো, খাযরাজের এক ব্যক্তিকে মক্কা ও মিনার মধ্যবর্তী মুহাস্‌সাব উপত্যকায় মারপিট করা হচ্ছে এবং সে তোমাদের দু'জনের নাম ধরে ডাকছে। সে বলছে- তার এবং তোমাদের মধ্যে আশ্রয়দানের সম্পর্ক আছে। তারা বল্লো, সে ব্যক্তি কে? সে বল্লো, সা'দ বিন ওবাদা। এ কথা শুনে উভয়ে বল্লো, খোদার কসম, সে সত্য কথা বলছে। আমাদের ব্যবসায়ীদেরকে সে আশ্রয় দিত এবং তাদের উপর কাউকে জুলুম করতে দিতনা। তারা এলো এবং হযরত ওবাদাকে জালেমদের হাত থেকে রক্ষা করলো।

ওয়াকেদী বলেন, হযরত সাদের নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর যখন আনসার জানতে পারলেন, তখন তাঁরা তাঁর তালাশে মক্কার দিকে ফিরলেন। কিন্তু পথে তাঁরা সা'দকে ফিরে যেতে দেখলেন।

বায়আতের পর মদীনায় ইসলাম প্রচার

মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর আনসার অতি দ্রুততার সাথে ইসলাম প্রচার শুরু করেন এবং দ্বীনী আবেগসহ প্রতিমা ভেঙে ফেলার কাজে লেগে যান। ইবনে সা'দ বিস্তারিত বর্ণনা দেন যে, আবু আবস বিন জাবর ও আবু বুরদা বিন নিয়ার, বনী হারেসার প্রতিমা, উমারা বিন হাযম, আসয়াদ বিন যুরারা, আওফ বিন আফরা, সালিত বিন কায়স ও আবু সিরমা বনী নাজ্জারের প্রতিমা; যিয়াদ বিন লাবিদ ও ফারওয়া বিন আমর বনী বিয়াযার প্রতিমা; সা'দ বিন উবাদাহ, মুনযের বিন আমর ও আবু দু'জামা, বনী সয়েদার প্রতিমা; মুযায বিন জাবল, সা'লাবা বিন গানামা ও আবদুল্লাহ বিন উনায়েস বনী সালেমার প্রতিমা চূর্ণ করছিলেন। এর থেকে আন্দাজ করা যায় যে, মুসলমান সে সময়ে মদীনার মুশরিকদের উপর এতোটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে, তারা এ প্রতিমা ধ্বংসে প্রতিবন্ধকতা করতে পারেনি।

এ সম্পর্কে একটি মজার ঘটনা ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন। মদীনাবাসীদের সর্দারদের মধ্যে বনী সালেমার সর্দার আমর বিন জামুহ্ শির্কের উপর অবিচল ছিল। অথচ তার পুত্র মুয়ায বিন আমর মুসলমান হয়ে আকাবায় বায়আত করে এসেছিলেন। সে তার বাড়িতে কাঠের একটি প্রতিমা অত্যন্ত সম্মানের সাথে রেখেছিল যার নাম ছিল মানাত। এ ধরনের প্রতিমা ঘর সাধারণতঃ মুশরিকদের সর্দার তাদের বাড়িতে রাখতো। বনী সালেমা গোত্রের যুবকগণ স্বয়ং আমর বিন জামুহ-এর পুত্রসহ মুসলমান হয়ে গেলেন। রাতের বেলা তাঁরা প্রতিমাগৃহে ঢুকে সে প্রতিমাকে উপুড় করে একটি গর্তে নিক্ষেপ করতেন যেখানে মহল্লার লোক ময়লা-আবর্জনা ফেলতো। সকালে উঠে যখন আমর তার প্রতিমাকে দেখতে পেতনা তখন হৈ হল্লা করে তা খুঁজে বেড়াতো। তারপর গর্ত থেকে তুলে এনে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে সুগন্ধি লাগিয়ে তার স্থানে রেখে দিত। তারপর সে বলতো, যে তোমার সাথে এ আচরণ করেছে তাকে যদি পেতাম তো ভালোভাবে লাঞ্ছিত করতাম। এ ধরনের খেল-তামাশা কিছুদিন চলে। একদিন সে তার প্রতিমা গর্ত থেকে তুলে এনে তার ঘাড়ে একটি তরবারী ঝুলিয়ে দেয়। তারপর বলে, আমি জানিনা তোমার সাথে এ আচরণ কে করে। এখন তোমার কোন শক্তি থাকলে এ তরবারী দিয়ে নিজের হেফাজত কর।

রাতে যুবক দল প্রতিমার ঘাড় থেকে তরবারী নামিয়ে রাখে, একটি মৃত কুকুর তার সাথে বেঁধে দেয় এবং তাকে নিয়ে বনী সালেমার একটি কূপে তা নিক্ষেপ করে। সকাল

বেলা তালাশ করতে করতে তাকে সে কূপের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। একটি মৃত কুকুরের সাথে ময়লা-আবর্জনায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তখন তার কওমের মুসলমানগণ তাকে অনেক বুঝাবার পর তার চোখ খুলে যায় এবং তারপর সে খাঁটি হেলে ইসলাম গ্রহণ করে।(৩)

নির্দেশিকা

১. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন।
২. তাফহীমুল কুরআন, দ্বিতীয় খন্ড, সূরা আনফাল-এর ভূমিকা।
৩. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মদীনায় হিজরত

সর্ব প্রথম মুহাজির

ইবনে জারীর ও ইবনে হিশাম বলেন, এখনো মদীনায় সাধারণ হিজরতের পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি, শুধুমাত্র আকাবায় দ্বিতীয় বায়আত অনুষ্ঠিত হয়েছে (নবুওতের দ্বাদশ বর্ষ, যিলহজ্ব মাস), এমন সময়ে হুযুরের (স) দুধ ভাই এবং তাঁর ফুফী বাররা বিন্তে আবদুল মুত্তালেবের পুত্র হযরত আবু সালামা (রা) মদীনায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত করেন। কারণ হাবশায় হিজরত করার পর পুনরায় মক্কায় ফিরে আসলে মক্কার কাফেরগণ এবং স্বয়ং তাঁর গোত্র বনী মাখযুমের অত্যাচার উৎপীড়নে তিনি অতিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু জালেমরা তাঁকে হিজরতের জন্যে সুস্থ পরিবেশে বেরুতে দেয়নি।

হযরত উম্মে সালামার বিপদ কাহিনী

ইবনে হিশাম মুহাম্মদ বিন ইসহাকের বরাত দিয়ে স্বয়ং উম্মে সালামার এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যখন আমার স্বামী মদীনা হিজরত করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তো আমিও তাঁর সাথে আমার শিশু সালামাকে কোলে করে বেরিয়ে পড়ি। তিনি আমাকে ও আমার সন্তানকে উটের উপরে বসিয়ে তার নাকল বা নাকরশি হাতে নিয়ে চলতে শুরু করেন। আমার পিতামাতার পক্ষের লোকেরা (বনী মুগীরা) তাঁকে যেতে দেখে পথ রোধ করে দাঁড়ালো এবং বলতে লাগলো, তুমি স্বয়ং তো আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছ। তুমি যেখানে খুশী চলে যাও। কিন্তু আমাদের এ শিশুকে নিয়ে তোমাকে অসহায়ের মতো ঘুরে বেড়াতে দিতে পারিনা। তারপর তারা উটের নাকল আবু সালামার হাত থেকে কেড়ে নেয় এবং আমাকে ফিরে নিয়ে চলে। ওদিকে আবু সালামার পরিবারের লোকজন (বনী আবদুল আসাদ) রাগান্বিত হয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো এবং বল্লো, তোমরা যখন আমাদের লোকের কাছ থেকে তার শিশুকে কেড়ে নিয়েছ তো আমরা আমাদের শিশু পুত্র সালামাকে এর নিকটে কেন যেতে দেব? এ কথা বলে তারা জোর করে আমার নিকট থেকে আমার শিশুকে কেড়ে নেয়। এই কাড়াকাড়ি ও টানা হেঁচ্‌ড়াতে শিশুটির হাত উঠে যায় বা অসংলগ্ন হয় (বালাযুরী বলেন, মৃত্যু পর্যন্ত শিশুটির হাত ঐ অবস্থায় থাকে)। এখন অবস্থা এই হলো যে, শিশু তারা নিয়ে গেল এবং বনী মগীরা আমাকে তাদের ওখানে নিয়ে আমাকে আটক করে রাখলো। বেচারা আবু সালামা একাকী মদীনা রওয়ানা হয়ে যান। প্রায় এক বছর যাবত আমার অবস্থা এ ছিল যে, প্রতিদিন বের হয়ে গিয়ে আবতাহ্ নামক স্থানে গিয়ে বসে কাঁদতাম। একদিন বনী মগীরার এক ব্যক্তি আমার চাচার দিক দিয়ে আত্মীয়- আমার এ মর্মন্তুদ অবস্থা দেখার পর আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে পড়েন। তিনি গিয়ে বনী মগীরাকে বলেন, এ মিসকীন বেচারীকে তোমরা কেন যেতে দিচ্ছনা? তোমরা তাকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করেছ এবং তার শিশু পুত্র থেকেও। অবশেষে তারা আমাকে বল্লো, তুমি যদি

স্বামীর কাছে যেতে চাও তো চলে যাও। আবদুল আসাদ আমার শিশুকেও আমার কাছে ফিরিয়ে দিল। আমি আমার শিশুকে নিয়ে আমার উটে চড়ে একাই মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম। আমি যখন তান্ইমের নিকটে পৌঁছলাম তখন বনী আবদুদ্দারের ওসমান[১] বিন তাল্হা বিন আবি তালহার সাথে পথে আমার দেখা হয়। তিনি বলেন, আবু উমাইয়ার মেয়ে, কোথায় যাচ্ছ? বল্লাম, মদীনায়- স্বামীর কাছে। তিনি বল্লেন, তোমার সাথে কেউ নেই? বল্লাম, খোদা এবং এ শিশু ছাড়া আমার সাথে আর কেউ নেই। তিনি বল্লেন, খোদার কসম, আমি তোমাকে একা যেতে দেবনা।

তারপর তিনি আমার উটের নাকল ধরে চলতে লাগলেন। খোদার কসম, তাঁর চেয়ে অধিক শরীফ লোক আমি দেখিনি। কোন মন্যিলে পৌঁছার পর আমার উটকে বসিয়ে দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াতেন। আমার শিশুকে নিয়ে উট থেকে নেমে পড়লে তিনি উটকে কোন গাছে বেঁধে রেখে আমার থেকে দূরে কোন এক গাছতলায় বসে পড়তেন। আবার চলার সময় হলে তিনি উটকে এনে বসাতেন, দূরে সরে যেতেন এবং আমাকে বলতেন, উটে চড়ে বস। চড়ে বসলে তিনি উটের নাকল ধরে চলতে থাকতেন। মদীনা পর্যন্ত সারা রাস্তা তিনি এভাবে অতিক্রম করেন। যখন কুবায় বনী আওফের বস্তি নজরে পড়লো, তখন তিনি বল্লেন, তোমার স্বামী ওখানে আছে। তার কাছে চলে যাও। আল্লাহ্ তোমাকে বরকত দান করুন। তারপর যেভাবে তিনি পায়ে হেঁটে এসেছিলেন, সেভাবে পায়ে হেঁটেই মক্কা ফিরে যান। বালাযুরীও এ ঘটনা 'আনসাবুল আশরাফে' বয়ান করেছেন।

এর থেকে অনুমান করা যায় যে, কুরাইশ কাফেরগণ যেভাবে মুসলমানদের প্রতি জুলুম নির্যাতনে সীমালংঘন করে চলেছিল, তা লক্ষ্য করে স্বয়ং তাদের দলের লোকদের মধ্যে এ জুলুমের কারণে বীতশ্রদ্ধা সৃষ্টি হচ্ছিল এবং মজলুম মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক হচ্ছিল। ঐ সমাজের যাদের মধ্যেই মানবতা ও ভদ্রতার গুণাবলী বিদ্যমান ছিল, তারা ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা সত্ত্বেও আপন কওমের ওসব মহান চরিত্রের লোকদেরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে থাকে যাঁরা কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে নয়, নিছক নিজেদের ঈমানের খাতিরে সর্ব প্রকার জুলুম নিপীড়ন সহ্য করছিলেন এবং কোন প্রকার নির্যাতনে দমিত হয়ে যাকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন তার থেকে বিমুখ হতেননা।

হিজরতের সাধারণ নির্দেশ

আকাবায় শেষ বায়আতের পর নবুওতের ত্রয়োদশ বর্ষে, যিলহজ্ব মাসে, নবী (স) মক্কার মুসলমানগণকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন এবং বলেন, আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্যে ভাই পয়দা করে দিয়েছেন ও এমন এক শহর ঠিক করে দিয়েছেন যেখানে তোমরা নিরাপদে থাকতে পার (ইবনে ইসহাক বরাতসহ ইবনে হিশাম)। এ নির্দেশ পাওয়া মাত্র সর্ব প্রথম হযরত আমের বিন রাবিয়া আল্ আন্যী (রা) তাঁর বিবি লায়লা বিন্তে আবি

---

১. ইনি কাবার চাবি রক্ষক ছিলেন। যুদ্ধে কুরাইশের পতাকা তাঁর হাতে থাকতো। মক্কায় শক্তিশালী সর্দারগণের অন্যতম ছিলেন। সে সময়ে তিনি শুধু মুশরেকই ছিলেননা, বরঞ্চ ইসলাম ও মুসলমানের চরম দুশমন ছিলেন। তাঁর চাচাতো ভাই মুস্আব বিন ওমাইর ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর উপর ভয়ানক নির্যাতন চালায়। হযরত উম্মে সালামার সাথে কোন নিকট আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিলনা। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খালেদ বিন অলীদের সাথে হিজরত করেন- গ্রন্থকার।

হাস্‌মাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তারপর হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা), হযরত বেলাল (রা) এবং হযরত সা'দ বিন আবি ওক্কাস (রা) হিজরত করেন। অতঃপর হযরত ওসমান বিন আফ্‌ফান (রা) তাঁর বিবি রুকাইয়া (রা) বিন্তে রসূল (স) সহ রওয়ানা হন। এভাবে হিজরতের এক ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায় এবং লোক ক্রমাগত এ নতুন হিজরতের স্থলে যেতে শুরু করে। এমনকি এক এক পরিবারের সকল লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে তিনটি পরিবারের উল্লেখ করেন, যাদের সব লোক হিজরত করেন। তাঁদের ঘরবাড়ি শূন্য পড়ে থাকে। এক- বনী মায্‌উন। দ্বিতীয়- বনী আল্‌ বুকাইর। তৃতীয়- বনী জাহ্‌শ বিন রিয়াব। ইবনে আবদুল বার বলেন, বনী জাহ্‌শের সাথে বনী আসাদ বিন খুযায়মার নারী-পুরুষ-শিশু সবাই চলে যান। এ দুটি পরিবারের মোট ৩০ জন হিজরত করেন যাঁদের মধ্যে হুযুরের (স) ফুফাতো ভাই আবদুল্লাহ্‌ বিন জাহ্‌শ (রা) এবং আবু আহমদ জাহ্‌শ (রা) (যাঁর নাম ছিল আব্‌দ), তাঁর দুই ভগ্নি- হযরত যয়নব বিন্তে জাহ্‌শ (রা) (পরবর্তীকালে উম্মুল মুমেনীন), হাস্‌না বিন্তে জাহ্‌শ (রা)- (হযরত মুস্‌আব বিন উমাইরের বিবি) এবং উম্মে হাবিব বিন্তে জাহ্‌শ (রা)- হযরত আবদুর রহমান বিন আওফের (রা) বিবি শামিল ছিলেন। তাঁদের চলে যাওয়ার পর উত্‌বা বিন রাবিয়া, আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব এবং আবু জাহ্‌ল ঐদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। উত্‌বা বিন রাবিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে দুঃখ করে বলে, আজ বনী জাহ্‌শের বাড়ি বসতি শূন্য অবস্থায় রইলো। আবু জাহ্‌ল বল্লো, কাঁদছ কেন? এসব আমাদের এ ভাইয়ের (আব্বাস) ভাতিজার কর্মকান্ড। সে আমাদের দলে ভাঙন সৃষ্টি করেছে, আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ফাটল ধরিয়েছে। তারপর আবু সুফিয়ানের পালা। সে বনী জাহ্‌শের বাড়ি দখল করে- তা বিক্রি করে দেয়। উপলক্ষ এ ছিল যে, তার মেয়ে ফারয়া অথবা ফারেয়া আবু আহমদ বিন জাহ্‌শের স্ত্রী ছিল। যেন জামাইয়ের গোটা পরিবারের উত্তরাধিকার তার জীবদ্দশায় শ্বশুরের কাছে পৌঁছে গেল। হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন জাহ্‌শ (রা) আবু সুফিয়ানের এ বাড়াবাড়ির অভিযোগ হুযুরের (স) কাছে পেশ করলে তিনি বলেন, তুমি কি তোমার বাড়ির বিনিময়ে জান্নাতে একটি বাড়ি লাভে সন্তুষ্ট নও? মক্কা বিজয়ের পর হযরত আবু আহমদ (রা) হুযুরের (স) নিকটে আবেদন করে বলেন, আমাদের বাড়ি আমাদের ফেরৎ দেয়া হোক। এতে হুযুর (স) নীরব থাকেন। সাহাবা (রা) তাঁকে বলেন, হুযুর (স) এটা পছন্দ করেননা যে, মুহাজেরদের যে সম্পদ খোদার পথে ব্যয় করা হয়েছে তা তাঁরা ফেরৎ নেয়ার চেষ্টা করবেন। হুযুরের (স) আপন বাড়ি যা মক্কায় ছিল, তা হিজরতের পর আকীল বিন আবি তালেব দখল করে নেন। আর তখনো তিনি ঈমান আনেননি। মক্কা বিজয়ের পর হুযুর (স) তাঁর কাছ থেকে সে বাড়ি ফেরৎ নেননি। (আবু দাউদ- কিতাবুল হজ্ব)

মুসলমানগণকে হিজরত থেকে বিরত রাখার জন্যে কুরাইশের চেষ্টা তদবির

হযরত সুহাইব (রা) যখন হিজরতের জন্যে বেরিয়ে পড়েন তখন কুরাইশের লোকেরা তাঁকে বলে, তুমি এমন নিঃস্ব অবস্থায় এসেছিলে এবং আমাদের শহরে থেকে ধনবান হয়েছ। এখন তুমি কি চাও যে- তোমার জানের সাথে তোমার মালও এখান থেকে নিয়ে যাবে? খোদার কসম, তা হতে পারেনা। হযরত সুহাইব বলেন, আমি যদি আমার সমুদয় ধনসম্পদ তোমাদেরকে দিয়ে দিই, তাহলে কি তোমরা আমাকে যেতে দেবে? তারা বলে,

হ্যাঁ। হযরত সুহাইব তাঁর সমুদয় ধনসম্পদ তাদেরকে দিয়ে শূন্য হাতে খোদার পথে বেরিয়ে পড়েন। হুযুর (স) তা জানতে পেরে বল্লেন, সুহাইব মুনাফার সওদা করেছে, সুহাইব মুনাফার সওদা করেছে। এ ইসহাক বিন রাহ্ওয়াইয়া, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে হিশাম ও বালাযুরীর বর্ণনা যা তাঁরা আবু ওসমান আন্নাহ্দী থেকে উদ্ধৃত করেন।

ইবনে আবদুল বার- 'আদ্দুরারু ফী ইখতিসারিল মাগাযী ওয়াস্‌সিয়ার'-এ লিখেছেন যে, যখন হযরত সুহাইব (রা) মক্কা থেকে রওয়ানা হন, তখন কুরাইশ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁকে হত্যা করে- তাঁর অর্থসম্পদ হস্তগত করার উদ্দেশ্যে। তিনি তাদেরকে আসতে দেখে বল্লেন, তোমরা তো জান যে আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ তীরন্দাজ। খোদার কসম, তোমাদের মধ্যে কেউ আমার নিকটে পৌছতে পারবেনা। যতোক্ষণ পর্যন্ত যার মৃত্যু নির্ধারিত আছে সে না মরেছে। তারা বল্লো, তোমার মাল সম্পদ ছেড়ে দিয়ে চলে যাও। সুহাইব (রা) বল্লেন, মালতো আমি মক্কায় ছেড়ে এসেছি। অমুক স্থানে যাও এবং সেখান থেকে মাল বের করে নাও। অতঃপর তারা চলে যায় এবং তাঁর মাল হস্তগত করে। অনুরূপ বর্ণনা বালাযুরী হযরত সাঈদ বিন আল্ মুসাইয়াব (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

বায়হাকী ও তাবারানী হযরত সাঈদ বিন আল মুসাইয়াব থেকেই স্বয়ং হযরত 'সুহাইবের' (রা) এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, আমি যখন হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরুলাম তো কুরাইশের কতিপয় যুবক আমাকে আটক করে রাখে। তারা ঘুমিয়ে পড়লে আমি পালিয়ে আসি। কিন্তু পথে তাদের কয়েকজন আমাকে ধরে ফেলে। আমি তাদেরকে বল্লাম, আমি যদি মক্কায় গিয়ে তোমাদেরকে কয়েক উকিয়া[১] সোনা দিয়ে দিই, তাহলে আমাকে ছেড়ে দেবে? তারা ছেড়ে দেয়ার ওয়াদা করলো। আমি মক্কায় ফিরে গিয়ে তাদেরকে বল্লাম, অমুক স্থানে মাটি খনন করে সোনা বের করে নাও এবং অমুক মেয়ে লোক থেকে দু'জোড়া কাপড় নিয়ে নাও। এভাবে তাদের কাছ থেকে মুক্তিলাভ করে কুবায় হুযুরের (স) নিকটে পৌছলাম- তখন তিনি বল্লেন, এ সওদায় তুমি বড়ো মুনাফা করেছ। আমি বল্লাম, এ ঘটনা তো আর কারো জানা নেই। জিব্রিল ছাড়া আর কে আপনাকে এ খবর দিতে পারে?

আইয়াশ বিন আবি রাবিয়ার (রা) বিবরণ

অন্যান্য মুহাজিরগণ চুপে চুপে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু হযরত ওমর (রা) প্রকাশ্যে বিশ জন আরোহীসহ রওয়ানা হন। তাঁর সাথে ছিলেন তার ভাই যায়েদ বিন আল খাত্তাব (রা), তাঁর ভগ্নিপতি সাঈদ বিন যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল, তাঁর জামাই খুনাইস বিন হুযাফা (রা) (হযরত হাফ্সার প্রাক্তন স্বামী) এবং আরও অনেক সংগী সাথী। বায্যার ও ইবনে ইসহাক সঠিক সনদসহ স্বয়ং হযরত ওমরের (রা) বর্ণনা উদ্ধৃত করেন- যাতে তিনি বলেন, আমি আইয়াশ বিন আবি রাবিয়া এবং হিশাম বিন আস বিন ওয়াইলের সাথে এ কথা স্থির করেছিলাম যে, মক্কা থেকে দশ মাইল দূরে তানাদিব নামক স্থানে এসে তারা আমাদের সাথে মিলিত হবে। নির্দিষ্ট সময়ে তারা সেখানে না পৌছলে মনে করা হবে যে- তাদেরকে আটক করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট লোক তাদের প্রতীক্ষায় না থেকে সামনে অগ্রসর হবে। হিশাম মক্কাতেই ধরা পড়েন এবং আইয়াশ আমাদের সাথে মদীনায় পৌছে যান। পেছনে পেছনে আবু জাহল বিন হিশাম এবং হারেস বিন হিশাম (যারা ছিল আইয়াশের চাচাতো

---

১. এক উকিয়া ৩ $\frac{১}{৪}$ তোলার সমপরিমাণ- গ্রন্থকার।

ভাই এবং বৈপিত্র ভাই ও)[১] মদীনায় পৌছে এবং বহু চালাকি চাতুরি করে আইয়াশকে বশ করে বলে, আম্মা কসম করেছে যে যতোক্ষণ না তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করেছ- সে মাথায় চিরুণীও দেবেনা এবং রৌদ্র থেকে ছায়ায় যাবেনা। আমি তাকে অনেক বুঝালাম যে, এরা তোমাকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলতে চায়। এ ফাঁদে পা দিওনা। তোমার মাকে যখন উকুন জ্বালাতন করবে তখন সে আপনা-আপনি মাথায় চিরুণী দেবে এবং মক্কায় রৌদ্র তাপ যখন সহ্য হবেনা তখন ছায়ায় যাবে। কিন্তু আইয়াশের মায়ের ভালোবাসা এতোটা বিজয়ী হলো যে, সে আমাকে বলতে লাগলো, আমি মায়ের কসম পূর্ণ করে এবং নিজের মালসম্পদ নিয়ে ফিরে আসব। আমি বল্লাম, আমি আমার অর্ধেক সম্পদ তোমাকে দিচ্ছি, তুমি তাদের সাথে যেয়োনা। কিন্তু সে আমার কথা মানলোনা। আমি তখন বল্লাম, তুমি যখন যাবেই তো আমার উটনী নিয়ে যাও। এ সর্বোৎকৃষ্ট উটনী, তাকে কখনো হাতছাড়া করবেনা। এ দু'জনের নিয়ত যদি খারাপ মনে কর তো তক্ষুণি এ উটনী নিয়ে পালিয়ে আসবে। একথা সে মেনে নিল।

পথে এক স্থানে আবু জাহল তাকে বল্লো, ভাই, আমার উট তেমন ভাল চলতে পারছেনা। তোমার উটনীর উপরে কি আমাকে নেবেনা? আইয়াশ বলে, কেন নেবনা? তারপর উভয়ে উট থেকে নেমে পড়ে যাতে আবু জাহল আইয়াশের উটনীর পিঠে উঠতে পারে, হারেসও তার উট বসিয়ে নেমে পড়ে। তারপর উভয়ে মিলে আইয়াশকে বেঁধে ফেলে।

ইবনে ইসহাক বলেন, আইয়াশ বিন আবি রাবিয়ার (রা) পরিবারের লোকেরা আমাকে বলেছে, আবু জাহল এবং হারেস আইয়াশকে নিয়ে এমন অবস্থায় দিবালোকে মক্কায় পৌছে যে, রশি দিয়ে তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং দু'ভাই ঘোষণা করছিল- হে মক্কাবাসী। তোমরা তোমাদের অবাধ্য ছেলে-ছোকরাদেরকে এভাবে সোজা কর, যেভাবে আমরা করেছি।

ইবনে হিশাম বলেন, আমাকে নির্ভরযোগ্য লোকেরা বলেছেন যে, নবী (স) হিশাম বিন আস (রা) এবং আইয়াশ বিন আবি রাবিয়া (রা) সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ও পেরেশান ছিলেন। তিনি বলেন, কে এ দু'জনকে আমার কাছে নিয়ে আসতে প্রস্তুত? অলীদ বিন মগীরা (খালেদ বিন অলীদের ভাই) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! এ খেদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্যে আমি হাযির। তারপর তিনি মক্কায় যান। গোপনে এ দু'আটক ব্যক্তির সন্ধানে রইলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে তাঁরা একটি ছাদবিহীন চত্বরে বন্দী আছেন, তখন রাতের বেলা দেওয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করেন, তাঁদের বেড়ি কেটে দেন এবং তাঁর উটের পিঠে চড়িয়ে মদীনায় নিয়ে আসেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন সুহাইলের বিপদ

যাঁদেরকে বলপ্রয়োগে হিজরত থেকে আটকে রাখা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ বিন সুহাইল বিন আমর। বালাযুরী বলেন যে, তিনি মদীনায়

---

১. আবু জাহল ও হারেস উভয়ে সহোদর ভাই। তাদের পিতা হিশাম বিন মুগীরার মৃত্যুর পর তার ভাই আবু রাবিয়া বিন হিশামের সাথে তাদের মায়ের বিয়ে। আইয়াশ একই মায়ের গর্ভে আবু রাবিয়ার উরসে জন্মগ্রহণ করেন। এভাবে আবু জাহল ও হারেস তাঁর চাচাতো ভাই এবং বৈপিত্র ভাইও। -গ্রন্থকার

হিজরতের কথা শুনে হাবশা থেকে মক্কায় আসেন এ উদ্দেশ্যে যে রসূলুল্লাহর (স) সাথে নতুন দারুল হিজরতে যাবেন। কিন্তু তাঁর পিতা সুহাইল বিন আমর তাঁকে জোর করে বন্দী করেন। তিনি এ কৌশল অবলম্বন করে পিতাকে সন্তুষ্ট করেন যে, তিনি পৈত্রিক দ্বীনে ফিরে এসেছেন। এ বিশ্বাসে তিনি বদরের যুদ্ধে তাঁকে সংগে নিয়ে যান। যখন সৈনিকগণ এসে অপরের সামনা-সামনি হলো তখন হযরত আবদুল্লাহ্ মুসলমানদের সাথে মিলিত হন। এর কয়েক বছর পর মক্কা বিজয়ের সময়ে তাঁর পিতা মুসলমান হয়ে বলতেন, আল্লাহ্ আমার পুত্র আবদুল্লাহর ঈমানে আমার জন্যে বড়ো মংগল রেখেছিলেন।

শেষ সময় পর্যন্ত হুযুরের (স) মক্কায় অবস্থান

ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে হাবশা থেকে মদীনায় হিজরতের জন্যে যাঁরা মক্কায় এসেছিলেন- তাঁদের মধ্যে সাতজনকে বন্দী করা হয় এবং তাঁরা হিজরত করতে পারেননি। এতদ্ব্যতীত মক্কায় বেশ কিছু সংখ্যক লোক এমন ছিলেন- যাঁরা হিজরত করতে গিয়ে ধরা পড়েন, অথবা যাঁরা এমন অপারগ ছিলেন যে, হিজরত করতে পারতেননা, অথবা যাঁরা- মনে মনে ঈমান তো রাখতেন- কিন্তু নিজেদের দুর্বলতার কারণে হিজরত করার সাহস রাখতেননা। এসব ব্যতীত যাঁরাই হিজরত করতে সক্ষম ছিলেন তাঁরা সকলেই চলে যান এবং মক্কায় শুধু নবী (স), হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত আলী (রা) রয়ে যান।

বোখারীতে হযরত আয়েশার (রা) একটি বর্ণনা আছে যে, যখন হযরত আবু বকর (রা) মদীনায় হিজরতের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন হুযুর (স) বলেন, একটু আপন স্থানে অবস্থান কর। কারণ আশা করি যে, আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হবে। হযরত আবু বকর (রা) বলেন, আমার মা বাপ আপনার জন্যে কুরবান হোক্, আপনি কি এমন আশা করেন? হুযুর (স) বলেন, হ্যাঁ। এ জন্যে হযরত আবু বকর (রা) রয়ে যান যাতে হুযুরের (স) সাথে হিজরত করতে পারেন। দুটি উট কিনে তা পালতে থাকেন। ইবনে হিশাম ও ইবনে জারীর ইবনে ইসহাকের বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, আবু বকর (রা) যখনই হুযুরের (স) নিকট থেকে অনুমিত চাইতেন, তিনি বলতেন, তাড়াহুড়া করোনা, হয়তো আল্লাহ্ তোমাকে একজন সাথী দান করবেন। এতে হযরত আবু বকর (রা) আশা করতেন যে, সে সাথী স্বয়ং হুযুরই (স) হবেন। হাকেম হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (স) জিব্রিলকে (আ) জিজ্ঞেস করেন, হিজরতে আমার সাথী কে হবে? তিনি বলেন- আবু বকর (রা), ইবনে জারীর ওরওয়া বিন যুবাইরের (রা) বরাত দিয়ে বলেন, হযরত আবু বকর (রা) অন্যান্য হিজরতকারী সাহাবীদের সাথে যাওয়ার জন্যে দুটি উটনী খরিদ করে রেখেছিলেন। যখন তিনি আশা করছিলেন যে, তিনি হুযুরের (স) সাহচর্য লাভ করবেন, তখন তিনি সে দুটি উটনীকে ভালোভাবে খাইয়ে-দাইয়ে তৈরী করেন।

ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে ইবনে হিশাম ও ইবনে জারীর বলেন, হযরত আলীকে (রা) হুযুর (স) এ জন্যে যেতে দেননি যাতে তিনি হুযুরের (স) পরে মক্কায় থেকে ওসব লোকের আমানত ফেরৎ দিতে পারেন যারা তাদের মূল্যবান ধনসম্পদ সংরক্ষণের জন্যে হুযুরের (স) নিকটে জমা রেখেছিল। এ প্রসংগে ইবনে ইসহাক বলেন, মক্কায় এমন কেউ ছিলনা যার কাছে এমন কোন জিনিস আছে যা চুরি হওয়ার আশংকা আছে- আর সে তা হুযুরের (স) কাছে আমানত হিসাবে রেখে দিতনা। কারণ তাঁর আমানত ও দিয়ানতের উপর দোস্ত-দুশমন সকলের আস্থা ছিল।

এভাবে আকাবায় শেষ বায়আত (১২ই যিলহজ্ব, নবুওতের ত্রয়োদশ বর্ষ) থেকে সফর নবুওতের ১৪ শ বর্ষ) পর্যন্ত প্রায় আড়াই মাস হুযুর (স) এমন অবস্থায় আপন স্থানে অবস্থান করেন- যখন মদীনায় হিজরতকারীদের এক স্রোত চলছিল এবং শেষের কয়েক দিন এমন অবস্থায় অতিবাহিত করেন যখন তাঁর সকল সাথী মক্কা ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি একাকী দু'সাথীসহ দুশমনদের মধ্যে এ জন্যে অবস্থান করেন যে, আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে হিজরতের হুকুম আসার পূর্বে নিজের কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলনা। চিন্তা করলে অনুমান করা যায় যে, এ কত বিরাট দায়িত্ববোধ ছিল- যা তাঁকে এ চরম বিপদ সংকুল অবস্থায় আপন স্থানে অবিচল রেখেছিল তাঁরাও কতটা নির্ভীকচিত্ত ছিলেন যাঁরা মানবরূপী হিংস্র পশুদের মাঝে নির্ভয়ে ও নিঃশংকে হুযুরের (স) সাথে অবস্থান করেন।(১)

কুরাইশের পেরেশানী

কুরাইশ কাফেরগণ এখন নিশ্চিত যে, যে কোন সময়ে রসূলুল্লাহ (স) মদীনায় হিজরত করবেন। এর পরিণামও তাদের ভালোভাবে জানা ছিল। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ যোগ্যতা, কুরআনের মন জয়কারী শক্তি তাদের অজানা ছিলনা। এখন তারা দেখছিল যে একটি নিরাপদ বসবাসের স্থান তিনি লাভ করেছেন। দুটি শক্তিশালী ও রণঅভিজ্ঞ গোত্র তাঁর সহায়ক শক্তি হিসাবে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। স্বয়ং কুরাইশের এমন সব সাহসী ও নিবেদিত প্রাণ লোক তাঁর সাথে মিলিত হয়েছে- যারা তের বছর যাবত নানান ধরনের বিপদ মুসিবত বরদাশত্ করে তাদের দৃঢ় সংকল্প ও অবিচলতার প্রমাণ দিয়েছে এবং বার বার হিজরত করে এ কথারও প্রমাণ দিয়েছে যে, নিজেদের খাতিরে আপন ঘরবাড়ি, ধনসম্পদ, আত্মীয়স্বজন, কওম ও জন্মভূমি সব কিছুই কুরবান করতে পারে। নবীর (স) বিরাট নেতৃত্বে এমন নিবেদিত প্রাণদের একটি নগর রাষ্ট্র তাঁর হস্তগত হওয়া প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় মৃত্যুরই নামান্তর। তারপর বিশেষ করে মদীনার পরিস্থিতি এমন ছিল যে, মুসলমানদের শক্তি এখানে সুসংহত হওয়ায় তা কুরাইশের জন্যে আশংকার কারণ হয়ে পড়ে। এ জন্যে যে ইয়ামেন থেকে সিরিয়ার দিকে যে বাণিজ্য রাজপথ লোহিত সাগরের তটভূমির উপর দিয়ে চলেছে তার নিরাপত্তার উপরেই কুরাইশ ও অন্যান্য বড়ো বড়ো মুশরিক গোত্রগুলোর অর্থনৈতিক জীবন নির্ভরশীল ছিল। তা এখন মুসলমানদের আওতায় এসে যাবে, এর উপর হস্তক্ষেপ করে মুসলমান জাহেলী ব্যবস্থার জীবন পদ্ধতি সুকঠিন করে দেবে। শুধু মক্কাবাসীদের যে ব্যবসা বাণিজ্য এ রাজ পথের উপর দিয়ে মক্কা থেকে সিরিয়া, রোম ও মিসর পর্যন্ত চলতো তার বার্ষিক প্রায় আড়াই লক্ষ আশরাফীর অধিক ছিল। তায়েফ ও অন্যান্য স্থানের ব্যবস্থা ছিল এর অতিরিক্ত। এ জন্যে আকাবায় বায়আতের সংবাদে কুরাইশের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। প্রথমে তো তারা মদীনাবাসীদের নবী (স) থেকে বিচ্ছিন্ন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। তারপর মক্কা থেকে মুসলমানদের হিজরত প্রতিরোধ করার সকল কলাকৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু অতি মুষ্টিমেয় লোককেই তারা ধরে রাখতে পেরেছে এবং আহলে ঈমানের বিরাট সংখ্যক মদীনায় গিয়ে পৌঁছেছে। তারপর তারা এ আশংকা রোধ করার জন্যে শেষ উপায় অবলম্বনের জন্যে প্রস্তুত হলো।(২)

হুযুরকে (স) হত্যা করার সিদ্ধান্ত

ইবনে হিশাম, ইবনে সা'দ, ইবনে জারীর এবং বালাযুরী বলেন, শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে, 'দারুন্-নাদ্ওয়ায়' সকল কওম প্রধানদের এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ আশংকার পথ রুদ্ধ কিভাবে করা যায়- তার উপর আলোচনা হয়। এক পক্ষের মত এ ছিল যে, এ ব্যক্তিকে শিকল পরিয়ে এক স্থানে বন্দী করে রাখা হোক। জীবদ্দশায় তাকে আর মুক্ত করা হবেনা। কিন্তু এ অভিমত গ্রহণ করা হয়নি। কারণ অনেকের মতে তাকে বন্দী করে রাখলে যারা বাইরে আছে তারা ক্রমাগত তাদের কাজ করে যাবে এবং কিছু শক্তি অর্জন করলে তাকে মুক্ত করার জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিতেও কোনরূপ ইতস্ততঃ করবেনা। কেউ বলে যে তাকে এখান থেকে বহিষ্কার করা হোক। আর সে যখন আমাদের মধ্যে থাকবেনা তখন আমাদের মাথা ব্যথা থাকবেনা যে, সে কোথায় থাকে আর কি করে। সে থাকলে আমাদের জীবন ব্যবস্থায় যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হতো তাতো বন্ধ হবে। কিন্তু এ প্রস্তাবও এই বলে প্রত্যাখ্যান করা হলো যে, তার কথাবার্তা তো যাদুর মতো ক্রিয়াশীল এবং মন জয় করার কৃতিত্ব তার বিরাট। যদি সে এখান থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে না জানি কোন্ কোন্ গোত্রকে সে আপন করে নেবে এবং তারপর এমন শক্তি অর্জন করবে এবং আরবের কেন্দ্রস্থলকে তার অধীনে আনার জন্যে তোমাদের উপর আক্রমণ করবে। অবশেষে আবু জাহ্ল বলে, আমরা আমাদের সকল গোত্র থেকে এক একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় চালাক চতুর লোক বেছে নিই এবং সকলে মিলে এক সাথে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি ও তাকে হত্যা করে ফেলি। এভাবে মুহাম্মদের (স) খুন সকল গোত্রের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। তারপর বনু আবদে মানাফের জন্যে অসম্ভব হয়ে পড়বে, সকলের বিরুদ্ধে লড়াই করা। এ জন্যে বাধ্য হয়ে রক্তপণ (BLOOD MONEY) গ্রহণ করতে রাজী হয়ে যাবে।

এ অভিমত সকলে পছন্দ করলো এবং হত্যার জন্যে লোকও মনোনয়ন করা হলো। হত্যার সময় ও নির্ধারিত হলো। এ সকল কার্যবিবরণী এমন গোপন রাখা হলো যে, কানে কানেও যেন এ খবর কোথাও না পৌঁছে।

এ বিষয়ের প্রতি সূরা আনফালে ইংগিত করা হয়েছে-

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ
وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۔ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ۔(٣٠)

(এবং হে নবী, সে সময়ও স্মরণযোগ্য) যখন কাফেরগণ তোমার বিরুদ্ধে নানা অপকৌশল চিন্তা করছিল- তোমাকে বন্দী করবে অথবা মেরে ফেলবে অথবা বহিষ্কার করবে। তারা তাদের ষড়যন্ত্রের চাল চালতেছিল এবং আল্লাহ্ তাঁর চাল চালছিলেন। অবশ্য আল্লাহ্র চাল সবচেয়ে ভালো (আয়াত-৩০)।(৩)

হুযুরের (স) প্রতি হিজরতের অনুমতি ও তার প্রস্তুতি

তিরমিযি ও হাকেম ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, পরিস্থিতি যখন এতোদূর পৌঁছে গেল তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীকে মক্কা থেকে হিজরত করার অনুমতি দিলেন এবং বল্লেন-

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ
وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۔ (بنى اسرائيل : ٨٠)

(এবং হে নবী) দোয়া ক'র, এই বলে, হে আমার রব, আমাকে সত্যসহ প্রবেশ করাও প্রবেশ করার স্থানে এবং সত্যসহ আমাকে বের কর বের হওয়ার স্থান থেকে এবং কোন শক্তিকে আমার মদদগার বানিয়ে দাও (বনী ইসরাইলঃ ৮০)।[১]

এ অনুমতি সেদিন পাওয়া যায়- যার পরবর্তী রাত হুযুরকে (স) হত্যা করার জন্যে নির্ধারিত করা হয়েছিল।[২] ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর বরাত দিয়ে এবং ইবনে জারীর ও ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে বলেন, ঐদিনই জিব্রিল (আ) এসে হুযুরকে (স) কুরাইশের অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত করেন এবং বলেন, আজ রাতে আপনি নিজের বিছানায় শুবেননা।

তারপর দুপুর বেলায় কাপড়ে মুখ ঢেকে তিনি হযরত আবু বকরের (রা) বাড়ি যান। বোখারীতে ইমাম যুহরীর বরাত দিয়ে হযরত ওরওয়া বিন যুবাইরের- এ বর্ণনা আছে যে, হযরত আয়েশা বলেছেন, দুপুরে আমরা বাড়িতে বসেছিলাম, এমন সময় একজন হযরত আবু বকরকে (রা) বলে, রসূলুল্লাহ (স) মুখ ঢেকে এমন সময়ে এখানে এসেছেন যে এমন সময়ে তিনি কখনো আসতেননা। তাবারানীতে হযরত আসমা বিন্তে আবু বকরের (রা) বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তিনি বলেন, হুযুর (স) রোজ আমাদের এখানে সকাল সন্ধ্যায় আসতেন। এ বর্ণনা বোখারীতে 'বাবুল হিজরতে' হযরত আয়েশা (রা) থেকেও উদ্ধৃত আছে। ইবনে হিশামে ইবনে ইসহাকের বরাতসহ হযরত আয়েশার (রা) বর্ণনা এই যে, হুযুর (স) প্রতিদিন সকালে অথবা সন্ধ্যায় আমাদের এখানে তশরিফ আনতেন। কিন্তু ঐদিন তিনি যোহরের সময় তশরিফ আনেন যা সাধারণতঃ তাঁর আসার সময় ছিলনা। হযরত আবু বকর (রা) সংগে সংগে বলেন, আমার মা-বাপ তাঁর জন্যে কুরবান হোক, নিশ্চয় এমন কোন বিষয় আছে যার জন্যে তিনি এ সময়ে এসেছেন। তারপর হুযুর (স) ভেতরে আসার অনুমতি চান। অনুমতিক্রমে ভেতরে এসে বল্লেন, এখান থেকে সবাইকে সরিয়ে দাও। হযরত আবু বকর (রা) বলেন, এতো আপনার বাড়িরই সব লোক। (হযরত আয়েশা (রা) থেকে মূসা বিন ওকবায় এ বর্ণনা আছে যে, তিনি বলেন, সে সময়ে আমি এবং আমার বোন আসমা (রা) ব্যতীত হযরত আবু বকরের (রা) কাছে আর কেউ ছিলনা। ইবনে ইসহাকের এরূপ বর্ণনাই ইবনে হিশামে আছে। অবশ্যি ইবনে ওকবার বর্ণনায় অতিরিক্ত এ কথা আছে, আবু বকর (রা) বলেন, এখানে শুধু আমার মেয়েরা আছে। কোন গুপ্তচর-আপনার খবর নেয়ার জন্যে নেই)। তখন হুযুর (স) বলেন, আমাকে এখান থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা) বলেন, আমার মা-বাপ আপনার জন্যে কুরবান, আমি কি আপনার সাহচর্য লাভ করতে পারব? হুযুর (স) বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, আমার এ দু' উটনীর একটি আপনি নিন। হুযুর (স) বলেন, কিন্তু মূল্য

---

১. এখানে কারো এ আপত্তি পেশ করা ঠিক নয় যে, উল্লেখিত আয়াততো বনী ইসরাঈলে হিজরতের বহু পূর্বে নাযিল হয়েছিল। অতঃপর এখানে তা হিজরতের অনুমতি হিসাবে পেশ করা কিভাবে সঠিক হতে পারে? প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত আছে যে, একটি আয়াত প্রথমে নাযিল হয়েছে। পরবর্তীকালে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে তার পুনরাবৃত্তি এজন্যে করা হয় যাতে হুযুর (স) জানতে পারেন যে, এ আয়াতের হুকুম এ অবস্থার জন্যে করা হয়েছে- গ্রন্থকার।

২. এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা নবীকে (স) এ সময় পর্যন্ত মক্কায় আটকিয়ে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য যে কুরাইশ কাফেরগণ হক দুশমনির শেষ সীমায় পৌছে যাক এবং তখন তাদের ভেতর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুকুম নবীকে দেয়া হবে- গ্রন্থকার।

দিয়ে নেব। ইবনে ইসহাক বলেন, হুযুর (স) বলেন, যে মূল্যে তুমি খরিদ করেছ সেই মূল্যেই নেব। আবু বকর (রা) মূল্য বল্লে হুযুর (স) বলেন, এ মূল্য আমি তোমাকে দেব। তারপর হুযুর (স) ও আবু বকর (রা) বনী আদ্দীলের এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ বিন উরায়কেতকে[১] পারিশ্রমিকসহ পথ দেখাবার জন্যে নিযুক্ত করেন। সে ছিল পথঘাট বিশারদ। উটনী দুটো তার তত্ত্বাবধানে দেয়া হলো এ শর্তে যে, যখন যে স্থানে ডাকা হবে তখন সে স্থানে পৌঁছতে হবে।

হত্যার রাতের ঘটনা

তারপর নবী (স) নিজের বাড়ি তশরিফ নিয়ে যান এবং রাত পর্যন্ত থাকেন যাতে দুশমনের সামান্য পরিমাণ সন্দেহ্ না হয় যে, তিনি তাদের অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত। রাতে নির্দিষ্ট সময়ে সবাই পৌঁছে যায় যাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ইবনে সাদের বর্ণনা অনুযায়ী তারা মোট ১২ জন ছিল। আবু জাহ্ল হাকাম বিন আবিল আস্, ওকবা বিন আবি মুয়াইত, নদর বিন আল হারেস, উমাইয়া বিন খালাফ, হারেস বিন কায়েস বিন আল গায়তালা, যামায়া বিন আল আসওয়াদ, তুয়ায়মা বিন আদী, আবু লাহাব, উবাই বিন খালাফ, নুবায়া বিন আল হাজ্জাজ ও মুনাবেব বিন হাজ্জাজ। কিন্তু এদের আসার পূর্বেই হুযুর (স) তাঁর বিছানায় হযরত আলীকে (রা) তাঁর (হুযুরের) সবুজ হাদরমাওতী চাদর উড়িয়ে শুইয়ে দেন। এ জন্যে দুশমন বাইর থেকে উঁকি ঝুঁকি মেরে যখনই দেখতো এটাই মনে করতো যে, ইনি রসূলুল্লাহ্ (স) যিনি তাঁর বিছানায় ঘুমুচ্ছেন। সুহায়লী কোন কোন সীরাত প্রণেতা আলেমের বরাত দিয়ে বলেন যে, তারা দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকবার চেষ্টা করে। কিন্তু ভেতর থেকে কোন মেয়েলোকের চিৎকার ধ্বনি শুনে তারা ভয় পেয়ে যায় এবং পরস্পর বলাবলি করে, খোদার কসম! সারাদেশে আমাদের এক ভয়ানক বদনাম হবে যে আমরা দেয়াল টপকে রাতের বেলা আমাদেরই এক ঘনিষ্ট আত্মীয়ের ঘরে ঢুকেছি এবং আমরা আমাদের গোত্রের মেয়েদের ইজ্জৎ-আবরুর প্রতিও লক্ষ্য রাখিনি। এ কারণে তারা সারা রাত বাইরে বসে থাকে। তারা এ প্রতীক্ষায় থাকে যে, খুব সকালে যখন রসূলুল্লাহ্ (স) উঠবেন তখন এক সাথে সকলে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

হযরত আলীর (রা) গ্রেফতারী ও মুক্তি

দুশমন বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছিল এমন অবস্থায় রাতের কোন এক সময়ে হুযুর (স) নিশ্চিন্ত মনে বাইরে আসেন এবং তাদের উপর মাটি নিক্ষেপ করতে করতে তাদের মধ্য দিয়েই বেরিয়ে যান। তখন তিনি সূরায়ে ইয়াসীনের প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করছিলেন। ভোর হলে তারা হযরত আলীকে (রা) হুযুরের (স) বিছানা থেকে উঠতে দেখে। তখন তারা বুঝতে পারে রসূলুল্লাহ্ (স) তো কবে চলে গেছেন (ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম,

---

১. কেউ সে ব্যক্তির নাম আরকাদ এবং কেউ আরকাত বলেছে। সঠিক নাম উরায়কেত। মূসা বিন ওকবা, বালাযুরী ও ইবনে সাদ তাই বলেছেন। এ সেই ব্যক্তি যাকে তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রসূলুল্লাহ্ (স) বাণী বাহক হিসাবে মক্কায় সর্দারদের নিকটে পাঠিয়েছিলেন। যদিও সে মুশরিক ছিল কিন্তু এতোটা বিশ্বস্ত যে, হিজ্রতের এ নাজুক পরিস্থিতিতে সে একেবারে বিশ্বস্ত প্রমাণিত হয়। অথচ কুরাইশ হুযুরের (স) সন্ধান জানার জন্যে মোটা অংকের পুরস্কার ঘোষণা করেছিল- গ্রন্থকার।

বালাযুরী, ইবনে জারীর, যাদুল মায়াদ)।

ইবনে জারীর ও ইবনে আসীর লিখেছেন যে, তারা হযরত আলীকে (রা) জিজ্ঞেস করে, তোমার সাহেব কোথায়? তিনি বলেন, আমি কিছুই জানিনা যে তিনি কোথায় গেছেন। আমি তাঁর পাহারাদার নই। তোমরা তাঁকে বের করে দিয়েছ এবং তিনি বেরিয়ে গেছেন। এতে রক্ত পিপাসু দুশমন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাঁকে বকাঝকা করে, মারপিট করে এবং মসজিদে হারামে নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ বন্দী করে রাখে। কিন্তু কঠোর আচরণের পরেও যখন হুযুরের (স) কোন সন্ধান জানা গেলনা তখন বাধ্য হয়ে তারা তাঁকে ছেড়ে দিল। অসম্ভব নয় যে তাঁকে ছেড়ে দেয়ার কারণ হয়তো এ ছিল যে, হুযুর (স) মক্কাবাসীর আমানতসমূহ ফেরৎ দেয়ার জন্যে তাঁকে রেখে গিয়েছিলেন। কাফেরগণ হয়তো জানতে পেরেছিল যে, রসূলুল্লাহ (স) হযরত আলীকে (রা) এ কাজের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন, সে জন্যে আমানতের মাল ফেরৎ পাওয়ার লোভে তারা তাঁকে মুক্তি দিয়েছিল। তাদের কিছুটা লজ্জাও হয়ে থাকতে পারে যে, যাঁকে তারা হত্যা করতে এসেছিল- তিনি এমন উন্নত চরিত্রের মানুষ যে হত্যার স্থান থেকে বেরিয়ে যাবার সময়েও দুশমনের আমানত ফেরৎ দেয়ার চিন্তায় অধীর।

হযরত আবু বকরের (রা) বাড়িতে আকস্মিক আক্রমণ

হযরত আলীকে (রা) মুক্তি দেয়ার পর জালেমেরা হযরত আবু বকরের (রা) বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়। ইবনে ইসহাক হযরত আসমা বিন্তে আবি বকর (রা) এর বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। বলা হয়েছে, দ্বিতীয় দিনে কুরাইশের কতিপয় লোক আমাদের বাড়ি আসে। তাদের সাথে আবু জাহলও ছিল। দরজায় দাঁড়িয়ে তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার পিতা কোথায়? বল্লাম, আমার জানা নেই। এতে আবু জাহল আমাকে এমন জোরে থাপ্পড় মারে যে, আমার কানের চালি ভেঙে দূরে গিয়ে পড়ে। তারপর তারা চলে যায় (ইবনে হিশাম ও ইবনে জারীর)।

মক্কা থেকে বেরিয়ে সওর গুহায় আশ্রয়

রসূলুল্লাহ (স) তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা হযরত আবু বকরের (রা) বাড়ি আসেন। অতঃপর দু'জন রাতেই মক্কা থেকে দু'তিন মাইল দূরে সওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় নেন। মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযিতে আছে যে, মক্কা থেকে বেরুবার সময় হুযুর (স) 'হায্ওয়ারা' নামক স্থানে দাঁড়ান, বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করেন এবং দরদ ভরা কণ্ঠে বলেন-

হে মক্কা! খোদার কসম। খোদার যমীনে তুমি আমার নিকটে সবচেয়ে প্রিয়। আর খোদার নিকটেও তাঁর যমীনে তুমি সবচেয়ে প্রিয়। যদি তোমার অধিবাসীরা আমাকে বহিষ্কার করে না দিত, তাহলে তোমাকে ছেড়ে বেরুতামনা।

তারপর তিনি সওরের দিকে রওয়ানা হন।

'সওরে' আশ্রয় গ্রহণের রহস্য

এখানে এ বিষয়টি উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, কোন্ যুক্তিসংগত কারণে আশ্রয় গ্রহণের জন্যে সওর পর্বত নির্বাচন করা হলো। এ পবর্তটি মক্কার দক্ষিণে ইয়ামেনের পথে অবস্থিত। অথচ মদীনা তাইয়েবা মক্কার উত্তরে সিরিয়ার পথে অবস্থিত। মক্কার কাফেরদের জানা ছিল যে, হুযুর (স) হিজরত করে মদীনা যেতে চান। এ কারণে তাঁর

সওর পর্বতের গুহা

পশ্চাদ্ধাবনকারীদের মন অবশ্য অবশ্যই চাইতো সর্ব প্রথম উত্তর দিকের পাহাড়গুলোতে ও পাহাড়ী পথে তাঁকে খুঁজে বের করে ধরে ফেলতে, উত্তরগামী পথগুলোতে তালাশ করে ব্যর্থ হওয়ার পরই তারা পূর্ব-দক্ষিণ ও পশ্চিমের দিকে তালাশে বেরুতো। এজন্যে আশা করা হচ্ছিল যে, সওর গুহায় তাদের পৌছতে পৌছতে যথেষ্ট সময় লেগে যাবে।

সওরে অবস্থান কালের জন্যে আবু বকরের (রা) ব্যবস্থাপনা

সওর গুহার জন্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই হযরত আবু বকর (রা) যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন।[১] বোখারীতে হযরত আয়েশার (রা) এ বর্ণনা আছে যে, তিনি বলেন, আমরা তাড়াতাড়ি দু' মুসাফিরের জন্যে সফরের সরঞ্জাম তৈরী করলাম এবং একটি থলিয়াতে পাথেয় স্বরূপ প্রয়োজনীয় বস্তু রাখলাম। হযরত আবু বকর তাঁর বুদ্ধিমান ও চতুর যুবক পুত্র আবদুল্লাহকে এ নির্দেশ দেন, দিনের বেলা মক্কাবাসীদের সাথে থেকে খবর সংগ্রহ করবে এবং রাতে আমাদের সাথে সাথে সাক্ষাৎ করে সারাদিনের খবরাখবর জানাবে। তাঁর আযাদ করা গোলাম ফুহায়রাকে (রা) হুকুম করলেন, দিনের বেলা যথারীতি আমাদের ছাগল চরাবে এবং মক্কাবাসীদের খবরাখবর নিতে থাকবে। তারপর রাতে আমাদেরকে দুধও দিয়ে যাবে এবং যাবতীয় খবর জানাবে। ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত আসমা (রা) প্রতি রাতে টাটকা খাদ্য পাঠাতেন[২] (ইবনে হিশাম)।

---

১. মুসনাদে আহমদে, তাবারানী ও সীরাতে ইবনে হিশামে ইবনে ইসহাকের বরাতে হযরত আস্‌মা বিন্তে আবি বকরের (রা) বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে। হযরত আসমা (রা) বলেন, আমাদের পিতা যাবার সময় তাঁর সমুদয় অর্থ- প্রায় পাঁচ ছয় হাজার দিরহাম- সাথে নিয়ে যান। (বালাযুরীর মতে ইসলাম কবুল করার পূর্বে তাঁর নিকটে ৪০ হাজার দিরহাম ছিল)। তারপর আমাদের দাদা আবু কুহাফা- যিনি অন্ধ ছিলেন এবং তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি, আমাদেরকে বলেন, আমার মনে হয়, সে তার জানের সাথে সমুদয় মালও নিয়ে গেছে। বল্লাম, না, দাদাজান, তিনি আমাদের জন্যে অনেক মংগল রেখে গেছেন। তারপর যে তাকের মধ্যে আব্বাজান তাঁর মাল রাখতেন- সেখানে কিছু পাথর রেখে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিই, তারপর দাদাজানকে নিয়ে গিয়ে বলি, আপনি হাত দিয়ে দেখুন। তিনি তার উপর হাত রেখে বলেন, এ সব যদি সে তোমাদের জন্যে রেখে গিয়ে থাকে তো যথেষ্ট। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমাদের পিতা আমাদের জন্যে কোন অর্থই রেখে যাননি। আমি শুধু দাদাকে সান্ত্বনা দিতে চাচ্ছিলাম- গ্রন্থকার।

২. এখানে একটি সন্দেহের উদ্রেক হয় যা দূর হওয়া জরুরী। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেরগণ যখন হযরত আলীকে (রা) জিজ্ঞেস করে, তোমার সাহেব কোথায়? তখন জবাবে তিনি বলেন, আমার জানা নেই। তারপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আবু বকরের (রা) বাড়িতে গিয়ে তিনি কোথায় জানতে চাইলে হযরত আস্‌মা (রা) বলেন, আমার জানা নেই। অথচ পরবর্তী অবস্থা থেকে জানা যায় যে, সত্তর গুহায় যাবার পূর্বে হযরত আবু বকর (রা) যে সব ব্যবস্থা করেন সে সবের মধ্যে কিছু খেদমতের দায়িত্ব হযরত আসমার (রা) উপর অর্পিত হয়। এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা) সমুদয় অর্থ বাড়ি থেকে নিয়ে গেছেন। কিন্তু হযরত আসমা (রা) দাদাকে বলেন, তিনি অনেক কিছু রেখে গেছেন। এ সব ব্যাপারে মনে প্রশ্ন জাগে যে, এসব কি মিথ্যা নয়? তার জবাব এই যে, প্রথম দুটি ব্যাপার সম্পর্কে কথা এই যে, এতে দুটি একই ধরনের সম্ভাব্যতা রয়েছে। একটি সম্ভাব্যতা এই যে, হযরত আলী (রা) এবং হযরত আস্‌মা (রা) হুযুর (স) এবং আবু বকর (রা) কোথায় তা তাঁদের সে সময়ে জানা ছিলনা, যখন তাঁদেরকে এ প্রশ্ন করা হয়। দ্বিতীয় ন্যায়সংগত

সওর গুহার বিবরণ

বায়হাকী হযরত মুহাম্মদ বিন সিরীনের বরাত দিয়ে একটি মুরসাল রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেন- যাতে বলা হয়েছে যে- একবার হযরত ওমরের (রা) বৈঠকে কিছু লোক এ ধরনের কথা বলেন যার থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, তাঁরা হযরত ওমরকে (র) হযরত আবু বকর (রা) থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করছেন। এতে হযরত ওমর (রা) বলেন, কসম খোদার, আবু বকরের (রা) একরাত ওমর পরিবার থেকে শ্রেয়ঃ এবং আবু বকরের (রা) একদিন ওমর পরিবার থেকে শ্রেয়ঃ।

তারপর তিনি বয়ান করেন, যে রাতে হুযুর (স) গুহায় তশরিফ নিয়ে যান এবং আবু বকর (রা) তাঁর সাথে ছিলেন, তখন অবস্থা এমন ছিল যে, আবু বকর (রা) কখনো সামনে চলতেন এবং কখনে পেছনে চলতেন। হুযুর (স) এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার যখন পশ্চাদ্ধাবনকারীদের কথা মনে পড়তো তখন পেছনে চলতে লাগতাম এবং যখন আশংকা হতো যে কি জানি সামনে কোন বিপদের আশংকা নেই তো তখন সামনে যেতাম। হুযুর (স) বল্লেন, তোমার মতলব এই যে, কোন বিপদ এলে তা আমার উপরে না এসে যেন তোমার উপরে আসে। তাই না? তিনি বলেন, জি হ্যাঁ। তারপর যখন তাঁরা গুহায় পৌঁছলেন তখন আবু বকর (রা) আরজ করলেন, আপনি একটু দাঁড়ান আমি ভেতরে গিয়ে গুহা আপনার জন্যে পরিষ্কার ও সংরক্ষিত করি। তারপর তিনি ভেতরে গিয়ে গুহা সংরক্ষিত করে বাইরে এলেন। কিন্তু তাঁর মনে পড়ে গেল যে, আর একটি ছিদ্র রয়ে গেছে। তারপর আবার ভেতরে গিয়ে তা বন্ধ করে এলেন। তখন হুযুরকে (স) ভেতরে যেতে অনুরোধ করলেন। কোন কোন রেওয়াতে অতিরিক্ত এ বয়ান করা হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা) অন্ধকারে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে এক এক করে ছিদ্র তালাশ করে তা চাদর ছিঁড়ে ছিঁড়ে বন্ধ করতে থাকেন। অনুরূপ বর্ণনা হাফেজ আবুল কাসেম বাগাবী ইবনে আবি মুলায়কা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তার শেষে নাফে বিন ওমর আলজুমাহীর এ বয়ান উদ্ধৃত করেন যে, গুহায় একটি গর্ত রয়ে গিয়েছিল। আবু বকর (রা) তাঁর পায়ের গোড়ালী দিয়ে

হওয়ার সম্ভাব্যতা এই যে, তাঁদের জানা তো ছিল কিন্তু তাঁরা দুশমনকে তা বলতে এ জন্যে অস্বীকার করেন যে, ঘটনার বিপরীত কথা না বলে সত্য কথা বলে জালেমকে জুলুম করতে সাহায্য করা বহু গুণে মন্দ কাজ। আর ঘটনার বিপরীত কথা বলে মজলুমকে জুলুম থেকে রক্ষা করা মোটেই কোন খারাপ কাজ নয় বরঞ্চ শরিয়ত, নৈতিকতা ও বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে একেবারে জায়েয। একজন নির্বোধই একে নাজায়েয বলতে পারে এবং দৃঢ়তা সহকারে বলতে পারে হত্যাকারীদেরকে গারে সওরের ঠিকানা বলে দেয়া উচিত ছিল। অথবা এ কথা বলা উচিত ছিল, তাদের ঠিকানা জানা আছে কিন্তু বলবনা। যার ফলে হত্যাকারী তাদেরকে নির্যাতন করে সত্য কথা ফাঁস করে নিত। এখন রইলো, হযরত আসমার (রা) সে কথা যা তিনি তাঁর দাদাকে বলেছিলেন। এ হচ্ছে, 'তাওরিয়ার' উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'তাওরিয়া'-এর অর্থ সুস্পষ্ট মিথ্যা বলার পরিবর্তে কোন মুসলেহাৎ বা সময়োপযোগির জন্যে প্রকৃত বিষয়কে পর্দাবৃত করে রাখা। শরীয়তে এ জায়েয। হযরত আসমা (রা) একথা বলেননি যে, তাঁর পিতা বহু ধন রেখে গেছেন, বরঞ্চ বলেছেন, তিনি বহু মংগল রেখে গেছেন। তারপর তাকের উপর রাখা স্তুপের উপর তাঁর দাদার হাত রাখতে দেন। দাদা মনে করলেন এ অর্থের স্তুপ। কিন্তু হযরত আসমা (রা) এ কথা বলেননি যে এ স্তুপের মধ্যে অর্থসম্পদ আছে। এভাবে তিনি মিথ্যা না বলে, তাঁর বৃদ্ধ ও অন্ধ দাদাকে সে পেরেশানী থেকে রক্ষা করেন- নিঃস্ব হওয়ার আশংকায় যার মধ্যে তিনি মগ্ন ছিলেন- গ্রন্থকার।

সে গর্ত চেপে ধরেন যাতে করে কোন বিষধর প্রাণী বের হয়ে হুযুরকে (স) দংশন করতে না পারে। এ কথাই বায্‌যার হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে এবং তাবারানী হযরত আসমা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

সওর গুহায় চরম মর্মান্তিক মুহূর্ত

ওদিকে কুরাইশ নবীর (স) সন্ধানে মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী স্থানের অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়ে। বালাযুরী বলেন যে, তারপর তারা দু'জন দক্ষ অনুসন্ধানকারী নিয়োগ করে যাতে তারা পদচিহ্ন ধরে ধরে হুযুরের (স) সন্ধান পেতে পারে। এভাবে এরা সওর গুহা পর্যন্ত পৌছে যায়। কিন্তু সেখানে তারা দেখতে পেলো যে, গুহার মুখে মাকড়সার জাল বুনানো রয়েছে। একজন অনুসন্ধানী কুর্য্ বিন আলকামা বল্লো, এর থেকে সম্মুখে যাওয়ার কোন চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছেনা। সন্ধানীদের সাথে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে একজন বল্লো, গুহার মধ্যে গিয়ে দেখা যাকনা কেন। কিন্তু উমাইয়া বিন খালাফ বল্লো, এখানে কি পাবে? এ গুহায় যে মাকড়সার জাল তাতো মুহাম্মদের (স) জন্মের পূর্বে বুনানো হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এর পরে সকলে পেছন ফিরে চলে যায়। এ এমন এক পরিস্থিতি ছিল যখন হযরত আবু বকর (রা) দুশমনদেরকে গুহার একেবারে মুখের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন এবং হুযুরকে (স) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! এদের কেউ যদি তাদের পায়ের নীচে তাকায় তাহলে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। হুযুর (স) একেবারে নিশ্চিন্ত মনে জবাব দেন, হে আবু বকর! তোমার কি ধারণা ঐ দুটি লোক সম্পর্কে যাদের মধ্যে তৃতীয় আল্লাহ? (বোখারী কিতাব-ফাদায়েল-আসহাবু-ন্নবী, কিতাবুত্ তফ্সীর ও বাবুল হিজরত, মুসলিম-ফিল, ফাদায়েল, তিরমিযি ফিত্ তফসীর, মুসনাদে আহমদ, মুরবিয়্যাতে আবি বকর)।

হাফেজ আবু বকর আহমদ বিন আলী আল উসাবী মুসনাদে আবি বকর সিদ্দীকে এ সম্পর্কে যে সব বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তার একটিতে বলা হয়েছে, যে সময়ে তারা গুহার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন নবী (স) নামায পড়ছিলেন এবং হযরত আবু বকর (রা) দুশমনের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন। হুযুর (স) নামায শেষ করলে হযরত আবু বকর (রা) আরজ করেন, আমার মা বাপ আপনার জন্যে কুরবান, এই যে আপনার কওম আপনার তালাশে এসে পৌছেছে। খোদার কসম। আমি নিজের জন্যে কাঁদছিনা, বরঞ্চ এ ভয়ে কাঁদছি যে, আমার চোখের সামনে আপনার উপর কোন আঘাত না পৌছে। হুযুর (স) বলেন- لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا -ভয় করোনা, আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।

আল্লাহ কুরআন পাকে এ জিনিসেরই উল্লেখ করেছেন-

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا - (التوبة ٤٠)

- যদি তোমরা (মুসলমান) তার (আল্লাহর নবীর) সাহায্য না কর তাহলে তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তার মদদ সে সময়ে করেছিলেন- যখন সে দু'জনের মধ্যে একজন ছিল যখন তারা দু'জন গুহার মধ্যে ছিল, যখন সে তার সাথীকে বলছিল ভয় করোনা আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। (তওবাঃ ৪০)

হুযুর (স) এবং হযরত আবু বকরকে (রা) হত্যা অথবা গ্রেফতারের জন্যে পুরস্কারের সাধারণ ঘোষণা

এ ছিল শেষ চেষ্টা যার দরুন দুশমন নবীকে (স) পাওয়ার আশা করতে পারতো। এখানে (গুহায়) যখন তাঁকে পাওয়া গেলনা তখন তারা বুঝে ফেল্লো যে, হুযুর (স) তাদের নাগালের বাইরে চলে গেছেন। তারপর তারা সাধারণ ঘোষণা করলো যে, যে কেউ মুহাম্মদকে (স) এবং আবু বকরকে (রা) ধরে আনবে অথবা হত্যা করবে তাদেরকে একশত করে উট পুরস্কার দেয়া হবে। এ হলো বালাযুরীর বর্ণনা এবং ইবনুল কাইয়েম যাদুল মায়াদে এটা গ্রহণ করেছেন। ইবনে হিশাম ও ইবনে জারীর শুধু ধরে আনার জন্যে একশত উট পুরস্কারের উল্লেখ করেছেন। বালাযুরী একে দুর্বল বক্তব্য বলে উদ্ধৃত করেন।

গুহা থেকে রওয়ানা

বোখারীতে হযরত আয়েশার (রা) এ বর্ণনা আছে যে, হুযুর (স) এবং হযরত আবু বকর (রা) তিনদিন-তিনরাত গুহায় অবস্থান করেন। তাবারানীতে হযরত আসমার (রা) এরূপ বর্ণনাই আছে এবং ইবনে আবদুল বার, ইবনে সা'দ ও ইবনে ইসহাকের বর্ণনাও তাই। এ জন্যে সে বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়- যা মুসনাদে আহমদ ও হাকেমে তালহাতুল বাসারী থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, গুহায় অবস্থান দশ দিনের বেশী সময় পর্যন্ত ছিল। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তিনদিন-তিনরাত পর্যন্ত হুযুরের (স) তালাশে কুরাইশের তৎপরতা শিথিল হয়ে পড়েছিল। অতএব আবদুল্লাহ বিন উরায়কেত তার দায়িত্বে দেয়া দুটি উটনীকে নিয়ে তৃতীয় রাতের শেষ প্রহরে 'গারে সওরে' পৌছে। ঠিক সময়ে হযরত আসমাও (রা) একটি থলিয়ায় পাথেয় নিয়ে পৌছে যান। কিন্তু তা বেঁধে নেয়ার জন্যে কোন কিছু আনার খেয়াল তিনি করেননি। অবশেষে তিনি তাঁর 'নেতাক' খুলে তা ছিঁড়ে ফেলেন। সে যুগে মহিলাগণ যে কাপড় তাদের কোমরে পেঁচিয়ে রাখতো তাকে 'নেতাক' বলা হতো। তিনি নেতাকের এক অংশ দিয়ে খাবার জিনিস বেঁধে উটনীর হাউদায় ঝুলিয়ে রাখেন এবং অন্য অংশটি কোমরে বাঁধার জন্যে যথেষ্ট মনে করেন- (ইবনে হিশাম, ইবনে জারীর, ইবনে ইসহাকের বরাতসহ)। এর ভিত্তিতে হযরত আসমাকে (রা) 'যাতুন্ নেতাকাইন' বলা হয়। অর্থাৎ দুই কোমরবন্দওয়ালী।

বোখারীতে হযরত আসমার (রা) নিজস্ব বর্ণনা এরূপ আছে যে, যখন (তোশাদান) খাদ্য রাখার পাত্র বাঁধার প্রয়োজন হলো, তখন আবু বকর (রা) আসমাকে তাঁর 'নেতাক' ছেঁড়ার নির্দেশ দেন। তারপর এ কাফেলা এভাবে রওয়ানা হয় যে, একটি উটনীর পিঠে নবী (স) ছিলেন এবং অন্যটির পিঠে হযরত আবু বকর (রা)। তিনি খেদমতের জন্যে আমের বিন ফুহায়রাকে (রা) তাঁর পেছনে বসিয়ে নেন। আগে আগে আবদুল্লাহ বিন উরায়কেত রাস্তা দেখাবার জন্যে পায়ে হেঁটে চলছিল। এভাবে সে মহান হিজরতের সফর শুরু হয়, যা দুনিয়ার, ইতিহাসে বিপ্লব আনয়ন করে। ইবনে সা'দ ও বালাযুরী নিশ্চয়তাসহকারে বলেন, গারে সওর থেকে এ মুবারক কাফেলার যাত্রা ৪ঠা রবিউল আউয়াল সোমবার শুরু হয়। ইমাম আহমদ ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, হুযুর (স) রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার দিন গুহা থেকে রওয়ানা হন, কিন্তু তিনি তারিখ বলেননি।

কাস্‌তাল্লানী মাওয়াহিবুল্‌-লাদুন্নিয়াতে লিখেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) জুমা, শনি ও রবি এ তিন রাত গুহায় অতিবাহিত করে সোমবার রাতে সেখান থেকে রওয়ানা হন। ইবনে জারীর বলেন, রবিউল আউয়ালে (৫৪ হাতি বর্ষ) নবী (স) মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করেন।

সফরের বিবরণ

সীরাতে ইবনে হিশামে ইবনে ইসহাকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আবদুল্লাহ বিন উরায়কেত যখন এ কাফেলা নিয়ে চল্লো তখন সে সাধারণ পথ পরিহার করে মদীনা যাওয়ার জন্যে অন্য পথ অবলম্বন করলো যাতে দুশমন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ইবনে সা'দ বলেন, যেহেতু আবু বকর (রা) ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যে প্রায় চলাফেরা করতেন, সে জন্যে লোক তাঁকে দেখে চিনে ফেলতো এবং জিজ্ঞেস করতো, আপনার সাথে এ ব্যক্তি কে? তিনি বলতেন, هٰذا الرجل يهدينى السبيل

- এ এমন ব্যক্তি যিনি আমাকে পথ দেখাচ্ছেন। তাবারানীতে হযরত আসমা থেকে এবং মুসনাদে আহমদ মারবিয়্যাতে আনাস বিন মালেক (রা), বোখারী বাবুল হিজরতে হযরত আনাস (রা) থেকেও প্রায় অনুরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে।[১]

বোখারী ও মুসলিমে হযরত আবু বকরের (রা) এরূপ বর্ণনা আছে ঃ আমরা দ্বিতীয় দিন দুপুর পর্যন্ত চলতে থকি। যখন রৌদ্র তাপ প্রখর হলো তখন চারদিকে দেখতে লাগলাম কোথাও ছায়া পাওয়া যায় কিনা। দেখলাম একটি বিরাট প্রস্তরের নীচে এখনো ছায়া রয়েছে। সেখানে গিয়ে নবীর (স) জন্যে বিছানা বিছিয়ে দিয়ে আরজ করলাম, একটু জিরিয়ে নিন। তারপর চারদিকে দেখতে থাকলাম আমাদের তালাশে কেউ আসছে নাতো। এমন সময় একটি বালক ছাগল চরাতে চরাতে ছায়াতে আশ্রয় নেয়ার জন্যে এ শিলা খন্ডের দিকে এলো। আমি তাকে বল্লাম, তোমার কোন বকরীর দুধ বের করে আমাদের দেবে? সে রাজী হয়ে গেল। আমি সে বকরীর স্তন ও সে বালকের হাত পরিষ্কার করে একটি পাত্রে দুধ দোহন করালাম। তারপর তাতে সামান্য পানি দিয়ে ঠান্ডা করলাম। তারপর নিয়ে গিয়ে নবীকে (স) পান করালাম।

তারপর হযরত আবু বকর (রা) সুরাকা বিন মালেক বিন জুশমের ঘটনা বয়ান করল- যা ইমাম বোখারী মুনাকেবুল মুহাজেরীন ও বাবে হিজরতে এবং ইমাম মুসলিম কিতাবুয্ যুহদ- বাবুল হিজরতে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তার বিশদ বিবরণ বোখারী বাবুল হিজরতের একটি বর্ণনায় স্বয়ং সুরাকার ভাষায় তার ভাইপো আবদুর রহমান বিন মালেকের[২] বরাত দিয়ে ইমাম যুহরী বয়ান করেন- তার বিশদ বিবরণ সীরাতে ইবনে হিশাম, তাবাকাতে ইবনে সা'দ প্রভৃতিতে পাওয়া যয়।

---

১. এটাও 'তাওরিয়ার' একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হযরত আবু বকর (রা) বলেননি যে, ইনি মুহাম্মদ (স)। বরঞ্চ বলেছেন- আমার পথ প্রদর্শক। প্রশ্নকারী বুঝলো ইনি পথ দেখাচ্ছেন। আবু বকর (রা) একেবারে সত্য কথা বলেছেন- ইনি আমার হাদী- গ্রন্থকার।

২. ইবনে হিশাম তার নাম শুদ্ধ করে বলেছেন- আবদুর রহমান বিন হারেস বিন মালেক বিন জু'শুম- গ্রন্থকার।

সুরাকার ঘটনা

সুরাকা বনী মুদরেসের প্রধান ছিল। কুদাইদের নিকটে তার এলাকা ছিল। তার বর্ণনা এমন- আমাদের নিকটে কুরাইশের এক ব্যক্তি এ পয়গাম নিয়ে এলো যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (স) এবং আবু বকরকে (রা) হত্যা অথবা গ্রেফতার করবে তাদের প্রত্যেকের দিয়াত অর্থাৎ একশ একশ উট দেয়া হবে। তারপর একদিন আমি আমার কওমের এক বৈঠকে বসে ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আমাকে বল্লো, এখনি আমি সমুদ্র তীর ধরে কিছু লোক যেতে দেখলাম। আমার মনে হয়- তারা মুহাম্মদ (স) ও তাঁর সাথী। আমি বুঝে ফেল্লাম ঠিক তারাই হবে। কিন্তু আমি তাকে বল্লাম, তারা নয় বরঞ্চ তুমি অমুক অমুককে দেখেছ যারা এখনই আমাদের সামনে দিয়ে গেল। তারপর আমি এ বৈঠকে কিছুক্ষণ থাকার পর উঠে বাড়ি গেলাম। তারপর ঘোড়ায় চড়ে তখন চুপে চুপে বেরিয়ে গেলাম যেন অন্যান্যরা আমার যাওয়া জানতে না পারে। ইবনে শায়বায় বর্ণনা আছে, সুরাকা বলে, আমি এ আশংকা করে এমন করলাম যাতে বস্তিবাসী আমার পুরস্কারে অংশীদার হতে না পারে। আমি তাদের নিকটে পৌছলে হঠাৎ আমি ঘোড়া থেকে পড়ে গেলাম। আমি ফালের তীর বের করে ফাল দেখলাম তো তা আমার ইচ্ছার বিপরীত বেরুলো। আমি তার পরোয়া না করে বলতে থাকলাম। তারপর তাদের এমন নিকটে গেলাম যে, রসূলুল্লাহর (স) কেরাত পরিষ্কার শুনতে পেলাম। হুযুর (স) কোন দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখতেননা। আবু বকর (রা) চারদিক বার বার তাকিয়ে দেখতেন। এমন সময় হঠাৎ আমার ঘোড়ার পা হাঁটু পর্যন্ত মাটির মধ্যে বসে গেল এবং আমি তার পিঠ থেকে পড়ে গেলাম। হযরত বারা বিন আযেবের (রা) বর্ণনা স্বয়ং আবু বকর (রা) থেকে এরূপ যে আবু বকর (রা) বলেন, আমরা তখন কঠিন যমীনে অতিক্রম করছিলাম। আমি আরজ করলাম, আমাদের এ পশ্চাদ্ধাবনকারী খুব নিকটে এসে গেছে। হুযুর (স) দোয়া করলেন এবং সে মাটির মধ্যে তার পেট পর্যন্ত বসে গেল। হযরত আনেস (রা) বলেন, হুযুর (স) বলেন, হে খোদা! একে ফেলে দাও। সুরাকা বলে, আমি পুনরায় ফাল বের করলাম তো আমার ইচ্ছার বিপরীত বেরুলো। তখন আমি চিৎকার করে নিরাপত্তা চাইলাম। তখন তাঁরা থেমে গেলেন। আমি ঘোড়ায় চড়ে তাঁদের কাছে গেলাম। আমার সাথে যা কিছু ঘটলো তার থেকে বুঝে নিলাম যে রসূলুল্লাহর (স) কাজ সাফল্যমন্ডিত হবেই। (ইবনে হিশামে মুহাম্মদ বিন ইসহাকের বর্ণনা ইমাম যুহরীর বরাতে এমন আছে যে, সুরাকা চিৎকার করে বলে- আমি সুরাকা বিন জু'শুম। আপনারা সুযোগ দেন কথা বলব। খোদার কসম। আমি আপনাদের কোন আঘাত করবনা, আর না আমার মুখ থেকে এমন কোন কথা বেরুবে যা আপনাদের অসহনীয় হবে।) সুরাকা বলে, আমি রসূলুল্লাহকে বল্লাম, আপনার কওম আপনার জন্যে দিয়াতের ঘোষণা করেছে- আর মানুষ এ আশায় ঘোরাফেরা করছে যে- তার পুরস্কার মিলে যাবে। অতঃপর আমি সফরের পাথেয় ও সরঞ্জাম দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। তিনি এ ছাড়া আর কিছু চাইলেননা যে, আমি যেন তার সন্ধান কাউকে না দিই। আমি আবেদন করলাম, আমাকে অভয়নামা লিখে দিন। তিনি আমের বিন ফুহায়রাকে (রা) হুকুম দিলেন এবং তিনি চামড়ার এক টুকরার উপরে লেখা (অভয়নামা) আমাকে দিলেন। হযরত আনাস বিন মালেক (রা) বলেন, সুরাকা আবেদন

করে, হে আল্লাহর নবী! আপনি যা চান, সে হুকুম আমাকে করুন। হুযুর (স) বলেন, ব্যস্ নিজের জায়গায় থাক এবং আমাদের পর্যন্ত কাউকে পৌঁছতে দিওনা। এভাবে যে ব্যক্তি কয়েক মুহূর্ত পূর্বে জানের দুশমন ছিল, সে রক্ষক হয়ে গেল। ইবনে সা'দ বলেন, তারপর যে ব্যক্তিই হুযুরের (স) পেছনে পেছনে তার সন্ধানে আসতো সুরাকা তাকে বলতো, ফিরে যাও। আমি নিশ্চিত যে তিনি এদিকে নেই। আর তোমরা তো জান যে, আমি কেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখি এবং গোয়েন্দাগিরিতে কতটা পাকাপোক্ত।

ইবনে ইসহাক ও মূসা বিন ওকবা সুরাকার এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, সুরাকা বলেন, যে লিখিত নিরাপত্তা আমি লাভ করেছিলাম- তা সংরক্ষণ করি এবং কয়েক বছর পর যখন রসূলুল্লাহ (স) হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে জে'রানায় অবস্থান করছিলেন, তখন আমি হুযুরের (স) খেদমতে হাযির হলাম এবং সে লেখাটা পেশ করে আরজ করলাম, আমি সুরাকা বিন জু'শুম এবং এ আপনার লিখিত আমালনামা বা অভয়নামা। তিনি বল্লেন, আজ শপথ পূরণ করার এবং হক আদায় করার দিন। নিকটে এসো। আমি হুযুরের (স) নিকটে গেলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করলাম। তাবারানী সুরাকার এ সমগ্র ঘটনার সংক্ষিপ্ত সার হযরত আসমা বিন্তে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

ইস্তিয়াবে ইবনে আবদুল বার এবং ইসাবায় ইবনে হাজার হযরত হাসান বাসরীর মুরসাল রেওয়ায়েত হযরত সুফ্ইয়ান বিন উরায়নার বরাতে উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) এই হযরত সুরাকা বিন মালেককে সম্বোধন করে বলেন, সে কেমন সময় হবে যখন তুমি কিসরার বালা পরিধান করবে? এ এরশাদের কয়েক বছর পর যখন হযরত ওমরের (রা) নিকটে শাহ ইরানের বালা, তার কোমরপাট্টা এবং মুকুট আনা হলো তখন তিনি হযরত সুরাকাকে ডাকলেন এবং এসব তাকে পরিয়ে দিয়ে বল্লেন, হাত উঠাও এবং বল, প্রশংসা সেই খোদার- যিনি এসব জিনিস কিস্‌রা বিন হুরমুয থেকে কেড়ে নিয়েছেন যে বলতো- আমি মানুষের রব এবং এসব জিনিস বনী মুদলেজের এক বেদুইন সুরাকা বিন মালেক বিন জু'শুমকে পরিয়ে দিয়েছেন। সুহায়লী রাওদুল উনুফে এ ঘটনার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি অপ্রয়োজনীয় মনে করে তা পরিহার করা হলো।

উম্মে মা'বাদের কাহিনী

কুদাইদ এলাকা অতিক্রম করেই এ মহান কাফেলাটি বনী খুযায়ার একটি স্ত্রীলোক উম্মে মা'বাদের বাসস্থানে গিয়ে পৌঁছে। কোন কোন গ্রন্থপ্রণেতা এ ঘটনাকে সুরাকার ঘটনার পূর্ববর্তী বলে উল্লেখ করেছেন এবং কেউ পরবর্তী। আমরা সুরাকার ঘটনাকে এজন্যে পূর্ববর্তী মনে করি যে- হযরত আবু বকর (রা) গুহা থেকে রওয়ানা হওয়ার পর পরবর্তী ঘটনাগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমেই এ ঘটনার উল্লেখ করেন। সম্ভবতঃ এ কারণেই হাফেজ ইবনুল কাইয়েম যাদুল মায়াদে এ ঘটনাকেই অগ্রবর্তী গণ্য করেছেন।

ইবনে খুযায়মা, হাকেম, বায়হাকী, বাগাবী, ইবনে আবদুল বার, তাবারানী, ইবনে সা'দ প্রমুখ বিভিন্ন সনদে এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন এবং ইমাম বোখারী তাঁর ইতিহাসে স্বয়ং উম্মে মা'বাদের বরাত দিয়ে এ কথা সন্নিবেশিত করেছেন যে, যখন এ কাফেলা কুদাইদ অতিক্রম করছিল তখন পথে উম্মে মা'বাদের (আতেকা বিন্তে খালেদ) তাঁবুতে পৌঁছেন।

খুযায়া গোত্রের একটি শাখা বনী কা'বের যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। উম্মে মা'বাদ একজন সম্ভ্রমশীলা বয়স্কা মহিলা ছিলেন। এদিক দিয়ে যারা ভ্রমণ করতো তাদের মেহমানদারী করতো এ পরিবার। রসূলুল্লাহ্ (স) ও তাঁর সাথী যখন ওখানে পৌছলেন- তখন তিনি তাঁর তাঁবুর সামনে উঠানে বসেছিলেন। তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল এবং গোটা এলাকা দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। আগন্তুকগণ, উম্মে মা'বাদকে বল্লেন, তোমার কাছে দুধ, গোশ্‌ত অথবা খেজুর যাই থাক আমাদেরকে খেতে দাও। আমরা তার দাম দিয়ে দেব। তিনি বল্লেন, খোদার কসম, আমাদের কাছে কিছু থাকলে আপনাদের মেহ্মনদারী করতে মোটেই কুণ্ঠাবোধ করতামনা। এমন সময় তাঁবুর এক কোণায় একটি ছাগীর উপর রসূলুল্লাহ্‌র (স) নজর পড়লো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মা'বাদের মা, এ বকরীটি কেমন? তিনি বল্লেন, এ বেচারী তার শীর্ণতা ও দুর্বলতার কারণে অন্যান্য ছাগলের সাথে চরতে যেতে পারেনি। হুযুর (স) জিজ্ঞেস করেন, এ কি কিছু দুধ দিতে পারে? তিনি বলেন, এ দুধ দেয়ার অবস্থা থেকে অনেক দুর্বল। হুযুর (স) বলেন, তুমি অনুমতি দিলে আমি তার দুধ দুইতে পারি। তিনি বল্লেন, আমার মা-বাপ আপনার জন্যে কুরবান, আপনি যদি তার কিছু দুধ বের করতে পারেন তো অবশ্যই করুন। হুযুর (স) বকরীটি নিকটে আনিয়ে তার পা বাঁধলেন, তার স্তনে অথবা মতান্তরে তার পিঠে হাত বুলালেন এবং দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! এ স্ত্রীলোকটির ছাগলগুলোতে বরকত দান কর। তারপর আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে দুধ দোয়া শুরু করেন। খোদার কি শান! বকরী তার ঠ্যাং ছড়িয়ে জাবর কাটতে থাকে। তার স্তন থেকে দুধ স্রোতধারায় বেরুতে লাগলো। হুযুর (স) এমন বড়ো একটা পাত্র চাইলেন যা একটি দলের তৃপ্তিসহ্ পান করার মত দুধ ধারণ করতে পারে। তিনি দুধ দুয়ে চল্লেন এবং পাত্রটি কানায়-কানায় দুধে পূর্ণ হয়ে গেল। দুধের উপর ফেনা পড়লো, তিনি প্রথমে দুধ উম্মে মা'বাদকে তৃপ্তিসহকারে পান করালেন, সাথীগণ তৃপ্তিসহকারে পান করলেন এবং শেষে তিনি স্বয়ং পান করলেন। অতঃপর বল্লেন- ساقى القوم اخرهم
- যে অন্য লোককে পান করায় সে স্বয়ং শেষে পান করে।

তারপর তিনি দ্বিতীয় বার সে পাত্র দুধে পূর্ণ করে উম্মে মা'বাদকে দিয়ে বলেন, মা'বাদের বাপ এলে এ দুধ তাকে দেবে।

উম্মে মা'বাদ হুযুরের (স) হুলিয়া শরীফ বয়ান করেন

অনতিবিলম্বে তাঁর স্বামী জীর্ণ শীর্ণ ছাগলের পাল নিয়ে বাসস্থানে ফিরে এলেন। পাত্র ভরা দুধ দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, মা'বাদের মা এ দুধ কোথা থেকে এলো? তিনি বল্লেন, খোদার কসম, এক মুবারক লোক এদিক দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন- তিনিই এসব করে গেছেন। তারপর তিনি স্বামীর কাছে সব ঘটনা বিবৃত করেন। স্বামী বলেন, তুমি তাঁর একটু হুলিয়া বয়ান করত শুনি। তিনি (উম্মে মাবাদ) বলতে থাকেন, আমি এমন ব্যক্তিকে দেখলাম যিনি বড়ো সুন্দর ছিলেন। মুখমন্ডল উজ্জ্বল, চরিত্র পাকপবিত্র, দেহ্ না মোটা, না পাতলা। সুন্দর ও হাসি খুশী। দুটি কালো চোখ, অক্ষিপক্ষ বা চোখের পাতার লোম দীর্ঘ, আওয়াজ উচ্চ কিন্তু কর্কশ নয়, চোখের পুত্তলি কালো, অক্ষিগোলক সাদা, ভুরু দুটি না যুক্ত, না পৃথক, উভয়ের মাঝে সামান্য কেশ, চুল একেবারে কৃষ্ণবর্ণের, ঘাড় প্রশস্ত,

ঘনো দাড়ি, নীরব থাকলে মর্যাদা সম্পন্ন, কথা বল্লে আওয়াজ চারদিকে ছড়িয়ে পড়তো, কথাবার্তায় মনে হতো মণিমুক্তা ঝরে পড়ছে, কথা মিষ্টি ও সুস্পষ্ট, কথা কমও বলতেননা- বেশীও না, দূর থেকে তাঁর কথা শুনলে আওয়াজ খুব উচ্চ মনে হয় কিন্তু সন্তোষজনক। নিকট থেকে শুনলে মিষ্টি মধুর ও সুরুচিপূর্ণ মনে হয়। দৈহিক গঠন মধ্যম ধরনের- খুব লম্বা চওড়াও নয়, আবার ছোটোখাটোও নয় সাথীদের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন এবং সবচেয়ে বেশী মর্যাদাসম্পন্ন। সাথীগণ তাঁকে ঘিরে রেখেছিলেন। তাঁর কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর হুকুম পালনে দৌড় দিতেন। সকলের খেদমতের পাত্র, প্রিয়, না খিটখিটে মেজাজী আর কর্কশভাষী।

আবু মা'বাদ এসব কথা শুনে বল্লেন, খোদার কসম, ইনি তো সেই কুরাইশের লোক যাঁর উল্লেখ আমরা শুনে আসছি। তাঁর সাথে আমার দেখা হলে তাঁর সাথে যাওয়ার আবেদন জানাতাম। এমন সুযোগ পেলে আবশ্যই সে চেষ্টা করব- (বায়হাকী ও ইবনে সা'দ আবদুল মালেক বিন ওয়াহাব আল্ মায্‌জেহীর এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলেন, আমার নিকটে সংবাদ পৌছেছে যে আবু মা'বাদ মুসলমান হন এবং হিজরত করে নবীর (স) খেদমতে হাযির হন। হাফেজ আবু নুয়াইম আবদুল মালেকের যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন- তার মধ্যে অতিরিক্ত এ কথা আছে যে, উম্মে মা'য়াদও মুসলমান হন এবং হিজরত করে হুযুরের (স) খেদমতে পৌছেন)।

মদীনায় হুযুরের (স) আগমন প্রতীক্ষা

রসূলুল্লাহর (স) মক্কা থেকে বের হওয়ার খবর মদীনায় পৌছে গিয়েছিল। বোখারী- বাবুল হিজরতে যুহরী বিন ওরওয়া বিন যুবাইরের সনদে এ বর্ণনা করা হয়েছে। ইবনে ইসহাকও একথা উদ্ধৃত করেছেন। হাকেম ও মূসা বিন ওকবা ব্যাখ্যা করেছেন যে এ ঘটনা হযরত ওরওয়া (রা) স্বয়ং তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত যুবাইর বিন আল আওয়াম (রা) এর মুখে শুনেছেন যে মুসলমান রোজ সকালবেলা বেরিয়ে মক্কার পথে বসে পড়তেন এবং রোদের উত্তাপ অসহ্য না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকার পর বাড়ি ফিরতেন। ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর বরাতে বলেন, হুযুরের (স) আগমনে বিলম্ব হওয়াতে মুহাজেরগণ পেরেশান থাকতেন। প্রতিদিন আনসার ও মুহাজেরীন হাররাতুল আসাবায়[১] গিয়ে বসতেন এবং সূর্য তাপ প্রখর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। ইবনে জারীর ও ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে আবদুর রহমান বিন উয়াইম বিন সায়েদার এ বয়ান উদ্ধৃত করেন যে, আমাকে আমার কওমের বিভিন্ন সাহাবা বলেছেন যে, হুযুরের (স) মক্কা থেকে বেরুবার সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই আমরা তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করতে থাকলাম। গরমের সময় ছিল। সে জন্যে সূর্যের উত্তাপ তীব্রতর হলে এবং কোথাও ছায়া না থাকলে দুপুরের মধ্যে বাড়ি ফিরতাম। বাযযার হযরত ওমর (রা) থেকেও এরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

এটা তারই বড় নিদর্শন যে, রাসূল (স) তাঁর প্রিয় জন্মভুমি ছেড়ে একজন আশ্রয়

---

১. ভূগর্ভ থেকে গলিত পদার্থ উদ্‌গীরণের ফলে বিরাট প্রস্তরখন্ড জ্বলে পুড়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করলে তাকে 'হাররা' বলে। মদীনার চতুষ্পার্শে এ ধরনের বিরাট পাথর পাওয়া যায়। 'হাররাতুল আসাবা' সে পাথরখন্ডের নাম যা কুবার বাইরে মক্কার পথে পাওয়া যায়। তাকে খাররা কুবাও বলে- গ্রন্থকার।

প্রার্থীর মতো কোনো নতুন জায়গায় যাচ্ছিলেননা। বরঞ্চ আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি হিজরতের জন্যে এমন স্থান লাভ করেছিলেন যেখানকার লোকেরা তাঁর আগমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে ব্যাকুল ছিল।

হুযুরের (স) কুবায় পৌঁছানো

দুপুরের সময় ছিল এবং লোক হুযুরের (স) প্রতীক্ষায় থাকার পর বাড়ি চলে গিয়েছিল। এমন সময় তিনি তাঁর সাথীগণসহ কুবায় পৌছেন। মদীনার পার্শ্ববর্তী বস্তিগুলোর মধ্যে কুবা ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত। কুবায় হুযুরের (স) আগমন সম্পর্কে দুটি বর্ণনা আছে যা প্রকাশ্যতঃ পরস্পর বিরোধী মনে হয়, একটি বর্ণনা এমন যে, হুযুর (স) হাররায়ে কুবার নিকটে পৌছে তার একধারে নেমে পড়েন। তারপর আনসারকে সংবাদ দেয়ার জন্যে একজনকে পাঠানো হয়। খবর পাওয়া মাত্র লোক এসে হুযুর (স) ও হযরত আবু বকরকে (রা) সালাম দিয়ে বল্লেন, আপনি নিশ্চিন্ত মনে তশরিফ আনুন, আমরা আপনার অনুগত। এ বোখারীতে হযরত আনাসের (রা) বর্ণনা এবং ইবনে সা'দও একে তাঁর বরাত দিয়েই উদ্ধৃত করেছেন। মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকীতে হযরত আনাসের (রা) যে বর্ণনা এসেছে, তাতে অতিরিক্ত একথা আছে যে, হুযুরের (স) আগমন সংবাদ শুনা মাত্র ৫০০ লোক সম্বর্ধনার জন্যে দৌড় দেন।

অন্য একটি বর্ণনা এরূপ আছে যে, হুযুর (স) কুবার নিকটে পৌছার পর একজন ইহুদী, যে কোন কাজের জন্যে তার ক্ষুদ্র দূর্গের উপর উঠেছিল, হুযুরকে (স) আসতে দেখে উচ্চস্বরে বল্লো, হে বনী কায়লা এই যে, তোমাদের সর্দার এসে পৌছেছেন।[১] এ কথা শুনা মাত্র কুবায় বসবাসকারী বনী আমর বিন আওফ সমস্বরে- না'রায়ে তকবীর বুলন্দ করে এবং অস্ত্রসজ্জিত হয়ে- হুযুরের (স) সাদর অভ্যর্থনার জন্যে এগিয়ে চলে। ওদিকে রসূলুল্লাহ (স) ও হযরত আবু বকর (রা) আপন আপন সওয়ারী থেকে নেমে একটি খেজুর গাছের ছায়ায় অবস্থান করছিলেন। আনসারের বিরাট ভিড় প্রচন্ড আবেগ-উদ্দীপনা সহ হুযুরের অবতরণস্থলে গিয়ে হাযির হয়। অদম্য ভাবাবেগে লোক গায়ের উপর এসে পড়ছিল। কিন্তু তাঁরা জানতেননা যে এ দু'জনের মধ্যে রসূলুল্লাহ (স) কে ছিলেন। এজন্যে প্রথমে তো তারা হযরত আবু বকরকে (রা) সালাম করতে থাকে। কিন্তু যখন হুযুরের (স) গায়ে রোদ এসে লাগছিল, তখন আবু বকর (রা) উঠে তাঁর চাদর দিয়ে হুযুরের (স) ছায়া করলেন। তখন লোক জানতে পারলেন হুযুর (স) কোন্ ব্যক্তি। তখন সকলে তাঁকে সালাম করতে লাগলেন। এ বর্ণনা বোখারী হযরত ওরওয়া বিন যুবাইর থেকে, মুহম্মদ বিন ইসহাক আবদুর রহমান বিন ওয়াইম বিন সায়েদা থেকে এবং ইবনে সা'দ ওয়াকেদী থেকে উদ্ধৃত

---

১. আউস এবং খাযরাজ যেহেতু একই মায়ের সন্তান ছিল যার নাম ছিল কায়লা। এ জন্যে তাদেরকে বনী কায়লা বলা হতো। ইহুদীর এ ঘোষণা - "তোমাদের সর্দার এসে পৌছেছেন" - একথা সুস্পষ্ট করে দেয় যে, মদীনার মুমেন, মুশরিক, ইহুদী সবাই পূর্ব থেকেই জানতো যে, রসূলুল্লাহ (স) আশ্রয় প্রার্থী হিসাবে নয়, বরঞ্চ মদীনার আনসারদের নেতা ও শক্তিশালী শাসক হিসাবে আগমন করছেন। ইহুদীর এ ঘোষণা বিভিন্ন বর্ণনাকারী বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগে উদ্ধৃত করেছেন। আমরা শুধু একটি বর্ণনার শব্দাবলী গ্রহণ করেছি। কারণ সব উদ্ধৃতি দিয়ে প্রবন্ধ দীর্ঘায়িত করে কোন লাভ নেই- (গ্রন্থকার)।

করেন। হাকেম, মূসা বিন ওকবা, ইবনে জারীর তাবারী, বালাযুরী প্রমুখ সবাই এ ঘটনা বয়ান করেন।

এ দুটি বর্ণনায় দৃশ্যতঃ যে মতভেদ দেখা যায় তা প্রকৃতপক্ষে কোন মতভেদ নয়। মনে হয় যে একদিকে হুযুর (স) ওখানে পৌঁছার পর সম্ভবতঃ আমের বিন ফুহায়রা অথবা আবদুল্লাহ বিন উরায়কেতকে তাঁর আগমনের খবর দেয়ার জন্যে পাঠিয়ে থাকবেন এবং অপরদিকে তাঁকে দেখে ইহুদীও চিৎকার করে বলে থাকবে যে তিনি এসেছেন।

কুবা পৌঁছার তারিখ

হুযুরের (স) কুবা পৌঁছবার তারিখ নিয়ে রাবীগণের মধ্যে বহু মতভেদ আছে। ইবনে সা'দ এক স্থানে সোমবার দিন এবং দুসরা রবিউল আউয়াল উল্লেখ করেছেন। অন্যত্র তিনি গারে সওর থেকে বেরুবার তারিখ ৪ঠা রবিউল আউয়াল এবং মদীনা পৌঁছার তারিখ নিশ্চয়তার সাথে ১২ই রবিউল আউয়াল বলেছেন। বোখারীতে ওরওয়া বিন যুবাইরের বর্ণনায় তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে সোমবার দিন এবং রবিউল আউয়াল মাস। মূসা বিন ওকবা ইমাম যুহরীর বরাত দিয়ে ১লা রবিউল আউয়াল কুবা পৌঁছার তারিখ বলেছেন। অথচ রাবীগণের অধিকাংশ তাকে মক্কা থেকে বেরুবার তারিখ বলেছেন। ইবনে ইসহাক থেকে জারীর বিন হাযেমের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, হুযুর (স) দুসরা রবিউল আউয়াল কুবায় পৌঁছেন। কিন্তু তাবারানী আসেম বিন আদী এবং ইবনে হিশাম, ইবনে জারীর ও ইব্রাহীম বিন সা'দ ইবনে ইসহাকের যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তাতে ১২ই রবিউল আউয়াল বলা হয়েছে। বালাযুরী ও ইবনে কুতায়বা বলেন, এটাই সঠিক তারিখ। ইবনুল কাইয়েম যাদুল মায়াদে ও ইবনে আবদুল বার আদ্দুরারেও এই তারিখ উল্লেখ করেছেন। কোন কোন বর্ণনায় ৮, ১৩, ও ১৫ই রবিউল আউয়াল বলা হয়েছে। কিন্তু সঠিক ও নির্ভরযোগ্য কথা এই যে- হুযুর (স) পয়লা রবিউল আউয়াল মক্কা থেকে বেরিয়ে গারে সওরে যান। তিনদিন তিনরাত সেখানে অবস্থান করেন এবং ৪ঠা রবিউল আউয়াল শেষ রাতে মদীনা রওয়ানা হন। ১২ই রবিউল আওয়াল মদীনায় (কুবায়) পৌঁছেন।[১] সৌর মাসও বছর হিসেবে ২৪ শে সেপ্টেম্বর, ৬২২ খৃঃ।

কুবায় অবস্থান

এ কথা সর্বসম্মত যে- কুবায় হুযুরের (স) অবস্থান আউস গোত্রের শাখা বনী আমর বিন আওফের বস্তিতে ছিল। এও প্রমাণিত যে ওখানে তাঁর মেহমানদারীর সৌভাগ্য লাভ

---

১. প্রকাশ থাকে যে- চান্দ্র মাসের হিসাবে রাত দিনের পূর্বে হয় এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর নতুন তারিখ শুরু হয়। এ জন্যে ১লা রবিউল আউয়ালের রাতের অর্থ দিনের আগের রাত, দিন শেষে রাত নয়। উপরন্তু এটা জানা দরকার যে, হযরত ওমরের (রা) খেলাফত কালে হিজরী তারিখের সূচনা করা হয়- তখন তা হিজরতের দিন থেকে করা হয়নি। বরঞ্চ পয়লা মহররম (১৬ই জুলাই, ৬২২ খৃঃ) থেকে সূচনা করা হয়। কারণ আরববাসী প্রাচীনকালে মহররমকেই বছরের প্রথম মাস হিসাবে মেনে আসতো। এ জন্যে হিজরত হিজরী সনের তৃতীয় মাসে হয়েছিল। -(গ্রন্থকার)

করেন কুলসূম বিন হিদম।[২] কিন্তু হুযুর (স) তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্যে হযরত সা'দ বিন খায়সামার বাড়ি থাকতেন। কারণ তাঁর ছেলেমেয়ে ছিলনা এবং সমস্ত বাড়ি পুরুষদের জন্যে মুক্ত ছিল। এর ভিত্তিতে লোকের মধ্যে একথা সুবিদিত হয়ে পড়ে যে হুযুর (স) সাদের বাড়িতে অবস্থান করছেন। বালাযুরী ফতহুল বুলদানেও একথা বিশদভাবে লিখেছেন। তিনি বলেছেন, আমি হাদীস, সীরাত এবং যুদ্ধবিগ্রহাদির জ্ঞানসম্পন্ন একদল লোকের কাছে একথা শুনেছি।

এখানে অবস্থানকালে হুযুর (স) কুবা মসজিদ নির্মাণ করেন। ইমাম বোখারী হযরত ওরওয়া বিন যুবাইর (রা) থেকে এবং ইবনে হিশাম ও ইবনে জারীর মুহাম্মদ বিন ইসহাক থেকে একথা উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে জারীর এ সম্পর্কে ইবনে ইসহাকে গোটা সনদ সন্নিবেশিত করেন যার থেকে জানা যায় যে, এ প্রকৃতপক্ষে হযরত আলীর (র) বর্ণনা। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, এ ছিল প্রথম মসজিদ যা ইসলামী যুগে নির্মাণ করা হয় এবং এ ছিল প্রথম মসজিদ যার মধ্যে রসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণসহ প্রকাশ্যে জামায়াতে নামায পড়ান।[৩]

এ সময়ে হযরত আলী (রা) মক্কা থেকে হুযুরের (স) খেদমতে পৌছেন। তাঁর সাথে তিনি কুলসূম বিন হিদমের ওখানেই অবস্থান করেন। ইবনে হিশাম ও ইবনে জারীর মুহম্মদ বিন ইসহাকের বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন যে, তিনি তিন দিন মক্কায় অবস্থান করেন এবং মক্কাবাসীদের সেসব আমানত ফেরৎ দেন যা তারা হুযুরের (স) নিকটে রেখেছিল। তারপর তিনি সেখান থেকে হিজরত করেন।

এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, কুবায় হুযুর (স) কতদিন ছিলেন। বোখারী, মুসলিম ও ইবনে সাদে হযরত আনাস বিন মালেকের (রা) বর্ণনা আছে যে, তিনি সেখানে ১৪ দিন ছিলেন। ওয়াকেদীও ১৪ দিনের কথা বলেন। হযরত আয়েশা (রা) এবং ওরওয়া বিন যুবাইর (রা) থেকে কথিত আছে যে, হুযুর (স) ১০ দিন পর আরও কিছুদিন ছিলেন। বনী আমর বিন আওফের কেউ কেউ বলেন, হুযুর (স) সেখানে ১৮ দিন ছিলেন। ইমাম যুহরী এবং মুজাম্মে বিন ইয়াযিদ বিন হারেসা থেকে মূসা বিন ওকবা বর্ণনা করেন যে, হুযুর (স) সেখানে ২২ দিন ছিলেন আর এটাই ছিল যুবাইর বিন বাক্কারের বর্ণনা যা তিনি বনী আমর বিন আওফের বিভিন্ন লোকের কাছে শুনেছেন। বালাযুরী ২৩ দিনেরও এক বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু ইবনে সা'দ, ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম, ইবনে জারীর, বালাযুরী ও ইবনে হিব্বান নিশ্চয়তার সাথে বলেছেন যে, হুযুর (স) কুবায় সোম, মংগল, বুধ ও

---

২. ইনি একজন বয়োবৃদ্ধ বুযুর্গ ছিলেন। হুযুরের তশরিফ আনয়নের অল্পদিন পর তাঁর ইন্তেকাল হয়। জানিনা এ কথা কিভাবে কোন কোন বর্ণনায় এলো যে- হুযুরের (স) অবস্থানকালে তিনি মুশরিক ছিলেন। ইবনে আবদুল বার ইস্তিয়াবে এবং ইবনে হাজার ইসাবায় সুস্পষ্ট করে বলেছেন যে, হিজরতের পূর্বে তিনি মুসলমান হন। -(গ্রন্থকার)

৩. মসজিদে কুবা এখনও মদীনার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। তার কেবলা সংলগ্ন যেস্থানে এখন মকামুল ওমরা নামে একটি কুবরা আছে এখানে হযরত কুলসূম বিন হিদমের বাড়ি ছিল। তার নিকটে দ্বিতীয় কুবরা যা মসজিদ সংলগ্ন এবং বায়তে ফাতেমা নামে খ্যাত তা ছিল হযরত সা'দ বিন খায়সামার বাড়ি- গ্রন্থকার।

বৃহস্পতি অবস্থান করেন এবং জুমার দিন সেখান থেকে মদীনা রওয়ানা হন। এ বক্তব্যই মাগাযী ও সিয়ারের আলেমগণের নিকটে সুবিদিত। যদিও ইবনে হিব্বান কুবায় হুযুরের (স) অবস্থান তিনদিন বলেছেন এবং মূসা বিন ওকবাও একথা বলেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা হুযুরের (স) কুবায় পৌছার এবং কুবা থেকে রওয়ানার দিন অবস্থানের দিনগুলোর মধ্যে ধরেননি। এ জন্যে তাঁদের বক্তব্যও মশহুর বক্তব্যের অনুরূপ।

কুবা থেকে রওয়ানা এবং প্রথম জুমার নামায

ইবনে হিশামও ইবনে জারীর- ইবনে ইসহাকের বর্ণনা উদ্ধৃত করেন এবং ইবনে সা'দ ও বালাযুরীর বর্ণনাও তাই যে, হুযুর (স) জুমার দিন কিছুটা বেলা হলে কুবা থেকে রওয়ানা হন। বনী সালেম বিন আওফের বস্তিতে পৌছতেই জুমার নামাযের সময় হয়ে যায়। সেখানে তিনি নেমে পড়েন এবং তাদের মসজিদে জুমা পড়িয়ে দেন১০০ লোক এতে শরীক হয় এবং এ ছিল প্রথম জুমা যা হুযুরের (স) ইমামতিতে পড়া হয়। বনী সালেমের এ মসজিদ রানুনা প্রান্তরে ছিল[১] এবং প্রথম তাকে মসজিদে খুবাইব বলা হতো। হুযুরের (স) ওখানে জুমা পড়াবার পর তা জুমা মসজিদ নামে অভিহিত হয় এবং আজ পর্যন্ত সে নামেই সুবিদিত। মদীনা থেকে কুবা যাবার পথে এ রাস্তার বাম ধারে পড়ে।

এ জুমায় হুযুর (স) যে খোৎবা দিয়েছিলেন তা সাঈদ বিন আবদুর রহমান আল জমহীর বরাত দিয়ে ইবনে জারীর তাবারী তাঁর ইতিহাসে প্রতিটি শব্দসহ সন্নিবেশিত করেছেন। কিন্তু তাতে কুরআনের এমন সব আয়াত পাওয়া যায় যা হিজরতের পর নাযিল হয়। এ জন্যে সন্দেহ হয় যে- হুযুরের (স) প্রতি যে ভাষণ আরোপ করা হয়- তা সঠিক শব্দাবলীসহ উদ্ধৃত করা হয়েছে কিনা।

মদীনায় প্রবেশ

জুমার নামাযের পর হুযুর (স) যখন মদীনা যাবার জন্যে তৈরী হন তখন হযরত ইতবান বিন মালেক (রা) ও হযরত আব্বাস বিন উবাদাহ বিন নাদলীর নেতৃত্বে জনতা হুযুরের (স) সামনে আসে এবং উটনীর নাকল ধরে তাঁরা আরজ করেন- হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের এখানে অবস্থান করুন। আমরা সংখ্যায়ও যথেষ্ট, যুদ্ধের সরঞ্জামও রাখি এবং প্রতিরক্ষার শক্তিও। হুযুর (স) বলেন, আমার উটনীর পথ ছেড়ে দাও। কারণ সে আদিষ্ট। অর্থাৎ এ আল্লাহর হুকুমে চলছে। সে সে স্থানেই থামবে- যেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে থামার হুকুম হবে। সামনে অগ্রসর হলেন তো, বনী বায়াদা, বনী সায়েদা, বনী আল হারেস, বনী আদী বিন নাজ্জারের মহল্লা পথে পড়লো। প্রত্যেক স্থানে এসব গোত্রের লোক তাঁদের সর্দারদের নেতৃত্বে সামনে এসে সেখানে অবস্থানের অনুরোধ জানায়। হুযুর (স) তাঁদের সবাইকে এ জবাবই দিতেন- আমার উটনীর পথ ছেড়ে দাও। কারণ সে আদিষ্ট। তিনি তাঁর উটনীর নাকল ঢিলা করে রেখেছিলেন এবং সে কোথায় যাবে, কোথায় দাঁড়াবে

---

১. ইয়াকুত মু'জামুল বুলদানে রানুনা' শব্দের নীচে লিখেছেন, রানুনা প্রান্তরে- মসজিদের উল্লেখ ইবনে ইসহাকের সীরাতের সে সারাংশে আছে যা ইবনে হিশাম লিখেছেন, অন্যথায় অন্যান্য সকলে লিখেছেন, হুযুর (স) বনী সালেমের বস্তিতে জুমার নামায আদায় করেন- গ্রন্থকার।

এ জন্যে সামান্যতম ইংগিতও তিনি করতেননা। যখন সে বনী মালেক বিন নাজ্জারের[২] মহল্লায় পৌছে তো ঠিক সে স্থানে গিয়ে বসে পড়ে আজ যেখানে মসজিদে নববী- মতান্তরে রসূলের মেম্বর রয়েছে। হুযুর (স) তার পিঠে বসেই ছিলেন। সে উঠে পড়ে কিছুদূর চলার পর ফিরে এসে ঠিক ঐ স্থানেই বসে পড়ে এবং বিশ্রামের জন্যে গা এলিয়ে দেয়, তখন হুযুর (স) তার পিঠ থেকে নেমে পড়েন।[৩] এ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা ইবনে হিশাম বিশদভাবে এবং ইবনে জারীর সংক্ষেপে উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে সা'দ ও বালাযুরীও সংক্ষেপে বয়ান করেছেন।

হযরত আবু আইয়ূবের বাড়ি অবস্থান

পরবর্তী বিবরণে কিছু মতভেদ আছে। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আছে যে- যখন হুযুর (স) উটনী থেকে নামলেন তো সামনেই হযরত আবু আইয়ূব আনসারীর (রা) - (খালেদ বিন যায়েদ) বাড়ি ছিল। তিনি হাযির হন এবং হুযুরের (স) জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে নিজের বাড়ি নিয়ে যান। হুযুর (স) তাঁর ওখানেই অবস্থান করেন।

বোখারী ও মুসনাদে আহমদে আছে যে হুযুর (স) উটনী থেকে নেমে জিজ্ঞেস করেন- আমাদের লোকের মধ্যে কার বাড়ি সবচেয়ে নিকটে। হযরত আবু আইয়ূব (রা) বলেন- আমার, হে আল্লাহর রসূল। এই যে সামনে আমার বাড়ি এবং এ আমার দরজা। হুযুর (স) বলেন, যাও এবং আমার বিশ্রামের ব্যবস্থা কর।

ইবনে সা'দও হযরত আনাসের (রা) বরাত দিয়ে এ কথা বলেছেন। ওয়াকেদীর বরাত দিয়ে ইবনে সা'দ ও বালাযুরী অতিরিক্ত এ কথা বলেন যে, হযরত আসয়াদ বিন যুরারা হুযুরের উটনী তার বাড়িতে নিয়ে দেখাশুনা করতে থাকেন।

কোন কোন বর্ণনায় আছে, হুযুর (স) উটনী থেকে নেমে বলেন-

هذا المنزل ان شاء الله

- আল্লাহ চাইলে এই থাকার স্থান। আবু আইয়ূব (রা) এসে আরজ করেন, আমার বাড়ি সবচেয়ে নিকটে। অনুমতি দিলে আমি আপনার জিনিসপত্র আমার বাড়ি নিয়ে যাই। হুযুর (স) অনুমতি দেন এবং তিনি জিনিসপত্র তুলে নিয়ে যান। তাবারানী আবদুল্লাহ বিন যুবাইর থেকে এ কথাই বলেছেন।

বোখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদে হযরত বারা বিন আযেবের (রা) এ বর্ণনা আছে যে, হুযুর (স) কোথায় থাকবেন এ নিয়ে লোকের মধ্যে ঝগড়া হয়। শেষে হুযুর (স)

---

২. এ সেই পরিবার- যার এক মহিলা- সালমা বিন্তে আমরের সাথে হুযুরের (স) পরদাদা হাশেমের বিয়ে হয়। আবদুল মুত্তালেব তাঁর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেন। এ পরিবারেই আবদুল মুত্তালিব যৌবনকল পর্যন্ত পালিত-বর্ধিত হন। এ পরিবারের লোকেরা সে সময়ে আবদুল মুত্তালেরের সাহায্যে মক্কায় পৌছেন- যখন তাঁর চাচা তাঁর উত্তরাধিকার হস্তগত করেন। এ পরিবারের সাথে হুযুরের (স) পরিবারের এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যে, তাঁর পিতা জনাব আবদুল্লাহ তাঁর জীবনের শেষ ভাগে এখানেই অতিবাহিত করেন। এখানেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়। হুযুরের (স) মা তাঁকে তাঁর শৈশব অবস্থায় তাঁদেরকে দেখাবার জন্যে মদীনা নিয়ে যান- গ্রন্থকার।

৩. এতে আল্লাহ তায়ালার বিরাট হিকমত এ ছিল যে, তিনি হুযুরের থাকার স্থান বেছে নেয়ার দায়িত্ব স্বয়ং হুযুরের উপর দেননি, বরঞ্চ তাঁর হুকুমে এ খেদমত উটনী থেকে নেন। হুযুর (স) নিজের পছন্দমত থাকার স্থান বেছে নিলে আনসারের অন্যান্য গোত্রের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি হতো যে, তিনি বনী নাজ্জারকে অন্যান্যের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন- গ্রন্থকার।

বলেন, আমি বনী নাজ্জারের ওখানে থাকব যা আবদুল মুত্তালিবের নানার পরিবার।

হাফেজ ইবনে হাজার ইসাবায় মুসনাদে আহমদের বরাতে স্বয়ং আবু আইয়ূবের এ বয়ান উদ্ধৃত করেন যে- এ নিয়ে যখন আনসারের মধ্যে ঝগড়া বেড়ে যায়, তখন অবশেষে লটারী করা হলো এবং তাতে আবু আইয়ূবের (রা) নাম উঠলো।

এসব বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা দেখে এমন মনে হয় যে, প্রথমে তো হুযুর (স) আবু আইয়ূবের (রা) ওখানে নেমে থাকবেন এর পরে অন্যান্য গোত্রের লোক এ অভিলাষ ব্যক্ত করে থাকবে- যে এ মর্যাদা লাভে তারাও অংশীদার হোক। এর ফলে ভাগ্য পরীক্ষার (লটারীর) প্রয়োজন দেখা দেয়। আর হুযুর (স) এ বলে লোকদেরকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন যে, ঐ পরিবারের প্রথম থেকেই তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল এবং আরববাসী আত্মীয়তার অধিকারকে অগ্রাধিকার দিত।[১]

ইমাম আবু ইউসূফ কিতাবুয্ যিকির ওয়াদ্দোয়াতে হযরত আবু আইয়ূব আনসারীর (রা) বর্ণনা উদ্ধৃত করেন যাতে আবু আইয়ূব বলেছেন, হুযুর (স) যখন আর এখানে নামলেন তো তিনি নীচ তলায় রইলেন এবং আমি ও আইয়ূবের মা উপর তলায় রইলাম। রাতে আমি আইয়ূবের মাকে বল্লাম, হুযুর (স) উপর তলায় থাকার বেশী হকদার। কারণ তাঁর কাছে ফেরেশতাগণ আসেন এবং তাঁর উপর অহী নাযিল হয়। এ চিন্তায় আমি ও আইয়ূবের মা রাতে ঘুমোতে পারিনি। সকালে হুযুরের (স) কাছে সব কথা বল্লাম। তিনি বল্লেন, নীচ তলা আমার জন্যে আরামপ্রদ। আমি বল্লাম, কসম সেই সত্তার- যিনি আপনাকে হকসহ পাঠিয়েছেন। আমি এমন দালান বাড়িতে থাকতে পারিনা যার নীচ তলায় আপনি থাকেন। আমি এমন কাকুতি মিনতি করলাম যে- তিনি উপর তলায় থাকতে রাজী হলেন।

ইবনে হিশাম মুহাম্মদ বিন ইসহাক থেকে হযরত আবু আইয়ূবের যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তা এর চেয়ে একটু ভিন্ন ধরনের। তাতে এ কথা আছে যে- হুযুর (স) নীচ তলা এ জন্যে পছন্দ করেন যে, তা সাক্ষাৎকারীদের জন্যে বেশী সুবিধাজনক। এ জন্যে আবু আইয়ূব (রা) অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপর তলায় থাকতে রাজী হন। কিন্তু একদিন এমন হলো যে, উপর তলায় একটি পানির পাত্র ভেঙে যায়। হযরত আবু আইয়ুব (রা) আশংকা করেন যে হয়তো পানি গড়ে নীচে পড়লে হুযুরের কষ্ট হবে। এ জন্যে দুই মিয়া-বিবির জন্যে যে একটি মাত্র লেপ ছিল তা পানির উপর ফেলে দিয়ে তা শুকিয়ে ফেলেন। বায়হাকী এবং ইবনে আবি শায়বাও হযরত আবু আইয়ূব (রা) থেকে এ ঘটনা এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

ইবনে সা'দ হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা)-এর বরাত দিয়ে বলেন, হযরত আবু আইয়ূবের ওখানে হুযুরের (স) অবস্থানকালে এমন দিন যায়নি যেদিন তিন চার বাড়ির লোক তাঁর দরজার সমনে খাবার জিনিসপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়নি।

মদীনায় হুযুরের (স) সম্বর্ধনা

যদিও উপরের বর্ণনায় একথা ভালোভাবে অনুমান করা যায় যে- মদীনাবাসীগণ কেমন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে হুযুরকে (স) মাথায় তুলে নিয়েছিল, কিন্তু শহরে তাঁর সম্বর্ধনা

---

১. হযরত আবু আইয়ূব আনসারীর (রা) এ বাড়ি এখনো মসজিদে নববীর দক্ষিণ পূর্ব দিকে বিদ্যমান এবং তার সন্নিকট 'বাবে জাফর সাদেক' আছে সেখানে এখন মসজিদে নববীর ইমাম ও খতিব থাকেন- গ্রন্থকার।

যে উৎসাহ উদ্যম ও গভীর ভক্তি শ্রদ্ধাসহকারে করা হয় তা ছিল নজীরবিহীন। আরবে এ ধরনের সম্বর্ধনা না অতীতে কখনো হয়েছে না পরবর্তীকালে। বোখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদে বারা বিন আযেবের মধ্যস্থতায় হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) এরূপ বর্ণনা আছে। তিনি বলেন, আমরা যখন মদীনা পৌঁছলাম তখন দেখলাম- জনতা আমাদের সম্বর্ধনার জন্যে রাজপথে বেরিয়ে পড়েছে। ছাদের উপর মানুষের প্রচন্ড ভিড়। খাদেম ও বালকেরা রাস্তায় আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছিল এবং শ্লোগান দিচ্ছিল- আল্লাহু আকবর, রসূলুল্লাহ তশরিফ এনেছেন, মুহম্মদ (স) তশরিফ এনেছেন। বোখারীতে হযরত আনাস বিন মালেকের (রা) বর্ণনা আছে যে, হুযুর (স) এবং হযরত আবু বকরকে (রা) সশস্ত্র জনতা ঘিরে রেখেছিল। উঁচু জায়গায় উঠে মানুষ হুযুরকে (স) দেখার চেষ্টা করছিল এবং সমগ্র শহরে এসেছেন নবীউল্লাহ- এসেছেন রসূলুল্লাহ- ধ্বনি গুঞ্জরিত হচ্ছিল। তাবকাতে ইবনে সাদে হযরত আনাসের (রা) বর্ণনায় যে শব্দাবলী পাওয়া যায় তাতে তিনি বলেন, আমি কখনো এমন উজ্জ্বল ও মর্যাদাপূর্ণ দিন দেখিনি। মুসনাদে আহমদে হযরত আনাসের (রা) বর্ণনা এরূপ- মদীনাবাসী সম্বর্ধনার জন্যে প্রচন্ড উৎসাহ-উদ্দীপনাসহ বেরিয়ে এসেছিল, মহিলাগণ ছাদের উপর সমবেত হন এবং তাঁরা লোকের কাছে জিজ্ঞেস করছিলেন, এ দু'জনের মধ্যে রসূলুল্লাহ (স) কে? এমন দৃশ্য আমরা কখনো দেখিনি।

অনুরূপ বর্ণনা হযরত আনাস (রা) থেকে দারেমী, তিরমিযি, ইবনে মাজা, আবু দাউদ ও বায়হাকীতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। বোখারীতে বারা বিন আযেবের (রা) বর্ণনা আছে যাতে তিনি বলেন, আমি মদীনাবাসীকে কখনো এমন আনন্দিত দেখিনি- যেমনটি দেখেছিলাম- হুযুরের (স) মদীনা আগমনের দিন।

বায়হাকী দালায়েলে, মু'জামুল কাবীর প্রণেতা আবু বকর আল মুকরী কিতাবুশ শামায়েলে এ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, মহিলাগণ ছাদের উপর উঠে এ গীত গাইছিলেনঃ

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ

- আমাদের উপর পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে ওয়াদীর পাহাড়ী পথ থেকে, শোকর করা আমাদের ওয়াজেব যতোক্ষণ আল্লাহকে ডাকার লোক বাকী থাকবে।

রাযীন এর সাথে আর একটি কবিতা যোগ করেছেন-

اَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا جِئْتَ بِالْاَمْرِ الْمُطَاعِ

- হে আমাদের মধ্যে আগত মাবউস্! তুমি এমন পদমর্যাদা নিয়ে এসেছ যার আনুগত্য করা আমাদের জন্যে ওয়াজেব।

ইবনুল কাইয়েম- যাদুল মায়াদে এ বর্ণনাকে এর ভিত্তিতে নাকচ করেন যে, সানিয়্যাতুল ওয়দা- শামের দিকে ছিল- না তার বিপরীত মক্কার দিক। আর কবিতাগুলো মেয়েরা তখন গেয়েছিলেন যখন হুযুর (স) তবুক থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তন করছিলেন। বোখারী, আবু দাউদ ও তিরমিযিতে এরূপ বলা হয়েছে। অথচ এ অসম্ভব কিছু নয় এবং বিবেক বিরুদ্ধও নয় যে, মক্কামুখী মুসাফিরগণকে যে পাহাড়ী পথ পর্যন্ত বিদায় দেয়ার জন্যে মদীনাবাসী যেতো তাকেও ثنيات الوداع বলা হতো। সানিয়্যা ثنية তো প্রত্যেকে সে পথকে বলে যা পাহাড়গুলোর ভেতর দিয়ে গেছে এবং কোন পথকে 'সানিয়্যাতুল ওয়াদা' বলার অর্থ পাহাড়ী পথ যার উপর দিয়ে

অতিক্রমকারীদেরকে বিদায় দেয়া হয়।

হুযুর (স) যখন বনী নাজ্জারের মহল্লায় পৌছেন তখন বালিকারা দফ্ বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে আসে এবং এ গান গায় ঃ

نَحْنُ جَوَارٍ مِّنْ بَنِي النَّجَّارِ   يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِّنْ جَارِ

- আমরা বনী নাজ্জারের মেয়েরা, কত ভালো প্রতিবেশী মুহাম্মদ (স)! এ কথাগুলো হাকেম ও বায়হাকী হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। হুযুর (স) মেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি আমাকে ভালোবাস? তারা বলে, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হুযুর (স) তিনবার বলেন, খোদার কসম, আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ আনসারকে ভালোবাসি।

"তাবারানী 'মু'জামুস সাগীরে' হুযুরের (স) এ শব্দগুলি উদ্ধৃত করেছেন। আল্লাহ জানেন যে- আমার মন তোমাদেরকে ভালোবাসে।"

বায়হাকী এবং ইবনে মাজাও একথা হযরত আনাস (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। বোখারীতে হযরত আনাসের (রা) এরূপ বর্ণনা আছে, হুযুর (স) মেয়েদের ও মহিলাদের আসতে দেখে দাঁড়িয়ে যান এবং তিনবার একথা বলেন, খোদার কসম! তোমরা আমার নিকটে সবচেয়ে প্রিয়।(৪)

কুরাইশের অস্বস্তিকর অবস্থা

রসূলুল্লাহর (স) নিরাপদে মদীনা পৌছে যাওয়টাই কুরাইশের জন্যে অত্যন্ত বিব্রতকর ছিল। কিন্তু যখন মদীনায় হুযুরের (স) রাজকীয় সম্বর্ধনার সংবাদ তাদের কাছে পৌছলো তখন তারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে এবং মদীনার সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের নিকটে পত্র পাঠায়- যাকে হিজরতের পূর্বে মদীনাবাসী তাদের বাদশাহ্ বানাবার প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং হুযুরের (স) মদীনায় পৌছে যাওয়ার এবং আউস ও খাযরাজের অধিকাংশ মুসলমান হওয়ার কারণে যার আশা চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছিল। পত্রে বলা হয় ঃ

তোমরা আমাদের লোককে তোমাদের ওখানে আশ্রয় দিয়েছ। আমরা খোদার কসম করে বলছি যে, তোমরা তার সাথে লড়াই কর অথবা তাকে বের করে দাও। নতুবা আমরা সকলে তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবো এবং তোমাদেরকে হত্যা করব এবং স্ত্রী লোকদেরকে বাঁদী বানাবো।

আবদুল্লাহ বিন উবাই পত্র পাওয়ার পর কিছু দুষ্কৃতি করার উদ্যোগী হলো। কিন্তু নবী (স) যথাসময়ে এ দুষ্কৃতি প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর মদীনার সর্দার হযরত সা'দ বিন মুয়ায (রা) ওমরার জন্যে মক্কা যান। ওখানে একেবারে হারামের দরজার উপর আবু জহল তাঁকে বাধা দিয়ে বলে-

الا أُراك تطوف بمكة أمنًا وقد أويتم الصّباة وزعمتم انكم تنصرونهم وتعينونهم؟ اما والله لولا انك مع ابى صفوان ما رجعت الى اهلك سالمًا-

তোমরা আমাদের দ্বীনের মুরতাদেরকে আশ্রয় দেবে এবং তাদের সাহায্য সহযোগিতা করবে আর আমরা তোমাদেরকে নিশ্চিন্ত মনে মক্কায় তাওয়াফ করতে দেব? খোদার কসম যদি তুমি আবু সাফওয়ানের (অর্থাৎ উমাইয়া বিন খালাফ) সাথে না হতে তাহলে এখান থেকে জীবিত যেতে পারতেনা।

হযরত সা'দ জবাবে বলেন-

والله لئن منعتنى هذا لامنعنك ما هو اشد عليك منه ، طريقك على المدينة -

খোদার কসম, তোমরা যদি আমাকে এ কাজে বাধা দাও, তাহলে আমি তোমাদেরকে সে জিনিসে বাধা দেব যা তোমাদের জন্যে কঠিনতর হবে- অর্থাৎ মদীনার উপর দিয়ে তোমাদের বাণিজ্যের জন্যে চলাচল।[১] ব্যাপারটা এমন যে মক্কাবাসীর পক্ষ থেকে ঘোষণা যে- বায়তুল্লাহর পথ মুসলমানদের জন্যে নিষিদ্ধ এবং তার জবাব মদীনাবাসীদের পক্ষ থেকে এ ছিল যে, শামদেশে ব্যবসার পথ ইসলাম বিরোধীদের জন্যে আশংকাজনক। এ ব্যাপারটি সুস্পষ্ট ইংগিত করে যে অবস্থা কোন্ দিকে গড়াবে।(৫)

মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ

হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রা) ওখানে হুযুরের (স) অবতরণের পর তিনি যে বিষয়ের চিন্তা করছিলেন তা এই যে, একটি মসজিদ নির্মাণ করতে হবে। তাঁর উটনী যে স্থানে গিয়ে থেমেছিল, । ইবনে সা'দের বর্ণনা মতে সেখানে পূর্ব থেকে মুসলমান, নামাযের জন্যে সমবেত হতেন। আসয়াদ বিন যুরারা (স) ওখানে জামায়াত করাতেন এবং জুমাও সেখানে হতো। এ দু'জন এতিম- সাহল এবং সুহাইলের যমীন ছিল- যা আসয়াদ বিন যুরায়রার (রা) তত্ত্বাবধানে ছিল। এই ছিল বোখারীতে ওরওয়া বিন যুবাইর এবং সীরাতে

---

১. এ হলো বোখারীতে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদের (রা) বর্ণনা, যা তিনি স্বয়ং হযরত সা'দ বিন মুয়ায (রা) থেকে শুনেই করেছেন। এতে এ কথা সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, জাহেলিয়াতের যুগ থেকেই তাঁর এবং উমাইয়া বিন খালাফের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সে মদীনায় এলে সা'দের বাড়িতেই উঠতো। আর ইনি যখন মক্কায় যেতেন তো তার বাড়িতেই উঠতেন। এ বন্ধুত্বের ভিত্তিতে হযরত সা'দ বিন মুয়ায (রা) ওমরা করতে মক্কায় যান এবং তাকে বলেন, আমাকে এমন সময়ে হারামে নিয়ে যাবে যখন কেউ না থাকে। অতএব দুপুরে ওমাইয়া তাকে তাওয়াফের জন্যে নিয়ে গেল। কিন্তু সেখানে আবু জাহলকে পাওয়া গেল। তার সাথে হযরত সা'দের সেসব কথাবার্তা হয়- যা উপরে আমরা উল্লেখ করেছি। এ বর্ণনায় এ কথাও আছে যে, যখন হযরত সা'দ (রা) আবু জাহলকে শক্ত জবাব দিলেন, তখন উমাইয়া বলে, আবুল হাকামের সাথে রূঢ় কথা বলোনা। সে এ উপত্যকার সর্দার। হযরত সা'দ বলন, রাখ ভাই, আমি রসূলুল্লাহ (স) থেকে শুনেছি যে, এরা তোমাকে হত্যা করবে। একথা শুনে উমাইয়া খুব পেরেশান হলো। সে জিজ্ঞেস করলো- এরা আমাকে মক্কায় হত্যা করবে? হযরত সা'দ (রা) বলেন- তা জানিনা। মুসনাদে আহমদে এ কাহিনীর যে বর্ণনা আছে তাতে অতিরিক্ত একথা আছে যে, উমাইয়া সা'দের (রা) এ কথা তার বিবিকে বল্লে- সে বলে, খোদার কসম, মুহাম্মদ (স) মিথ্যা বলেননা।
হাফেজ আবু বকর বায্যার তাঁর মুসনাদে আবদুল্লাহ বিন মাসউদের (রা) যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন- তাতে উমাইয়া বিন খালাফের স্থলে উতবা বিন রাবিয়ার উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে যে, হযরত সা'দকে যখন সে আবু জাহলের সাথে রূঢ় ব্যবহার করতে নিষেধ করলো- তখন তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে (স) এ কথা বলতে শুনেছি যে- তিনি তোমাকে হত্যা করবেন। এ কথা শুনে উতবা হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং বলে, মুহাম্মদের (স) কথা মিথ্যা হতে পারেনা। যদিও বায্যারের এ হাদীসের রাবী নির্ভরযোগ্য- তথাপি সত্য কথা তাই যা বোখারীতে বয়ান করা হয়েছে। উমাইয়া বিন খালাফ বদরের যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত ছিলনা। কুরাইশের লোকেরা তাকে ভর্ৎসনা দিয়ে দিয়ে যুদ্ধে এনেছিল, সে গ্রেফতার হওয়ার পর হুযুরের (স) হাতে নয় হযরত বেলালের (রা) হাতে নিহত হয়। এখন রইলো সে ব্যক্তি যাকে স্বয়ং হুযুর (স) হত্যা করার কথা বলেছিলেন, তো সে উমাইয়া বিন খালাফ নয় বরঞ্চ উবাই বিন খালাফ ছিল। সে ওহোদের যুদ্ধে হুযুরের (স) হাতে নিহত হয়। -গ্রন্থকার।

ইবনে হিশামে মুহাম্মদ বিন ইসহাকের বর্ণনা। বালাযুরী ফতহুল বুলদানে একে সুবিদিত বক্তব্য হিসাবে উদ্ধৃত করেন। (ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় হযরত মুয়ায বিন আফরাকে (রা) তার পৃষ্ঠপোষক বলা হয়েছে এবং কোন কোন বর্ণনায় উভয়কেই পৃষ্ঠপোষক বলা হয়েছে)। বোখারীতে হযরত আয়েশা (রা) ও ওরওয়া বিন যুবাইরের বর্ণনা আছে এবং সীরাতে ইবনে হিশামে ইবনে ইসহাকের বর্ণনাও এরূপ যে, এ যমীনের উপর খেজুর শুকানো হতো। বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ এবং ইবনে জারীরের বর্ণনায় আছে যে, এতে কিছু খেজুর গাছ ছিল, কিছু চাষাবাদের জমি (এবং কোন কোন বর্ণনায় কিছু অকেজো জমি) আর কিছু মুশরেকদের পুরাতন কবর। হযরত আয়েশা (রা) এবং ওরওয়া বিন যুবাইরের বর্ণনামত হুযুর (স) ছেলে দুটোর সাথে জমির মূল্য সম্পর্কে কথা বলেন। তারা বলে, হে আল্লাহর রসূল! আমরা এ জমি হেবা করে দিচ্ছি। কিন্তু হুযুর (স) হেবাতে রাজী না হয়ে মূল্য দিয়ে খরিদ করেন। ইমাম যুহরী থেকে মূসা বিন ওকবার বর্ণনা মতে হুযুর (স) তা দশ দিনারে খরিদ করেন। ওয়াকেদী থেকে ইবনে সা'দ এরূপ বর্ণনাই করেন এবং তাতে অতিরিক্ত এ কথা আছে যে, মূল্য হযরত আবু বকর (রা) পরিশোধ করেন। ফতহুল বুলদানে বালাযুরীও একথা বলেছেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত মুয়ায বিন আফরা (রা) আরজ করেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনি এখানে মসজিদ তৈরী করুন। আমি এ বালকদেরকে রাজী করাব (একথা বলা হয়নি যে, তিনি স্বয়ং মূল্য দিয়ে রাজী করাবেন, অথবা হুযুরের (স) নিকট থেকে মূল্য নিয়ে তার কাছে বিক্রি করার জন্যে রাজী করাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন)।

বোখারী ও আবু দাউদে হযরত আনাসের (রা) এ বর্ণনা আছে যে, হুযুর (স) বনী নাজ্জারকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, তোমরা এ বাগানের[১] মূল্য নির্ধারণ করে দাও। তাঁরা বলেন, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মূল্য চাইনা। এ বর্ণনায় এ বিশদ বিবরণ নেই যে, জমি মূল্য দিয়ে খরিদ করা হয়, না হেবা করে নেয়া হয়। কিন্তু অন্যান্য সকল বর্ণনা সর্বসম্মত যে- মসজিদে নববীর জমি বিনামূল্যে নেয়া হয়নি।

জমি নেয়ার পর তা পরিষ্কার করা হয়, গর্ত ও উঁচু-নীচু সমান করা হয়, কবরগুলো উৎপাটিত করা হয়, খেজুর গাছ কেটে তার কান্ড মসজিদের খুঁটি বানানো হয়। খেজুর পাতার ছাদ করা হয়। ইট ও কাদার গলা দিয়ে দেয়াল তৈরী করা হয়। খালি জমি নামাযের জন্যে রাখা হয়। বর্ষায় কাদা হওয়ার পর মেঝেতে পাথরকুচি বিছিয়ে দেয়া হয়। খেজুর পাতার ছাদের নীচে প্রচন্ড গরম হলে খেজুর পাতায় কাদার লেপ দেয়া হয়। বোখারীতে হযরত আয়েশা (রা)ও ওরওয়া বিন যুবাইর, আবু দাউদে হযরত আনাস (রা) এবং সীরাতে ইবনে হিশামে মুহাম্মদ বিন ইসহাকের বর্ণনা আছে যে, এ মসজিদ নির্মাণে রসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং অন্যান্যদের সাথে ইট ও কাদা বহনে অংশগ্রহণ করেন।

হুযুরের (স) হুজরা নির্মাণ

মসজিদে নববী সংলগ্ন একধারে হুযুর (স) তাঁর জন্যে দুটি কামরা তৈরী করেন- একটি হযরত সাওদার (রা) জন্যে এবং অন্যটি হযরত আয়েশার (রা) জন্যে। ইবনে সা'দ

---

১. মূলতঃ হায়েত حائط শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ এমন বাগানকে বলা হয় যা প্রাচীর ঘেরা থাকে। এতে মনে হয় প্রথমে তা বাগান ছিল এবং পরে তা নষ্ট হয় এবং অন্য কাজে ব্যবহার হতে থাকে যেমন উপরের বর্ণনা থেকে জানা যায়- গ্রন্থকার।

বলেন, এ দুটি কামরাও কাঁচা ইটের ছিল। খেজুর পাতার বেড়ার উপর কাদার প্রলেপ দিয়ে কামরা পৃথক পৃথক করা হয়। ছাদও খেজুর পাতার। দরজার উপর কম্বল লটকিয়ে দেয়া হয়। হযরত হাসান বস্‌রী বলেন, আমি ছোটো বেলায় নাবালক অবস্থায় হুযুরের (স) ঘরে গিয়েছিলাম, ঘরের ছাদ এতো নীচু ছিল যে, হাত দিয়ে স্পর্শ করা যেতো। ইমাম বোখারী ইতিহাসে এবং হাফেজ আবু ইয়ালা তাঁর মুসনাদে লিখেছেন যে, হুযুরের (স) দরজায় আঙুলের নখ দিয়ে টোকা দেয়া হতো। কারণ তাতে কোন কড়া বা আংটা ছিলনা।

পরিবার পরিজনকে মক্কা থেকে ডেকে পাঠানো

হযরত যায়েদ বিন সাবেত থেকে ওয়াকেদীর বর্ণনা আছে যে, হুযুর (স) আবু আইয়ূবের (রা) ওখানে সাত মাস থাকেন। ইবনে সা'দ ও বালাযুরী তা উদ্ধৃত করেন এবং হাফেজ ইবনে হাজার এর সত্যতা স্বীকার করেন।

হুযুর (স) তাঁর নতুন ঘরে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বে হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা) এবং তাঁর আযাদ করা গোলাম আবু রাফেকে (রা) পাঁচশ' দিরহাম[১] ও দুটি সজ্জিত উটসহ মক্কায় পাঠান যাতে তাঁর পরিবার-পরিজন ও সংশ্লিষ্ট লোকদেরকে নিয়ে আসতে পারেন। এ দু'জনের সাথে হযরত আবু বকর (রা) আবদুল্লাহ বিন উরায়কেতকে তাঁর ছেলে আবদুল্লাহর নামে পত্র দিয়ে পাঠান যেন তিনি তাঁর মা ও বোনদের নিয়ে আসেন। যায়েদ বিন হারেসা (রা) উম্মল মুমেনীন হযরত সাওদা (রা), হুযুরের (স) দুই কন্যা হযরত ফাতেমা (রা) ও উম্মে কুলসূম (রা) এবং তাঁর (যায়েদ বিন হারেসার) স্ত্রী উম্মে আইমান (রা) ও তাঁর পুত্র উসামা বিন যায়েদকে (রা) নিয়ে আসেন। কিন্তু হযরত যয়নবকে (রা) আনতে পারেননা। কারণ তাঁর স্বামী আবুল আস বিন রাবী তাঁকে আসতে দেয়নি। হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি বকর (রা) তাঁদের সাথে উম্মে রুমান (রা), হযরত আসমা (রা) ও হযরত আয়েশাকে (রা) নিয়ে আসেন (তাবারানী, ইবনে সা'দ, বালাযুরী ও ইবনে আবদুল বার)।

এখানে ইসলামী আন্দোলনের মক্কী যুগ শেষ হলো। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা এর উপর পর্যালোচনা করব।

---

১. বালাযুরী বলেন হুযুর (স) এ পাঁচশ' দিরহাম হযরত আবু বকর (রা) থেকে গ্রহণ করেন- গ্রন্থকার।

নির্দেশিকা

১. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন।
২. তাফহীমুল কুরআন, ২য় খন্ড, সূরা আনফালের ভূমিকা।
৩. তাফহীমুল কুরআন ২য় খন্ড, টীকা ২৫।
৪. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন।
৫. তাফহীমুল কুরআন- ২য় খন্ড, সূরা আনফালের ভূমিকা।
৬. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন।

চতুর্দশ অধ্যায়

মক্কী যুগের সামগ্রিক পর্যালোচনা

আমাদের পেছন দিকে ফিরে মক্কী যুগের সূচনা থেকে হিজরত পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা উচিত যে, ইসলামী আন্দোলন প্রথমে কতটুকু মূলধন নিয়ে শুরু হয়েছিল, তের বছরে এ মূলধনের মধ্যে কোন্ কোন্ ধরনের পরিবর্ধন হয়েছিল এবং যখন এ আন্দোলন মদনী যুগে পদার্পণ করে তখন তার মূলধন কি ছিল যার সুযোগ গ্রহণ করে মক্কী যুগের অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ এক ভিন্নতর অবস্থায় আপন গন্তব্যপথে অগ্রসর হতে হয়।

এ আন্দোলনের প্রাথমিক অথবা সঠিকতর অর্থে বুনিয়াদী মূলধন একমাত্র মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সত্তা, তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং নবুওতপূর্ব কালের চল্লিশ বছরের জীবন।

হুযুরের (স) উচ্চ বংশ মর্যাদা

ব্যক্তি হিসাবে হুযুর (স) আরবের এক অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন যাঁর বংশ পরিচয় আরববাসী জানতো এবং আরবের অধিকাংশ গোত্র, যারা তাদের বংশ সম্পর্কে গর্ববোধ করতো, এ ব্যাপারে ওয়াকেফহাল ছিল যে, পিতা অথবা মাতার দিক দিয়ে কোথাওনা কোথাও গিয়ে হুযুরের (স) বংশের সাথে মিলিত হয়। এজন্যে হুযুরের (স) মর্যাদা এমন ছিলনা যে, কোন অজ্ঞাত কুলশীল, অপরিচিত, অজ্ঞাত বা নিম্নবংশীয় কোন লোক হঠাৎ এক বিরাট দাবীসহ আবির্ভূত হলো যাকে দেখা মাত্র লোকে বলে যে, এ ধরনের লোকের এমন দাবী করা মোটেই সাজেনা। গোটা আরবের মধ্যে কোন ব্যক্তিই-হুযুরের (স) বংশ মর্যাদার প্রতি সামান্যতম কটাক্ষও করতে পারতোনা। স্বয়ং মক্কা শহরে যতো পরিবার নিজেদের বংশ মর্যাদার অহংকারে কারো কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতোনা। তাদের সকলের সাথে হুযুরের (স) ও তাঁর পরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তাদের মধ্যেও একথা কেউ বলতে পারতোনা যে, তিনি বংশ ও সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে তার চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন। যে কুরাইশ আরবে নেতৃত্বদানের মর্যাদা রাখতো তার এক ব্যক্তি তিনিও ছিলেন। কুরাইশ ইসমাইল (আ) এর বংশধর ছিল। এতে কোন সন্দেহ ছিলনা। দেশের ভেতরে ও বাইরে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছড়িয়ে ছিল। খানায়ে কাবার অলীগিরি ও হজ্বের আকর্ষণের কারণে তাদের সাথে আরবের দূর-দূরান্তের লোকের যোগাযোগ হতো। এসব কারণে আরবের মধ্যে এ গোত্রের এমন উচ্চ মর্যাদা ছিল যা আর কারো ছিলনা। মক্কার মতো কেন্দ্রীয় শহরে কুরাইশের মতো গোত্রে জন্মগ্রহণ করা আরব দেশের পরিবেশে এ আন্দোলনের নেতার জন্যে বিরাট সুযোগ-সুবিধা ছিল।

বনী ইসমাইলে হুযুরের (স) জন্মগ্রহণ

ইসমাইলী খান্দানের সম্মান শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সাথে এ বিষয়েরও বিশেষ গুরুত্ব ছিল যে, বিগত আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসে হযরত ইসমাইলের (আ) পর এ বংশের কোন

ব্যক্তি কখনো নবুওতের দাবী করেনি। বনী আমের বিন সা'সায়ার জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এ বিষয়ের উল্লেখ সে সময়ে করেন যখন তাঁর গোত্রের লোকজন হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তন করে রসূলুল্লাহ্‌র (স) সাথে তাদের সাক্ষাৎ ও আলাপ-চারীর উল্লেখ তাঁর কাছে করেন। তারা যখন তাঁকে বল্লো, কুরাইশের এক ব্যক্তির সাথে আমাদের দেখা হয়- যিনি নিজেকে নবী বলে পরিচয় দেন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেন আমরা যেন তাঁকে আমাদের এলাকায় নিয়ে যাই যাতে আল্লাহর পয়গাম পৌছাতে আমরা তাঁকে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু আমরা তাঁর কথা মেনে নিতে অস্বীকার করি। তখন বয়োবৃদ্ধ ভদ্রলোক দুঃখ করে বলেন, তোমাদের বিবেক তখন কোথায় চলে গিয়েছিল? খোদার কসম, আজ পর্যন্ত কোন ইসমাইলী মিথ্যা দাবী করেনি। এ ছিল হুযুরের (স) ইসমাইল বংশে জন্মগ্রহণ করার আর এক কল্যাণ। ইতিহাসও এ সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, হুযুরের (স) নবুওতের দাবী ছিল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ এ বংশের কেউ কখনো নবুওতের মিথ্যা দাবীসহ আবির্ভূত হয়নি।

তাঁর ব্যক্তিত্ব

তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কথা এই যে, তাঁর গঠন আকৃতি, কথাবার্তা, চালচলন, সদাচরণ প্রভৃতি দেখে শৈশবকাল থেকেই আরবের চরিত্র নির্ণয় বিদ্যাবিদ (Physiognomist) এ কথা বলতো যে, এ কোন অসাধারণ সত্তা যা আবদুল মুত্তালিবের পরিবারে জন্মলাভ করেছে। তাঁর মাতা, দাদা, চাচা, দুধ মাতা সকলেরই প্রতিক্রিয়া ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে যার থেকে জানা যায় যে, অল্প বয়সেই তাঁকে যাঁরা নিকট থেকে দেখতেন, তাঁরাই তাঁর মধ্যে এক সুস্পষ্ট মহত্ব অনুভব করতেন। এমন দৃষ্টান্তও আছে যে, একজন একেবারে অপরিচিত ব্যক্তি তাঁকে দেখেই বলে উঠতো, খোদার কসম, এ মুখমন্ডল কোন মিথ্যাবাদী লোকের হতে পারেনা। তিনি যখন যৌবনে পদার্পণ করেন তখন তাঁর মর্যাদাই এমন ছিল যে, শহরের ও পরিবারের লোকজন তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকেন। লোকে সতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা করতো কারণ তারা তাঁকে সাধারণ মানুষ থেকে অনেক উচ্চস্তরের মনে করতো। তাঁর মর্যাদা, গাম্ভির্য, পরিচ্ছন্নতা, উদারতা, বিনয় নম্রতা ও নিষ্কলুষ চরিত্র এমন সুস্পষ্ট ছিল যে, যে ব্যক্তিই তাঁর সংস্পর্শে আসতো সে তাঁকে সম্মান শ্রদ্ধা না করে পারতোনা। তাঁর এ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তখনো প্রভাবশীল ছিল যখন ইসলামী দাওয়াত পেশ করার কারণে কুরাইশের লোক তাঁর দুশমন হয়ে পড়েছিল। শত্রুতার অন্ধ আবেগে পাগল হয়ে তারা তাঁর সাথে ভয়ানক অসদাচরণ করে ফেলতো। কিন্তু যে শত্রুতা তাদের মনের মধ্যে আগুনের মতো জ্বলতো এবং যে দুশমনীর কারণে তারা তাদের পুত্র ভাই ও নিকট আত্মীয়দেরকে পর্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকেও রেহাই দিতনা, এসব সামনে রেখে চিন্তা করলে মনে হয় যে এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল যা তাদেরকে একেবারে অসহায় করে ফেলতো যখন তারা তাঁর মুকাবেলা করতে আসতো। তিনি সাধারণ দাওয়াত শুরু করার পর ভয়ানক প্রতিকূল অবস্থায়ও প্রকাশ্যে তাঁর তবলিগ অব্যাহত রাখেন। শিয়াবে আবি তালেবে অবরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি বরাবর অবরোধ থেকে বেরিয়ে দাওয়াতী কাজ করতেন। মক্কায় শেষ তিন বছর ছিল খুবই মারাত্মক এবং এ অবস্থাতেও শুধু মক্কায় আগমণকারীদের সাথেই নয়, বরঞ্চ ওকাজ, মাজান্না, যিলমাজায ও মিনার সমাবেশগুলোতে গোত্রীয় সর্দারদের সাথে প্রকাশ্যে সাক্ষাৎ করে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। অবশ্যই এ কথা মেনে নিতে হবে যে, তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন বিরাট শক্তি ছিল যার দরুন কেউ তাঁকে রেসালতের দায়িত্ব পালন থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে সে সব

দৃষ্টান্তও আপনাদের চোখে পড়েছে যে, তাঁর চরম দুশমন আবু জাহল পর্যন্ত কতখানি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

নবুওত পূর্ব জীবন

এখন লক্ষ্য করতে হবে যে, নবুওতের পূর্বে চল্লিশ বছর যাবত নবী (স) মক্কায় যে জীবন অতিবাহিত করেন- তার প্রতিক্রিয়া কি ছিল। এ জীবন শুধু নিষ্কলুষই ছিলনা, অতি উন্নত চরিত্রের নমুনা ছিল। যে সমাজে তিনি শৈশব থেকে প্রৌঢ় কাল পর্যন্ত জীবন যাপন করলেন- যে সমাজের মানুষের সাথে সকল দিক দিয়ে আত্মীয়তা মেলামেশা, বন্ধুত্ব, লেনদেন, প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক- মোটকথা নানা বিষয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে জড়িত ছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ এমন ছিলনা, যে তাঁর সততা, দিয়ানতদারী, তাঁর ভদ্রতা, নৈতিক পবিত্রতা, সদাচারণ, দয়াশীলতা, সহানুভূতি-সহযোগিতার সপ্রশংস স্বীকারোক্তি করেনা। তিনি ছিলেন মংগল ও কল্যাণের মূর্তপ্রতীক। তাঁর পক্ষ থেকে কারো কোন অন্যায়ের অভিজ্ঞতা তো দূরের কথা কখনো কোন আশংকাও হয়নি। তাঁর উপর মানুষের এতোটা দৃঢ় আস্থা ছিল যে, তারা তাঁকে 'আমীন' বলতো। আর এ আস্থা তখন পর্যন্ত অবিচল যখন ইসলামের দাওয়াত পেশ করার কারণে লোক তাঁর দুশমন হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থাতেও দোস্ত-দুশমন নির্বিশেষে সকলেই তাঁর কাছে তাদের আমানত গচ্ছিত রাখতো। তাঁর দ্বারা খেয়ানতের কোন আশংকা কারো মনে ছিলনা। বধ্যভূমি থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাঁর নিকটে গচ্ছিত আমানত ফেরৎ দেয়ার ব্যবস্থা করে পরিপূর্ণ আস্থাভাজন হওয়ার প্রমাণ পেশ করেন। তাঁর সত্যবাদিতা সমাজে এতোটা সর্বজনস্বীকৃত ছিল যে, যখন তিনি ইসলামের দাওয়াত পেশ করা শুরু করেন এবং কুরাইশের লোকেরা তা জোরেশোরে প্রত্যাখ্যান করে, তখনো বিরোধিগণ তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে সাহস করেনি, বরঞ্চ সে দাওয়াতকেই অসত্য বলতে থাকে যা তিনি পেশ করেন। চরম শত্রুতা কালেও কেউ তাঁর চরিত্রের প্রতি কোনরূপ দোষারূপ করতে পারেনি। তাঁর সাথে যাদের অতি নিকট সম্পর্ক ছিল যাদের কাছে কোন দোষ গোপন থাকার কথা নয় যদি মায়াযাল্লাহ যদি কোন দোষ থেকে থাকে, তারাই তাঁর মহান চরিত্র দ্বারা সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত ছিল।

হযরত খাদিজা (রা) কুরাইশের বড়ো বড়ো সর্দারদের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং স্বয়ং স্বেচ্ছায় তাঁর সাথে এ জন্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন যে, তাঁর মহান চরিত্রে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। পনেরো বছরের দাম্পত্য জীবন এ বিষয়ের জন্যে যথেষ্ট যে স্ত্রী তাঁর স্বামীর দোষগুণ সম্পর্কে অবহিত হবেন বিশেষ করে যখন তিনি স্বামী থেকে বয়সে বড়ো, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমতী এবং স্বামী তাঁর অর্থেই ব্যবসা বাণিজ্য করেন। কিন্তু রসূলুল্লাহর (স) ব্যাপারে হযরত খাদিজার (রা) এ দীর্ঘ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ফল যা ছিল তা এই যে, তিনি তাঁকে নিছক একজন উচ্চস্তরের মানুষই নয়, বরঞ্চ এমন মহান মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসাবে পান যে, তাঁকে রাব্বুল আলামীনের রসূল হিসাবে মেনে নিতে এবং তাঁর উপর ঈমান আনতে এক মুহূর্তও দ্বিধা করেননি। অথচ একজন বানোয়াট লোকের দুনিয়াদার স্ত্রী তার স্বামীর প্রতারণামূলক কাজকর্মের দরুন যতোই সুযোগসুবিধা ভোগ করুক না কেন, মনের দিক দিয়ে কখনো তাকে বিশ্বাস করতে পারেনা ও তার উপর ঈমান আনতে পারেনা।

হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা) গোলামী অবস্থায় রসূলুল্লাহর (স) সংস্পর্শে আসেন। মনিবের প্রতি গোলামের ভালোবাসা থাকলেও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কদাচিৎ মধুর

হয়ে থাকে। কারণ গোলাম হয় অসহায় এবং মনিব তার থেকে যে কোন খেদমত গ্রহণের অধিকার রাখে, সে খেদমত তার জন্যে যতোই কঠিন হোক না কেন। তদুপরি মনিবের জীবনের ভালো-মন্দ সব কিছু দেখার সুযোগ গোলামের হয় এবং একজন এখতিয়ার বিহীন খাদেম হিসাবে তার সামনে তার স্বাধীনচেতা মনিবের জীবনের মন্দ দিকটিই বেশী দেখা যায়। কিন্তু হুযুর (স) এমন মনিব ছিলেন যে, গোলাম তাঁর প্রতি মুগ্ধই হতে থাকেন। এমনকি যখন তাঁর বাপ-চাচা তাঁকে গোলামী থেকে মুক্ত করতে আসেন, তখন তিনি মুক্ত হয়ে পিতার সাথে যাওয়ার পরিবর্তে হুযুরের (স) গোলামী করতে থাকাকেই অগ্রাধিকার দেন। পনেরো বছর হুযুরের (স) খেদমতে থেকে এ গোলাম যাঁকে তিনি আযাদ করে পুত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন- তাঁর সমান আচার-আচরণে এতোটা প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, যখন তিনি জানতে পারলেন যে, তাঁর মনিব নবুওতের পদমর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন, তখন তিনি হযরত খাদিজার (রা) মতো তাঁর উপর ঈমান আনতে এক মুহূর্তও ইতঃস্তত করেননি। তিনি কোন অবুঝ শিশু ছিলেননা বরঞ্চ ৩০ বছরের যুবক ছিলেন এবং এমন মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছিলেন যে, অষ্টম হিজরীতে তাঁকে সে সেনাবাহিনীর প্রধান বানিয়ে পাঠানো হয়, যার মধ্যে হযরত জাফর বিন আবি তালেব (রা) এবং খালেদ বিন অলীদের (রা) মতো লোক তাঁর অধীনে ছিলেন। এ জন্যে এ কথা মনে করা উচিত নয় যে, তিনি কোন নির্বোধ সেবক ছিলেননা যাঁর নবুওত ও রেসালাতের গুরুত্ব জানা ছিলনা এবং নিছক তাঁর মনিবের ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে না বুঝেই ঈমান এনেছিলেন। বরঞ্চ প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর দীর্ঘ পনেরো বছরের অভিজ্ঞতায় হুযুরকে (স) এমন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে পান যে, তাঁর রসূলে খোদা হওয়ার ব্যাপারে তাঁর মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। এই চারিত্রিক মহত্বের কারণেই তিনি আপন পিতার সাথে চলে যাননি।

এমন অবস্থা হযরত আবু বকরেরও (রা) ছিল। তিনি বিশ বছর যাবত হুযুরের (স) সাথীই ছিলেননা বরঞ্চ পরম বন্ধুও, ঠিক এমন অবস্থা হযরত আলীর (রা) যিনি হুযুরের (স) গৃহেই প্রতিপালিত হন, ওয়ারাকা বিন নাওফলের- যিনি শিশুকাল থেকেই হুযুরের (স) জীবনযাপন লক্ষ্য করে আসছিলেন এবং হযরত খাদিজার (রা) নিকট আত্মীয় হওয়ার কারণে তাঁকে বেশী করে জানার ও বুঝার সুযোগ হয়েছিল, হযরত ওসমান (রা) হুযুরের (স) ফুফুর ভাগ্নে ছিলেন। হযরত যুবাইর (রা) তাঁর ফুফাতো ভাই ছিলেন এবং হযরত খাদিজার (রা) ভাইপো। হযরত জা'ফর বিন আবি তালেব (রা) তাঁর আপন চাচাতো ভাই ছিলেন। হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রা) ও হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) তাঁর মায়ের আত্মীয় ছিলেন। এঁদের কেউ এমন ছিলেননা, যিনি তাঁর স্বভাব চরিত্র নিকট থেকে দেখেননি এবং এসব লোকই তাঁর নবুওত সকলের আগে মেনে নেন।

নবুওতের পর তাঁর মহৎ গুণাবলীর প্রকাশ

কোন আন্দোলনের সূচনাই যদি হয় এমন মহান সত্তার নেতৃত্বে- তো এ হয় আন্দোলনের বিরাট পুঁজি। কিন্তু শুরু হওয়ার পর থেকে তের বছর পর্যন্ত এ প্রাথমিক পুঁজিতে যে অতিরিক্ত পরিবর্ধন হয়েছে তা এতো মূল্যবান ছিল যে, মানব ইতিহাস তার নজীর পেশ করতে পারেনা। সর্বপ্রথম স্বয়ং রসূলুল্লাহর সে সব গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য করুন যা এ সময়ে সুস্পষ্টরূপে দেখা যায় এবং যা সবচেয়ে বেশী এ দাওয়াত সম্প্রসারণের কারণ।

হুযুরের (স) আর্থিক ত্যাগ

তাঁর সর্বপ্রথম গুণ ছিল তাঁর ত্যাগ যা তিনি এ মহান কাজের জন্যে স্বীকার করেন। নবুওতের সূচনাকালে তিনি ছিলেন একজন সার্থক ও সচ্ছল ব্যবসায়ী। একদিকে ছিল হযরত খাদিজার (রা) অর্থ যা কুরাইশের অন্যান্য ব্যবসায়ীর সর্বমোট অর্থের কম ছিলনা, অন্যদিকে ছিল হুযুরের (স) প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, সুব্যবস্থাপনা ও সততার খ্যাতি যার মুকাবেলা আর কেউ করতে পারতোনা। এ দুটি জিনিস যে ব্যবসায় একত্রে পাওয়া যায় অনুমান করুন তা কত উন্নতি লাভ করে থাকবে। কিন্তু নবুওতের পূর্বে এ অর্থ হুযুর (স) ও তাঁর জীবন সংগিনী বিলাসিতার জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখেননি। বরঞ্চ অভাবগ্রস্থদের সাহায্যে, অসহায়দের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মুসাফিরদের মেহমানদারীর জন্যে ব্যয় করতেন। প্রতিটি সৎ কাজে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রাখতেন। এ জন্যে নবুওতের সূচনাকালে কোন বিরাট আকারের সঞ্চিত অর্থ তাঁর নিকটে ছিলনা। তারপর যখন নবুওতের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয় তখন ক্রমশঃ তাঁর কাছে যাছিল- সবই আল্লাহর পথে ব্যয় করে ফেলেন। তাঁর জন্যে এটা সম্ভবও ছিলনা যে, দ্বীনের তবলিগের সাথে ব্যবসাও পরিচালনা করেন। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তায়েফ যাবার সময় তাঁকে পায়ে হেঁটে যেতে হয়, কোন পরিবহণ সংগ্রহ করতে পারেননি। হিজরত করার সময় তাঁর সমুদয় ব্যয়ভার বহন করেন হযরত আবু বকর (রা)। পরিবার পরিজনকে মক্কা থেকে মদীনা আনার জন্যে তাঁকে হযরত আবু বকরের (রা) নিকট ৫০০ দিরহাম নিতে হয়। তাঁর হাতে কোন দিরহাম-দিনার ছিলনা। প্রকাশ থাকে যে, কোন দাওয়াত পেশকারী যখন সে দাওয়াতের কাজে আপন স্বার্থ এভাবে বিলিয়ে দেয়, তো তা দেখার পর প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয় যে, সে তার উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে একেবারে ঐকান্তিক ও নিঃস্বার্থ। এমনকি দশমনও বিরুদ্ধবাদী পর্যন্ত মুখে কিছুই বলুক না কেন, অন্তর দিয়ে একথা মেনে নেয় যে, এ দাওয়াতের সাথে তার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত নেই। যারা তাঁর দাওয়াত কবুল করে তাঁর সাথে এসে যায়, তাদের জন্যে তাদের নেতার দৃষ্টান্ত এমন শিক্ষণীয় হয় যে, তারা হককে শুধু হক হওয়ার জন্যেই মেনে নেয়, কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ তাদের ঈমানের সাথে জড়িত থাকেনা এবং ত্যাগ ও কুরবানীতেও তারা তাদের নেতার অনুসরণ করে।

হুযুরের (স) দৃঢ় সংকল্প

দ্বিতীয় বস্তু ছিল তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তা যাকে কোন বিপদ মুসিবত ও বিরোধিতার ঝড়-তুফান পরাভূত করতে পারেনি, কোন ভয়-ভীতি যাকে আপন স্থান থেকে সরাতে পারেনি। কোন প্রলোভন ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। কোন কঠিন প্রাণান্তকর পরিস্থিতিও তাঁকে নিরাশ ও ভগ্ন হৃদয় করতে পারেনি। তাঁর অবিচলতা ছিল পাহাড়ের মতো যার সংঘর্ষে এসে সকল বিরুদ্ধ শক্তি শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়ে যে, কোন ষড়যন্ত্র, কোন প্রকারের শক্তি প্রদর্শন, জুলুম অত্যাচার, প্রলোভন, অপপ্রচার, কোন হীন অপকৌশল দ্বারা তাঁকে সে কাজ থেকে নিবৃত্ত করা যাবেনা যা নিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। বছরের পর বছর ধরে লোকে তাঁর এ দৃঢ় সংকল্প লক্ষ্য করার পর এ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে বাধ্য হয় যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির হকের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় না হয়েছে এবং যতোক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি ব্যক্তিস্বার্থ থেকে মুক্ত না হয়েছে, সে তার সংকল্পে এতোটা মজবুত হতে পারেনা। এ বস্তুই তাঁর সাথীদের মধ্যে ঈমানের দৃঢ়তা এবং সত্য পথে অবিচলতা সৃষ্টি করেছে। এ জিনিসই সকল নিরপেক্ষ লোকদের মনে এ দৃঢ় প্রত্যয়

সৃষ্টি করেছে যে, তিনি যে দাওয়াত পেশ করছেন তা বিশুদ্ধ হকপুরস্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

হুযুরের (স) নজীর বিহীন বীরত্ব

তৃতীয় বস্তু ছিল হুযুরের (স) নির্ভীকতা ও বীরত্ব যার জন্যে কোন বিরাট শক্তির দ্বারা দমিত হওয়া এবং বিরাট বিপদে ভয় পাওয়া কোন্ বস্তু তা তাঁর জানা ছিলনা। কুরাইশ কাফেরদের একটি ক্রূদ্ধ জনতা তাঁকে হারামে ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি সেই ব্যক্তি যে একথা বলে, তুমি কি সেই ব্যক্তি যে এ ধরনের কথা বলে? জবাবে তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে বলেন, হাঁ, আমি এ কথা বলি এবং এ কথাও বলি। জীবনের দুশমনদের মধ্যে নিজেকে পরিবেষ্টিত দেখেও তিনি সামান্য পরিমাণেও ঘাবড়ে যাননি। গারে সওরের একেবারে মুখে দুশমন পৌঁছে যাচ্ছে এবং তিনি সে সময়ে প্রশান্তচিত্তে নামায পড়ছেন। হযরত আবু বকর (রা) বলছেন, এ জালেম লোক তাদের পায়ের দিকে তাকালেই আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তিনি কোন প্রকার পেরেশানী ছাড়াই শান্ত মনে বলেন, আবু বকর (রা), তোমার ঐ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা যাদের মধ্যে একজন আল্লাহ্ আছেন? ঘাবড়ায়োনা, আমাদের সাথে আল্লাহ্ আছেন। দুশমন তাঁর পবিত্র মস্তকের জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করে রেখেছে। পুরস্কার লভের আশায় চারদিকে লোক ছুটাছুটি করছে। তিনি নিশ্চিন্ত মনে কুরআন তেলাওত করতে করতে পথ অতিক্রম করে চলেছেন। কোন দিকে ফিরেও দেখছেন না যে, কেউ পিছু করেছে কিনা। এমন সাহসী নেতার সাথে সাহসী লোকই আসে। তাঁর সাহসিকতা দেখে দেখে তাদের সাহসিকতা আরও বেড়ে যায়। দুশমন তার শত্রুতায় যতোই অন্ধ হোকনা কেন, তাঁর এ গুণের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ না করে পারেনা। সে মনোবল হারিয়ে ফেলে যখন সে জানতে পারে যে, সে এমন এক ব্যক্তির মুকাবেলা করছে যে ভয় কোন বস্তু তা তাঁর জানা নেই। কোন আন্দোলনের জন্যে বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের জন্যে তার নেতার নির্ভীক ও সাহসী হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বড়ো গুণ। নেতার ভীরুতা, বরঞ্চ সাহসিকতার মধ্যে সামান্য দুর্বলতা অগ্নি পরীক্ষার সময় গোটা আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দেয়।

হুযুরের (স) মহানুভবতা

হুযুরের (স) চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ গুণ ছিল- ধৈর্য, সহনশীলতা, প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ ও উচ্চাকাংখা। দুশমনের জঘণ্যতম আক্রমণের পরও তিনি ক্রোধে অধীর হয়ে পড়েননি। গালির জবাব গালির দ্বারা দেননি। কোন কটু কথা ও ভিত্তিহীন অভিযোগের জবাবে তাঁর মুখ থেকে শালীনতা বিরোধী কোন শব্দ বেরয়নি। দুশমন বার বার এমন আচরণ করে যা অত্যন্ত মর্মান্তিক, অবমাননাকর ও উস্কানীমূলক। কিন্তু তিনি অত্যন্ত মহানুভবতা সহকারে সব নীরবে সহ্য করেন। মন্দের জবাব মন্দের পরিবর্তে ভালোর সাথে দিয়েছেন। মক্কায় সুদীর্ঘ সংকটকালে এমন কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবেনা যাতে ভদ্রতা ও শালীনতার আচরণ তিনি পরিহার করেছেন। এ ছিল সেই মহৎ গুণ যা চারি পার্শ্বের সমাজে তাঁর চারিত্রিক মর্যাদা বর্ধিত করে চলেছিল এবং তাঁর বিরোধিগণকে সে ব্যক্তির দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করে চলেছিল যার মধ্যে সামান্য পরিমাণে নৈতিকতা ও ভদ্রতার কোন গুণ বিদ্যমান ছিল। তায়েফ থেকে কঠিনতর অবস্থার সম্মুখীন তিনি হননি। কিন্তু সে সময়েও তাঁর মুখ থেকে দোয়াই বেরিয়েছে এবং এ কথায় তিনি রাজী হননি যে, জালেমদের প্রতি কোন শাস্তি নাযিল হোক। যুদ্ধের ময়দানের পূর্বেই তিনি নৈতিক ময়দানে তাঁর বিরোধিদেরকে পরাভূত

করেন। এ পরাজয়ের উপর শেষ মোহ্‌র অংকিত হয় সে সময়ে যখন বধ্যভূমি থেকে বের হবার সময় তিনি মক্কাবাসীদের আমানত ফেরৎ দেয়ার চিন্তা করেন। যে ব্যক্তি তাঁর এ আচার-আচরণ ও ভূমিকা দেখার পর মন থেকে এ কথা মেনে নেবেনা যে, জাহেলিয়াত পন্থীগণ সেই ব্যক্তির মুকাবেলা করছে যিনি তাদের কওমেরই নয় বরঞ্চ সমগ্র দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত মানুষ, তার বিবেক একেবারে মৃতই হবে। ইসলামী আন্দোলনে যোগদানকারীদের নৈতিক প্রশিক্ষণের জন্যেও হাজার ওয়াজ-নসিহত অপেক্ষাও তাঁদের নেতার এ বাস্তব দৃষ্টান্ত ছিল অধিক প্রভাবসম্পন্ন। এরি এ প্রভাব ছিল যে, যে ব্যক্তিই তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করেছে সে চরিত্রের দিক দিয়ে আপন সমাজে এতোটা উন্নত হয়েছে যে, যে কেউ প্রকাশ্যে মূর্তিপূজক ও খোদা পুরস্তের পার্থক্য দেখতে পেতো।

তাঁর কথা ও কাজে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যতা

পঞ্চম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ এ ছিল যে, তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে নামমাত্র বৈপরিত্বও ছিলনা। যা তিনি বলতেন তাই করতেন। যে জিনিসকে তিনি মন্দ বলেন এবং মানুষকে তা করতে নিষেধ করেন, তার সামান্য চিহ্নও তাঁর চরিত্র ও আচার আচরণে পাওয়া যেতোনা। মক্কার লোক তাঁর বাড়ির বাইরের জীবনই নয় বাড়ির ভেতরের জীবনও দেখতে পারতো। কারণ তাদের মধ্যে কত লোক তাঁর পিতার, মাতার এবং বিবির আত্মীয় ছিল। কিন্তু কেউ এ কথা বলতে পারেনি যে, তিনি যে কাজ থেকে অপরকে বিরত থাকতে বলতেন, তা অথবা তার থেকে অতি অল্প পরিমাণের কোন মন্দ কাজও তাঁর মধ্যে পাওয়া যেতো। এভাবে যে সৎ কাজের দিকে তিনি মানুষকে দাওয়াত দিতেন, সবচেয়ে বেশী সে কাজ নিজে করতেন। তাঁর জীবন ছিল তার বাস্তব নমুনা। কেউ কখনো এ বিষয় চিহ্নিত করতে পারেনি যে, সেসব সৎ কাজ করতে সামান্য পরিমাণেও তাঁর কোন ত্রুটি ধরা পড়েছে। কোন আন্দোলনের সাফল্যের জন্যে, বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের, সর্বোৎকৃষ্ট জামানত এই যে, তার নেতা কথা ও কাজের বৈষম্য থেকে মুক্ত হবেন এবং তাঁর শিক্ষা শুধু মুখের কথা হবেনা বরঞ্চ তাঁর বাস্তব জীবন হবে সে শিক্ষার মূর্ত প্রতীক। এ নেতার আনুগত্য যারা করে তাদের উপরও তাঁর গভীর প্রভাব পড়বে। আর সেসব লোকও প্রভাবিত না হয়ে পারবেনা যারা নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে সত্যানুসন্ধানের জন্যে তাঁকে দেখে। এমনকি বিদ্বেষ পোষণকারী বিরোধীদের মধ্যে থেকেও বিরাট সংখ্যক লোক তাঁর দ্বারা বশীভূত হয়।

তিনি ছিলেন সকল প্রকার গোঁড়ামির উর্ধ্বে

যে ষষ্ঠগুণটি অন্যান্য গুণাবলী থেকে নিম্নতর ছিলনা তা এই যে, তিনি সকল গোঁড়ামি থেকে মুক্ত ছিলেন। গোত্র, কওম, জন্মভূমি, ভাষা, বর্ণ, বংশ মোটকথা কোন কিছুরই গোঁড়ামি তাঁর মধ্যে ছিলনা। ধন ও দারিদ্র্যের ভিত্তিতে তিনি মানুষের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতেননা। সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে কেউ উচ্চ শ্রেণীর এবং কেউ নিম্ন শ্রেণীর- এ ছিল তাঁর নিকটে অর্থহীন। তিনি মানুষকে শুধু মানুষের মর্যাদায় দেখতেন এবং মানুষের যে কেউই সত্যকে গ্রহণ করতো, সে তাঁর দলে একেবারে সমান মর্যাদা লাভ করতো। তা সে কুরাইশী হোক অথবা অকুরাইশী, আরব হোক অথবা হাবশী অথবা রোমীয়, কালো হোক অথবা সাদা, গরীব হোক অথবা ধনী, জাহেলিয়াতের সমাজ ব্যবস্থার দৃষ্টিতে ভদ্র হোক অথবা ইতর। এটাই সেই বস্তু ছিল যা ইসলামী আন্দোলনের সূচনা লগ্ন থেকেই তার একটি বিশ্বজনীন আন্দোলন হওয়ার ভিত্তি রচনা করেছিল। উম্মতে মুস্‌লিমাকে একটি

আন্তর্জাতিক উম্মতের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছিল। ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ইসলাম ও কুফর ব্যতীত অন্য আর সব কিছুর ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে পার্থক্যের অনুভূতি তিনি দূর করে দেন এবং তাঁর দলে গোলাম ও আযাদ, গরীব ও আমীর, উচ্চ ও নীচ, আরব ও অনারব, সকলে একেবারে সমান মর্যাদাসহ শরীক ছিল। আর শরীক হতে পারতো যদি তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনতো। আরবের মুষ্টিমেয় অহংকারী লোক ব্যতীত জনসাধারণের জন্যে এ জিনিস নিজের মধ্যে এক স্বাভাবিক আকর্ষণ পোষণ করতো যা অবশেষে কার্যকর প্রমাণিত হয়।

এ ছিল নবী পাকের (স) ওসব গুণাবলী যা তের বছরের মক্কী জীবনে প্রকাশ লাভ করে- যার প্রভাবে দুশমনের সকল চেষ্টা চরিত্র সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলন সম্মুখেই অগ্রসর হয়েছে। অতিরিক্ত গুণাবলী তাঁর মধ্যে লুক্কায়িত ছিল ও তার বহিঃপ্রকাশের জন্যে অন্য পরিস্থিতির দাবী রাখতো যা ইসলামী আন্দোলন সামনে অগ্রসর হয়ে মদীনায় প্রসার লাভ করে।

কুরআনের বশীকরণ শক্তি

এ আন্দোলনের অন্য বৃহত্তম মূলধন ছিল কুরআন মজিদ। তার দু'তৃতীয়াংশের কিছু কম মক্কায় নাযিল হয়। আরববাসী অলংকারপূর্ণ ভাষা ও বাকপটুতা ভালোবাসতো। এ ভালোবাসা তাদেরকে ওকাজের মতো মেলায় কবি ও বাগ্মীদের কথা শুনার জন্যে টেনে নিয়ে যেতো। কিন্তু কুরআন শুনার পর তাদের দৃষ্টিতে বড়ো বড়ো ভাষাবিদদের কোন মর্যাদাই আর রইলোনা। কবি ও বাগ্মী তার সামনে হতবাক হয়ে পড়ে। সাহিত্যের দিক দিয়ে তার ভাষা এতো উচ্চাংগের যে, কেউ তার থেকে উচ্চতর তো দূরের কথা সমপর্যায়ের উচ্চ সাহিত্যের ধারণাও করতে পারতোনা। তার বর্ণনা এতো শ্রুতিমধুর যে, লোক তা শুনার পর এ নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে। বিরোধীগণ তাকে যাদু বলে অবিহিত করে। নিরপেক্ষ লোক বলতে থাকে- এ মানুষের বাণী হতে পারেনা। তার যাদুকরী প্রভাব এমন ছিল যে, হযরত ওমরের (রা) মতো চরম ইসলাম দুশমনের মনও বিগলিত করে এবং তাঁকে এনে রসূলে আকরামের (স) কদম মোবারকে সমর্পণ করে। কুরাইশের একজন খ্যাতিমান সর্দার জুবাইর বিন মুতয়েম- বদর যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে আলাপ আলোচনার জন্যে মদীনা যান। তখন নবী (স) মাগরেবের নামায পড়াচ্ছিলেন এবং সূরা তূর তেলাওত করছিলেন। বোখারী ও মুসলিমে জুবাইর বিন মুতয়েমের নিজস্ব বর্ণনা এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে- হুযুর (স) যখন ৩৫ থেকে ৩৯ আয়াত পড়ছিলেন, তখন আমার বক্ষ থেকে মন উড়ে উঠছিল।

পরবর্তীকালে তাঁর মুসলমান হওয়ার বড়ো কারণ এ ছিল যে, সেদিন এ আয়াতগুলো শুনার পর তাঁর মনের মধ্যে ইসলামের ভিত্তি রচিত হয়। এ জন্যে দুশমন চেষ্টা করতো যাতে মানুষ তা না শুনে। কিন্তু স্বয়ং তিনি বিরত থাকতে পারেননি। চুপে চুপে তিনি তা শুনতেন। এ চরম প্রভাব সৃষ্টিকারী বাণীর মাধ্যমে শির্ক ও জাহেলিয়াতের এক একটি দিকের এমন যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করা হয়েছে যে, কোন বিবেকবান লোকের পক্ষে সম্ভব ছিলনা যে সেসব আকীদা বিশ্বাস, প্রথা ও নৈতিক অনাচারের সপক্ষে টুঁ শব্দ করে, যে সবের উপর আরবের ধর্ম ও সংস্কৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারপর এ বাণীর মাধ্যমে অতীব হৃদয়গ্রাহী ভংগীতে ইসলামের আকীদাহ, তার সভ্যতা সংস্কৃতির মূলনীতি ও তার নৈতিক শিক্ষা পেশ করা হয় যার সমালোচনায় চরম বিরোধীরও মুখ খোলার কোন অবকাশ রইলোনা। তারপর ইসলামের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে মারপিট, জুলুম নির্যাতন,

গালিগালাজ, মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ রচনা, হৈহল্লা প্রভৃতির হাতিয়ার ব্যবহার করতে কাফেরগণ বাধ্য হয়। কিন্তু এ ছিল স্বয়ং তাদের পক্ষ থেকে যুক্তি প্রমাণ এবং নৈতিকতা ও ভদ্রতার ক্ষেত্রে স্বীয় পরাজয়ের বাস্তব স্বীকৃতি। যার মধ্যে যৌক্তিকতার সামান্যতম লেশ পাওয়া যায় এমন প্রতিটি ব্যক্তি এ সংগ্রামে উভয় পক্ষকে দেখার পর এরূপ অনুভব করতে থাকে যে, অস্বীকার ও বিরোধিতাকারীদের নিকটে কুরআনের যুক্তি ও তার মহান শিক্ষার কোন জবাবহীন অপকৌশল ও অমানবিক ফাঁকিবাজি ছাড়া কিছু নেই। এ প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব শুধুমাত্র মক্কাবাসীদের সামনেই চলছিলনা। সমগ্র আরব তার প্রতি লক্ষ্য রাখছিল। মক্কায় তো দিনরাত সকল শ্রেণীর লোক কোন না কোন ভাবে কুরআন শুনছিল এবং কুরআনের জবাবে কুরাইশ সর্দারগণ ও তাদের অধীন ব্যক্তিগণ যে কর্মকান্ড করছিল তাও তারা দেখছিল। কিন্তু দশ বছর যাবত প্রতিবছর রসূলুল্লাহ (স) ওকাজ থেকে মিনা পর্যন্ত স্থানগুলোতে অনুষ্ঠিত সকল সমাবেশ করে আরবের প্রত্যেক অঞ্চল থেকে আগত লোকদেরকে কুরআন শুনাতে থাকেন। অপরদিকে আবু জাহল ও আবু লাহাবের মতো লোকেরা জনসমক্ষে নবীকে (স) পাথর মেরে ও তাঁর উপর ধূলা-মাটি নিক্ষেপ করে তাদেরকে এ কথা বলতো যে- এ বাণীর জবাব তাদের নিকটে কি আছে। এর পরিণাম এই হলো যে, মক্কাতেও সকল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ইসলামের অগ্রগতি হতে থাকলো এবং আরব ভূখন্ডেও কোন গোত্র এমন ছিলনা যার কেউ না কেউ ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েনি। মক্কী যুগে পরিস্থিতি এমন ছিল যে, প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা অল্প ছিল। কিন্তু তার বিশ গুণ লোক এমন ছিল, যাদের অন্তরে কুরআনের শিক্ষা, রসূলের (স) প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁর মজলুম সংগীসাথীদের প্রতি সহনুভূতি কুরাইশের অন্যায় অত্যাচারের প্রতি ঘৃণা স্থান লাভ করে। এ যুগের এ কাজ পুরোপুরি ফলপ্রসূ হওয়ার জন্যে এক মদীনার প্রত্যাশী ছিল যা যথাসময়ে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে সামনে এলো।

হুযুরের (স) প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের গুণাবলী

তৃতীয় বিরাট মূলধন ছিল ঈমান আনয়নকারী মুসলমানদের সে বাছাই করা দল যা তের বছর ব্যাপী আন্দোলন লাভ করেছিল। তাঁরা পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ মন মস্তিষ্ক ও চিন্তাধারার লোক ছিলেন যাঁরা শির্ক ও জাহেলিয়াতের অন্ধকার পরিবেশে লালিত পালিত হওয়া সত্ত্বেও, কুরআনের বানী শ্রবণ করে স্বীয় পূর্ব পুরুষের দ্বীনকে ভ্রান্ত ও দ্বীন ইসলামকে সত্য বলে মেনে নেন এবং কোন গোঁড়ামি তাঁদের ঈমান আনার পথে প্রতিবন্ধক হয়নি। তাঁরা জানতেন যে, নিজের পরিবার, গোত্র এবং শহরের জনগণের মতের বিপরীত ইসলাম গ্রহণ এবং নবী মুহাম্মদের (স) আনুগত্য করার অর্থ কি। ঈমান আনয়নকারীদেরকে যে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল তা তাঁরা স্বচক্ষে দেখতেন। কিন্তু তাঁরা এমন নির্ভীক চিত্ত লোক ছিলেন যে, কোন ভয়-ভীতি তাঁদেরকে বাতিলকে প্রত্যাখ্যান এবং হককে গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তাঁরা সকল প্রকার অত্যাচার এজন্যে সহ্য করেন যে, যাকে তারা ভ্রান্ত মনে করেছে তার অনুসরণ কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। আর যা সত্য হওয়া তাঁরা জানতে পেরেছেন, তা ছাড়তে তাঁরা প্রস্তুত নন। তাঁদেরকে নির্মমভাবে মারপিট করা হয়েছে, উল্টা লটকানো হয়েছে, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কষ্ট দেয়া হয়েছে, তাঁদেরকে শৃংখলিত করে বন্দী করে রাখা হয়েছে, তাঁদেরকে জ্বলন্ত আগুনের উপর ঠেসে ধরা হয়েছে, উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর দিয়ে হিঁচড়ে নেয়া হয়েছে, তাঁদের ব্যবসা বাণিজ্য নষ্ট করা হয়েছে, তাঁদের সম্মানিত ব্যক্তিগণকে জনসমক্ষে হেয়-অপদস্ত করা হয়েছে। কিন্তু এসব কিছু তাঁরা শুধু হকের জন্যে বরদাশ্‌ত

করেছেন এবং তাদের মধ্যে কোন নারী ও পুরুষকে ঈমান থেকে কুফরের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়নি। তাঁরা তাঁদের ঈমান রক্ষার জন্যে দু'বার হাবশায় এবং শেষে মদীনায় হিজরত করেন। বাড়িঘর, ক্ষেত-খামার, ধনসম্পদ, আত্মীয় স্বজন সব কিছু পরিত্যাগ করে- খোদার পথে বেরিয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে বহু সংখ্যক এমন ছিলেন- যাঁরা পরনের কাপড় ছাড়া আর কিছু নিয়ে যেতে পারেননি। তাঁদের এ কর্মপদ্ধতি প্রমাণ করে যে, ইসলামী আন্দোলন ওসব অত্যন্ত একনিষ্ঠ নিবেদিতপ্রাণ লোক পেয়েছে, যাঁরা যদিও মুষ্টিমেয় কিন্তু এমন নির্ভীক যে, স্বীয় দ্বীনের জন্যে যে কোন কুরবানী দিতে পারেন, সকল মুসিবত হাসি মুখে বরণ করতে পারেন, সকল দুঃখ কষ্ট বরদাশ্‌ত করতে পারেন এবং যে কোন বিরাট শক্তির মুকাবেলা করতে পারেন। এসব গুণাবলীর সাথে এমন বিরাট নৈতিক বিপ্লব কুরআনের শিক্ষা ও নবী পাকের (স) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের জীবনে রূপলাভ করে যে, তাঁদের সততা, দিয়ানতদারী, পরহেজগারী, পাক পবিত্রতা, খোদাভীরুতা ও খোদা পুরস্তি, নিষ্কলুষ চরিত্র, ভদ্রতা ও শালীনতা, মজবুত ও আস্থাভাজন জীবন চরিতের দিক দিয়ে শুধু আরবেই নয়, গোটা দুনিয়ায় তার কোন নজীর পাওয়া যেতোনা। নবী মুহাম্মদ (স) যেভাবে সে সমাজে আলোকস্তম্ভের ন্যায় ছিলেন, তেমনি তাঁর সাহাবীগণের জীবনে নৈতিক বিপ্লবও এতোটা সুস্পষ্ট ছিল যে, তা দেখে প্রত্যেকে কাফেরদের নৈতিক অবস্থা এবং তাঁদের নৈতিক অবস্থার পার্থক্য সুস্পষ্ট দেখতে পেতো। গোঁড়ামি ও আক্রোশের ভিত্তিতে বিরোধিগণ মুখে তা স্বীকার করতে পারতো, কিন্তু তাদের অন্তর জানতো যে, প্রাচীন জাহেলিয়াত কোন্ চরিত্র তৈরী করতো এবং এ নতুন দ্বীন কোন্ চরিত্রের লোক তৈরী করছে।

মদীনার আনসারের গুণাবলী

চতুর্থ বিরাট ও মূল্যবান পুঁজি যা মক্কী যুগের শেষ তিন বছরে ইসলামী আন্দোলন লাভ করে, তা মদীনার আনসারের ঈমানের এখলাস বা আন্তরিকতা। তাঁদের নবী পাকের (স) সাহচর্য ও তরবিয়তের সুযোগ হয়নি, না তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণের পবিত্র জীবন যাপন দেখার সুযোগ হয়েছে। মক্কার ঈমানদারদের মতো কুরআন পাকের অতটা জ্ঞানও তাঁরা লাভ করেননি। কিন্তু তাঁরা এমন সত্যনিষ্ঠ ও সুস্থ মস্তিষ্ক লোক ছিলেন যে, তাঁরা হকের এক ঝলক দেখা মাত্র তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা ইসলামের সিরাতে মুস্তাকীমের সংকেত চিহ্ন পাওয়া মাত্র শতাব্দীর জমাট বাঁধা মুশরেকী জাহেলিয়াতের ধুলি আবর্জনা ঝেঁটিয়ে বের করে ফেলেন। তাঁরা পাকা ফলের মতো ইসলামের ঝুলিতে এমনভাবে টপাটপ পড়তে থাকেন যে, তের বছরে মক্কায় যতো লোক ঈমান এনেছেন, তিন বছরে তার চেয়ে অনেক বেশী পুরুষ, নারী, যুবক, বৃদ্ধ মদীনায় ঈমান আনেন। এতেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি, বরঞ্চ এমন আন্তরিকতাসহ ঈমান আনেন যে, রসূলুল্লাহকে (স) এবং তাঁর সাথী সকল মুসলমানকে তাঁরা তাঁদের ওখানে হিজরত করার দাওয়াত দেন। অথচ এ দাওয়াত দেবার সময় তাঁরা ভালো করে জানতেন যে, তার পরিণামে তাঁদেরকে গোটা আরবের দুশমনী খরিদ করতে হবে, যেমন আকাবায় শেষ বায়আতের সময় তাঁদের ভাষণে প্রকাশ পায়। কথা শুধু এতোটুকুই নয় যে- তাঁরা হুযুর (স) ও তাঁর মক্কী সাহাবীদের জন্যে নিজের শহরকে দারুল হিজরত স্বরূপ পেশ করেন, বরঞ্চ সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁরা সন্তুষ্টচিত্তে তাঁকে তাঁদের শাসক হিসাবে স্বীকার করে নেন। তাঁরা তাঁর বিশ্বস্ত প্রজা ও নিবেদিতপ্রাণ সেনাবাহিনী হয়ে যান। হুযুরের (স) সাথে হিজরত করে আগমনকারী মুসলমানগণকে নিজেদের শহরে নিজেদের সাথে সমান অধিকার দেন এবং নিজেদের বাড়ি, ধনসম্পদ,

এমনকি ভূসম্পত্তি পর্যন্ত তাঁদের জন্যে পেশ করেন।

এ জিনিসই ইতিহাসের মোড় বদলে দিয়েছে। ইসলামকে একটি দাওয়াত ও আন্দোলনের স্থান থেকে উঠিয়ে একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের মর্যাদায় ভূষিত করেছে। সেই সাথে নবীকে (স) এ সুযোগ দান করে যে- তিনি একটি স্বাধীন সার্বভৌম দারুল ইসলামে ইসলামের এক একটি দিক বাস্তবায়িত করে দুনিয়ার সামনে যেন এ নমুনা পেশ করতে পারেন যে, লা শরীক আল্লাহর প্রেরিত দ্বীন কেমন লোক তৈরী করে, কেমন সমাজ গঠন করে, কোন ধরনের সভ্যতা সংস্কৃতির জন্ম দেয়, কেমন চারিত্রিক প্রাণশক্তি গোটা সমাজে সঞ্চারিত করে। অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা, রাজনীতি, আইন ও বিচার বিভাগের কেমন ব্যবস্থা কায়েম করে। যুদ্ধে তার নীতি কি, বিজয় লাভের পর বিজিতদের সাথে কেমন আচরণ করে, চুক্তি করার পর কিভাবে তা মেনে চলে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তার দৃষ্টিভংগী কি, তার নমুনার উপাদান কি ছিল এবং বাস্তবে তা পেশ করার পর কি সুফল হলো- এ বিষয়বস্তু আলোচনা করা হবে তৃতীয় খন্ডে।

নির্দেশিকা

১. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন।

সমাপ্ত

www.icsbook.info

সীরাতে সরওয়ারে আলম

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী